বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

বরিশাল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

বরিশাল

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী

সংগ্রাহক

সুদীপ্তা অধিকারী

আতিকুর রহমান হিমু

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বরিশাল

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩৩৯

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA BARISHAL : (Present state of Folklore in Barishal District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 400.00 only. US$: 07

ISBN-984-07-5348-7

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি- তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার

www.pathagar.com

জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১.সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

২.সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।

৩.সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।

৪.সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।

৬.সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭.সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।

৮.প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।

৯.সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।

১০.সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

১১.সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১২.বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২.জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩.জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪.জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫.জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬.লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭.অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক.ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ.ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ.দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ.যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ.স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ.থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন

www.pathagar.com

এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান বরিশাল জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বরিশালের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-১০৪

ক. নামকরণ, প্রতিষ্ঠা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
খ. উপজেলাসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়
গ. নদ-নদী
ঘ. রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ঙ. মুক্তিযুদ্ধ
চ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ১০৫-১৬৮

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকছড়া
ঘ. লোককবিতা

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৬৯-১৯২

১. মৃৎশিল্প
২. নৌশিল্প
৩. শঙ্খশিল্প
৪. বাঁশশিল্প
৫. শোলাশিল্প
৬. পাটি-চিকনি-হোগলা ও মাদুর শিল্প
৭. কচুরিপানা-পাট-শন-সুতার তৈরি বাহারি পণ্যসামগ্রী
৮. পিঁড়িচিত্র
৯. আলপনা
১০. ডালা/কুলাচিত্র
১১. সরাচিত্র
১২. ঘটচিত্র
১৩. হাঁড়িচিত্র
১৪. অঙ্গচিত্র
১৫. কাঠচিত্র

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৯৩-১৯৪

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৯৫-২০০

লোকসংগীত (folk song) ২০১-২৮৮

১. রয়ানি
২. বিয়ের গান : হয়লা
৩. গুণাই বিবি পালার গান
৪. বাস্তু পুজোর গান
৫. পার্বণ সংগীত
৬. পুরাণের গান
৭. গাজনের গান
৮. ষাণ্মাসিক গান
৯. চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান
১০. আবদুল লতিফ-এর গান
১১. জারি গান
১২. ত্রিনাথ মেলার গান
১৩. অন্যান্য লোকসংগীত

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৮৯-২৯৬

লোকউৎসব (folk festival) ২৯৭-৩১৬

১. বৈশাখি উৎসব
২. নবান্ন
৩. ঈদ উৎসব
৪. শারদোৎসব
৫. আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগৈলঝাড়ায় নারীদের নৌকাবাইচ
৬. হারতায় লক্ষ্মী পুজার নৌকা বাইচ
৭. বড়দিন
৮. শশ্মান দীপালী

লোকমেলা (folk fair) ৩১৭-৩২৮

১. মাধবপাশার মেলা
২. বাটাজোরের অশ্বিনী মেলা
৩. আগৈলঝাড়ার মার্বেল মেলা
৪. কচ্ছপ মেলা
৫. লক্ষ্মী দশহরার মেলা

www.pathagar.com

৭. মাহিলাড়ার বইমেলা
৮. সূর্যমণির মেলা
৯. আরজ মেলা
১০. ছবি খাঁর বই মেলা
১১. কলসকাঠির জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা
১২. জীবনানন্দ মেলা
১৩. শিবচতুর্দশীর মেলা

লোকাচার (ritual) ৩২৯-৩৯০

১. চৈত্র সংক্রান্তিতে তিতা খাওয়া
২. ভাইফোঁটা
৩. হরিজন সম্প্রদায়ের সূর্যপূজা
৪. আউগলাই-নিআউগলাইয়ের ব্রত
৫. ঘাটকালীর ব্রত
৬. শ্রীশ্রীসুবচনীর পাঁচালি ও ব্রতকথা
৭. শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালি
৮. শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালি

লোকখাদ্য (folk food) ৩৯১-৪০৪

১. বালাম চাউল, ২. গৌরনদীর দই, ৩. গুঠিয়ার সন্দেশ, ৪. নকশি পিঠা,
৫. মুড়ি, ৬. হোগলের গুড়ি, ৭. শামুক চুন, ৮. আমড়ার চাটনি,
৯. কাঁকড়া, ১০. শাপলা, ১১. মোচা ও থোর, ১২. ইলিশঝুড়ি

লোকনাট্য (folk theatre) ৪০৫-৪৮৮

ক. লোকনাট্য
   ১. আসমান সিংহ
   ২. গুনাই বিবি
খ. লোকনৃত্য
   শিবের গাজন ও নীলের নাচ

লোকক্রীড়া (folk games) ৪৮৯-৫১০

১. বউচি খেলা, ২. হা-ডু-ডু বা কাবাডি, ৩. নৌকা বাইচ, ৪. ছি-বুড়ি,
৫. গোল্লাছুট, ৬. দাড়িয়াবান্ধা, ৮. পলাপলি/ লুকোচুরি, ৯. ঘোড়দৌড় ,
১০. কানামাছি, ১১. এক্কাদোক্কা, ১২. উপেন্টি বায়স্কোপ, ১৩. এলাটিং বেলাটিং,
১৪. কোইল্যা, ১৫. চার গুটি বা পচা কুমড়া খেলা, ১৬. মোরগের লড়াই,

www.pathagar.com

১৭. মার্বেল খেলা, ১৮. ইচিংবিচিং বা বিঘাত বিঘাত খেলা, ১৯. লাঠিখেলা,
২০. ঘুড়ি উড়ানো, ২১. পাঁচগুটি

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৫১১-৫২৮
১. বাড়ৈ/বারুজীবী/পান চাষি, ২. ওঝা/ ফকির/ সাপুরে/ বশিকারক, ৩. করাতি,
৪. কুলু, ৫. কামার, ৫. কুইড্ডাল, ৬. কুবাইত্তা, ৭. কুমার/কুম্ভকার, ৮. গাছি,
৯. গোয়ালা, ১০. গণক, ১১. ঘরামি, ১২. চামার/চর্মকার/ঋষি/ মুচি,
১৩. জিয়ানি, ১৪. দর্জি, ১৫. ধুনকার, ১৬.রজক/ধোপা, ১৭. নইক্দা/লাঠিয়াল,
১৮. নলুয়া, ১৯. নাপিত, ২০. পাটিয়াল, ২১. পুরোহিত / ব্রাহ্মণ, ২২. বেদে,
২৩. বাওয়ালি, ২৪. ময়রা, ২৫. ভূঁইমালী, ২৬. মালাকার, ২৭. মাঝি, ২৮. মিস্ত্রি,
২৯. শাখারি, ৩০. শানদার, ৩১. স্বর্ণকার, ৩২. পাটা খোঁটানি,
৩৩. হাজমা বা ওস্তা, ৩৪. হেকিম বা কবিরাজ

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৫২৯-৫৪২

ধাঁধা (riddle) ৫৪৩-৫৬২

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৫৬৩-৫৬৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৫৬৭-৫৭৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৫৭৫-৫৮৬
১. ডালা-কুলা-চালুনি, ২. পিঁড়ি, ৩. বিঁড়া, ৪. মালই, ৫. দেউলহা, ৬. হিজারি,
৭. উড়কি, ৮. বাসন/খোরা, ৯. সরা, ১০. ঘট/ঘটি, ১১. মালসা, ১২. শিকা,
১৩. হামানদিস্তা/ মুষাল, ১৪. পাটা/পুতা, ১৫. জাঁতা, ১৬. হাত পাখা,
১৭. মরই/ডোলা, ১৮. পিছা (ঝাড়ু), ১৯. চাই/বুচনা, ২০. গুচা/খুচইন,
২১. খারই, ২২. গড়া, ২৩. চুঙ্গা, ২৪. ঠুঁই, ২৫. ছাবি, ২৬. লাঙল/ জোয়াল,
২৭. কারাইল্যা, ২৮. টোনা, ২৯. তেক্যাইট্যা, ৩০. ঢেঁকি, ৩২. হাঁড়িকাঠ,
৩৩. বাঁক, ৩৪. চরকি, ৩৫. গুলতিবাঁশ,

লোকভাষা (folk language) ৫৮৭-৫৯২

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ, প্রতিষ্ঠা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রামায়ণের জনকঋষির ধনুর্যজ্ঞে *বঙ্গ* রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে জরাসন্ধবধ পর্বাধ্যায়ে তাঁর রাজত্ব বর্ণন সময়ে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের গিরিগাত্রে খোদিত এক আদেশে 'বঙ্গাল' দেশের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। *বঙ্গ* বা *বঙ্গাল* বা *বাঙ্গালার* অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ সমুদ্রোপকূলীয় এক বিস্তীর্ণ জনপদ যা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে *বগলা* বা *বাকলা সরকার* নামে বর্ণিত হয়েছে। *চন্দ্রদ্বীপের* উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। *ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড* নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত মতে এখানকার সমান্তভূমি পূর্বে জলমগ্ন ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সে জল শুকিয়ে যায়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হয়েছিল।

চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো দুটি কিংবদন্তি রয়েছে। প্রথমটি বিক্রমপুর পরগনার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক ব্রাহ্মণ তাঁর আরাধ্য দেবীর বরে এ ভূখণ্ড লাভ করেন। দ্বিতীয়ত চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক সন্ন্যাসী তার প্রিয়শিষ্য দনুজমর্দ-কে স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এ ভূখণ্ড দান করে ছিলেন। চন্দ্রশেখরের আদেশ ও নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ লেখকের মতে বিক্রমপুর হতে আসা দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা। ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় বা নৌজা ও প্রাচীন কুলাচার্যকারিকায় দনৌজমাধব নামে বিখ্যাত। অনেকের মতে ইনিই লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র। ফিরোজশাহী নামক পারস্যগ্রন্থ হতে জানা যায়–দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যখন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তুঘ্রিল খাঁকে দমন করতে এ অঞ্চলে আসেন তখন (১২৮০) দনুজ রায় বলবনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ইনিই অবশেষে সুবর্ণগ্রাম ছেড়ে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে–

পূর্বে মধুমতি সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে,
সমন্তাৎ মাস মার্গস্য শাসকোহম্ মহীপতিঃ।

এখানে পূর্বসীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপ। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দি হতে এ অঞ্চলের নাম চন্দ্রদ্বীপের বদলে বাকলায় পরিণত হয়। বাদশা আকবরের সময়ে বাকলা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল যা–ইসমাইলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর ও আলিপুর (ইদিলপুর) এই ৪টি মহালে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আগাবাখর এই অঞ্চলের সর্বময়কর্তা ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর বাখরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিস্তারিত ও পূর্ণাকারে বাকরগঞ্জের সীমা লিখিত হয়। সেখানে বাকেরগঞ্জের উত্তর সীমা ফরিদপুর ও ঢাকা; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর, খুলনা ও বলেশ্বর নদী।

www.pathagar.com

বরিশাল জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বসীমা মেঘনা নদী, সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর। যা উত্তর-দক্ষিণে ৮৭ ও পূর্ব-পশ্চিম ৬০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৩৬৪৯ বর্গমাইল। বরিশাল ধানের দেশ। গানের দেশ। শতশত নদ-নদীর তরঙ্গভঙ্গে কল্লোলিত-হিল্লোলিত এর মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। শ্যামলে সবুজে রূপে রূপে অপরূপা রূপসী বাংলার দক্ষিণের সাগর ঘেঁষা জেলা বরিশাল। প্রকৃতির অপরূপ রূপের সাথে নিজেদের একাত্ম করে বরিশালের জনগণ শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে রেখে চলেছে অপরিসীম অবদান। বাঙালির জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় প্রাচ্যের ভেনিস বরিশাল বাঙালির সংস্কৃতির স্বর্ণালিভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে। বরিশালের আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—এক সময়ে রাঢ় ও বঙ্গ বারো ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটি অঞ্চল ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এর আরেক নাম ছিল বাকলা। বৈদিকগ্রন্থ অনুযায়ী যার অর্থ 'সময়ে সময়ে জলমগ্ন হতো, আবার উত্থিত হতো'। বাকলা পরবর্তী এ অঞ্চলের নাম হয় বাকেরগঞ্জ।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি নিয়ে আছে অসংখ্য জনশ্রুতি। ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী শিষ্যদের নিয়ে সুগন্ধা নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন তীর্থ ভ্রমণে। এসময়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য রামনাথ দনুজমর্দন ছিলেন সঙ্গে। এক রাতে সবাই নৌকায় ঘুমিয়ে ছিলেন। চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখলেন—জগদম্বা কালিকা দেবী তাঁকে বলছেন, নৌকার কাছেই জলের নিচে ডুবে আছে তিনটি পাষাণ মূর্তি। মূর্তি তিনটি প্রতিষ্ঠা করলে এখানে জেগে উঠবে ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ড তিনি এবং তার বংশধরেরা ভোগ করতে পারবেন যুগ যুগ ধরে। গুরুর কথানুযায়ী দনুজমর্দন ডুব দিয়ে তুলে আনলেন কাত্যায়ণী এবং মদনগোপালের মূর্তি। জেগে উঠলো বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। গুরুর নামানুসারে রাজ্যের নামকরণ করা হলো চন্দ্রদ্বীপ। রামনাথ দনুজমর্দন রাজা উপাধি গ্রহণ করে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান বাগেরহাটের কচুয়ায়।

রোহিণী কুমার সেন রচিত *বাকলা* গ্রন্থানুযায়ী চন্দ্রদ্বীপের সীমা ছিল—উত্তরে ঢাকা জেলার ইছামতি নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে মেঘনা নদী, পশ্চিমে তেনীহাটি ও সেলিমাবাদ পর্যন্ত। দনুজমর্দনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ জয়দেব ছিলেন পুত্রহীন। এ কারণে তার কন্যা কমলা রানি স্বামী বলভদ্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন শুরু করেন। মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ট হয়ে ওঠেন। জলোচ্ছ্বাস এবং দস্যুদের আক্রমণের কারণে তাকে বিকল্প রাজধানী খুঁজে ফিরতে বাধ্য করে। পরবর্তীকালে কন্দর্পনারায়ণ বর্তমান বরিশালের উত্তর-পূর্বে বাঁশরীকাঠিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে হোসেনপুর এবং পরে ক্ষুদ্রকাঠিতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানগুলো স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় সর্বশেষ রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশায়। খনন করেন পরিখা। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে উল্লেখ আছে—'রাজ্য শাসন, প্রজা পালন, বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি রাজাকেই করিতে হইত; কেবল বাৎসরিক রাজকর এবং যুদ্ধ সময়ে নিয়মানুযায়ী বাদশাহকে সৈন্য পাঠাইতে হইত'। এছাড়া চন্দ্রদ্বীপ স্বাধীনই ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়ষ শতকে রচিত এডুমিশ্রের কারিকায় বলা হয়েছে—'চন্দ্রকলার ন্যায়

www.pathagar.com

এ দ্বীপের হ্রাস-বৃদ্ধি হতো বলেই জনপদের নামকরণ হয়েছে চন্দ্রদ্বীপ'। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণে বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার প্রাচীন নাম বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ বলে পাওয়া যায়। একাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের একাধিক তাম্রলিপিতেও বাঙ্গালা ও চন্দ্রদ্বীপের নাম খোদিতাকারে পাওয়া গেছে। নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন তখন আগাবাকের নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগারো আনি এবং বুজর্গউমেদপুরের সম্পূর্ণ অধিকার করেন। আগাবাকের-এর নামানুসারে এই জেলার নাম হয়েছিল বাকেরগঞ্জ।

ইতিহাসের বর্ণনানুযায়ী সপ্তদশ শতকে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর বা মাধবপাশাকে কেন্দ্র করে বর্তমান বরিশাল সিটি এলাকার কাশীপুর, কড়াপুর, রূপাতলী, মতাসার, কাগাশুরা, কাউনিয়া, জাগুয়া প্রভৃতি এলাকায় বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই সময়ে বরিশাল ছিল একটি বিখ্যাত বন্দর। বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস বাকেরগঞ্জ থেকে জানা যায়–১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে সিভিল জজ ও সুন্দরবন কমিশনারের দপ্তর নলছিটির বাড়ৈইকরণ থেকে বাকেরগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। আর বাকেরগঞ্জকে সদরদপ্তর করে জেলা গঠিত হয় ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। কিছুদিনের মধ্যেই বাকেরগঞ্জ সংলগ্ন নদীতে চরপড়ার কারণে জেলা সদর স্থানান্তর নিয়ে শুরু হয় উপর মহলে পত্রালাপ। এই ধারাবাহিকতায় ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ঢাকা কোর্ট অব সার্কিট বরিশালে জেলা সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকট সুপারিশ পাঠান। ওই সুপারিশ অনুমোদন করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। ফলে ওই বছরের ১ মে নিজামত আদালত জেলা সদর দপ্তর বাকেরগঞ্জ থেকে বরিশালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট ও জজ মি. উইল্টন নিজামত আদালতের নির্দেশানুসারে জেলা সদর দপ্তর বরিশালে স্থানান্তর করেন। সেই থেকে বাকেরগঞ্জ জেলা সদর বরিশালে।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে সরকার জমির মালিক রামকানাই রায়ের কাছ থেকে বরিশাল মৌজার পুরো জমি কিনে নেয়। ওই সময়ে সবমিলিয়ে বরিশাল শহরের আয়তন দাঁড়ায় ৩৮৫৬.৬৩ একর। ঢাকা থেকে কালেক্টরেট পৃথক হলে মি. হান্টার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। মেজিস্ট্রেট পৃথক রইলেন। কোলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হওয়ার সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে মফস্বলে সিভিল কোর্ট স্থাপিত হওয়ার আইন পাস হয়। তখন ইংরেজ শাসিত বঙ্গদেশের মধ্যে ১৮টি জেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে বাকেরগঞ্জ অন্যতম। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুজলা সুফলা এই অঞ্চলে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেলার কালেক্টরেট মি. ডগলাস রেভিনিউ বোর্ডের কাছে লিখে পাঠান। এতে বলা হয়–এই দুর্ভিক্ষে ষাট হাজার অধিবাসী প্রাণ হারিয়েছে এবং বহুসংখ্যক কৃষক একমুঠো ভাতের সন্ধানে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতিই বরিশালবাসীকে সাহসী ও স্বাধীনচেতা করে তুলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলীয় কৃষকরা ইংরেজ শাসন ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বোলাকি শাহ্। তিনি সুবান্দিয়ার গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণসহ সৈন্যদল গঠন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তবে কোম্পানির সেনাবাহিনী ও জমিদারদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে বিদ্রোহ অল্প দিনের মধ্যে দমন করা হয়। ইংরেজদের ক্ষমতা

www.pathagar.com

দখলের অর্ধশতকের মধ্যেই বরিশালে খ্রিষ্টান মিশনারীরা প্রচারকেন্দ্র ও ভজনালয় (চার্চ) স্থাপন করে। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে গ্যারেট সাহেবের স্কুল ১৮৫৮তে গভর্নমেন্ট স্কুলে পরিণত হয়। যা বর্তমানে বরিশাল জেলা স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন বরিশালে ব্রাহ্ম উপাসনা প্রবর্তিত হয়। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয় বরিশাল টাউন কমিটি। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত তাঁর পিতার নামে ব্রজমোহন ইন্সটিটিউট এবং ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যারীলাল রায়কে চেয়ারম্যান এবং দীনবন্ধু সেনকে ভাইসচেয়ারম্যান করে বরিশাল মিউনিসিপ্যালটি বোর্ড প্রবর্তিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও রাষ্ট্রিক চেতনার উদ্বোধন উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করে। এ ঘটনাপ্রবাহে বরিশালবাসীর সংগ্রামী চেতনা এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বরিশাল অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে যে সকল নেতৃবৃন্দ সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে–আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, উপাধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য মনোমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.) বিরোধী আন্দোলনের প্রথমদিককার প্রথম সারির নেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। 'বরিশাল স্বদেশবান্ধব সমিতি' নামে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে শুরু হলে ক্রমে জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ সংগঠনের সভাপতি হিসেবে অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অল্প কিছু দিনের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলে সমিতির দেড় শতাধিক শাখা গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের নিরলস কর্মীদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী), নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, শরৎচন্দ্র গুহ, তরণীকান্ত সেন, লেখক শরৎ কুমার রায়, ডা. তারিণী কুমার গুপ্ত, দুর্গামোহন সেন, শশীকান্ত গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবরঞ্জন মজুমদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নতুনমাত্রা যুক্ত করে চারণকবি মুকুন্দ দাসের জাগরণের গান ও যাত্রাপালা, কবি রামচন্দ্র দাশগুপ্তের সাহিত্য, আলম আকবর ও মফিজউদ্দিন বয়াতির জারিগান, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথকতা বরিশালে বিলাতি পণ্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বরিশালে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এবং ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে দ্বিতীয় বারের মতো জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হলে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পথপরিক্রমায় বরিশালে বিপ্লবী সংগঠন ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা গঠিত হবার মাত্র কয়েক দিন পরেই ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং শিক্ষার্থী নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরীর অক্লান্ত চেষ্টা ও উৎসাহে 'বরিশাল পার্টি' বা 'বরিশালদল' নামে সশস্ত্রবাদি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয়

www.pathagar.com

বরিশাল থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ক্রমে বরিশালদল যুগান্তর দলে পরিণত হয়ে ওঠে। বিপ্লবী বরিশাল দলের কর্মীগণের মধ্যে–যোগেন্দ্রনাথ বসু, রমণীরঞ্জন গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী, মনোমোহন ঘোষ, রাধীকাজীবন সেন, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুনচন্দ্র গুহ, অবলাকান্ত করচৌধুরী, মনোমোহন দত্ত, হরপ্রসন্ন করচৌধুরী, সতীশচন্দ্র দাস, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ডা. মাখনচন্দ্র দত্তরায়, প্রফেসর বাসুদেব দত্তরায়, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নলিনী দাস, হিরালাল দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, সরলকুমার দত্ত, হিমাংশুভূষণ বসুরায়, সন্তোষকুমার দে, রাখালচন্দ্র দাস, শৈলেন্দ্রনাথ দাস, সুধীরকুমার আইচ, অনন্তকুমার পুততুণ্ড, মনোরঞ্জন বসু, মহেন্দ্র দত্ত, রেবতী দাশগুপ্ত প্রমুখসহ আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সমিতি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) উত্থাপক শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯১২ থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে সর্বভারতীয় এবং বাংলার রাজনীতিতে অসামান্য অবদান রাখেন। আর তার রাজনৈতিক শিক্ষা এই বরিশাল থেকে উৎসারিত। তার পৈতৃকভিটা জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের (১৯৪২) ডাকে বরিশালের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তাত্ত্বিকধারণার প্রসার ঘটলে বরিশালের রাজনীতিতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার পারস্পরিক অবিশ্বাস। বরিশাল অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হানাহানি আমাদের ইতিহাসকে কলুষিত করেছে।

বরিশাল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে পরিমল বাহিনী (প্রকাশকাল: ১৮৬২ খ্রি.), সত্যপ্রকাশ (১৮৭২), কাশিপুর নিবাসী (১৮৮০), বরিশাল হিতৈষী (১৮৮৩), বিকাশ (১৯০০) ছাড়াও প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদ পত্রিকা হলো–বরিশাল, হিতসাধনী, বালরঞ্জিকা, বঙ্গদর্শন, সত্যবাদী, ব্রহ্মবাদী, বাসন্তী, ইসলাম দর্শন, নমঃশূদ্র, ভাস্কর, নকীব, সুহৃদ, তরুণ, পথিক, উজ্জ্বল ভারত, বাখরগঞ্জ, বঙ্গমিহির, বিলবাসী, মাতৃবক্ষ, খাদেম অন্যতম। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপক্ষে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় এস.এম ইকবাল সম্পাদিত রণাঙ্গনের সংবাদপত্র 'বাংলাদেশ'। একাত্তরের ৪ আগস্ট নুরুল আলম ফরিদ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বিপ্লবী বাংলাদেশ'। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বরিশাল থেকে ১৮টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ পূর্ববর্তী জাতিগত হামলা বিশেষ করে মুলাদী, মাধবপাশার গণহত্যার ইতিহাস বরিশালের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। ভাষাআন্দোলনপর্বে বরিশালের অবদান স্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন বরিশাল জেলা ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। বরিশাল জেলার আয়তন ২৭৯০.৫১ বর্গ কি.মি.। উত্তরে মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলা, দক্ষিণে পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলা, পূর্বে ভোলা ও লক্ষ্মীপুর জেলা, পশ্চিমে ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৫.১ সে, সর্বনিম্ন ১২.১ সে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত

www.pathagar.com

১৯৫৫ মিমি। প্রধান নদীসমূহ: লোয়ার মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, সন্ধ্যা, সুগন্ধা, কচা, কীর্তনখোলা, তেঁতুলিয়া, নয়াভাঙ্গা, জয়ন্তী।

জেলা শহর: ৩০টি ওয়ার্ড ও ৫০টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৬.৩৭ বর্গ কিমি। পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৫৭ সালে এবং সিটি কর্পোরেশন এ রূপান্তর করা ২০০০ সালে। জনসংখ্যা ২০২২৪২; পুরুষ ৫৩.২৮%, মহিলা ৪৬.৭২%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ১২৩৫৪ জন। শিক্ষার হার ৬৫%।

প্রশাসন: ১৭৯৭ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা সৃষ্টি হয়। সাবেক বাকেরগঞ্জ জেলাকে পরবর্তীকালে বরিশাল নামকরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি বরিশালকে বিভাগ ঘোষণা করা হয়। সিটি কর্পোরেশন ১, উপজেলা ১০, পৌরসভা ৫, ইউনিয়ন ৮৫, মৌজা ১১৪৭, গ্রাম ১১৭৫।

উপজেলাসমূহ: বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, হিজলা, মুলাদি, উজিরপুর, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ।

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ: সুজাবাদের কেল্লা, সংগ্রাম কেল্লা, সরিকলের দুর্গ, মাহিলারা মঠ, অক্সফোর্ড মিশন গির্জা, শ্রীশ্রীশংকর মঠ, মুকুন্দ দাসের কালীবাড়ি, ভাটিখানার জোড় মসজিদ, অশ্বিনী কুমার হল, চরকিল্লা, দুর্গাসাগর দিঘী, এক গম্বুজ মসজিদ (কসবা), গৈলা বিজয়গুপ্তের মনসা মন্দির, কলসকাঠি জমিদারবাড়ি, গুঠিয়ার বায়তুল আমান মসজিদ কমপ্লেক্স, বরিশাল মহাশ্মশান।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি: বরিশালের পূর্ব নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বাকলা। ১৮৫৪ সালে রাজধানী মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দনুজ মাধব বা দনুজ মর্দন দেব।

বর্তমানে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ: দক্ষিণাঞ্চল, আজকের পরিবর্তন, শাহনামা, আজকের বার্তা, বরিশালের আজকাল, বরিশাল প্রতিদিন, মতবাদ, বরিশাল বার্তা, ভোরের অঙ্গীকার, বাংলার বনে, ভোরের আলো, কলমের কণ্ঠ, সত্যসংবাদ, আজকের বরিশাল, বরিশাল সংবাদ, সমাচার, আলোকিত বরিশাল, দেশ-জনপদ, মাসিক আনন্দ লিখন অন্যতম।

অবলুপ্ত পত্রিকাসমূহ: মাসিক খাদেম, চিরন্তন বাংলা, উপকূল, সমাচার, গৌরনদী পরিক্রমা, সাপ্তাহিক পায়রা, দি রিভার, ইতিবৃত্ত, সপ্তাকাশ, পরিমল বাহিনী (১৮৫৯), বরিশাল বার্তাবহ (১৮৭০), হিতসাধনী (১৮৭১), সত্যপ্রকাশ (১৮৭২), বঙ্গদর্পণ (১৮৭৩), গ্রামদূত (১৮৭৩), বাংলার রঞ্জিকা (১৮৭১), কাশিপুর নিবাসি (১৮৮১), স্বদেশি (১৮৮৫), ভারত হিতৈষী (১৮৮২), বরিশাল হিতৈষী (১৮৮৫), বিকশা (১৯৯০), সহযোগী (১৮৮৫), প্রদ্বীপ (১৯২৭), তরুণ (১৯২৩), পথিক (১৯২৫), বহুমিহির (১৯২৬), প্রতিভা তানজীম (১৯৪৯) উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা: ২৩৩০৯৬০; পুরুষ ৪৯.৯৯%, মহিলা ৫০.০১%। মুসলমান ৮৬.১৯%, হিন্দু ১৩.১০%, খ্রিষ্টান ০.৬৩%, অন্যান্য ০.০৮%।

বরিশার জেলা স্কুল, শেরে বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল, ব্রজমোহন বিদ্যালয়, ব্রজমোহন কলেজ, পিংলাকাঠি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

www.pathagar.com

বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, অক্সফোর্ড মিশন হাইস্কুল, আসমত আলী খান ইনস্টিটিউট (এ.কে.স্কুল), বাটাজোর অশ্বিনী কুমার দত্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কর্ণকাঠি জি.আর. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার ইনস্টিটিউট, রসিক চন্দ্র কলেজ (আর.সি. কলেজ) ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ: কৃষি ৩৫.২৮%, মৎস্য ৩.৪৫%, কৃষি শ্রমিক ১৮.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.১৬%, ব্যবসা ১৩.৮৯%, পরিবহন ১.৭২%, চাকরি ১০.৬৪%, নির্মাণ ১.২৫%, অন্যান্য ১০.৮৫%।

ভূমির ব্যবহার চাষযোগ্য জমি ১৭৮৬০১ হেক্টর, পতিত জমি ৫৭৮৫.৪ হেক্টর। এক ফসলি ৩৭.৬৮% দো ফসলি ৪৮.৮০%, তিন ফসলি ১৩.৫২%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পান, তৈলবীজ। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি চিনাবাদাম ও আউশ ধান।

প্রধান ফল ফলাদি: নারকেল, পেয়ারা, আমড়া, কলা।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গয়না নৌকা, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।

শিল্প ও কলকারখানা: ওষুধ কারখানা, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, জুট মিল, টেক্সটাইল মিল, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, ধানকল, তেলকল, বরফকল, ময়দার মিল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুটির শিল্প: তাঁত, বাঁশের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, পানবরজ তৈরি, নৌকা তৈরি, জালবোনা, চাই তৈরি, মিষ্টি তৈরি, দই তৈরি, ওয়েল্ডিং, বিড়ি তৈরি, ইত্যাদি।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য: ইলিশ মাছ, পান, সুপারি, পেয়ারা, নারিকেল, আমড়া, ধান-চাল. শীতলপাটি,

খ. উপজেলাসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বরিশাল সদর উপজেলা : আয়তন ৩০৭.৫৯ বর্গকিমি। উত্তরে বাবুগঞ্জ, মুলাদি এবং মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ এবং নলছিটি উপজেলা, পূর্বে মেহেন্দীগঞ্জ এবং ভোলা সদর উপজেলা, পশ্চিমে ঝালকাঠি সদর এবং নলছিটি উপজেলা। উপজেলা শহর ৩০টি ওয়ার্ড ও ৫০টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৬.৩৭ বর্গকিলোমিটার। পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৫৭ সালে এবং সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা ২০০০ সালে। জনসংখ্যা ২০২২৪২; পুরুষ ৫৩.২৮%, মহিলা ৪৬.৭২%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমি ১২৩৫৪ জন। শিক্ষার হার ৬৫%। প্রশাসন : সিটি কর্পোরেশন ১, ইউনিয়ন ১০, ওয়ার্ড ৩০, মৌজা ১৭৩, গ্রাম ১২৮। প্রাচীন নিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : বরিশাল মহাশ্মশান, মুকুন্দদাসের কালীবাড়ি, শংকর মঠ, অক্সফোর্ড মিশন স্কুল ও চার্চ, জীবনানন্দ দাশের পৈতৃকভিটা, চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর বরিশাল পাকিস্তানি শত্রুমুক্ত হয়। জনসংখ্যা ৪১৪২৮১; পুরুষ ৫২.৭২%, মহিলা ৪৭.২৮%। মুসলমান ৯০.৬৪%, হিন্দু ৮.৩৮%, খ্রিষ্টান ০.৯৮%।

www.pathagar.com

ব্রজমোহন কলেজ

শেরে বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল

www.pathagar.com

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৫৩.২%, পুরুষ ৫৭.৯%, মহিলা ৪৮.৫%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ: সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল জিলা স্কুল, ব্রজমোহন বিদ্যালয়, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, আ. রব সেরনিয়াবাত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। শিল্প ও কলকারখানা: ওষুধ কারখানা, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, বরফকল, ফ্লাওয়ার মিল, তেলমিল, বিস্কুট কারখানা, টেক্সটাইল মিল অন্যতম। কুটিরশিল্প: স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, বিড়ি, গুঁড়া মসলা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সেলাই কাজ, ওয়েল্ডিং, সুতা তৈরি কারখানা, নৌকা তৈরি, জাল তৈরি, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

গৌরনদী উপজেলা : আয়তন ১৪৪.১৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে কালকিনি উপজেলা, দক্ষিণে উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে বাবুগঞ্জ, মুলাদি ও কালকিনি উপজেলা, পশ্চিমে আগৈলঝাড়া উপজেলা। প্রধান নদী নন্দা।

উপজেলা শহর: ৯টি ওয়ার্ড ও ২০টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১২.৯৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩৭৪১১; পুরুষ ৫১.৩১% মহিলা ৪৮.৬৯%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. ২৮৯০। শিক্ষার হার ৪৮.৮%। প্রশাসন গৌরনদী থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮২ সালে। ইউনিয়ন ৭, গ্রাম ১২৪, মৌজা ১২২, পৌরসভা ১। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ এক গম্বুজ মসজিদ (আল্লার মসজিদ, কসবা), মাহিলারা মঠ, বাটাজোরে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের পৈতৃকভিটা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি স্বাধীনতা যুদ্ধকালে রামসিদ্ধি নামক স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রথম প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জনসংখ্যা ১৭১৬০২; পুরুষ ৫১.১২%, মহিলা ৪৮.৮৮%। মুসলমান ৮৫%, হিন্দু ১২%, খ্রিষ্টান ৩%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১৭০, মন্দির ২০৫, গির্জা ৬ ।শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪২.১%, পুরুষ ৪৮%, মহিলা ৩৬.২%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ : সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ৪, উচ্চবিদ্যালয় ২৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৭, মাদ্রাসা ২১৩, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১। পিংলাকাঠি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮২), হরিসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮৫), রামসিদ্ধির বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯৫), বার্থি তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ: কৃষি ৩৫.৭৪%, কৃষি শ্রমিক ২৫.৬২%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৩৭%, তাঁত ১.৫৯%, শিল্প ১%, ব্যবসা ১৩.৯৩%, পরিবহন ২.৫৪%, চাকরি ৭.৮২%, অন্যান্য ৮.৩৯%।

বাকেরগঞ্জ উপজেলা : আয়তন ৪১৭.২০ বর্গ কি.মি.। উত্তরে নলছিটি ও বরিশাল সদর উপজেলা, দক্ষিণে পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ এবং বাউফল উপজেলা, পূর্বে বাউফল ও ভোলা সদর উপজেলা, পশ্চিমে নলছিটি, বেতাগী ও রাজাপুর উপজেলা।

প্রধান নদীসমূহ: তেঁতুলিয়া, বরিশাল, খায়রাবাদ, পাণ্ডব, চরামদ্দি, শ্রীমন্ত।

উপজেলা শহর: ৯টি ওয়ার্ড ও ১৫টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৪.০১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৫৮২৩; পুরুষ ৫০%, মহিলা ৫০%। জনসংখ্যার ঘনত্ব

www.pathagar.com

প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১২৯ জন। শিক্ষার হার ৫৫.৪%। প্রশাসনঃ থানা সৃষ্টি ১৮৭৪ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ১৫, গ্রাম ১৭১, মৌজা ১৫৬, পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৯। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদঃ মুঘল আমলে নির্মিত জামে মসজিদ, কলসকাঠি জমিদার বাড়ি, পাদ্রিশিবপুর চার্চ।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : মুক্তিযুদ্ধের সময় কলসকাঠি বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী ১৮১ জন মানুষকে হত্যা করে। জনসংখ্যা ৩৩৬৭০৬; পুরুষ ৪৯.৬৪%, মহিলা ৫০.৩৬%। মুসলমান ৮৭.৮৭%, হিন্দু ১১.৭৬%, খ্রিষ্টান ০.৩৩%, অন্যান্য .০৪%।

বাকেরগঞ্জ বন্দর জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর হরিরাম সংকীর্তন মন্দির, বার আউলিয়া মাজার উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৭.২%; পুরুষ ৫২.৭%, মহিলা ৪১.৬%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি কলেজ ২, বেসরকারি কলেজ ৫, উচ্চবিদ্যালয় ৬৬, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৭, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭, মাদ্রাসা ৭২, ক্যাডেট স্কুল ১। কলসকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮২), দক্ষিণ দাড়িয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৪), চর মসজিদ বাড়ীগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮২০), কলসকাঠি বি.এম. একাডেমী (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহঃ কৃষি ৩৬.৫%, কৃষি শ্রমিক ১৩.২৭%, মৎস্য ২.৫৮%, অকৃষি শ্রমিক ৫.৪৪%, শিল্প ১.১৬%, ব্যবসা ১৩.৪৮%, পরিবহন ১.৬৩%, চাকরি ১০.১৯%, অন্যান্য ১৪.৯৫%।

প্রধান কৃষি ফসলঃ ধান, সরিষা, পান। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ডাল, কাউন, তিসি, অড়হর। কুটির শিল্পঃ তাঁত, বাঁশের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, শোলার কাজ, জাল বোনা, মৃৎশিল্প (প্রতিমা তৈরি), নৌকা তৈরি, হোগলা বুনন উল্লেখযোগ্য।

বানারীপাড়া উপজেলা : আয়তন ১৩৪.৩২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে উজিরপুর উপজেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা, পূর্বে উজিরপুর এবং ঝালকাঠি সদর উপজেলা, পশ্চিমে নাজিরপুর ও নেছারাবাদ উপজেলা। প্রধান নদীঃ সন্ধ্যা, স্বরূপকাঠি। প্রধান খাল : ঝানিহানিয়া, বিশারকান্দি।

উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ১৬টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ৪.৭৭ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯২০৬; পুরুষ ৫৩.৬৩%, মহিলা ৪৬.৩৭%, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৯৩০ জন। শিক্ষার হার ৬৫.৫৬%।

প্রশাসনঃ থান সৃষ্টি ১৯১৩ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ১১, গ্রাম ৭৭, মৌজা ৮৭, পৌরসভা ১।

প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদঃ দুটি সতীদাহের মঠ, বড়বনিয়া বাড়িতে সাড়ে তিন মণ ওজনের পিতলের মনসা বিগ্রহ, নরোত্তমপুরে দুশো বছরের পুরনো ৬ ফুট উঁচু বিগ্রহ শেরে বাংলা স্মৃতি জাদুঘর। জনসংখ্যা ১৪৩৮২৫; পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৯%। মুসলমান ৮২.৫৫%, হিন্দু ১৬,৭৫%, অন্যান্য ০.৭%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২৬৫, মন্দির ২০, গির্জা ৩, তীর্থস্থান ১। বানারীপাড়া জামে মসজিদ, বিনোদ বিহারী মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৬%, পুরুষ ৫১.১%, মহিলা ৪০.৯%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ২,

www.pathagar.com

উচ্চবিদ্যালয় ২৭, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮০, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১, বধির স্কুল ১, মাদ্রাসা ৫৯, কমার্শিয়াল কলেজ ১। সরকারি ফজলুল হক কলেজ (১৯৪০), বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন (১৮৮৯), নলশ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১০) উল্লেখযোগ্য। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ২৭.২৮%, মৎস্য ১.৮৭%, কৃষি শ্রমিক ১৮.৫৪%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৭৮%, ব্যবসা ২৫.৫১%, পরিবহন ১.৪৭%, চাকরি ৭.৯১%, নির্মাণ ১.২৯%, অন্যান্য ১১.৩৫%।

কুটিরশিল্প: স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, শামুকচুন তৈরি, বাঁশের কাজ উল্লেখযোগ্য।

বাবুগঞ্জ উপজেলা : আয়তন ১৬৪.৮৮ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে গৌরনদী ও উজিরপুর উপজেলা, দক্ষিণে বরিশাল সদর ও ঝালকাঠি সদর উপজেলা, পূর্বে মুলাদী ও বরিশাল সদর উপজেলা, পশ্চিমে উজিরপুর উপজেলা। প্রধান নদী: সুগন্ধা, সন্ধ্যা, শিকারপুর, আমতলি, আড়িয়াল খাঁ। দেহেগতি বিল উল্লেখযোগ্য। উপজেলা শহর: ৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ২.০৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৯৯৭; পুরুষ ৪৯.৬৮%, মহিলা ৫০.০৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪৩৪ জন। শিক্ষা হার ৪৭.৪%। প্রশাসন: বাবুগঞ্জ থানা সৃষ্টি ১৯০৬ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৬, গ্রাম ৮৭, মৌজা ৮৩। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ: রামমোহনের সমাধি মন্দির, মাধবপাশা রাজবাড়ি, দুর্গাসাগর দীঘি, গুঠিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ। জনসংখ্যা ১৩৫৯০৫; পুরুষ ৫০.৫৮%, মহিলা ৪৯.৪২%। মুসলমান ৯৪.০৫%, হিন্দু ৫.৫২%, খ্রিষ্টান ০.২৫%, বৌদ্ধ ০.০৪%, অন্যান্য ০.১৪%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৩৮০, মন্দির ৯, গির্জা ২। বাবুগঞ্জ জামে মসজিদ, খানপুরা জামে মসজিদ, আগরপুর জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৭.৪%; পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৩.৭%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ: কলেজ ৩, ক্যাডেট কলেজ ১, উচ্চবিদ্যালয় ২১, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৯, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪, মাদ্রাসা ৯১। রামপত্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯৮), চরউত্তর ভূতেরদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৪), আগরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৯) উল্লেখযোগ্য।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশসমূহ কৃষি ৪৪.৯১%, মৎস্য ১.২৫%, কৃষি শ্রমিক ১৭%, অকৃষি শ্রমিক ২.৮৫%, ব্যবসা ৮.৬৩%, পরিবহন ১.৭%, চাকরি ১৩.৫২%, নির্মাণ ১.২৮%, অন্যান্য ৮.৮৬%। কুটিরশিল্প: বাঁশের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, মিষ্টি তৈরি, পানবরজ তৈরি উল্লেখযোগ্য।

আগৈলঝাড়া : আয়তন ১৬১.৮২ বর্গকিলোমিটার। উত্তর ও পূর্বে গৌরনদী উপজেলা, দক্ষিণে উজিরপুর উপজেলা, পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলা। প্রধান নদী : বিশারকান্দি, পয়সারহাট। জোবারপাড়ের বিল উল্লেখযোগ্য। উপজেলা শহর ৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ৬.৪০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৮১৮৫; পুরুষ ৫২.৫৭%, মহিলা ৪৭,৪২%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৭৯ জন। শিক্ষার হার ৪৮.৭%। প্রশাসন: আগৈলঝাড়া থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন ৫, গ্রাম ৯৫, মৌজা ৮৪। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ মধ্যযুগের কবি বিজয় গুপ্তের মনসা মন্দির ফুল্লশ্রী, মুন্সীবাড়ি অন্ধকূপ (গৈলা), ধরাধরের দিঘি (বেলুহার), ছবিখারপাড় দিঘী, বিষ্ণু মন্দির। জনসংখ্যা ১৪৭৩৪৩; পুরুষ ৫০.৯৩%, মহিলা ৪৯.০৭%। মুসলমান ৫১.৭১%, হিন্দু ৪৫.৫১%, খ্রিষ্টান ২.৭৪%, অন্যান্য ০.০৪%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১১৫, মন্দির ৩১৮, গির্জা ২০, মাজার ২, তীর্থস্থান ৩। শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪২.৪%, পুরুষ ৪৯.৪%, মহিলা ৩৫%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ: কলেজ ২, শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজ (১৯৭২), ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমী (১৯১৯), গৈলা বাহাদুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯২৪), পূর্ব সুজনকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৩৮.৫৪%, মৎস্য ১.০৩%, কৃষি শ্রমিক ২৪.৮১%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫৭%, শিল্প ১.০৪%, ব্যবসা ১৩.৯%, নির্মাণ ১.৯৬%, চাকরি ৮.৪১%, অন্যান্য ৭.৭৪%। কুটিরশিল্প: স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, শামুকচুন তৈরি, বাঁশের কাজ, প্রতিমাশিল্প (মৃৎশিল্প), বাদ্যযন্ত্র তৈরি, চাই তৈরি, হাতপাখা তৈরি, নানাপ্রকার হস্তশিল্প তৈরি উল্লেখযোগ্য।

উজিরপুর উপজেলা : আয়তন ২৪৮.৩৫ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলা, দক্ষিণে বানারীপাড়া ও ঝালকাঠি সদর উপজেলা, পূর্বে বাবুগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া ও নাজিরপুর উপজেলা। প্রধান নদী: উজিরপুর, আমতলী, কালীজিরা ও বিয়ারকান্দি। প্রধান বিল: সাতলা ও কুড়ালিয়ার বিল। উপজেলা শহর: ৬টি মৌজা নিয়ে উজিরপুর নদীর তীরে অবস্থিত। আয়তন ৬.৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯৫১০; পুরুষ ৫৩.৭৩%, মহিলা ৪৬.২৭%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪৬৩ জন। শিক্ষার হার ৭৮.৯%। প্রশাসন: উজিরপুর থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৯, মৌজা ১১৮, গ্রাম ১১৭। জনসংখ্যা ২২৭১১৫; পুরুষ ৫০.৬%, মহিলা ৪৯.৪%।

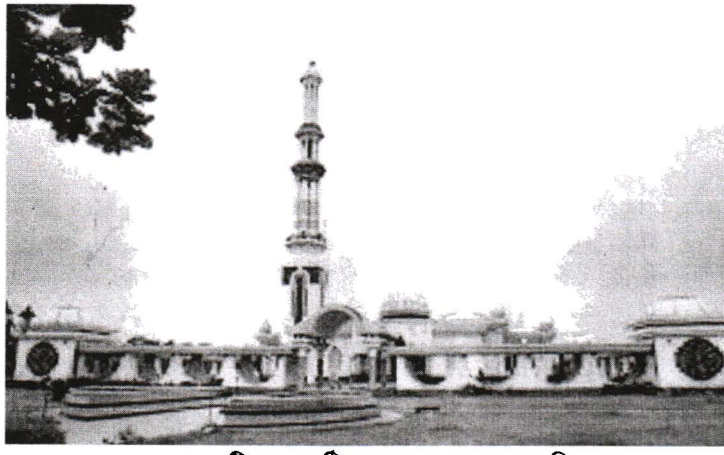

দৃষ্টিনন্দন গুঠিয়া বায়তুল আমান মসজিদ

www.pathagar.com

মুসলমান ৭৪.৫%, হিন্দু ২৫%, অন্যান্য ০.৫%। শিকারপুর জামে মসজদি, ধামুড়া মিঞার মাজার, হারতা গোবিন্দ মন্দির, ধামসর গীর্জা, তাঁরাবাড়ির মন্দির, গুঠিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ এবং বরাকোঠা গ্রামের দরগাবাড়ি নামক স্থান ৯নং মুক্তিযুদ্ধ সেক্টরের প্রধান কার্যলয়ের স্মৃতি বিজড়িত এবং উল্লেখযোগ্য স্থান। শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৭.৬%; পুরুষ ৫২.৯%, মহিলা ৪২.৩%। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৩৯.৭১%, কৃষি শ্রমিক ২৩.৫২%, অকৃষি শ্রমিক ২.৭%, চাকরি ৮.৫৬%, ব্যবসা ১৪.০৯%, নির্মাণ ১.০৭%, অন্যান্য ১০.৩৫%।

মুলাদী উপজেলা : আয়তন ২৬১.০২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে গোসাঁইরহাট উপজেলা, দক্ষিণে বরিশাল সদর উপজেলা, পূর্বে হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে কালকিনি, গৌরনদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী: জয়ন্তী, নয়াভাঙ্গা।

উপজেলা শহর : ৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ২.৭৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১০০৯৬; পুরুষ ৫৩.৯৫%, মহিলা ৪৬.০৫%। জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গকিলোমিটারে ৩৬৭১ জন। শিক্ষার হার ৪৪%। প্রশাসন মুলাদী থানা সৃষ্টি ১৯৬৭ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৭, গ্রাম ১০৮, মৌজা ৯৮। জনসংখ্যা ১৭১৯৪৮; পুরুষ ৫০.৪৯%, মহিলা ৪৯.৫১%। মুসলমান ৯৭.৭৯%, হিন্দু ২.১৬%, অন্যান্য ০.০৫%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৪৪০, মন্দির ১৮, গির্জা ১। কাজীবাড়ি জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৩১.৪%; পুরুষ ৩৬.৫%, মহিলা ২৬.২%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভেদুরিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯২), তয়ক-টুমচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৪৫) উল্লেখযোগ্য। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৫১.১৭%, মৎস্য ২.৫%, কৃষি শ্রমিক ২০,৬৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.১৮%, ব্যবসা ৭.৫২%, চাকরি ৭.১৩%, অন্যান্য ৭.৮৩%। কুটিরশিল্প: তাঁত, বাঁশের কাজ, স্বর্ণকার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, ওয়েল্ডিং, পানবরজ তৈরি, নৌকা তৈরি উল্লেখযোগ্য।

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা : আয়তন ৪৩৫.৭৯ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে হিজলা এবং মুলাদী উপজেলা, দক্ষিণে বরিশাল সদর এবং ভোলা সদর উপজেলা, পূর্বে ভোলা সদর, লক্ষ্মীপুর সদর এবং রায়পুর উপজেলা, পশ্চিমে মুলাদী ও বরিশাল সদর উপজেলা। উপজেলা শহর: ৯টি ওয়ার্ড ও ১০টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৫.৬২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৮৯৯৯; পুরুষ ৫০.১২%, মহিলা ৪৯.৮৮%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটাপর ১৮৫৭ জন। শিক্ষার হার ৪৩.৮%।

প্রশাসন: মেহেন্দীগঞ্জ থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮২ সালে। ইউনিয়ন ১৩, গ্রাম ১৬১, মৌজা ১৩৫, পৌরসভা ১। জনসংখ্যা ২৯২৪৩৬; পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৯%। মুসলমান ৯৭.৬৪%, হিন্দু ২.০৬%, খ্রিষ্টান ০.৩%। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৩৩০, মন্দির ২৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: পাতারহাট মুসলিম হাই স্কুল (১৯২৪), ভাষানচর এস.এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৪৩) উল্লেখযোগ্য।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ: কৃষি ৩৮.২৬%, মৎস্য ১১.৩৬%, কৃষি শ্রমিক ২০.৩৩%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৩৩%, ব্যবসা ৯.৮৩, চাকরি ৫.৪%, অন্যান্য ১০.৪৯%। কুটিরশিল্প: বাঁশের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

হিজলা উপজেলা : আয়তন ৫১৫.৩৬ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে গৌসাইরহাট ও হাইমচর উপজেলা, দক্ষিণে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে রায়পুর উপজেলা, পশ্চিমে মুলাদী উপজেলা। প্রধান নদী: লোয়ার মেঘনা, জয়ন্তি, নাইয়া, ভাঙ্গা, আজিমপুর।

উপজেলা শহর: ২টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ৭.৫৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১০০৪৭; পুরুষ ৫২.৬৪%, মহিলা ৪৭.৩৬%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৩২৫ জন। শিক্ষার হার ৩৮.৭%। প্রশাসন: থানা সৃষ্টি ১৯১১ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৬, গ্রাম ১০৫, মৌজা ১৩৯। জনসংখ্যা ১৬৬২৬৫; পুরুষ ৫৩%, মহিলা ৪৭%, মুসলমান ৯৮%, হিন্দু ২%। শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২৭.৪%; পুরুষ ৩২.৩%, মহিলা ২২.৫%। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৪৯.৫%, মৎস্য ৬.১৮%, কৃষি শ্রমিক ২৫.১৭%, অকৃষি শ্রমিক ১.৮১%, ব্যবসা ৭.০৯%, চাকরি ৩.৭৬%, অন্যান্য ৬.৪৯%। কুটিরশিল্প হোগলা তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, সুতার জাল বুনন, পাটের হস্তশিল্প, আখের গুড় প্রক্রিয়াকরণ, শীতল পাটি তৈরি।

গ. নদ-নদী

মেঘনা : বরিশাল জেলার পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে গিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সাতবেড়িয়া, ইলশা ও তেঁতুলিয়া, মেঘনার নামান্তর মাত্র।

কীর্তনখোলা নদীতে নৌকাবাইচ

www.pathagar.com

আড়িয়াল খাঁ : পদ্মা নদীর এক শাখা। এই নদী বরিশাল জেলায় প্রবেশ করে অবশেষে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ মোহনাকে ডাকাতিয়া নদী বলা হয়। আড়িয়াল খাঁ হতে এক উপনদী বের হয়ে জেলার উত্তর-পূর্বাংশ দিয়ে তেঁতুলিয়ার মোহনাতে পতিত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ হতে আর একটি নদী প্রথম বরিশাল নদী, তারপর বিষখালী নামে, বরিশাল নগরী পশ্চিম পাড়ে রেখে হরিণঘাটা মোহনায় পতিত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ অংশ হতে নূতন বা নয়াভাঙ্গানী, লাটার গাঙ প্রভৃতি শাখা উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে মেঘনায় পতিত হয়েছে।

বলেশ্বর নদ : এই নদী ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার পশ্চিম সীমা দিয়ে হানু, মধুমতী, এলেনখালি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক প্রশস্ত মোহানা দিয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। বলেশ্বর গঙ্গানদীর উপশাখা।

কীর্তনখোলা নদী : নলছিটি ও ঝালকাঠির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাউখালি ও কচা নাম ধারণ করে বলেশ্বর নদে মিলিত হয়েছে। বিষখালি ও খয়েরাবাদ নদী কীর্তনখোলা বা বরিশাল নদী হতে উৎপন্ন।

পাণ্ডব নদী : বাউফলে কারখানা, ধুলিয়া ও খয়েরাবাদ নদী, পটুয়াখালিতে লেহালিয়া, গলাচিপায় গলাচিপা ও বিষখালি নদী, নেয়ামতি ও কালমেঘার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিঘাই নদী মীর্জাগঞ্জ ও গুলিসাখালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে; গুলিসাখালিতে আন্ধারমাণিক নদী, মঠবাড়িয়ায় সাপলেজ ও আগুনমুখা নদী দক্ষিণবাহী হয়ে সাগরে মিলেছে।

ঘ. রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

কবি বিজয় গুপ্ত

কবি বিজয় গুপ্তের পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়–

"চারিযুগ ধরি হেথা ব্রাহ্মণ সকল,
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়,
হেন ফুলশ্রী গ্রমে বসতি বিজয়।"

ফুল্লশ্রী গ্রামে কবি বিজয়গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন–হুসেন শাহের পূর্ববর্তী নবাব মুজাফফর হোসেনের রাজত্বকালে। কবি যখন পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তখন মুজাফফর হোসেনের মৃত্যু হয়েছে এবং হুসাইনশাহ বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তার কবি পরিচিতি এবং মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থ রচনা করার উদ্দীপনা যখন কবি স্বপ্নে মনসাদেবী কর্তৃক উর্দিষ্ট হয়েছিলেন তখন বাংলার মসনদে হুসেন শাহের প্রতিভা উদয়ের ভূমিকা অতিক্রম করে মধ্যাহ্নের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের দিকে ধাবিত হয়েছিল। কবি হিসেবে বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের দপ্তর হতে 'ছোট বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেছিলেন। হুসেন শাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির অভিব্যক্তি :

"সংগ্রামে দুর্জয় রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।"

www.pathagar.com

কাব্য গ্রন্থ রচনাকাল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা–

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসাইন শাহ নৃপতি তিলক ॥

অর্থাৎ ফারসি লেখার রীতি অনুযায়ী ১৪০৬ শকে কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেছিলেন। সুতরাং কবির গ্রন্থ রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। কবি বিজয়গুপ্ত গৈলা নিবাসী ভবদাশ বংশের দৌহিত্র ছিলেন। নিজ পরিচয় সূত্র নির্দেশ প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন :

"সনাতন তনয় রুক্মিনী গর্তজাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ তব সাথ ॥"

দুর্গামোহন দাশ

১৮৪১ সালের নভেম্বরে ঢাকার তেলিবাগে দুর্গামোহন দাসের জন্ম হলেও তাঁর কর্ম জীবনের অনেকটা সময় বরিশাল কাটান। তাঁর বাবা কাশীশ্বর দাশ ছিলেন বরিশাল আদালতের খ্যাতনামা উকিল। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন। কলকাতার কালীঘাটে বাল্যশিক্ষা গ্রহণের পর তিনি বরিশাল ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে সেখান থেকে প্রদর্শনীবৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাস করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৬১ সালে আইনের প্রথম পরীক্ষায় (Licentiate of law) পাস করে তিনি কলকাতা সদর আদালতে আইনব্যবসা শুরু করেন এবং ১৮৬৩ সালে বরিশাল এসে সরকারি উকিল হন। ১৮৭০ সালে তিনি আবার কলকাতা চলে যান এবং সেখানকার হাইকোর্টে একজন শীর্ষস্থানীয় উকিল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে এবং পেশাগত জীবনের শুরুতেই তিনি তাতে দীক্ষিত হন। ১৮৭৮ সালে বরিশালে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অর্থানুকূল্যে বরিশালে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭৮ সালে বরিশালে দু'টি কায়স্থ বাল্য বিধবার পুনর্বিবাহ হয়। আর এটিই পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে প্রথম বিধবা বিবাহ। এ কাজের জন্য তাকে বহু আর্থিক ও সামাজিক পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এরপরে তিনি বহু অর্থব্যয়ে আরো অনেক বিধবার বিয়ে দেন। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতাকেও তিনি আবার বিয়ে দেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি অতুল প্রসাদ সেনের বিধবা মাকে বিয়ে করেন। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ বিধবা বিয়ের জন্য তাঁর মতো এত অর্থ ব্যয় করনেনি। শুধু বরিশালেই নয় কলকাতার নব্যব্রাহ্মদের একটি ক্ষুদ্র দলেরও তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৭২ সালে তিন (৩) আইন বিধিবদ্ধ হলে তিনি ওই রূপ বিবাহ সম্পাদন কার্যের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Registar) নিযুক্ত হন। কলকাতায় আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সাথে মিলিত হয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও নারী জাতির উন্নতির জন্য তৎপর হন। উদ্ধারপ্রাপ্ত বাল্যবিধবা ও কুলীন কন্যাদের তিনি নিজের ঘরে আশ্রয় দিতেন। এসব মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কিন্তু এটি বন্ধ হয়ে গেলে দুর্গামোহন দাশসহ আরো কয়েকজনের

www.pathagar.com

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালের ১ জুন 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রিতদের শিক্ষার জন্য তিনি অকৃপণ হাতে সাহায্য দিয়েছেন। ১৮৭৬ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ভারত সভারও তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে এস.আর. দাশ ও বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন দাশের নাম উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও দার্শনিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায় তাঁর জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তার ভ্রাতুষ্পুত্র। উদার, মহৎ, সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবেখ্যাত দুর্গামোহন দাশ ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় ইহধাম ত্যাগ করেন।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

নদীয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কর্কশ তর্কশাস্ত্রের প্রতিভার মুখ্য অবতার হিসেবেখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রিয় ছাত্র রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তার সতীর্থ বাকলার কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের সাফল্যে দেশত্যাগী হয়ে তিনি রতন লালের আশ্রয়ে কলকাতা গিয়ে যশস্বী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সেকালে গুরু কৃষ্ণানন্দ উত্তরবাদিরূপে এবং রামমাণিক্য পূর্বপক্ষবাদিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৪৬সালের ২৬ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ইহধাম ত্যাগ করেন।

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত

অশ্বিনী কুমার দত্ত। জন্ম ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর। পৈতৃকভিটা- বাটাজোর, উপজেলা- গৌরনদী, জেলা- বরিশাল। রংপুর হতে ১৮৬৯ সালে ১০ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, কলিকাতা প্রেসডেন্সি কলেজ হতে ১৮৭১ সালে এফ.এ. কৃষ্ণনগর কলেজ হতে ১৮৭৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. এবং এলাহাবাদ কলেজ হতে ১৮৮০ সালে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। পটুয়াখালীর মুন্সেফ-মেজিস্ট্রেট ব্রজমোহন দত্তের সুযোগ্য পুত্র অশ্বিনী কুমার বি.এল পরীক্ষা দিয়ে শ্রীরামপুরের চাতয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরীক্ষার ফল বের হলে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে আইনব্যবসা করার সংকল্প করেন। এম.এ.বি.এল পাস করে অশ্বিনী কুমার এলাহাবাদে ওকালতি শুরু করেন। তার পরম বন্ধু রাজনারায়ণ বসু একদিন তাকে বলেন, 'অশ্বিনী যদি কাজ করতে চাও বরিশালে থাকিও, আর যদি সুনাম করতে চাও কলিকাতায় থাকিও।' ইচ্ছা করলে অশ্বিনী কুমার সহজেই ডেপুটিগিরি জোটাতে পারতেন। পিতা ব্রজমোহন দত্ত পুত্রকে ইংরেজদের গোলাম হওয়া পছন্দ করতেন না। তাই পিতার নির্দেশ ও রাজনারায়ণের উপদেশে অশ্বিনী কুমার ১৮৮২ সালে বরিশালে চলে এসে আইনব্যবসা শুরু করেন। তিনি বরিশালের প্রথম এম.এ.বি.এল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র নয় বছর আইনব্যবসা করে তিনি চিরদিনের জন্য আইনব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

অশ্বিনী কুমার কর্মচিন্তা তিনটি ধারায় প্রবাহিত–শিক্ষা প্রচার ও বিদ্যালয় স্থাপন, দ্বিতীয়ত কর্ম সমাজ ও ধর্মভাব ও তৃতীয়ত জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক সেবা। তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে পূতিগন্ধময় অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, দুর্নীতি ও অসত্য থেকে টেনে তুলে সত্য-প্রেম-পবিত্রতায় প্লাবিত করতে ব্যাকুল হন। তিনি বরিশালে কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর পিতার নির্দেশে প্রথম ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট এবং পরে ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুন ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে বিনাবেতনে ১৭ বছর স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। অশ্বিনী কুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট এবং ব্রজমোহন কলেজ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, মহান ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে ব্রজমোহন বিদ্যালয় এবং ব্রজমোহন কলেজেকে কেন্দ্র করে ঘুমন্ত বাঙালির জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে বরিশালবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে। তখন তিনি বরিশালে স্বদেশ বান্ধব সমিতি গঠন করেন। ১৯০৬ সালে বরিশাল কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অশ্বিনী কুমার সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি বন্ধ করে দেয়। বড়লাট ও ভারত সচিবের নির্দেশে ১৯০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সরকার অশ্বিনী কুমার দত্ত ও ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে চৌদ্দ মাস রেঙ্গুন ও আগ্রায় অন্তরীণ রাখে।

১৯২১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রথম বার বরিশালে আসেন। তখন অশ্বিনী কুমার রোগশয্যায়। মহাত্মা গান্ধী বরিশাল অঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের বাসভবনে দেখা করেন। পরে অশ্বিনী কুমারের তিরোধানের পর মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বার বরিশালে পদার্পণ করে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি স্কুলের ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে 'ছাত্র বন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া নিজে পুস্তক রচনা করেন। তাঁর লেখা পুস্তকগুলির মধ্যে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, দুর্গোৎসব, তত্ত্ব ও প্রেম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভক্তিযোগ ইংরেজিসহ ও ভারতের কয়েকটি স্থানীয় ভাষায় অনুদিত হয়। তার প্রেরণায় 'বরিশাল হিতৈষী' ও 'বিকাশ' পত্রিকা বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা-সাহিত্যের সাথে সাথে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ১৯০৬ সালে রাজা বাহাদুরের হাবিলীতে মিছিলের উপর পুলিশ হামলা চালায়। অশ্বিনী কুমার সেই ঘটনাকে স্মরণ রেখে একটি হল বা মঞ্চ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। ১৯২০ সালে তাঁকে সভাপতি ও শরৎচন্দ্র গুহকে সম্পাদক করে একটি মঞ্চ নির্মাণ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অশ্বিনী কুমারের মৃত্যুর পর যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় ওই হল 'অশ্বিনী কুমার হল' নামকরণ গৃহীত হয়। এই ন হল বরিশালের সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান। অশ্বিনী কুমারের নিজের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ ছাড়া পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পর নিজ গ্রাম বাটাজোরে একটি স্কুল এবং তাঁর বরিশাল শহরস্থ বাসগৃহে বরিশাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুগে যুগে অনেক মণীষী জন্মগ্রহণ করেন। যাঁদের সাধনা চেতনা, প্রতিভা, দূরদর্শিতা এবং কর্মে দেশ ও সমাজ বিকশিত হয়, আধুনিকত্ব সৃষ্টি হয়। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত তাঁর প্রতিভা দিয়ে আধুনিক বরিশালকে গড়ে গিয়েছেন। বরিশালের সাধারণ জনগণের শিক্ষা মানসিকতা বৃদ্ধিকল্পে স্কুল-কলেজ স্থাপন করে সমগ্র ভারতে বরিশালকে পরিচিত করেছেন। বরিশালের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

বরিশাল পৌরসভার কাজ ১৮৮৫ সালে শুরু হয়। পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান প্যারীলাল রায়। চতুর্থ বার ১৮৮৭ সালে এবং পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে অশ্বিনী কুমার দত্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। এরপর ১৯১৮ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা বোর্ডের প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি হলে অনেকে তাঁকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান করতে চান। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি এ দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ডিস্ট্রিক বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি বরিশালবাসী ও জেলা পৌরবাসীর অনেক মঙ্গল সাধন করেছেন। ১৯১০ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর অশ্বিনী কুমারের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে চিকিৎসার জন্য তিনি কোলকাতা গমন করেন। তিনি ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আধুনিক বরিশালের নির্মাতা মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশালের সমাজ ও রাজনীতিতে পথপ্রদর্শক। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত, শিক্ষা বিস্তারে নিবেদিতপ্রাণ, আদর্শ শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সত্য-প্রেম-পবিত্রতার অবতারক।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার জন্ম ১৮৫৭সালে। বরিশাল জেলার বানারীপাড়ায় তার জন্ম। ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বরিশাল অঞ্চলের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি কলকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। ১৯০৮ সালে তিনি গ্রেফতার হন। তিনি নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালের ৩১মে দেহত্যাগ করেন।

খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহম্মদ

১৮৬০ সালের ১৯ নভেম্বর মৌলভী মহিউদ্দীন আহমদের ঘরে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া মহাকুমার কুশলা গ্রাম তাঁর পৈতৃক নিবাস। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বি.এ এবং ১৮৯১ সালে বি.এল. পাস করেন। তিনি প্রথমে বরিশাল বারে ওকালতি শুরু করেন। আলিগড়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বেল ইসলামিয়া হোস্টেলে বরিশালের মুসলিম তরুণদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা তাঁর অন্যতম সাফল্য। তিনি ১৯১০ সালে ইসলামিয়া আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৩ সালে সেন্ট্রাল কো-

www.pathagar.com

অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমবায় ব্যাংকের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি জেলা বোর্ডের দু'বার চেয়ারম্যান ছিলেন। তার চেষ্টায় ১৯২৭ সালে বরিশাল হতে নকীব পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সরকার জনসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ হেমায়েত উদ্দিনকে ১৯১১সালে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কামরুদ্দিন আহমেদ ও ঢাকার আবদুর রহমান খান তাকে মুসলিম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৯৪১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

কবি কামিনী রায়

১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কামিনী রায় বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠি জেলার বাসণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ন কেদারনাথ রায়ের সাথে ১৮৯৪ সালে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯০১ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। কামিনী রায়ের গ্রন্থের মধ্যে আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকী (১৮৯৭), গুঞ্জন (১৯০৫), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), সালেট সংগ্রহ, অশোক সংগীত (১৯১৪), ঠাকুরমার চিঠি (১৯২৪), দ্বীপকূপ (১৯২৯), জীবন পথে (১৯৩০) উল্লেখযোগ্য। কাব্য সাধনায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কবি মৃত্যুবরণ করেন।

ললিতমোহন দাস

বরিশালের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র ললিতমোহন দাস ১৮৬৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নগর্ভা গ্রাম গৈলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে ব্রজমোহন স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রাস পাস করেন। ১৮৯২ সালে কলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ এবং ১৮৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পাস করে কিছু দিন যশোর জেলার নলদা গ্রাম এবং পরে কলকাতা এসে সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। অশ্বিনী কুমার দত্তের সত্য-প্রেম-পবিত্রতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ ললিতমোহন দাস সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। Risley Circular দ্বারা সরকার শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য আজীবন গৃহশিক্ষকতা করেন। ১৯২৪ সালে পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯০৯ সালে উষাহরণ গুপ্ত, অনন্ত কুমার সেনগুপ্তসহ আরো কয়েকজন যুবক মিলে কলকাতায় 'বরিশাল সেবা সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন তিনি তার প্রথম সভাপতি এবং আমরণ এই সমিতির কর্ণধার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ৮২/১, হ্যারিসন রোডে তিনি ছাত্রদের নিয়ে মেস করে থাকতেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাকে ব্রাহ্ম মতে দীক্ষিত

www.pathagar.com

করেন। ধর্ম সাধন (১৯০০), নিবেদন (পূর্বার্ধ), নিবেদন (উত্তরার্ধ) প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। এছাড়াও তার লেখা জীবন কাহিনি 'করুণার লীলা' আজও অপ্রকাশিত। ১৯৩২ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

নূরউদ্দিন আহমদ

বরিশালের বলহারের নূরউদ্দিন আহমদের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তিনি একজন লেখক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মাছায়েলে আরবা (১৯৩৬), ছেলেদের নূরনবী (১৯৩৬), আল জুমুয়া (১৯৩৬), নেছার চরিত (১৯৩৮), স্বামী-স্ত্রীর সংসার (১৯৩৯), জুমুয়ার অকাট্য দলিল (১৯৪১), নারী ও পর্দা (১৩৪৭), ছবিতে নেছারিয়া (১৩৬০) অন্যতম।

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ

১৮৬২ সালে বরিশালের কাউনিয়ায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদের জন্ম। তার আদি নিবাস ঢাকার বঙ্গীমাইনা। পির, মুরিদি ও শিক্ষকতা ছিল তাদের বংশজাত পেশা। ছোটবেলায় তিনি তার বাবাকে হারান। তারপর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের চাচার আশ্রয়ে থেকে বরিশাল বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর তাকে কুমিল্লা জেলার রূপসা গ্রামের জমিদার ও লেখিকা নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর স্বামী চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে তিনি বাজাপ্তী গাজীপুর সার্কেল স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ত্রিপুরা জেলায় (বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা) প্রথম হন। এরপর তিনি রূপসার পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এর কিছু দিন পর পোস্টমাস্টারের চাকরি পান।

১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় যান এবং সেখানে 'মুসলমান' (১৮৮৪) নামক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঢাকায় 'শ্রীমন্ত সওদাগর' নামক একটি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক নবসুধাকর (১৮৮৬) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ইসলাম (১৮৮৫) নামক মাসিক পত্রিকার সাথেও জড়িয়ে পড়েন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তার চেষ্টায় ও পরিচালনায় 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি এর সম্পাদক হন। এ সময় তিনি 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১) নামে অপর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করে। ১৯০৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক সোলতান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শেষ জীবনে তিনি 'নবযুগ' ও 'বয়াত বন্ধু' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

১২৮৭ বঙ্গাব্দে 'পদ্য প্রসূন' নামক একটি ছোট কবিতার বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কে ইসলামমুখী করে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মুন্সী রেয়াজউদ্দিন আহমদের ভাষাজ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি এক সময় বিদ্যাসাগরের 'বোধদয়' গ্রন্থের কয়েকটি অসঙ্গতি দেখিয়ে পত্র লেখেন, বিদ্যাসাগর তা যথারীতি সংশোধন করে তার পত্রের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে তোহফাতুল মুসলেমিন

www.pathagar.com

(১৮৬৬), বোধদয়তত্ত্ব, গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৯০০), হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত (১৯২৭), পাকপাঞ্জাতন (১৯২৯), হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) (১৯২৮), হক নসিহত (১৯০৭), জঙ্গেরুম ও ইউনান, জোলেখা, বৃহৎ হীরকখনি (১৩৬০), উপদেশ রত্নাবলী (১৩২১), বিলাতী মুসলমান (১৯০৯), কৃষকবন্ধু কাব্য (১৯১০), আমার সংসার জীবন (১৯১৪), মুসলমান সাহিত্যের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় এই কর্মযোগী পুরুষ ইন্তেকাল করেন।

শরৎচন্দ্র গুহ

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে প্রথম বছরের ছাত্র শরৎচন্দ্র গুহ ১৮৭২ সালের ৯ ই মে বরিশাল সদর উপজেলার জাগুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মণিচন্দ্র গুহ। ১৮৪০ সালে কলকাতার ডাফ কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন। ১৮৯৭ সালে রিপন কলেজ থেকে বি.এল পাস করে বরিশালে আইনব্যবসা শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম প্রধান উকিল হয়ে ওঠেন। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের বহু কাজের সঙ্গী ছিলেন শরৎচন্দ্র গুহ। তবে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি বরিশাল জেলা সমিতির যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নিজ গ্রামে শরৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধিকবার বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। অবিভক্ত বাংলায় ভারতীয়দের উচ্চ কারিগরি বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদেশ প্রেরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তিনি তার বরিশাল শাখার সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭-৪২ পর্যন্ত তিনি ব্রজমোহন কলেজ কাউন্সিলে অভিভাবক প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৫০ সালে বরিশালে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা দুর্গতদের সাহায্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৩ সালে এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন।

মফিজ উদ্দিন আহাম্মদ

১৮৭২ সালে উজিরপুর উপজেলার গাজীপাড়া গ্রামে মফিজ উদ্দিন আহাম্মদের জন্ম। তিনি ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ এবং রাজচন্দ্র কলেজ হতে বি.এল পাস করেন। তিনি বরিশাল জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গমিহির পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২৮ সালে এই কর্মযোগী ইন্তেকাল করেন।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

আবুল কাশেম ফজলুল হক ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৯ই কার্তিক/১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর তৎকালীন বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহকুমার রাজাপুরের সাতুরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার

www.pathagar.com

গ্রামে। আদি গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানা বিলবিলাস গ্রাম। তাঁর পিতা মৌলভী মুহাম্মদ ওয়াজেদ (১৮৪৩-১৯০১) এবং মা বেগম সৈয়দুন্নেছা এবং দাদার নাম কাজী মুহাম্মদ আকরম (১৮২০-১৯০০)। তাঁর পিতা বরিশালে আইনব্যবসা করতেন। মুহাম্মদ ওয়াজেদ বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বিএবিএল।

আবুল কাশেম ফজলুল হক বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৮৮৯ সালে প্রবেশিকা, ১৮৯১ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ এবং ১৮৯৪ সালে অংক, পদার্থ ও রসায়নে অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করেন। তিনি ১৮৯৭ সালে কোলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএল পাস করে স্যার আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষানবিশ হিসেবে কোলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি ১৯০০ সালে কোলকাতা ও ১৯০১ সালে বরিশাল জজ কোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালে তিনি নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সাথে মুসলিম লীগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯১১ সালে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে পুনরায় কোলকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৯১২ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। ১৯১৩ সালে তিনি ঢাকা বিভাগ হতে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৫ সালে পুনরায় ঢাকা বিভাগ হতে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৩ থেকে ১৬ সাল পর্যন্ত তিনি আইনসভায় ১৪৮ বার ভাষণ দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ১২৮ বার মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা করেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকার ফলে ১৯১৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কারমাইকেল ও টেইলর হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ.কে. ফজলুল হকের চেষ্টায় ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯১৮ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন এবং নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি দৈনিক নবযুগ পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ফজলুল হক ১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন থেকে দরিদ্র কৃষক প্রজাদের মুক্তি ও তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দাবি জানাতে থাকেন। ১৯২১ ও ১৯২৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারি বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। মুসলমান সহকারী পরিচালক, শিক্ষক নিয়োগ, প্রত্যেক স্কুলে মৌলভী নিয়োগ, মুসলমান ছাত্রদের নির্দিষ্ট আসন, পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর প্রভৃতি ব্যবস্থা তিনি চালু করেন। ১৯২৪ সালের ১ আগস্ট তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তেফা দেন। ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজাপার্টির সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৯-৩০ সালে তিনি লন্ডনে প্রথম ও ১৯৩১-৩২ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা দাবি করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি প্রজাসমিতির সভাপতি এবং ১৯৩৫ সালে কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম মুসলমান মেয়র। ১৯৩৭

www.pathagar.com

সালের নির্বাচনে তিনি পটুয়াখালীর ভোট যুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রার্থী খাজা নাজিম উদ্দিনকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর দল কৃষকপ্রজা সমিতি নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর গ্রাম-বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা লেডি ব্রাবোন কলেজ, আদিনা ফজলুল হক কলেজ, চাখার ফজলুল হক কলেজ, মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল, করটিয়া সা'দত কলেজ, তেজগাঁও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন পাস এবং ঋণসালিশি বোর্ড শক্তিশালী করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্য ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন পাসসহ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে সুপারিশ করে কমিশনে রিপোর্ট পেশ করেন। ওই সুপারিশেরভিত্তিতে পরবর্তীকালে এদেশ থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়। ১৯৪০ সালে তিনি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগ সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে বিরোধ দেখা দিলে ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ ও ওয়ার কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪১সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি প্রগতিশীল দল গঠন করে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার বাংলাদেশে পোড়ামাটিনীতি গ্রহণ করলে গভর্নর হারবার্ট-এর সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ১৯৪৩ সালের ২৮শে মার্চ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৩ থেকে ৪৫ সালে আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। এ.কে. ফজলুল হক বরিশাল ও বাগেরহাটে ২টি আসনে জয়লাভ করলেও তাঁর দল শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং ১৯৪৮ থেকে ৫৬ সালে পর্যন্ত ঢাকা হাইকোর্ট বারের সভাপতি এবং ১৯৫১ থেকে ৫৩ সালে পূর্ববঙ্গ সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন।

১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন করেন। তিনি ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তার মন্ত্রিসভা ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১ বৈশাখ সরকারি ছুটি ঘোষণা, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করে।

১৯৫৫ সালের ৫ জুন তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১১ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালের ২৪ মার্চ তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই বৈশাখ/১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে শেরে বাংলা

www.pathagar.com

আবুল কাশেম ফজলুল হক ৮৯বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২৮শে এপ্রিল ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে তাকে সমাহিত করা হয়।

কবি কুসুম কুমারী দাশ

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ (১৮৭৫ মতান্তরে ১৮৮২ সাল) করেন কুসুম কুমারী দাশ। জন্ম বছর পিতা চন্দ্রনাথ দাশ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় স্বগ্রামচ্যুত হয়ে বরিশাল শহরে বাস করতেন। কুসুম কুমারী দাশ কিছুদিন বরিশাল তারপর কলকাতা বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। ১৯ বছর বয়সে পতিগৃহে এসে স্বামী সত্যানন্দ দাশের অনুপ্রেরণায় জ্ঞানচর্চার সুযোগ লাভ করেন। এসময় তিনি শিশুদের জন্য 'কবিতা মুকুল' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা তাঁর গদ্যগ্রন্থ। প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায়ই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। তাঁর লেখা কবিতার মধ্যে অন্যতম একটি কবিতা হলো–

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।...'

নারীত্বের আদর্শ প্রবন্ধ লিখে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। বরিশালের বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন, তবে রেখে যান তাঁর উত্তরসূরি–জীবনানন্দ দাশকে।

দুর্গামোহন সেন

বরিশালের অন্যতম বিপ্লবী নেতা দুর্গামোহন সেন ১৮৭৭ সালের ১৭ নভেম্বর চন্দ্রহারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত সেবাদল 'দি লিটল ব্রার্দাস অফ দি পুওর' এবং 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯০৯ সালে বিধবা-বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকার কারণে তাকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে' অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁকে প্রচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদক রূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার কারণে ইংরেজ সরকারের হাতে তাঁকে বহুবার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনে তিনি বরিশালের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে তিনি বরিশালেই থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের আমলেও তিনি দু-বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারত চলে যান এবং পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯৭২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

মুকুন্দ দাসের জন্ম ১৮৭৮ সাল বলে স্বীকৃত। তাঁর জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে হলেও তার কর্মক্ষেত্র বরিশালেই বিস্তৃত। মুকুন্দ দাসের পিতার নাম গুরু দয়াল। তাঁর জন্ম ১৮৭৮ সাল এবং মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ১৮ মে। তাঁর নিবাস ছিল বরিশাল শহরের

www.pathagar.com

আলেকান্দা-বগুড়া রোড এলাকায়। তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯০০ সালের রামানন্দ ঠাকুরের নিকট তিনি দীক্ষা নেন। গুরু তার নাম দিলেন মুকুন্দ দাস।

মুকুন্দ দাসের বাল্যনাম যজ্ঞেশ্বর দে। যজ্ঞা বলেই ডাকত সবাই। যজ্ঞেশ্বরের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকাল উচ্ছৃংখলতায় অতিবাহিত হয়েছে। সাধারণ্যে একসময় যজ্ঞাগুণ্ডা নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। এর আগে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় একবার শারদোৎসবে মুকুন্দ দাস শোভাযাত্রার সমেবত গানে নেতৃত্ব দিয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুরন্তপনায় শংকিত বাবা যজ্ঞেশ্বরকে তার মুদি দোকানে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন। তাই মুদি দোকানের পরিবেশেই প্রস্ফুটিত হলো যজ্ঞেশ্বরের অন্তরের সুপ্ত শক্তি। সে শক্তিই কালক্রমে অংকুরিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে মুদি যজ্ঞেশ্বর যে কীর্তনিয়া মুকুন্দ দাসে পরিণত হয়েছিলেন, তার মূলেও আছে এই মুদি দোকানের নিরাপদ আশ্রয় ও স্বাধীনতা।

বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি মুকুন্দকে কীর্তনীয়ার আবেশ থেকে মুক্ত করে এনে দাঁড় করিয়েছে জনতার সামনে-চারণের বেশে। মুকুন্দ দাসের এই স্থান পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত। অশ্বিনী কুমার দত্তের সান্নিধ্যে এসে মুকুন্দ দাস নবজীবনের সন্ধান পান। মুকুন্দ দাস শুরু করলেন সমাজ সচেতন যাত্রাপালা ও গান রচনা। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। ক্রমশ মুকুন্দ দাস পরিচিত হলেন চারণ কবি হিসেবে। তিনি নিজেই গড়ে তুললেন দল। তার পালায় যেমন ছিল দেশপ্রেম, ছিল সমাজ আর সমাজের সংস্কার আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-তেমনি ছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রুপাত্মক আক্রমণ। আর ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। গানের এ ধারা স্বদেশিযাত্রা হিসেবে লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। মুকুন্দ দাস আবিস্কারক, লোকসংস্কৃতির নতুন অধ্যায়ের প্রবর্তক, প্রচারক, অভিনেতা ও শিল্পী প্রবক্তা।

মুকুন্দ দাস তাঁর রচিত গানে গ্রাম বাংলার প্রচলিত লোকসুরকে গ্রহণ করেছেন সমধিক। এর উদ্দেশ্য ছিল-গানকে সহজে শ্রোতায় হৃদয়ঙ্গম করা। যাত্রার মুকুন্দাদাস গান ও অভিনয়ের মাঝেমাঝে বক্তৃতার প্রচলন করেন। গানের পর বক্তৃাতা, সাথে সাথে গান, তার মধ্যে আবার পূর্বকথায় ফিরে এসে অভিনয়-যাত্রা-আন্দোলনের ইতিহাসে মুকুন্দ দাসের এক অভিনব টেকনিক। এই নতুন টেকনিকেই মুকুন্দ দাস মাতিয়ে তুলেছেন সারা বাংলা। মুকুন্দ দাসের *মাতৃপূজা, পথ, সাথী, সমাজ, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র* প্রভৃতি পালা ব্রিটিশ শাসকদের টনক নড়িয়েছিল। ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে রাজরোষে পতিত হন মুকুন্দ দাস। সে নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তার দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত। মুকুন্দ দাস সে সময়ে একজন রাজনৈতিক নেতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে-
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা বাবু খুলে।"

www.pathagar.com

এবং

"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম,
তবে ফিরিংগী বণিকের গৌরব রবি–
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।"

গান দুটির জন্য মুকুন্দ দাসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারে প্রথমটির জন্য তিন ও দ্বিতীয়টির জন্য আড়াই বছর জেল হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার *মাতৃপূজা*, *কর্মক্ষেত্র* ও *পথ* এই পালা তিনটি বাজেয়াপ্ত করে। মুকুন্দ দাসের নবযাত্রা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, একে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেও পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি স্বদেশি পালা প্রচারের জন্য সিরাজগঞ্জ ও মেদিনীপুরে একটি করে দল গঠন করিয়েছিলেন। তিনি বরিশালের কালীকৃষ্ণ নট্টকেও (১৩০১–১৩৬১) একটি দল গঠন করে দিয়েছিলেন। মুকুন্দ দাস গান লিখেছেন প্রচুর। তার রচিত গানকে বিষয়ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক. শাক্ত সংগীত, দুই দেশগান। দেশপ্রেমই মুকুন্দ দাসের মূলমন্ত্র। মুকুন্দ দাস দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির সাধনার পথের শক্তির উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন শাক্ত বন্দনা। তার এই শাক্ত বন্দনার আর এক কারণ হতে পারে, সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থা। সামাজিকভাবে মানুষ আধ্যাত্ম সংগীতের প্রতি যতটা আকৃষ্ট হয়, দেশগানে ততটা হবে না ভেবেই তিনি হয়ত এর আশ্রয় নিয়ে ছিলেন।

মুকুন্দ নিজেই নিজের লেখা গান নিজের সুরে গাইতেন গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে। চষে বেড়িয়েছিলেন সারা বাংলা। মুকুন্দ দাসের ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে। মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে' ; করমেরই যুগ এসেছে সবাই কাজে লেগে গেছে। মোরাই শুধু রব কি শয়ান'; হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা'; 'ভাইর ভাই মানুষ নাই দেশে। এদেশের সকল মেকি সকল ফাঁকি। যে যার মৌজে আপন রসে'; 'আয়রে বাঙালি আয় সেজে আয়। আয় লেগে যাই দেশের কাজে'; 'সকল কাজের মিলবে সময়। আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর; প্রভৃতি গান আজও আমাদের দেশ গড়ার প্রেরণা দেয়–দেয় স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হবার অমোঘ আহ্বান। এ আহ্বান সময়ের সীমার বাইরে অনাদি অনন্ত কালের। মুকুন্দ দাসের কর্মক্ষেত্র নাটকটি প্রথম নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ সালের ২০ এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায়। বরিশাল আদর্শ প্রেসে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম থেকে লেখক মুকুন্দ দাসই বইটির প্রকাশক। বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ নিষিদ্ধ হয় একই বছর ১১ জুলাইয়ের গেজেট ঘোষণায়। বইটির দুটি সংস্করণ মুদ্রিত হয় যথাক্রমে বরিশালের অভ্যুদয় প্রেস ও বাসন্তী প্রেসে। প্রকাশক মুকুন্দ দাস স্বয়ং। বরিশালের আদর্শ প্রেসে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও লেখক কর্তৃক কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম থেকে প্রকাশিত মুকুন্দ দাসের পথ নাটকটি নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ সালের ২০ এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায়।

এর আগেও মুকুন্দ দাসের একটি পালা নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেটি মাতৃপূজা। মাতৃপূজা নিষিদ্ধ হয় মুদ্রিত হবার আগেই। পালা ছাড়াও মুকুন্দ দাসের দুইটি গানের বই নিষিদ্ধ হয়। কর্মক্ষেত্রের গান ও পথের গান। কর্মক্ষেত্রের গান নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ সালের ১৬ নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। বইটির তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত সংস্করণগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮

www.pathagar.com

সালের ৫ এপ্রিল এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়। পথের গান নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ সালের ১৪ নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। এই বইর উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৮ সালের ৫ এপ্রিল। এইসব বই নিষিদ্ধ করা হয় ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) ১৯৩১ আইনের ১৯ ধারা অনুসারে। মুকুন্দ দাস মাতৃপূজা পালা রচনার জন্য ৩ বছর জেল খাটেন। ১৯৩৪ সালের ১৮ মে তিনি কোলকাতায় অবস্থানকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সংগীত ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী

বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী ১৮৮৪ সালের ১২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তঁর বাবার নাম ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। দারোগা পিতার কর্মস্থল গলাচিপায় তাঁর জন্ম। ১৯০১ সালে প্রবেশিকা পাস করে ঢাকায় এফ.এ. পড়েন। কর্ম জীবনের শুরুতে নিজ গ্রাম উজিরপুরে দু-বছর শিক্ষকতার পর তিনি বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর বরিশাল শহরে এসে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা শুরু করেন। অশ্বিনী কুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করে তৎকালীন বরিশালের বিপ্লবী সংগঠন স্বদেশ বান্ধব সমিতির সহসম্পাদক নিযুক্ত হন। তারই চেষ্টায় ১৯০৬ সাল থেকে বরিশালে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের ঘাঁটি তৈরি হয়। এ কারণে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। আর তখন থেকে একাহারে কায়ক্লেশে ভরণ-পোষণ চালাতে থাকেন। ১৯০৮ সালে অশ্বিনী কুমার গ্রেফতার হলে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র দেড় শতাধিক শাখার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার এ প্রতিষ্ঠানটি বেআইনি ঘোষণা করলে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে পড়াশুনা ও আধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত হন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতিতে জ্ঞান অর্জন করেন। এর সাথে সাথে বরিশালের যুগান্তর দলের কেন্দ্র রূপে 'শঙ্কর মঠ' গঠন করেন। প্রকাশ্যে তার আদর্শ ছিল বেদান্ত প্রচার।

১৯০৯ সাল থেকে তিনি কাশীতে যাতায়াত শুরু করেন। এ সময়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও সচীন সান্যালের সাথে তার যোগাযোগ ঘটে এবং সেখানেও একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। বিপ্লবী দল গঠন ছাড়াও কাশীতে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাথে তিনি আলোচনা ও পাঠ চালাতেন। ১৯১৩ সালে কাশীর শঙ্করাচার্য সরস্বতীর কাছ থেকে তিনি দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

১৯১৫ সালে কলকাতায় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাসকালে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করতেন এবং বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ তাঁর পরামর্শ নিতেন। কাশীতে তার জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ১৯১৬ সালের মার্চে ভারত রক্ষা আইনে তাকে গ্রেফতার করে স্বগ্রামে অন্তরীণ রাখে। পরে বরিশাল 'শঙ্কর মঠে' বাস করার অনুমতি পান। এ সময় আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা যুদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নলীনি কর বরিশালে প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর সাথে আলোচনা করতে আসতেন। পরে সরকার তাকে মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ করে। এখানে

www.pathagar.com

শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষই নয় সরকারি কর্মচারী ও মহীষাদলের রাজাও তার ভক্ত হয়ে ওঠেন। এখানে বেশ কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

১৯২০ সালে মুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান। কিন্তু মহিষাদলের শান্ত পরিবেশ ভাল লাগায় আবার সেখানে তিনি ফিরে যান। তবে আবারও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তিনি মহিষাদল ত্যাগ করেন। কলকাতায় তাঁর শিষ্য যেগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ১৯২১সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। তার অনুগামীরা ১৯২০ সালে কলকাতায় তার নামে সরস্বতী লাইব্রেরি এবং ১৯২৩ সালে শ্রীসরস্বতী প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। তার লেখা গ্রন্থাবলির মধ্যে রাজনীতি, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, কর্মতত্ত্ব, সবলতা ও দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের পূর্ব পাশে অবস্থিত শ্রীশ্রীশংকর মঠে এই মহান বিপ্লবীর প্রস্তর মূর্তি রয়েছে।

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত

১২৮৫ বঙ্গাব্দে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মাহিলারায় রামচন্দ্র দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফএ (আইএ) পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে বহু স্বদেশি গান রচনা করেন। তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সভা-সমিতিতে তাঁর অগ্নিঝরা বক্তৃতা শ্রোতা সাধারণকে বিমোহিত করতো। তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো–জাগরণ, দীক্ষা, দৈববাণী উল্লেখযোগ্য। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবকুমার রায়চৌধুরী

প্রথম মহিলা উপন্যাসিক কুসুমকুমারী রায় চৌধুরীদেবীর পুত্র দেবকুমার রায়চৌধুরী ১৮৮৬ সালের ২৩ জানুয়ারি বরিশালের লাকুটিয়া জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর ঘরে জন্ম নেন। বরিশালের অন্যতম কৃতী সন্তান অশ্বিনী কুমার দত্তের কাছে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তারই উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমন্ত্রিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরিশাল এসেছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী লেখেন। তার লেখা কাব্য গ্রন্থ হলো : অরুণ, প্রভাতী, মাধুরী, ধারা এবং কাব্যনাট্য: 'দেবদূত অন্যতম। তিনি তাঁর ব্যাধি ও প্রতিকার বইটিতে ভারত বর্ষের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ এবং এর সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

খান বাহাদুর হাসেম আলী খান

১৮৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি হাসেম আলী খান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আরমান আলী খান। তাঁর পৈতৃক আদি নিবাস পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠী উপজেলার সেহাঙ্গল গ্রাম। তবে বরিশালই তাঁর কর্মক্ষেত্র। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা হতে

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালে এফ.এ এবং ১৯১০ সালে বি.এ; ১৯১৩ সালে রিপন কলেজ হতে বি.এল ডিগ্রি অর্জন করেন। অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, বাকেরগঞ্জ জেলা বোর্ড ও বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান খান বাহাদুর হাসেম আলী খান ছিলেন বঙ্গীয় প্রজা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ছাত্র জীবনেই তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং এ.কে. ফজলুল হকের, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহম্মদের সান্নিধ্য লাভ করেন। বি.এল পাস করে আলীপুর কোর্টে আইনব্যবসা শুরু করলেও তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে কোলকাতা ছেড়ে এসে বরিশাল বারে ওকালতি শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যে অন্যতম ফৌজদারি উকিল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যখন বরিশাল বারে যোগ দেন তখন মাত্র ৩ জন মুসলিম উকিল ছিলেন।

হাশেম আলী খান ১৯১৫ সালে এ.কে. ফজলুল হকের নির্দেশে বরিশালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বাকেরগঞ্জ জেলা প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯২০ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বরিশাল জেলা খেলাফত কমিটির সম্পাদক এবং খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমেদ সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় তাঁর সভাপতিত্বে আগৈলঝাড়ায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী বরিশাল আসেন এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয় মাঠে জনসভায় বক্তৃতা দেন। তাদের হিন্দি ও উর্দু বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন হাশেম আলী খান। কুলকাঠি হত্যার প্রতিবাদে ১৯২৭ সালের ৮ হতে ১৩ মে বরিশালে মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। হাশেম আলী খান কনফারেন্সে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক এবং খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ সালের ২৫ জুলাই বরিশালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি হয় হাশেম আলী খান সেই চুক্তির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ৩ জুন সরকার সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

১৯৩০ সালে বরগুনার গৌরিচন্না গ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে হাশেম আলী খান সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি চরামদ্দির জমিদার চৌধুরী ইসমাইল খানকে পরাজিত করে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে বরিশাল উত্তর কেন্দ্র হতে মুসলিম লীগ প্রার্থী উলানিয়ার জমিদার আরিফ হোসেন চৌধুরী (ধনু মিয়াকে) পরাজিত করে বঙ্গীয় আইনসভার এম.এল.এ নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের সাথে এ.কে. ফজলুল হক কোয়ালিশন গঠন করলে হাশেম আলী খান বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। ফ্লাউড কমিশনর রিপোর্ট প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৫০ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস এবং ১৯৫৬ সালে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ হয়। ১৯৪১ সালে তিনি দৈনিক নবযুগ পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪২ সালে তার পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক গুলিস্তান কলকাতা হতে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। ১৯৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাশেম আলী খান এ.কে. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভায় সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের সাময়িক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার ভেতরে ও বাইরে থেকে ১৯৩৮ সালে ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৩৯ সালে কৃষি খাতক আইনের প্রথম সংশোধনী ও ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। ১৯৪২ সালের ২৭ মার্চ তিনি চাষী খাতক আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করেন। ১৯৪৩ সালের ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের পদত্যাগের সাথে হাশেম আলী খান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন ১৯৫০ সালে। ১৯৫২ সালে তিনি বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৬ সালের উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাউখালীতে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ সালের জাতীয় পরিষদের বাকেরগঞ্জ-৫নং আসনে তিনি প্রার্থী ছিলেন। ওই বছর ১৬ এপ্রিল নির্বাচনী প্রচারকালে বাবুগঞ্জ নদীতে নৌকাডুবির ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মনোরঞ্জন গুপ্ত

১৮৯০ সালের ৭ মার্চ বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার আধুনা গ্রামে মনোরঞ্জন গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজমোহন কলেজ হতে বি.এ পাস করে তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কারান্তরীণ থেকেও প্রার্থী হয়ে বিপুল বোটে জয়লাভ করেন তিনি। ১৯৫০ সালে বরিশালে সামপ্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি ১২ বছর এম.এল.সি. ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে কোলকাতায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৮৯০ সালের ২২ এপ্রিল দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বরিশাল নগরীর কাউনিয়া ক্লাব রোডের নিজস্ব বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিলো দোল পূর্ণিমা। সে কারণেই বাবা নিবারণ ঘোষ ও মা রাজলক্ষ্মী ঘোষ আদর করে তাঁর নাম রাখেন আবীর।

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত সত্য-প্রেম-পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতিপর্বের দীক্ষা লাভ করেন এ বিদ্যালয় থেকেই। স্কুল জীবনেই ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা করার কারণে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাকে সকল বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের লক্ষে আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র। এই ঢেউয়ের তোড়ে আন্দোলিত হয়ে ওঠে বরিশাল। অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে সেই উত্তাল ঢেউয়ে নিজেকে সমর্পণ করেন কিশোর দেবেন্দ্রনাথ। ঠিক পরের বছর জাতীয় কংগ্রেসের বরিশাল অধিবেশন ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে শামিল হন দেবেন্দ্রনাথ। ১৯০৭ সালে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ গুহ ও যতীন্দ্রনাথ দাসের অনুপ্রেরণায় ভীম বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেগু রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, সুবোধ

www.pathagar.com

মল্লিক, তারকনাথ দাস, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিন মিত্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগ দেন দেবেন্দ্রনাথ। শহরের বাজার রোডের এক বিস্ফোরণের ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেফতার হন। ১৯১৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় গ্রেফতার হন। জড়িয়ে পড়েন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়। অল্প বয়সের কারণে তৎকালীন বিচারে তার দ্বীপান্তর হয়নি তবে ভোগ করেন কারাজীবন। ১৯২৫ সালে নিজ ব্যায়ামগুরুর নামে প্রতিষ্ঠা করেন সূর্যকান্ত ব্যায়াম বিদ্যালয় যা বর্তমানে কাউনিয়া ক্লাব নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ যোগ দেন আর.এস.পি-তে। ১৯৩০ সালে বরিশালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। ওই বছরেই বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩১ সালে বারাসাত জেল হতে এনে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার জেলে ভিলেজ ডেটিনিউ হিসেবে আটকে রাখে ব্রিটিশ সরকার। বাঁকুড়া জেল থেকে বরিশালে ফিরে আসতে না আসতে তাঁকে আবার ১৯৩৩ সালে গ্রেফতার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে রাজপুতনার দেউলী জেলে। জেলে জেলে ঘুরতে থাকে তার জীবনচক্র। ১৯৩৪ সালে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে এবং তা বিলোপ হবার পক্ষে ফ্লাউড কমিশনে সাক্ষ্য দেন দেবেন্দ্রনাথ। ভারত স্বাধীনের পর কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে বরিশাল জেলার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে 'যুব সংঘ' গঠন করেন। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা রাখায় তাকে পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তাবন্দির নামে আটক করে। ১৯৫১ সালে স্থানীয়ভাবে ভাষা আন্দোলনের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করে দেবেন্দ্রনাথ ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনেও শরীক হন তিনি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথকে দেশরক্ষা আইনে বন্দি করা হয়। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাকশালে যোগ দেন এবং বরিশাল জেলা বাকশালের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর ওপর জেলা গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৭৫'র ১৫ আগস্টের কালোরাতের পরপরই দেবেন্দ্রনাথ ঘোষকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। প্রায় ১ বছর তিনি জেল ভোগ করে ছাড়া পান। ভগ্নদেহের-শান্ত স্বভাবের এই মানুষটি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। একাধারে তিনটি রাষ্ট্রের অধীনে দীর্ঘ জেলজীবন ভোগ করেই তিনি যেন পরিণত হয়ে উঠেছিলেন আজন্মসংগ্রামী চিরযুবা এক পুরুষে। ১৯৯৯ সালের ১১ জানুয়ারি চিরকুমার, সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের জীবনাবসান ঘটে।

রাজেন্দ্র নারায়ণ গুহঠাকুরতা

বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর রাজেন্দ্র নারায়ণ গুহঠাকুরতা ১৮৯২ সালে বানারীপাড়ায় বসন্ত কুমার গুহঠাকুরতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল বিএম স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি সার্কাস দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম শিখে নিজেই

www.pathagar.com

সার্কাসের দল গঠন করেন। তিনি বুকের উপর হাতি, গরুর গাড়ি ও রোলার তুলতে এবং চলন্ত মোটর থামাতে পারতেন। বাঙালিদের মধ্যে শরীরচর্চা প্রচলনের জন্য তিনি All Bengal Physical Culture নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। তিনি কলকাতার সিটি কলেজ এবং ল' কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন সূর্যকান্ত গুহ। ১৯১৭ সালে তিনি প্রথম কলকাতা যান এবং 'কার্লেকার সার্কাসে' ৪ টন রোলার বুকে তুলে দর্শকদের বিমোহিত করেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় বাঙালি যুবকদের মধ্যে শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়া কৌশল দেখানোর রেওয়াজ চালু হয়। প্রফেসর রামমূর্তি তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। ১৯৪৫ সালের ২১ জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সতীন্দ্র নাথ সেন

১৮৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল পটুয়াখালী শহরে সতীন্দ্র নাথ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবীনচন্দ্র সেন। ১৯১১ সালে পটুয়াখালী জুবিলী স্কুল হতে প্রবেশিকা পাস করার পর তিনি হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ ও কলিকাতার রিপন কলেজে অধ্যায়ন করেন। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম নেতা ছিলেন সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশাল শহরের শংকর মঠে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেন এবং গুপ্ত সমিতির সদস্য হন। ১৯১৫ সালে বরিশাল দলের সাথে শিবপুর ডাকাতিতে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হন এবং ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২১ সালে তার নেতৃত্বে পটুয়াখালী মহকুমায় অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সরকার পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। ১৯২৩ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি বরিশাল জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে পটুয়াখালীতে দীর্ঘদিন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে। ১৯২৭ সালে পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি লবণ ও ভারত ছাড় আন্দোলনেও বন্দি হন। ১৯৪৬ সালে মিশ্র নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পরাজিত করে তিনি এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের পরে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। মুক্তিলাভ শেষে ১৯৫২ (ক) ধারায় পুনরায় তিনি বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় ১৯৫৫ সালে ১৮ মার্চ এই বিপ্লবী বিনা চিকিৎসায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে মারা যান।

মনোরমা বসু মাসীমা

বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার বানারীপাড়া নরোত্তমপুর গ্রামে মনোরমা বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর। পিতার নাম নীলকণ্ঠ রায়। ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলন, পাকিস্তানি শাসন বিরোধী গণঅভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ সংগ্রামের দিনগুলোতে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গড়ার কাজসহ আমৃত্যু প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে সাধারণ মানুষ কাছে পেয়েছে তাঁকে। তিনি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। ষাট বছর আপনজন হিসেবে সাধারণ মানুষ কাছে পেয়েছেন তাঁকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মিছিলের গান তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে স্বদেশপ্রেমী হওয়ায়। ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবরে শোককাতর মানুষের মিছিলে তিনিও যোগ দেন সেই কৈশোরে। স্বদেশি আন্দোলনের জন্য নিজের সোনারবালা, চুড়ি, দুল দিয়ে দেন বিপবীদের হাতে। স্বামীর সমর্থন তাঁকে মানবসেবায় ব্রতী হতে সহায়তা

www.pathagar.com

করেছিল। রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কোরারুদ্ধ থাকায় তিনি হয়ে ওঠেন আন্দোলনের পরিচালক। মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের বাধা না মানায় বন্দি হন ৩৩ বছর বয়সে। তিনি তখন ৬মাস বন্দিজীবন কাটান বহররমপুর ও বরিশাল জেলে। জেল থেকে ফিরে তিনি নিজের বাড়ির বারান্দায় মেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল খোলেন। এই স্কুল পরবর্তীকালে মাতৃমন্দির নামে পরিচিতি লাভ করে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীরা, সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত নারীরা জীবন ফিরে পেতে থাকে মাতৃমন্দিরে। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দীক্ষায় দিক্ষিত হন। ১৯৪০-৪৭ পর্যন্ত তিনি সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে নারী-শিশু ও নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা করতে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ-পূর্ণবাসনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে বরিশাল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী হয়ে সংগঠিত করতে থাকেন নারী কর্মীদের। ১৯৪৮ সালের ১৭ মে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর মেয়ে বাসনার। মেয়ের জন্য শোক করার সময় মিললো না মাসীমার। ওই বছর ৫ জুন বরিশালের খাদ্য আন্দোলন করার সময় মেয়ে ভজনাসহ গ্রেফতার হন মাসীমা।

১৯৫১ সালের ২৫ এপ্রিল মুক্তি পান। তাঁর অবর্তমানে পাকিস্তান সরকার মাতৃমন্দির ভেঙে দিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে আবার গড়েন মাতৃমন্দির। ১৯৫৪সালের ১০ মে স্বামীকে হারান। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের নেত্রী ছিলেন। ১৯৭০ সালে মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি বরিশালে মহিলা পরিষদ স্থাপন করেন। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুগিয়েছেন ত্রাণসামগ্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল সংগঠকের। বরিশাল ছিল তাঁর কর্মস্থল। ১৯৭৮-এ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। মানবতাবাদের ধারক, মানবাধিকার ও গণআন্দোলনের প্রতীক, নারী আন্দোলনের অকুতভয় সৈনিক মনোরসা বাসু মাসীমা ১৯৮৬সালের ১৬ অক্টোবর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

পরেশ লাল রায়

১৮৯৮ সালের ২০ ডিসেম্বর বরিশালের লাকুটিয়ার জমিদার বংশের সন্তান ব্যারিস্টার পিয়ারীলালের ঘরে খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা পরেশলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তক। শিশুকাল থেকেই ইংল্যান্ডে তার শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয়। কেমব্রিজের বিখ্যাত কোচ বিলি চাইল্ডসের কাছে দশ বছর বয়সে তিনি বক্সিংয়ের তালিম নেন। পরে ফেদারওয়েটের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জিম ড্রিসকল স্বেচ্ছায় তাঁর শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে সেন্ট পলস্ স্কুলে চ্যাম্পিয়ন হন। বক্সিংয়ে তিনিই এশিয়ার প্রথম কেমব্রিজ ব্লু। পরে রাগবি খেলাতেও তিনি ব্লু পান। ১৯১৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডের ব্যান্টমওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি বন্দুক ছোড়া ও অশ্বারোহনেও দক্ষ ছিলেন। সম্ভবত তিনিই ভারতের প্রথম অপেশাদার জকি যিনি রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। কেমব্রিজে পড়ার পড়ার সময় জওহর লাল নেহেরু তার সতীর্থ ও ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে

www.pathagar.com

যোগ দেন এবং তিনি ও তাঁর ছোট ভাই ইন্দ্রলাল রয়েল ফ্লাইং কোরে কিংস কমিশন পান। এর আগে কোনো ভারতীয় এ সম্মান পাননি। ১৯১৯ সালে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করে তিনি দেশে ফিরে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে চাকরি নেন। পরে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের ডাইরেক্টর এবং ওটি রেলওয়ের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। বিশ দশকে বক্সিং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল। তিনিই ভারতীয়দের বক্সিংয়ের রিংয়ে টেনে আনেন। এ লক্ষ্যে তিনি কলকাতার বালিগঞ্জে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। ১৯২৮ সালে তিনি বেঙ্গল বক্সিং ফেডারেশন গঠন করে প্রথমে তার সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্বভার পালন করেন। তার শিষ্য সন্তোষ দে ১৯৩৩ সালে সিভিল মিলিটারি লড়াইয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রথম চৌধুরী, ফণী মিত্র, নগেন চ্যাটার্জী, জনি নাটাল, আর অস্টিন, ডি. গ্যাসপার, কার্তিক দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অ্যামেচার বক্সার হয়েও ওল্ড এম্পায়ার ভারত চ্যাম্পিয়ন এডগার ব্রাইটের বিরুদ্ধে খেলে তিনি বক্সার ইয়ং টারলেকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

জ্যোতিষ চন্দ্র রায়

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে বিখ্যাত প্রাণ-রসায়নবিদ জ্যোতিষচন্দ্র রায় বরিশালের নরোত্তমপুরের বরদাকান্ত রায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তি নিকেতন, কলকাতা, হেইডেলবার্গ, বার্লিন এবং লন্ডনে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সাল থেকে ২৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রফেসর মার্টিন হ্যানের তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্য চালান। তাঁর গবেষণার বিষয় 'কলেরার মৌখিক টিকা'র উপর কাজ শেষ করে ১৯২৬ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণির অনার্স ডক্টরেট উপাধি পান।

Leishmaniasis-এর ওপর তাঁর গবেষণা প্রোটোলজির একটি মৌলিক অবদান। তিনি ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রোটোলজিক্যাল সার্ভের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালে সংস্থার নাম 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন নামে পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন। অ্যানেলাস অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৯-এ ভারত সরকার তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৫-এর ২৪ নভেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ

জীবননান্দ দাশের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। তিনি ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। দুই দশকের বেশিকাল শিক্ষকতা জীবনে তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যের এক নতুন ধারার কবি। তিরিশোত্তর নবীন কবিদের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। এই নবীন কবি গোষ্ঠী প্রথম

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য কাব্যরীতি আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবি এই কাব্য আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক। তিনি নিসর্গ ও নির্জনতার প্রিয় কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। বাংলার প্রকৃতি জীবনানন্দের কাব্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭ ও 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ দুটির কবিতাবলি স্বদেশ প্রীতি নিসর্গময়তা ও গভীর ভালবাসা বোধের পরিচায়ক। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), সাতটি তামার তিমির (১৯৪৮), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১), ঝরা পালক (১৯২৭), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), কবিতার কথা (১৯৫৬)। কবি জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ সালে ১৪ই অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ/১৯০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামছরি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম এন্তাজ আলী মাতুব্বর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করা মানুষটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা তাঁর প্রিয় ছিল। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ তার বয়স যখন ৮০ বছর, তখন তিনি নিজের কবর নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর কবরের ভেতর রাখা হলো চুল, একটি দাঁত ও নখ। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ / ১৯৮১ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি লিখিত অছিয়ত করেন। সেখানে লেখা ছিল–'মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে দান করিয়াছি।'

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্রদের সামনে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি হুমায়ুন কবির স্মৃতি পদক (১৯৭৮), বাংলা একাডেমি সম্মাননা, (১৯৮৫), বাংলাদেশ লেখক শিবির সম্মাননা এবং ১৯৮২ সালে উদীচী বরিশাল জেলা শাখার সম্মাননা লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। তাঁর নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি তাঁর স্বপ্নের ফসল। সত্যের সন্ধানে (১৯৭৩), সৃষ্টির রহস্য (১৯৭৭), অনুমান (১৯৮৩) এবং মুক্তমন (১৯৮৮) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর মৃত্যুর পর *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র* প্রকাশিত হয়। ১৩৯২ বঙ্গাব্দের ১ চৈত্র তিনি ইন্তেকাল করেন।

বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান

১৯০১ সালে আব্দুল জব্বার খান বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজল খান। স্থানীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করে মেট্রিক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে সম্মানসহ প্রথম শ্রেণিতে এম.এ এবং পরে আইন বিষয়েও প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস করেন। শিক্ষা-জীবন শেষে তিনি বরিশালে আইনব্যবসা শুরু করেন। কিছুদিন

www.pathagar.com

পর বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুন্সেফ হিসেবে যোগদান করেন। পরে সাবজজ, ডিস্ট্রিক্ট জজের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে হাইকোর্টের জজ হিসেবে অবসর গ্রহণের পর ওই বছরই জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আব্দুল জব্বার খান বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, গৌরনদী, রাজাপুর, ঝালকাঠি, নলছিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বরিশাল অঞ্চলের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৮৪ সালের ২৩ এপ্রিল ঢাকায় আব্দুল জব্বার খান ইন্তেকাল করেন।

শৈলেশ্বর চক্রবর্তী

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবক ও শিক্ষাবিদ শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর জন্ম ১৯০১ সালের ১৭ ডিসেম্বর বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের হস্তিশুণ্ড গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা বরিশালের তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামহরি তর্কভূষণ। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ১৯১৮ সালে লক্ষ্মণকাঠী হাইস্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় এবং ১৯২০ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ সাল থেকেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শংকরমঠ কেন্দ্রিক বরিশাল পার্টির সাথে যুক্ত হন। ১৯২২ সালে ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক সম্মান কোর্স চালু হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন এবং জেলের মধ্যে থেকে পরীক্ষা দিয়ে অনার্স ও এমএ-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরে তিনি এলএলবি এবং ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরি সাইন্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাঁর ২১ বছরের রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কারান্তরালে। ১৯২৩ সালে তিনি তরুণ সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে রাজবন্দি হিসেবে তিনি দেউলী, হিজলী, বক্সা, আলীপুরদুয়ার, ক্যাম্পবেলপুর প্রভৃতি জেলে নয় বছর কারাভোগের পর মুক্তি পেয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে গাভা, কীর্তিপাশা, পটুয়াখালী লতিফ স্কুল প্রভৃতি স্থানে প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৫৩ সালে ব্রজমোহন কলেজের লাইব্রেরিয়ান ও পরে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। সবমিলিয়ে তিনি প্রায় ৩৭ বছর শিক্ষকতা করেন। ইংরেজি,বাংলা, সংস্কৃত ও জার্মান ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বার্ধক্যজনিত অসুখে তিনি দেহান্তরিত হন। প্রচার বিমুখ এই মানুষটি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের আশির্বাদ ধন্য ছিলেন। তাঁর সময়ে যারা বরিশালের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে সতীন্দ্রনাথ সেন, তারাপদ ঘোষ দস্তিদার, নির্মল ঘোষ, মনোরমা বসু মাসিমা, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, দুর্গামোহন সেন, সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত, শরৎকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র গুহ, হীরালাল দাশগুপ্ত, অমিয় কুমার রায় চৌধুরী, সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য, নকুলেশ্বর গুপ্ত,

www.pathagar.com

সরল কুমার দত্ত, কেদারনাথ সমদ্দার, সুধীর আইচ, অবলাকান্ত কর চৌধুরী, হাজী ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, খান বাহাদুর হাসেম আলী খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

যোগেশচন্দ্র বাগল

১৯০৩ সালের ২৭ মে যোগেশচন্দ্র বাগল তৎকালীন বরিশালের পিরোজপুর মহকুমার সদর থানা অন্তর্গত কুমিরমড়া গ্রামের মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন ১৯২৮ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রুফরিডার হিসেবে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মর্ডান রিভিও পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে নিযুক্ত হন। এরপর সহকারী সম্পাদকরূপে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি দেশ পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৬১ সালে সাংবাদিকতা থেকে অবসর নেন। ১৯৪০ সালে তাঁর গবেষণমূলক গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে পা ফেলেন। সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে দেবার পর দৃষ্টিশক্তিহীন যোগেশচন্দ্র বাগল গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা, নিজের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ পরিমার্জন এবং 'ভারত কোষ' ও 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র কাজ সম্পাদন করেন। তিনি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমরচনাবলী এবং রমেশ রচনাবলী সম্পাদনা করেন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে ১৯৫৬ সালে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া ১৯৬২ সালে তিনি 'সরোজিনী বোসস্মৃতি স্বর্ণপদক' এবং ১৯৬৬ সালে 'শিশির কুমার স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বক্তৃতা এবং ১৯৬৮ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় স্মৃতি বক্তৃতা দেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টিরও বেশি। এর মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৪১), ভারতের মুক্তি সন্ধানী (১৯৪৭), বাংলার জনশিক্ষা (১৯৪৯), জাতীয় আন্দোলনে বাঙালি (১৯৫৪), জাগৃতি ও জাতীয়তা (১৯৬০), বেথুন সোসাইটি (১৯৬১), সাহসীর জয়যাত্রা (১৯৩৮), জগৎ কোন পথে (১৯৪০), সংকল্প ও সাধনা (১৯৫০) উলেখযোগ্য। ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯০৪ সালের ২৯ জানুয়ারি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মৈস্তারকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজমোহন কলেজ হতে বি.এ এবং কলকাতা রিপন কলেজ হতে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন বরিশাল বারে যোগ দিয়ে। একইসাথে তিনি প্রজা আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রী, ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার ও ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে যান এবং আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালের ৫ অক্টোবর তিনি কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

মুকুল সেন

বরিশাল জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী মুকুল সেন ১৯০৭ সালের ১৪ই জুন আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নগর্ভা গ্রাম গৈলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নিরঞ্জন সেন। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এসসি. পাস করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিপ্লবী অনুশীলন দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯২৯ সালে পুটিয়াবাড়ি মেইল ডাকাতি ও মেছুয়াবাজার বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেফতার হন। প্রেসিডেন্সি, আলিপুর ও রাজশাহী জেলে রাখার পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত তাঁকে ১৯৩২ সালে প্রথম দলের সঙ্গে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে ১৯৩৪ সালে প্যারোলে মুক্তি লাভ করে তিনি বরিশাল চলে আসেন। অসুস্থ অবস্থায় নানা অসুবিধার মধ্যেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার সুদক্ষ নেতৃত্বে বরিশাল কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগের শাসনামলে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি তিন বছর পলাতক অবস্থায় পার্টির কাজ চালিয়ে যান। ১৯৫১ সালে বরিশালে গ্রেফতার হলে তিনি দীর্ঘদিন জেলে আটক থাকেন। কারামুক্ত হয়ে তিনি আবারও পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। বৃদ্ধ বয়সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পার্টি কলকাতা পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৯২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

শান্তিসুধা ঘোষ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি সুধা ঘোষ ১৯০৭ সালের ১৮ জুন তৎকালীন বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহকুমার গাভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং মা অন্নদা সুন্দরী ছিলেন কবি। তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছে। এরপর ৬ বছর বয়সে ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচারিত 'ছোট মেমের স্কুলে- ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে ব্রাহ্ম মহিলা স্নেহলতা দাশের সদর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। সেখান থেকে ১৯২৪ সালে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাস করেন। বরিশাল ফিরে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন মনোরমা গুহ ও হেমলতা রায়। ব্রজমোহন কলেজে এদেঁরকে নিয়েই প্রথম সহশিক্ষার প্রবর্তন হয়। ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি আইএ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। একই কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঈশানবৃত্তি লাভ করেন। তিনিই প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার। শুধু তাই নয়, ঈশান স্কলার হিসেবে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এমএ ক্লাসে পড়ার সুযোগ পান।

১৯৩০ সালে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করে এমএ পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময়ই স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীজিকে পত্র দেন। সে চিঠির

www.pathagar.com

উত্তরও তিনি পেয়েছিলেন। ভাই সত্যব্রতের সহযোগিতায় বরিশালের তরুণ সঙ্ঘের সাথে যোগাযোগ রেখে তিনি কাজ করতেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এমএ পাস করে তিনি বরিশাল শহরের ছাত্রী ও তরুণীদের নিয়ে 'শক্তি বাহিনী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এসময় কিছুদিন তিনি সদর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপিত নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্যের সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক প্রধানশিক্ষিকা হিসেবে কাজ আরম্ভ করে শক্তি বাহিনীকে সেখানে নিয়ে আসেন। এখানে মেয়েদের ব্যায়াম চর্চার সাথে সাথে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা শেখানো হতো। তিনি 'হরিজন বিদ্যামন্দির' নামে একটি স্কুলও পরিচালনা করতেন। বাড়ির লোকের অগোচরে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। লীলা নাগের দীপালি সঙ্ঘের মুখপত্র 'জয়শ্রী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। বিপ্লবাত্মক ভাবধারায় লিখিত তার প্রথম গল্প *ভাইফোঁটা* এই পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *গোলক ধাঁধাঁ* জয়শ্রী-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তার দ্বিতীয় উপন্যাস *১৯৩০ সাল*। যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে তার অপর গ্রন্থ *নারী*। এরপর ১৯৩২ সালে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া ইন্সিটিটিউশনের চালু করা কলেজ বিভাগে তিনি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে 'ছাত্রী সঙ্ঘ' এর প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণী দাসের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি এ সংস্থায় যোগ দেন। ১৯৩৩-এ পুলিশ তার বাড়ি তল্লাশি করে কিছু না পেলেও গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক জালিয়াতি ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৩৪ সালে এই মামলার বিচারে মুক্তি পেলেও বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারি আইন অনুযায়ী আবারও গ্রেফতার করে তাঁকে বরিশালের বাসবভনে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৩৮ সালে ছাড়া পেয়ে তিনি ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

বাংলাদেশের কলেজে সহশিক্ষার প্রবর্তন এবং পুরুষ কলেজে নারী অধ্যাপক নিয়োগ এ দু'ক্ষেত্রেই ব্রজমোহন কলেজ পথপ্রদর্শক। ১৯৩৮ সালে বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় তার রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বছরই তিনি বরিশাল পৌরসভায় কমিশনার নির্বাচিত হন। পরে ভারত সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে তিনি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে তিনি আবারও গ্রেফতার হন এবং গৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেন। এ সময় গঠিত মহিলা শিল্প ভবনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি আবারও ব্রজমোহন কলেজে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বরিশালেই থেকে যান। ওই সময় তিনি 'মন্দিরা'য় লেখা পাঠাতেন, 'শ্রী পাকিস্তানী' ছদ্মনামে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারত চলে যান এবং আসানসোলের মণিমালা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। পরে ১৯৫১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হুগলী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থ *বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেন, জীবনের রঙ্গ মঞ্চে* উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও জনসঙ্ঘ নেতা দেবপ্রসাদ ঘোষ তার অগ্রজ। ১৯৯২ সালের ৭ মে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়

১৯০৮ সালে বরিশালের উজিরপুরে সংগীত শিল্পী রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। প্রাচীন বাংলা গান, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে তার বিশেষ দখল ছিল, সংগীত শিক্ষক হিসেবে কলকাতায় তার বিশেষ সম্মান ছিল ১৯৮০ সালের ১৩ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বি.ডি. হাবিবুল্লাহ

বি.ডি হাবিবুল্লাহ-এর পিতার নাম মৌলভী আবদুল মজিদ অজিউল্লাহ্। তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া গ্রামে। তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ এবং ১৯৩৯ সালে বি.এল ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের সূচনালগ্নে সরকারি চাকরিতে যোগদান করলেও ১৯৪২ সালে তিনি বরিশালে আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারা অধীনে তিনি কারাবরণ করেন। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ বি.ডি. হাবিবুল্লাহ ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন। তিনি ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের অনুসারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো–পল্লীমঙ্গল (১৯৪২), দুরমুজ কেতাব (১৯৫০), মিলন চুক্তি (১৯৫০), শেরেবাংলা (১৯৬১)। যুগস্রষ্টা অশ্বিনী কুমার (১৯৬৫)। এছাড়া দর্পণ, মহামিলন, মিথ্যার মনুমেন্ট, ইনসানিয়াত, গল্পসম্ভার অন্যতম। অনলবর্ষী বক্তৃতার জন্য তিনি বাক্‌সম্রাট উপাধিতে পরিচিত। ১৯৯৮ সালের ১২ই নভেম্বর অসাম্প্রদায়িক, জনদরদি বি.ডি. হাবিবুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

পঞ্চানন ঘোষ

১৯১০ সালে ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানার ঘোষপুর গ্রামে পঞ্চানন ঘোষ জন্মগ্রহণ করলেও তার কর্মজীবন কেটেছে বরিশালে। বরিশালের সংগীতাঙ্গনে তিনি একজন সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধের ব্যক্তিত্ব। পারিবারিক সূত্রে ছোটবেলা থেকেই তিনি গানের অনুরক্ত ছিলেন। তাদের বাড়িতে প্রায়ই উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত এবং সেখানে দুর দুরান্ত থেকে সংগীত পিসাসুদের আগমন ঘটত। শিশু পঞ্চাননের মনে এ থেকেই গানের প্রতি অনুরাগ জন্মে। মাত্র ৮ বছর বয়সে শ্রীরাখালচন্দ্র কর্মকারের মাধ্যমে সংগীত জগতে যাত্রা শুরু হয়। ১২/১৩ বছরে তিনি কোলকাতায় চলে যান। সেখানে তার আত্মীয় নরেন্দ্রনাথ ঘোষের সাহায্যে ১নং ভবনাথ স্ট্রিটের গ্রান্ড ন্যানশনাল বোডিংয়ে থেকে সারস্বত ইনস্টিটিউটে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে গানে তার মন ডুবে থাকায় তিনি বল্লাভ স্ট্রিটের শাস্ত্রীয় সংগীত কেন্দ্রে ভর্তি হন। এখানে তিনি সংগীত জগতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, বাদল খাঁ, দবির খাঁ, দানী বাবু, কানা সাতকড়ি, আমজাদ হোসেন, কেরামত আলী প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের কাছে তালিম নেন। সংগীত চর্চার পাশাপাশি ১৯২৭ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন।

১৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে যাবার এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর কাছে তিনি দু'বছর সংগীতের তালিম নেন। এরপর ২৮ বছর বয়সে তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে আসেন। কোলকাতার

www.pathagar.com

গোয়ারপাড় রোডের নজরুল সংগীত একাডেমিতে তিনি স্বয়ং নজরুল ইসলামের কাছে গান শেখেন। এ সময় তাঁর সতীর্থ ছিলেন–অনিল বাগচী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সত্যেন ঘোষাল (অনুপ ঘোষালের পিতা) প্রমুখ। একপর্যায় পঞ্চানন ঘোষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ের সাথে পরিচয় সূত্রে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী, মো. আলী জিন্নাহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, শওকত আলী, সুভাষ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্রিটিশবিরোধী সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কলকাতার রাজপথে মিছিলে মিছিলে গান গেয়েছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে তিনি বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে তিনি যখন বরিশাল আসেন তখন বরিশালের থানায় প্রতি ৭ দিন অন্তর তাকে হাজিরা দিতে হতো। এরপর কলকাতার মাণিকতলায় পরিচয় ঘটে বরিশালের মুকুন্দ দাসের সাথে। চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান শুনে আর যাত্রাপালা দেখে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি মুকুন্দ দাসের প্রায় সবগুলো গানই শিখে নেন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নতুন করে মুকুন্দ দাসের গান চর্চার কৃতিত্ব পঞ্চানন ঘোষের। ৩০/৩১ সালের দিকে পঞ্চানন ঘোষ বামনার জমিদার বন্ধু আবু মিয়ার মারফত অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সাথে কলকাতায় তার ঝাউতালাস্থ বাসভবনে দেখা করেন। শেরে বাংলার পরামর্শে পঞ্চানন ঘোষকে বামনার জমিদারি স্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি স্টার থিয়েটারে যোগ দেন, সেখানে তিন বছর চাকরি করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বরিশালে বিয়ে করেন।

১৯৪৯ সালে বরিশালে চলে এসে তিনি প্রথমে কাউখালী এস ব্যানার্জী বালিকা বিদ্যালয় এবং পরে নলছিটি ও খেপুপাড়ায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ষাটের দশকে পঞ্চানন ঘোষ স্থায়ীভাবে বরিশাল শহরে বসবাস শুরু করেন। এসময় তিনি প্রভাতী স্কুলে (বর্তমান উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়) শিক্ষকতা শুরু করেন। বরিশালের অন্যতম সংগীত বিদ্যালয় প্রান্তিক-এর জন্ম থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। এছাড়া চতুরঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়, উদীচী বরিশাল জেলা শাখা, আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৪৯ এবং ৫০ সালে তিনি পল্লীগীতি ও নজরুল গীতিতে আর্ট কাউন্সিল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। পঞ্চানন ঘোষ তাঁর শিল্পী জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন, বরিশাল উদীচী, কীর্তনখোলা থিয়েটার, জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, ক্রান্তি ঢাকা তাঁকে গুণিজন হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংগীত সাধক পঞ্চানন ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবি বেগম সুফিয়া কামাল

১৯১১ সালের ২০জুন বেগম সুফিয়া কামাল বরিশাল সদর উপজেলার সায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম : সৈয়দ আব্দুল বারী এবং মা সাবেরা খাতুন। পারিবারিক পরিবেশেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল

www.pathagar.com

কোলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মাত্র ১৪বছর বয়সে বরিশাল হতে প্রকাশিত তরুণ প্রত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা *সৈনিক বন্ধু* প্রকাশ হয়। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত *বাসন্তী* কবিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে দীর্ঘ চিঠি লেখেন কাব্য চর্চায় উৎসাহ দিতে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের কর্মী হিসেবে কোলকাতার বস্তিতে বস্তিতে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি লেডি ব্রেবোন কলেজের আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারী কল্যাণ সংস্থা, বেগম রোকেয়া স্মৃতি কমিটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ছায়ানট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার উপদেষ্টা, উয়ারী মহিলা সমিতি, কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা একাডেমি ও ঢাকা লেডিস ক্লাবের আজীবন সদস্যা, বেগম ক্লাব, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সমিতি, কবি জসীমউদ্‌দীন একাডেমি, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, বরিশাল বিভাগ সমিতির সদস্য ছিলেন। সাঁঝের মায়া, মায়াকানন, উদাত্ত পৃথিবী, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, মন ও জীবন, অভিযাত্রিক, প্রশান্তি ও প্রার্থনা, ইতল বিতল (ছড়া), স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন, কেয়ার কাটা (গল্প সংকলন), সোভিয়েতের দিনগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তিনি বুলবুল ললিত কলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৫৯), তমঘা-ই-ইমতিয়াজ স্বর্ণপদক (১৯৬০), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) বেগম ক্লাবের পক্ষ থেকে পুরস্কার (১৯৬৪) লেনিন পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক (১৯৭৬), শেরেবাংলা জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৭), কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক (১৯৭) ঢাকা লেডিস ক্লাব পুরস্কার (১৯৮১), মুক্তধারা পুরস্কার (১৯৮২), জেবউন নিসা মাহবুব উল্লা ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৮৩), নাসির উদ্দীন পদক (১৯৭৭), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)। অশ্বিনী পদক (১৯৯৮), সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সম্মাননা লাভ করেন। নারী মুক্তি, সমাজে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা, প্রগতিশীল সকল কর্মধারায় আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটি ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পান্নালাল ঘোষ

উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ ১৯১১সালের ১১ই জুলাই বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা অক্ষয়কুমার ঘোষ ভাল সেতার বাজাতেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি বাঁশি বাজানো শুরু করেন। তবে শরীর চর্চায়ও তার খ্যাতি ছিল। ১৯৩৬ সালে ব্যান্টম ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় তিনি চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৩৫ সালে তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। এসময় ফিল্ম কোম্পানি নিউ থিয়েটার্সে তিনি চাকরি নেন। ওখানে ওস্তাদ খুশি মুহম্মদের কাছে তিনি হারমোনিয়াম বাজানোর তালিম নেন এবং তার কাছে মার্গ সংগীত শেখেন। পরে প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিষ্যাত্ব গ্রহণ করেন। তবে বাঁশরিয়া হিসেবেই তার খ্যাতি।

www.pathagar.com

১৯৩৮ সালে তিনি নৃত্য দলের সাথে ইউরোপ সফরে যান। এরপর দেশ-বিদেশে বহু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি বাঁশি বাজিয়েছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বেশ কয়েকটি ঐকতান বাদন পরিচালনা করেছেন। ১৯৪০ সালে সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি বোম্বে যান। ১৯৪৭ সালে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে বন্দি অবস্থায় অসুস্থ মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বাঁশি বাজিয়ে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের সংস্কার সাধন করে তিনি সফলতা ও খ্যাতি অর্জন করেন। খেয়াল অঙ্গের বাদনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিভিন্ন সপ্তকের জন্য তিনি তিনটি বাঁশি ব্যবহার করতেন। তার গানের বহু গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ফিল্মের খ্যাতমানা নেপথ্য গায়িকা সুপ্রভা ঘোষ তার স্ত্রী। ১৯৬০ সালে এপ্রিলে তিনি এ ধরাধাম ত্যাগ করেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রখ্যাত গবেষক সাহিত্যিকব শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯১১ (মাস তারিখ জানা যায়নি) সালে বরিশালের চন্দ্রহারে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি.এ. পাস করেন। ১৯৩৫-এ বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে Obscure Religion cults as a Background of Bengali Literature বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচডি উপাধি পান। ১৯৩৫ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ১৯৩৮ সালে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষার রামতনু অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস ও মরমী সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত গবেষক ছিলেন। Religious cults as Background of Bengali Literature, An introduction to Tantric Buddhism, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি শিশু সাহিত্য সংসদের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিঞা)

সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিঞা)-এর পিতা সৈয়দ মোতাহার হোসেন। তাঁর জন্ম ১৯১২ সালের ১ অক্টোবর বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখারে। কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৩২সালে স্নাতক এবং কোলকাতা আইন মহাবিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে শেরে বাংলা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে তিনি তার সহসম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে যখন এই সমিতির নাম বদল করে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি করা হয় তখনও তিনি এই সমিতির যুগ্মসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঝালকাঠী-উজিরপুর এলাকার এম.এল.এ নির্বাচিত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ১ বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১ মহররমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিন সমস্ত প্রতিষ্টান ছুটি রাখার ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি বাবুগঞ্জ-উজিরপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

রাখালচন্দ্র দাস

১৯১৩ সালে প্রখ্যাত যাত্রা অভিনেতা রাখাল চন্দ্র দাস বরিশালের বানারীপাড়ার বাইশারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম প্রসন্নকুমার দাস। তিনি তিরিশের দশকে যাত্রাদলে যোগ দেন। তিনি সাধারণত মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। আর একারণেই তিনি 'রাখাল রানি' হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। এ ধরনের অভিনয় করে তিনি যাত্রা জগতে 'স্টার' এর মর্যাদা পেয়েছেন। এক সময় 'নারায়ণ অপেরা' নামে তিনি একটি যাত্রাদল গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তাকে সংবর্ধিত করে।

মৈত্রেয়ী দেবী

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নগর্ভা গ্রাম গৈলার কৃতী সন্তান প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ঘরে ১৯১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম। তবে তাঁর জন্মস্থান পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রাম। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রাইভেট বি.এ. পাস করেন। ১৬ বছর বয়সে প্রকাশিত তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদারতা'র ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মনোমোহন সেনের সাথে তার বিয়ে হয়। মংপুতে সিঙ্কোনা চাষের ব্যাপারে তার স্বামীর বিশেষ অবদান ছিল। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে চারবার গিয়েছিলেন। মংপুর সে দিগগুলোকে নিয়ে ১৯৪৩ সালে মৈত্রেয়ী দেবী বই লেখেন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণে বইটি ইংরেজিতে অনুদিত হয় 'টেগোর বাই ফায়ার সাইড' নামে। রবীন্দ্র বিষয়ক তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলির মধ্যে স্বর্গের কাছাকাছি, বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ, গৃহে ও বিশ্বে, কবি সার্বভৌম, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ দি ম্যান বিহাইন্ড হিজ পোয়েট্রি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও গণতান্ত্রিক জার্মানিতে গিয়েছিলেন। এছাড়া নানা অনুষ্ঠানে কয়েকবার তিনি আমেরিকা, গণচীন, কানাডা ও ইউরোপের একাধিক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'ন হন্যেতে'র জন্য ১৯৭৬ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। এ বইটি বাঙালি পাঠক মহলে ঝড় তোলে। বহুলআলোচিত এ উপন্যাসটি 'ইট ডাজ নট ডাই' নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তার অনেকগুলি গ্রন্থ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে তিনি পদ্মশ্রী উপাধীতে ভূষিত হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে তিনি 'কাউন্সিল ফর প্রমোশন অব কমিউনাল হারমনি' সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবিরের অনাথ শিশুদের জন্য তিনি 'খেলাঘর' স্থাপন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ সংস্থার কাজ-কর্ম দেখাশোনা করেছেন। ১৯৯০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

কবি আহসান হাবীব

১৯১৭ সালের ১ জানুয়ারি কবি আহসান হাবীব বরিশালের শংকরপাশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দীন। চার দশকের বেশি সময় তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' প্রকাশিত হয়। সারাদুপুর, ছায়া হরিণ, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবে, দু'হাতে দুই আদিম পাথর, প্রেমের কবিতা তাঁর উলেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস–জাফরানী রঙ পায়রা এবং অরণ্য নীলিমা, রানি খালের সাঁকো অন্যতম। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর এবং ছুটির দিন দুপুরে ছড়ার বই। অসংখ্য অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি। ১৯৬৬ থেকে আমৃত্যু কবি আহসান হাবিব দৈনিক বাংলা'র সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কাব্যপ্রতিভার দীর্ঘ যাত্রার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, আবুল মুনসুর আহমদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক, আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার উলেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালে এই কবি প্রতিভার জীবনাবসান ঘটে।

দেবদাস দাশগুপ্ত

১৯১৭ সালে বরিশালের রত্নাগর্ভা গ্রাম গৈলায় প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক দেবদাস দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ আকাশ, পৃথিবী, পরাভূত প্রকৃতি, চাঁদের দেশ, মহাবিশ্ব, মহাপ্রাণ, বিজ্ঞানের আসর প্রভৃতি অন্যতম। তাঁর অনূদিত কাব্য গ্রন্থগুলোও উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের পর সরকারি উচ্চপদে থেকে উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন বিষয়ে নিঃস্বার্থ ও সহৃদয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্তর-চব্বিশ পরগনায় তাঁর স্মরণে 'দেবদাস পল্লী' নামে একটি স্থানের নামকরণ করা হয়। উত্তর-চব্বিশ পরগনার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পূর্ণিমা সম্মেলনী'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালের ২১শে এপ্রিল দেবদাস দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

শহিদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

বিচিত্র বিদ্যায় উৎসাহী, সজ্জন ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার বানারীপাড়ায়। ১৯২০ সালের ১০ই জুলাই ময়মনিসংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কুমুদচন্দ্র গুহঠাকুরতা এবং মা সুমতি গুহঠাকুরতা। ১৯৩৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৩৯ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪২-এ ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বিএ অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় সাবসিডিয়ারি বিষয় দর্শন শাস্ত্রে রেকর্ড নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি পোপ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৪৩ এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৬৭ সালের ৯ই জানুয়ারি লন্ডন কিংস কলেজ থেকে পি.এইচডি ডিগ্রি লাভ

www.pathagar.com

করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইংরেজি বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। মাত্র ছয় মাস অধ্যাপনা করার পর কিশোরগঞ্জে নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুদয়াল কলেজে যোগ দেন। এরপর জগন্নাথ কলেজে ইংরেজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে ১৯৪৬ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে তিনি রিডার পদে উন্নীত হন। ১৯৭০ সালে তিনি জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ হন। তাঁর Classical Myths in the plays of Swinburne, Bridges, sturge Moore and Eliot. শীর্ষক থিসিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রবীন্দ্র সাহিত্যে মূল্যায়নের সমস্যা, প্রগতি, প্রাদেশিকতা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি শীর্ষক প্রবন্ধ পঞ্চাশের দশকে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হলে ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

রফিকুল ইসলাম (মজিদ মিয়া)-এর পিতা আবদুল ওয়াজেদ মিয়া (মানিক মিয়া)। তাঁর জন্ম ১৯২০ সালে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের বালিয়ারকাঠী গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর (বাংলা ও দর্শন) ডিগ্রি লাভ করা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ফলে তিনি কমরেড মোজাফফর আহমদ, কমরেড হালিম এবং কমিউনিস্ট নেতা কমরেড ডাঙ্গের সাহচর্যে আসেন। তিনি বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টির নির্দেশে তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি বরিশাল যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বরিশাল জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি এবং গণতন্ত্রী দলের সহসভাপতি ছিলেন। প্রগতিশীল আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি দীর্ঘদিন কারান্তরালে থাকেন।

দীর্ঘদিন তিনি আত্মগোপনেও কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন নীরব, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কর্মী। শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আত্ম প্রচারকে ঘৃণা করতেন। তিনি চাখার ফজলুল হক কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। মাও সেতুং এর অবদান, জন্ম ও জাতীয়তাবাদ, বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি, ইমাম গাজ্জালী জীবন ও দর্শন, নয়া গণতন্ত্র, অনপ্রাক্টিস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

দানবীর অমৃত লাল দে

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় / ১৯২৪ সালের ২৭ জুন শরীয়তপুর জেলার আঙ্গারিয়ার পাঁচগাওঁ গ্রামে অমৃত লাল দে-এর জন্ম। তাঁর পিতা রাসমোহন দে এবং মা সারদা দেবী। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা গুণ, ব্যক্তিত্ব, দরদী মন ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধের

www.pathagar.com

জন্য তিনি সকলের 'অমৃত দা' বা 'বড় কাকু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 'কর্মই ধর্ম'। অভাবের তাড়নায় কিশোর বয়সে জীবিকার সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। ঘাঁটি গাড়েন বরিশালে। যে বয়সে সকলের লেখাপড়া করার কথা সে বয়সেই তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন কঠিন জীবন সংগ্রামের। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সততা, নিষ্ঠা আর মানসিক দৃঢ়তার জোরে কালক্রমে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিল্পপতি। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা দুঃখময় দিনগুলোকে তিনি ভোলেননি। তাই আমৃত্যু নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন সমাজ সেবায়। শৈশব-কৈশোরে দারুন আর্থিক সংকটে লেখাপড়ার তেমন একটা সুযোগ পাননি বলেই শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ তীব্রতর ছিল। তাই শিক্ষা বিস্তারকে তিনি রেখেছেন অতুলনীয় সাক্ষর।

তাঁর প্রচেষ্টা বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য দিয়েছেন আর্থিক অনুদান। এ ছাড়াও তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অকাতর দানের মধ্য দিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর দানের ধারা আজো বজায় রেখেছেন তাঁর সহধর্মিণী যোগমায়া দে, ভাই রাখাল চন্দ্র দে এবং বিজয়কৃষ্ণ দে। তাঁর কর্মময় জীবনে স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিনিত্বমূলক সংস্থায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনেক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন। বরিশাল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দান, বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে চানুস্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, সারদা ভবন, সারদা ঘাটলা নির্মাণ, মমতাজ মজিদুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ের অমৃত ভবন ও যোগমায়া ভবন নির্মাণ, কাউনিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণে আর্থিক সহায়তা, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির নতুন ভবন নির্মাণে আর্থিক সহায়তা, মুকুলস্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে সহায়তা, বরিশাল ক্লাবের অমৃত লাল দে মিলনায়তন নির্মাণ, বাকেরগঞ্জের সাহেবগঞ্জ নাজমুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান ছাড়াও অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মহতী কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি।

দানবীর অমৃত লাল দে-এর নামে আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অমৃত লাল দে সংগীত একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে তিনি সার্থক সমাপ্তি টানেন বরিশাল নগরীতে অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যা দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিত। বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং দুঃখী মানুষের অভাব মোচনে তার উদার চিত্তের দান তাঁকে দানবীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এছাড়াও বরিশালের লোকসাহিত্য, অশ্বিনী কুমার রচনা সমগ্র, 'আচার্য জগদীশ কথামৃত', বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভা কামিনী সুন্দরী চতুষ্পাঠী : ইতিহাস ও বিকাশ, বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি প্রকাশক। অমৃত পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একপর্যায়ে ১৯৯৩ সালের ১৪ই জুন (১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) ক্ষণজন্মা এই

www.pathagar.com

মানুষটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কোলকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

সরদার ফজলুল করিম

সরদার ফজলুল করিম-এর জন্ম ১৯২৫ সালের ১ মে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার আটিপাড়া গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণিতে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ১৯৪২ সালে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালীন সরদার ফজলুল করিম প্রগতি লেখক সংঘের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মার্কসীয় ভাবাদর্শে আস্থা জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে তিনি রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, মুনীর চৌধুরী, কবি সানাউল হক প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নির্যাতন শুরু হলে তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করেন। আত্মগোপনরত অবস্থায় তিনি ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হন। ১৯৫৫ সালে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকেই তিনি ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে পুনরায় তিনি নিরাপত্তা আইনে আটক হন। এবারে মুক্তি পান ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে। আইয়ুব খানের সামরিক আইনে তিনি ১৯৫৮ সালে পুনরায় কারাবরণ করেন। এবারে মুক্তিলাভ করেন ১৯৬২ সালে। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমির চাকরিতে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী তাকে বন্দি করে। দেশ শত্রুমুক্ত হলে ১৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অধ্যাপনা শুরু করেন। জীবন, নীতিধর্ম, সমাজ, সভ্যতা এই সব কিছুরই প্রতি একনিষ্ঠভাবে সৎ সরদার ফজলুল করিম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

তিনি প্রগতিতে আস্থাশীল, মানবতাবাদী, আধুনিকমনস্ক ব্যক্তিত্ব, প্লেটোর সংলাপ, প্লেটোর রিপাবলিক, এরিস্টটলের পলিটিক্সসহ বিভিন্ন ক্লাসিক দর্শনের গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ২০১৪ সালের ১৫ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

তপন রায়চৌধুরী

সাহিত্যিক ইতিহাসবেত্তা তপন রায়চৌধুরি ১৯২৬ সালের ৮মে বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠি জেলার কীর্তিপাশা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু হলেও তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে লেখাপড়া করেন। এরপর কোলকাতায় স্কটিশ চার্চ ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের গণ্ডী অতিক্রম করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডি.ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। জীবনের শুরু থেকেই তপন রায়চৌধুরি শিক্ষাকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৯ সালে কলকাতার পাক্ষিক দেশ পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় তাঁর লেখা গ্রন্থ ইউরোপ রিকনসিডার্ড

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়। রোমান্থন ও ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা তাঁর লেখা প্রথম বাংলা বই। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে তাকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে ভারত সরকার।

জন কোম্পানি ইন করোমন্ডল কোস্ট (১৯৬২), কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (সহসম্পাদক ইফরান হাবিব (১৯৬২)), বেঙ্গল রিকন্সিডার্ড : পারসেপশন্স অভ দ্য ওয়েস্ট ইন নাইটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল (১৯৮৮), পারসেপশন্স. ইমোশন্স. সেন্সিবিলিটিজ : এসেজ অন ইন্ডিয়ান কলোনিয়াল পোস্ট কলোনিয়াস এক্সপেরিয়েন্স (২০০৬) তাঁর উলেখযোগ্য গবেষণা। গবেষণার পাশাপাশি তপন রায় চৌধুরি আত্ম জীবনীর নানাদিক নিয়ে লিখেছেন তিনবার তিনটি আলাদা গ্রন্থে। এগুলো হলো–রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত চর্চা (১৯৯৩), বাঙ্গালনামা (২০০৭), দ্য ওর্য়াল্ড ইন আওয়ার টাইম : এ মেমোয়ার (২০১২)। পেশাগত দক্ষতার আলোকে তিনি অসংখ্য সম্মাননা পেয়েছেন যার মধ্যে–অ্যামেরিকান হিস্টোরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন গোল্ড মেডেল (১৯৯০), অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টর অব লের্টাস (১৯৯৩), ইউনিভারসিটি অব ক্যালকাটা থেকে ডক্টর অব লের্টাস (২০০৫), ভারত সরকারে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা–পদ্মাভূষণ (২০০৭), ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর (ভারত : ২০১০) অন্যতম। এছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট প্রদান করে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

শামসুদ্দীন আবুল কালাম ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বরিশাল জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদালয় থেকে স্নাতক; রোম বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাভাষার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ১৯৫৭ সালে ইউনেস্কো ফেলো হিসেবে ইউরোপ গমন করেন এবং ১৯৫৯ সাল থেকে রোমে বসবাস করতেন। এ সুখ্যাত সাহিত্যিক ২০টির অধিক উপন্যাস ও অসংখ্য ছোটগল্পের স্রষ্টা। সাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর শাহের বানু, পথ জানা নেই, পলি মাটির দেশ, কাঞ্চনগ্রাম ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। সুখ্যাত সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম ৭০ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালের ৪ঠা মার্চ ইটালির রাজধানী রোমে ইন্তেকাল করেন।

রাধাকান্ত নন্দী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দী ১৯২৭ সালে বরিশালের বানারীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রোহিনীকান্ত ছিলেন সে সময়কার একজন নামী তবলিয়া, লয়দার শিল্পী। পিতামহ কালীচরণ ছিলেন কীর্তনীয়া। শৈশবে তিনি পিতামহের সাথে নগর সংকীর্তন দলে মন্দিরা বাজাতেন। মন্দিরা, করতাল ও খোল দিয়েই তার তবলা চর্চার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ছয় বছর বয়সে খোল বাজিয়ে তিনি পুরস্কার পান। বাড়ি থেকে পালিয়ে

www.pathagar.com

তিনি সৈন্যদলের এক নৃত্যমণ্ডলির কাজ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। কলকাতা অবস্থানকালে তিনি অনোখিলাল মিশ্র ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তালিম নেন। সংগীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তের সাথে পরিচয়ের সূত্রে তিনি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ফিল্মে বাজনা বাজানোর সুযোগ পান। লক্ষ্মৌর বুধ্বন খাঁর কাছেও তিনি কিছুকাল তবলা বাদনের তালিম গ্রহণ করেন। লঘু ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে তিনি তবলায় সঙ্গত করে সুনাম অর্জন করেছেন। কাড়া, নাকাড়া, খোল, পাখোরাজ, নাল, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের উদ্যোগে নেহেরু তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তিনি লন্ডন যান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যার্থে তিনি আরও একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আব্দুর রব সেরনিয়াবাত

আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৭ শে চৈত্র বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের সেরাল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৌরনদীর চাঁদশী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে পড়ার সময় তাঁর সাথে পরিচয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এরই সূত্র ধরে ছাত্রবস্থাতেই তিনি বঙ্গবন্ধুর সেজো বোন আমেনা বেগমের সাথে পারিবারিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বে সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি আইনব্যবসা শুরু করেন বরিশালে। রাজনীতি সচেতন এই মানুষটি ছাত্রবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রী দল বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি ওই রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এবং বরিশাল জেলা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে ন্যাপ ছেড়ে তিনি এনডিএফ'র ব্যানারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেন। বঙ্গবন্ধুর ৬দফা আন্দোলনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের একপর্যায়ে ১৯৭০ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বরিশাল শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একাত্তরের ১৭ মার্চ তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকা গৌরনদীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সচিবালয় গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালনসহ তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বয়কারীর দায়িত্বে ছিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর তিনি ভূমি প্রশাসন ও ভূমি

www.pathagar.com

রাজস্ব মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের ৮ জুলাই তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি মনোনীত হন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য। আমৃত্যু তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে সৎ-নির্ভিক-অসাম্প্রদায়িক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত শাহাদাৎ বরণ করেন।

অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব

১৯২৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর কাজী গোলাম মাহবুব বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার কসবা গ্রামে জনন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল মাজেদ কাজী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ভি.পি ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৫২ সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণে তিনি ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৫৩ হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বরিশাল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কাজী গোলাম মাহবুব ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

আতিকুল হক চৌধুরী

আতিকুল হক চৌধুরী-এর পিতার নাম সিরাজুল হক চৌধুরী। তাঁর জন্ম ১৯৩৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর। উলানিয়া, বরিশাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ। প্রখ্যাত টিভি নাট্য প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরী ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সংস্কৃতি সংসদের সাথে যুক্ত হন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন।

ঢাকা বেতারে কর্মরত থাকাকালীন বহু নাটকের প্রযোজনা করেন এবং অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নাটকগুলির মধ্যে মন ও মানুষ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, সূর্য দীঘল বাড়ি, নেপথ্যের নায়িকা প্রসিদ্ধ। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান টেলিভিশনে যোগদান করেন এবং প্রযোজক, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক, অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অনুষ্ঠান পরিচালকের দায়িত্বে আসেন। টিভিতে তার প্রযোজিত নাটক সমূহের মধ্যে বাকরখানি, ক্রীতদাসের হাসি, জোহরা, এখন জোয়ার, গৃহদাহ, দৃষ্টিদান বড়দিদি, অক্টোপাশ, নিঝুম দ্বীপের সন্ধানে সেই চোখ, বাবার কলম কোথায়, ঘর থেকে ঘরে, নীল নকশার সন্ধানে, তিন দিনের ছুটি, যদিও দূরের পথ সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। বিশেষ কৃতিত্ব : তিনি ১৯৭৬ সালে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার, ১৯৮০ ও ১৯৮৩ সালে সিকোয়েন্স পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা পুরস্কার ও ১৯৮৬ সালে শেরে বাংলা পদক পান।

www.pathagar.com

শহিদ আলতাফ মাহমুদ

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার পাতারচর গ্রামে ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পি আলতাফ মাহামুদ। তাঁর পিতার নাম এ.এম. নাজেম আলী। ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করার করার পর ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। এরপর কিছুদিন কলকাতা আর্ট স্কুলেও পড়াশোনা করেন। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। কিশোর বয়সেই নিজের চেষ্টায় গণসংগীত আয়ত্ত করেন। বরিশালের খ্যাতনামা বেহালাবাদক সুরেন রায়ের কাছে বেহলাবাদন তালম নেন। ১৯৪৯ সালে বরিশালে পাট চাষীদের এক সভায় 'ম্যায় ভূখা হু...' গানটি গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। ১৯৫১ সালে যুবলীগের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট পূর্ব পাকিরস্তান শিল্পী সংসদ'এ যোগদান করে গণসংগীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিছুদিনের মধ্যে সংগীত পরিচালক নিযুক্ত হন। বাহান্ন'র ভাষা শহিদদের স্মরণে বরিশালের অপর কৃতী সন্তান আবদুল গাফ্ফার চৌধুরি রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...' অমর গীতিকার সুর সংযোজন করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন আলতাফ মাহামুদ। অবশ্য এর আগে বৃহত্তর বরিশালের কৃতী সন্তান আবদুল লতিফ এই গানের সুর দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ তে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সভায় গণসংগীত গেয়ে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করেন তিনি। ওই বছর ৩০ মে পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারা আরোপ করা হলে তাঁর উপর হুলিয়া জারি করা হয়। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি ছয় মাস অতিবাহিত করেন। হুলিয়া প্রত্যাহার হওয়ার পর সাড়া জাগানো ছায়ানাট্য 'শিল্পী'র সংগীত পরিচালনা ও সংগীতে কণ্ঠদান করেন। ১৯৫৬ থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত করাচিতে বাস করেন। করাচি বেতার কেন্দ্র থেকে পূর্বপাকিস্তান লোকসংগীত বিষয়ক অনুষ্ঠান 'ইত্তেহাদ ম্যুসিকি' পরিচালনা করেন। ওখানে অবস্থানকালে তাঁর ৩৫টি গানের রেকর্ড প্রকাশ হয়।

১৯৬৩ সালে করাচি ছেড়ে ঢাকায় 'আগুন নিয়ে খেলা', দুই ভাই, সংসার, আঁকা-বাঁকা, আদর্শ ছাপাখানা, নয়নতারা, শপথ, নিলাম, প্রতিশোধ, ক-খ-গ-ঘ-ঙ, মিশরকুমারী, কুচবরণকন্যা, সুয়োরানি-দুয়োরানি, আপন দুলাল, সপ্তডিঙা ইত্যাদি চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিছিল ও পথসভায় গণসংগীত গেয়ে সংগ্রামমুখর বাঙালি জনতাকে উজ্জীবিত করেন। একাত্তরের ৩০ আগস্ট ঢাকার আউটার সার্কুলার রোডের বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন শেষে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী-এর পিতা ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ জানুয়ারি। গ্রাম : উলানিয়া, থানা : মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা : বরিশাল। শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং ক্ষুরধার কলাম লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৮ বছর বয়সে ছাত্রজীবনে মহান একুশের

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে কীর্তি রেখে গেছেন তা বাঙালি জাতি স্মরণ করছে জাতীয় প্রতিটি পদক্ষেপে। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিলে অংশগ্রহণ হেতু পুলিশের লাঠির আঘাত প্রাপ্ত হলে তিনি আশ্রয় নেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালের শয্যাতেই তিনি রচনা করেন "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" গানটি। পরবর্তীকালে সংগীত সুরকার আলতাফ মাহমুদের স্পর্শে তা মহিমান্বিত রূপে বাঙালি জাতির কাছে গৃহীত হয়। তার শান্ত লেখনি বাঙালির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ পদ প্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন জয় বাংলা পত্রিকায় তিনি পালন করেন সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব। বর্তমানে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার রাজনৈতিক-সামাজিক দিক নির্দেশনামূলক নিবন্ধ লেখা দেশবাসীকে সজাগ করার কাজে সক্রিয় রয়েছে। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। বিশেষ কৃতিত্ব : সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে অবদান হেতু তিনি ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। গ্রন্থ রচনা : পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি প্রচুর ছোট গল্প লিখেছেন। কৃষ্ণপক্ষ, সময়ের ছবি, চন্দ্রপ্রদীপের উপাখ্যান, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, ডানপিটে শওকত, সুন্দর হে সুন্দর, শেষ রজনীর চাঁদ, বাংলাদেশ কথা কয় তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অভিনেতা গোলাম মোস্তফা

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা-এর পিতা : মো. ইসমাইল। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ সালের ২রা মার্চ। গ্রাম- দপদপিয়া, থানা- নলছিটি, জেলা- ঝালকাঠী। ১৯৫৬ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি। মো. গোলাম মোস্তফা দুই শতাধিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে বিবিধ প্রকার চরিত্রে অভিনয় করেছে। প্রথম ছবি ছিল রাজধানীর বুকে, সাল ১৯৫৯ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে জাতীয় এবং টেলিভিশন পুরস্কার অর্জন করেন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বিশেষ ধরনের চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। ১৯৪৫ সালে বরিশাল টাউন হলে বরিশাল জিলা স্কুলে অধ্যয়নকালীন পল্লী মংগল নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন পুরস্কার এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সাল জাতীয়ভাবে চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

শিল্পী আবদুল লতিফ

শিল্পী আবদুল লতিফের জন্ম ১৯৩৫সালের ৭ মার্চ। বরিশাল কোতয়ালী থানার রায়পাশা গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম আজীবুন্নেছা, পিতা আমিন উদ্দিন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আবদুল লতিফ ছিলেন চতুর্থ। বাংলাদেশের গণসংগীত প্রণয়ন এবং সুরদান ক্ষেত্রে আবদুল লতিফ অনন্য। টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই তিনি ১৬নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে যোগদেন। ১৯৩৯ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যান বোম্বে ও হায়দ্রাবাদ।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালে ১৬নং ব্যাটালিয়ন ভেঙে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর পালিয়ে যান কোলকাতায় ভূজঙ্গভূষণ বসুর আশ্রয়ে। এই ভূজঙ্গভূষণ বসুই তাঁর প্রথম সংগীতগুরু। আবদুল লতিফের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে সংগীতমুখী করে তোলে। কোলকাতায় দীনেশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় তিনি ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথ দাসের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বরিশালে ফিরে আসেন। সংগীত পরিচালক আবদুল হালিম চৌধুরীর সহায়তায় তিনি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায় গান গাওয়া শুরু করেন। অচিরেই তিনি সংগীত জগতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আবদুল লতিফ বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে রেডিও প্রোগ্রাম বর্জন করেন এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি...* অমর গীতিকার প্রথম সুরারোপ করেন। ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তার রচিত 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়..." আজও সকলের মুখে মুখে। দুয়ারে আইসাছে পালকী, ভাষার গান, দেশের গান প্রভৃতি সংগীত পুস্তক তার রচনা ১৯৭৯ সালে তিনি লাভ করেন একুশে পদক। আবদুল লতিফের দীর্ঘ সংগীত জীবনের অবসান ঘটে ২০০৫ সালে। তাঁর পুথি পাঠরীতি, লোকসংগীত বর্তমান সময়েও সমধিক জনপ্রিয়। আবদুল লতিফ একাধারে শিল্পি, রচয়িতা এবং লোকবাংলার অন্যতম লোককবি। আবদুল লতিফ তিন হাজারেরও অধিক গান রচনা করেছেন এবং সুর করেছেন। আধুনিক মানসিকতায় পরিশীলিত এ শিল্পীর সৃষ্টি মূলত লোক জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে।

এ.জেড. এম. ওবায়দুল্লাহ খান

১৯৩৭ সালের ১ মে এ.জেড.এম. ওবায়দুল্লাহ খান বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিচারপতি ও পাকিস্তানের সাবেক স্পিকার আব্দুল জব্বার খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে ডেভেলপমেন্ট এডমিনেস্ট্রেশন; ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক এডমিনেস্ট্রেশন এবং ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিকস-এর উপর ডিপ্লোমা কোর্স করেন। তিনি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র-এর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংক এবং জাতিসংঘের একজন কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওবায়দুল্লাহ খান ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চীনে পাকিস্তানি দূতাবাসে অর্থ এবং কৃষি বিষয়ক কাউন্সিলর ছিলেন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে পাকিস্তানের প্ল্যানিং কমিশনের কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৬৭-৬৯ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার এবং তথ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি কৃষি ও বন বিভাগের সচিব নিযুক্ত হন এবং ১৯৮২ সালের ৬ এপ্রিল রাষ্ট্রপ্রতির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ দেশে এবং বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ নামে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮০ সালে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

www.pathagar.com

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– সাতনরি হার, কখনো রঙ কখোনো সুর, সহিষ্ণু প্রতিভা, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৮৫ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদান স্বরূপ একুশে পদক পান। তিনি ২০০১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

আলমগীর কবির

আলমগীর কবির-এর তাঁর জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর। পিতা আবু সৈয়দ আহমেদ। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার নাজিরপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃকভিটা। পিতা সরকারি চাকুরে হওয়ার সূত্রে তার জন্ম হয় রাংগামাটিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞানে সম্মান ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ইলেকট্রনিক্স এবং অঙ্ক শাস্ত্রে অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। নাট্যানুরাগী পিতার সন্তান আলমগীর কবির পড়াশুনা শেষে সাংবাদিকতা ও সিনেমাটোগ্রাফিতে আগ্রহী হন এবং পরিণতকালে আন্তর্জাতিক মহলে প্রসিদ্ধি পান। ১৯৬৫ সালে তিনি একবার ব্রিটিশ পাসপোর্ট ব্যবহার করে প্যালেস্টাইন যান এবং প্যালেস্টাইন যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকতা শুরু করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চিত্র নাট্যকার ও ধারাভাষ্যকারের কাজ করেন। ১৯৭২ সালে ধীরে বহে মেঘনা, ১৯৮৬ সালে শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে পরিণীতা, ১৯৮৭ সালে শুরু করেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন। ১৯৮৮সালে নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মণিকাঞ্চন। একই বৎসর প্রথম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। নগরবাড়ি ফেরিঘাটে এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৮৯ সালে।

মোহাম্মদ ফজলুল হক

১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর মোহাম্মদ ফজলুল হক বরিশাল সদর উপজেলার সায়েস্তাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আলী তালুকদার। ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামী হিসেবে অভিযুক্ত হন। মামলার বিচার চলাকালীন সময়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য গুলি করা হয়। গুলি তার শরীরকে আঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি বরিশাল কোতোয়ালীর অংশবিশেষ ও বাবুগঞ্জ এলাকা হতে এম.পি.এ নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি নবম সেক্টরের অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনার পরে তিনি গ্রেফতার হন এবং অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন। মানবতার সেবায় উৎসর্গকৃত প্রাণ ফজলুল হক দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সমবায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

মেজর এম.এ. জলিল

১৯৪২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় এম.এ. জলিল-এর জন্ম। পিতার নাম জনাব আলী চৌধুরী। ১৯৬৫ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বীর বিক্রম পদক লাভ করেন। স্বাধীনতার উত্তরকালে তিনি সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি ছিলেন জাসদের সভাপতি। ১৯৮১ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি জাসদ হতে পদত্যাগ করে হাফেজ্জী হুজুরের সাহচর্যে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে পরিষদ ভেঙে গেলে তিনি নিজেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং তিনি দলের চেয়ারম্যান হন। তিনি সীমাহীন সমর, সূর্যোদয়, মার্কসবাদ নামে পুস্তক রচনা করেন। ১৯৮৯ সালের ১৯ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (বীর শ্রেষ্ঠ)

১৯৪৮ সালে বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জে বাংলার বীর সন্তান বীর শ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম। তাঁর বাবার নাম আবদুর রহীম হাওলাদার। ১৯৬৬ সালে আইএসসি পাস করে তিনি বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়ার চেষ্ট করেন। কিন্তু চোখের অসুবিধার কারণে ব্যর্থ হন। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এরপর ১৯৬৮ সালের ২ জুন ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন্ড অফিসারের র‍্যাংক লাভ করেন। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাকোরাম এলাকায় ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে কর্তব্যরত ছিলেন। ৩ জুলাই পাকিস্তানে আটকেপড়া আরো তিনজন অফিসারসহ তিনি শিয়ালকোটের কাছাকাছি সীমান্ত পেরিয়ে পালাতে সক্ষম হন। পরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে যোগ দেন। জাহাঙ্গীরের পোস্টিং হয় ৭নং সেক্টরে মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। সেখান থেকে দলের নেতা হিসেবে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের উপর অর্পিত হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখল করা। আর এ কাজে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও শেষ রক্ষা হয়নি। স্বাধীনতা লাভের মাত্র দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বরের ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘরিয়া থেকে নৌকাযোগে রেহাইচর এলাকা দিয়ে মহানন্দা নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক দিয়ে শত্রুপক্ষের এক একটি ট্রেঞ্চ ধ্বংস করতে থাকেন। কিন্তু সুনিশ্চিত জয়ের মুখে হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে ইস্টপাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈন্য দৌড়ে চর এলাকায় এসে যোগ দেন। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রবল আক্রমণ, সঙ্গে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ। আর এ থেকেই একটি গুলি ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কপালে লাগে। স্বাধীনতার উষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহিদ হন। চর দখলের পর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিনের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধার করে সোনা মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

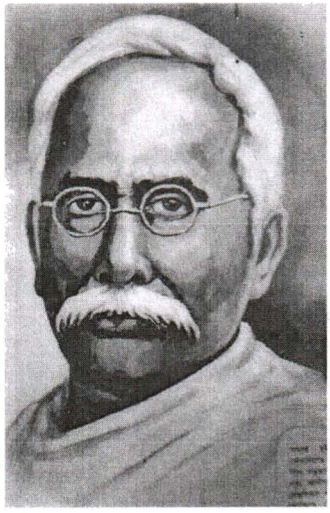

অশ্বিনী কুমার দত্ত

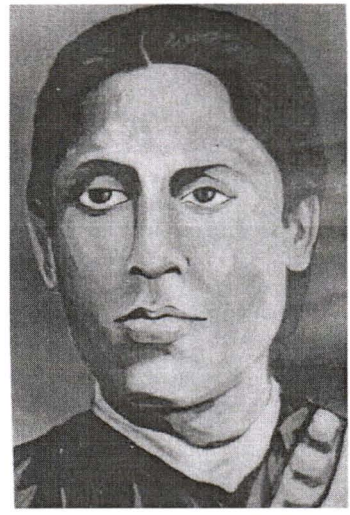

কামিনী রায়

শরৎচন্দ্র গুহ

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

www.pathagar.com

কুসুম কুমারী দাশ

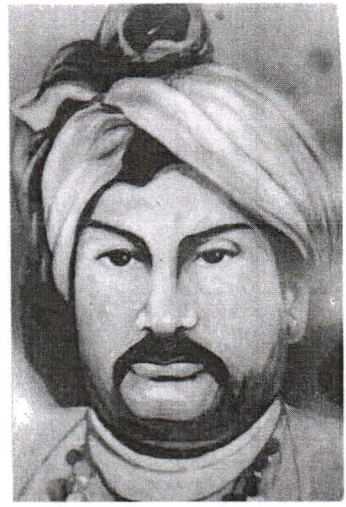

মুকুন্দ দাস

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী

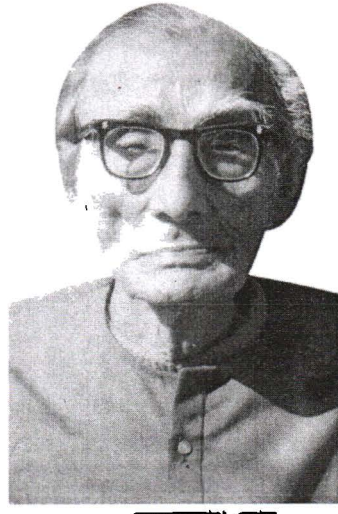

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

www.pathagar.com

মনোরমা বসু

জীবনানন্দ দাশ

আরজ আলী মাতুব্বর

আব্দুল জব্বার খান

www.pathagar.com

সুফিয়া কামাল

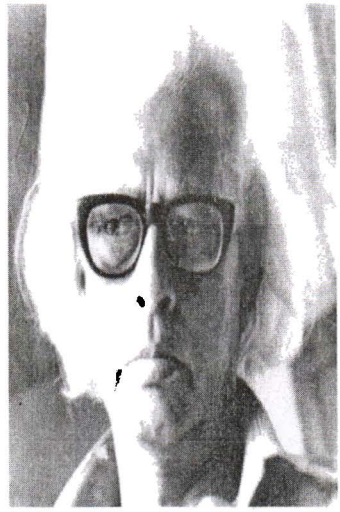

আহসান হাবীব

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

অমৃত লাল দে

www.pathagar.com

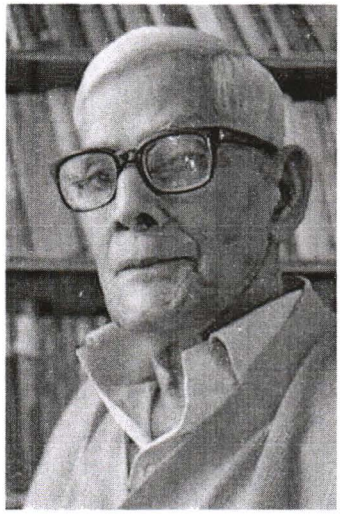

সরদার ফজলুল করিম

তপন রায়চৌধুরী

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

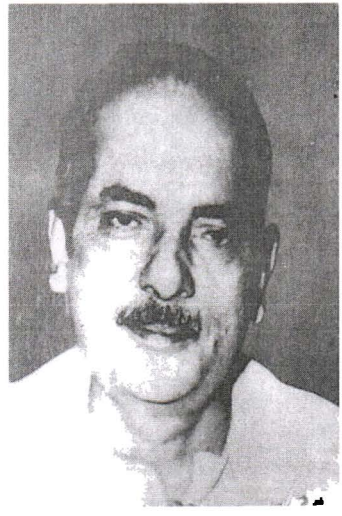

আব্দুর রব সেরনিয়াবাত

www.pathagar.com

কাজী গোলাম মাহবুব

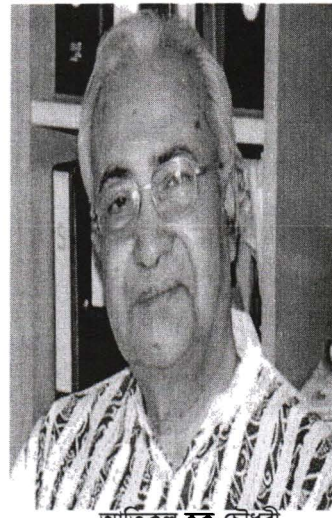

আতিকুল হক চৌধুরী

আলতাফ মাহমুদ

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা

আবদুল লতিফ

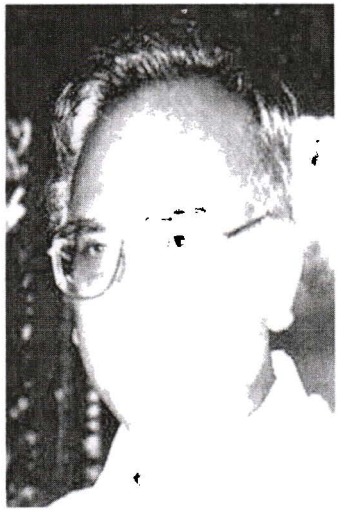

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্

আলমগীর কবির

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

ঙ. মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধেও রয়েছে বিশেষ অবদান। ১৯৬৯ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জন আসামীর মধ্যে ৭জনই ছিলেন বরিশালের। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফারভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার ১৪টি জাতীয় পরিষদ ও ২৫টি প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ (এম.এন.এ.) ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাদ (গৌরনদী-উজিরপুর), অধ্যাপক সালাহউদ্দিন কায়সার (বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা), অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (কাতয়ালী-মেহেন্দিগঞ্জ), অ্যাডভোকেট আবদুল বারেক (ঝালকাঠি-রাজাপুর), আবদুল মান্নান হাওলাদার (বাকেরগঞ্জ-নলছিটি), তোফায়েল আহমেদ (ভোলা-দৌলতখান-তজুমদ্দিন), ডা. আজাহার উদ্দিন (বোরহানউদ্দিন-লালমোহন-চরফ্যাশসন), একে ফায়জুল হক (বানারীপাড়া-স্বরূপকাঠি), অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান (পিরোজপুর-কাউখালী-ভাণ্ডারিয়া-কাঁঠালিয়া), অধ্যাপক আবদুল হাদী তারুকদার (গলাচিপা-খেপুপাড়া), অ্যাডভোকেট আসমত আলী সিকদার (বরগুণা-বেতাগী-আমতলী), অ্যাডভোকেট এম. শামসুল হক (মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা-বামনা), অ্যাডভোকেট গোলাম আহাদ চৌধুরী (পটুয়াখালী-মীর্জাগঞ্জ-বাউফল) এবং মহিলা আসনে মিসেস রাজিয়া বানু।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ (এম.পি.এ.)

মহিউদ্দীন আহমেদ, মেহেন্দিগঞ্জ। ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, বাবুগঞ্জ কোতোয়ালীর একাংশ। আমির হোসেন আমু, বরিশাল কোতোয়ালী। মোজাম্মেল হোসেন শিকদার, বাকেরগঞ্জ। একে এম নুরুল করিম, হিজলা-মুলাদী। আবদুল করিম সর্দার, গৌরনদী। হরনাথ বাইন, উজিরপুর। কবির উদ্দীন আহমেদ, ঝালকাঠি-নলছিটি। একে এম ইসমাইল মিয়া, রাজাপুর-কাঠালিয়া। সওগাতুল আলম সগীর, মঠবাড়িয়া। দুরুল ইসলাম, ভান্ডারিয়া-কাউখালী। ডা. ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, স্বরুপকাঠী-নাজিরপুর। ডা. আবদুল হাই, পিরোজপুর ও স্বরূপকাঠি একাংশ। ডা. শাহ মোজাহার উদ্দীন আহমেদ, বানারীপাড়া ও নাজিরপুরের একাংশ। মোশারেফ হোসেন শাহজাহান, ভোলা। মোতাহার উদ্দীন, চরফ্যাশন ও লালমোহন। এমডি নজরুল ইসলাম, দৌলতখা, তজুমদ্দিন। রেজাউল করিম চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন ও লালমোহন। মুজিবুর রহমান তালুকদার, পটুয়াখালী ও আমতলীর একাংশ। একে এম নুরুল হক, মির্জাগঞ্জ ও পটুয়াখালীর একাংশ। আবদুর বারেক তালুকদার তালুকদার, গরাচিপা। মীর মো. আবুল হাশেম, আমতলী-খেপুপাড়া। শাহজাদা আবদুল মালেক খান, বেতাগী-বামনা-পাথরঘাটা। রুসমত আলী খান, বরগুনা ও বেতাগীর একাংশ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টি ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মহাকুমা ও ৩৫টি থানায় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ রাতেই বরিশাল পৌঁছে এবং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পাওয়া যায়। সংগ্রাম কমিটি বরিশাল পুলিশ লাইন হতে ৫০০ রাইফেল নিয়ে আসে এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২৬ মার্চ বরিশালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সচিবালয় গঠন করা হয়। নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এম.এম.কে বরিশালের বেসামরিক প্রধান ও মেজর এম.এ. জলিলকে সামরিক প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম সচিবালয় সম্পর্কে সংগ্রাম পরিষদ ও দক্ষিণাঞ্চলীয় স্বাধীন বাংলা সরকার, বরিশাল-এর তৎকালীন প্রধান সমন্বয়কারী হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ বরিশালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকেন্দ্র উৎসব'-৯৩ নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেন–

'১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দৃষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠলো। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ। পথে বেরিয়ে এলো সর্বস্তরের জনতা। পরদিন অর্থাৎ ২রা মার্চ সারাদেশে পালিত হলো সর্বাত্মক ধর্মঘট। বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হলো। জনতার

www.pathagar.com

মুখে তখন একটিই মাত্র দাবি, মুক্তি-স্বাধীনতা। ৭ মার্চ জনতার স্রোতে ভেসে যাওয়া রেসকোর্স ময়দানের উত্তাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই কালজয়ী ঘোষণা, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ মার্চের এই কালজয়ী ঘোষণাও দিক নির্দেশনা অনুসারে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে। এ সময়ে ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া অন্য কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। এমনকি এ সময় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী সামরিক গভর্নর, জেনারেল টিক্কা খানকে শপথবাক্য পড়াতেও অস্বীকার করেন। বিক্ষুব্ধ জনতার কণ্ঠে তখন দিকে দিকে উচ্চারিত হচ্ছে–'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জয় বাংলা', ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তখন বাঙালির প্রাণের কথায় রূপান্তরিত হয়ে উদ্বুদ্ধ করছে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেফতার হবার আগেই পাকিস্তানি সেনার আসন্ন অভিযান ও তৎপরতা সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চ রাত এগারোটা নাগাদ টেলিফোনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর বর্বর অভিযানের খবর পেয়ে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এম.এন.এ-এর বাড়িতে একত্রিত হয় মুক্তিকামী বরিশালবাসী। সেখানে মুক্তিবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক আয়ূবুর রহমান সি.এস.পি. পুলিশ সুপার ফখরুদ্দীন আহম্মেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী আজিজুল ইসলাম এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্যে ২৫ মার্চ শেষ রাতে বরিশালের স্বাধীনতার স্বপক্ষের যুবক-তরুণরা পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার থেকে রাইফেল সংগ্রহ করে। ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনতা সেদিন দেশকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকারে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীন বাংলার সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় সংগ্রাম পরিষদ। নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দ ছিলেন সংগ্রাম পরিষদের বিভাগীয় প্রধান–

(১) বেসামরিক বিভাগ : নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (এম.এন.এ)
(২) প্রতিরক্ষা বিভাগ : মেজর এম.এ. জলিল
(৩) অর্থ বিভাগ : আবদুল মালেক খান (সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ)
(৪) খাদ্য বিভাগ : মহিউদ্দিন আহমেদ (এম.পি.এ)
(৫) বিচার বিভাগ : আমিনুল হক চৌধুরী (অ্যাডভোকেট)
(৬) ত্রাণ বিভাগ : আমির হোসেন আমু (এম.পি.এ)
(৭) জ্বালানী বিভাগ : শামসুল হক (এম.এন.এ)
(৮) তথ্য বিভাগ : ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন (অ্যাডভোকেট)
(৯) সিভিল ডিফেন্স বিভাগ : হাসান ইসলাম চৌধুরী (অ্যাডভোকেট)
(১০) যোগাযোগ বিভাগ : সরদার জালাল উদ্দিন (অ্যাডভোকেট)

www.pathagar.com

(১১) স্বাস্থ্য বিভাগ : ডা. হযরত আলী (চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজ),
প্রধান সমন্বয়কারী হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট
কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে ছিলেন মাকসুদ আলী বাদল ও লুৎফর রহমান।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে (মুজিবনগরে) আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণার পূর্ব সময় পর্যন্ত বরিশালের সংগ্রাম পরিষদই স্বাধীন বাংলার পক্ষে প্রথম অঘোষিত সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বরিশাল সরকরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সরকারি বেসরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এই কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। বাকেরগঞ্জ কালেকটরেটের কর্মচারীদের একাংশ ওই সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন। প্রধান সমন্বয়কারীর সভাপতিত্বে প্রতিদিনই সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নিয়ে সভা হতো। সভার সিদ্ধান্তগুলো বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ আকারে কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হতো। ব্যাংকগুলোও সে সময় সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মত কাজ করত। সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভায় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সম্মুখযুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রশাসনিক যাবতীয় কাজকর্ম সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে চলবে।

প্রতিরক্ষা প্রধান মেজর এম.এ. জলিল বরিশাল বেল্‌স পার্কে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু উদ্যান) প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেন। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান এম.এ. বারেক স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা হিরু, লে. মেহেদি আলী ইমাম, লে. নাছির, লে. অধ্যাপক শামসুদ্দিন খান, মাহফুজ আলম বেগ প্রমুখ সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান করেন। যেসব সম্ভাব্যস্থানে পাকিস্তানি বাহিনী বরিশাল-পটুয়াখালী আক্রমণ করতে পারে, সেসব স্থানে মুক্তিবাহিনীর খাঁটি স্থাপন করা হয়। নদীপথে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জুনাহারে মুক্তিবাহিনীর একটি শক্তিশালী খাঁটি স্থাপন করা হয়। জুনাহার ও নিকটবর্তী ঘাঁটিসমূহের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) ফজলুল হক। বাকেরগঞ্জ পটুয়াখালীর সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে বরিশাল সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাংবাদিকবৃন্দ সংগ্রাম পরিষদ অফিসে এসে নেতৃবৃন্দকে উৎসাহ দিতেন। আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আক্কাস হোসেনের নেতৃত্বে শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীত পরিবেশন করতেন। এছাড়া সংগ্রাম পরিষদের অনুমোদিত 'বাংলাদেশ' নামে একটি অনিয়মিত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এস.এম. ইকবাল, মিন্টু বসু ও হেলাল উদ্দিন। প্রকাশনায় : হারেচ এ. খান, এনায়েত হোসেন মিলন, মুকুল দাস। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল পত্রিকার একমাত্র সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও বরিশালের সাংবাদিকবৃন্দ মুক্তাঞ্চল থকে

www.pathagar.com

বিপ্লবী বাংলাদেশ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে প্রচারিত সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন নুরুল আলম ফরিদ। সে সময়ে বার্তা সম্পাদক ছিলেন মিন্টু বসু। রফিক হায়দার কর্তৃক চাঁপা প্রেস, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত বলে প্রিন্টার্স লাইনে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের হাসনাবাদ-টাকি'র মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অবস্থানরত বরিশাল অঞ্চলের যোদ্ধাদের মধ্য থেকে কয়েকজন *বিপ্লবী বাংলাদেশ* প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এর ১৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাহসী এবং প্রাণবন্ত ভূমিকাও এ সময় জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাত। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য সব রকম প্রস্তুতি চলছিল। বরিশালের শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা খুলনার গল্লামারী বেতার কেন্দ্রে প্রথম বারের মত পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামে শুধুমাত্র ৩০৩ রাইফেল হাতে নিয়ে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও এ যুদ্ধে শহিদ হন। আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর অনুরোধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা লঞ্চ ভর্তি খাদ্য সামগ্রী নিয়ে চাঁদপুর পৌঁছায় এবং লাকসামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। মেজর এম.এ. জলিলকে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি ফিরে আসেন। ১৮ এপ্রিল বেলা এগারটায় পাকিস্তান বাহিনীর ছ'টি জঙ্গী বিমান বরিশালের ওপর বোমা এবং মেশিনগানের সাহায্যে গুলি বর্ষণ করে। ফলে বরিশাল এক জনমানবশূন্য ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়। বোমাবর্ষণের দু'দিন পরে নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ভারত থেকে কিছু অস্ত্রসশস্ত্র নিয়ে বরিশালে পৌঁছেন এবং পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি নেন। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পাক বাহিনী জলে-স্থলে ও আকাশ পথে বরিশালের ওপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। গানবোট জঙ্গি বিমান ও যুদ্ধজাহাজ ঘায়েলের কোনো অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে না থাকা সত্ত্বেও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ অদম্য মনোবল নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করে। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার নিয়ে এরপর তরা নরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়। ২৫ মার্চ হতে ২৫ এপ্রিল এক মাসব্যাপী বরিশাল ও পটুয়াখালী মুক্ত ছিল। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বরিশাল শহরে বিমান হামলা চালায় এবং অনেককে হত্যা করে। বরিশালের একদল মুক্তিযোদ্ধা চাঁদপুরে এবং একদল খুলনা বেতার ভবনের নিকট যুদ্ধে অংশ নেয়। নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি কাজী মহিউদ্দিন অস্ত্রের জন্য কলকাতায় যান। কাজী মহিউদ্দিন ২৪ এপ্রিল অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবন হয়ে বরিশাল পৌঁছেন। ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বরিশাল দখল করার জন্য বিমান, পদাতিক ও নৌবাহিনী নিয়ে বরিশালের ওপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গৌরনদী ও চরবাড়িয়া ইউনিয়নে শত শত লোক হত্যা করে। ২৬ এপ্রিল তারা বরিশাল শহর দখল করে। ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা জলে, স্থলে ও বিমানে পটুয়াখালী জেলা শহরের ওপর আক্রমণ চালায়। বিমান থেকে গুলি বর্ষণ করে তারা

www.pathagar.com

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক এম.এ. আউয়ালকে আহত করে। ২৬ এপ্রিল হতে বরিশাল পটুয়াখালীতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নায়ক ছিলেন কর্নেল আতিক মালিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেনহাবিব শাহ্। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ২১ ফেব্রুয়ারির গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ সহ হাজার হাজার বরিশাল বাসীকে হত্যা করে। বরিশাল শহরে ওয়াপদা অফিস, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলখানা, আটঘর-কুরিয়ানা প্রভৃতি পাকিস্তানি সেনাদের বধ্যভূমি ছিল। বরিশালের হাজার হাজার শহিদদের সাথে নিম্নে কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করছি।

পিরোজপুর জেলার ডুমুরতলার লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, শরিফ নুরুল হুদা, রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বি.এম. কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াকুব মিয়া, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার পিআরএস মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, গৌরনদী ডা. সুশীল চন্দ্র শর্মা, অ্যাডভোকেট সুধীর চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট রায় সাহেব ললিত কুমার বল, অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্র লাল দত্ত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক আব্দুল হালিম, অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী, রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, দর্শনা কলেজের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, পাতারহাট আর.সি. কলেজের অধ্যাপক শফিফকুল মান্না, ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক এম.এ. সাদেক, পটুয়াখালীর সাহিত্য বিনোদ মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী, বরিশাল বগুড়া রোডের বাসিন্দা ডা. বংশী বিহারী চক্রবর্তী, বিপ্লবী হীরালাল গুপ্ত, তৎকালীন বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী আজিজুল ইসলাম, বরিশালের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোলাম হোসেন, পিরোজপুরের এসডিও আবদুর রাজ্জাক, পিরোজপুরের এসডিও ফয়জুর রহমান, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এস.এম. আলমগীর, পিরোজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান, দুর্নীতি দমন পুলিশ অফিসার হিরেন্দ্র মহাজন, স্বরূপকাঠির কাজী শামসুল হক আকমল, বরগুনার ডা. কৃষ্ণকান্ত, পাথরঘাটা শাহজাহান, পাথরঘাটার রাজস্ব অফিসার আতিকুল্লা প্রমুখ। বরিশাল শহরের ত্রিশ গোডাউন সংলগ্ন কীর্তনখোলা নদী তীরবর্তী স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিকামী নিরীহ বাঙালি, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে হত্যা করত।

২৬ এপ্রিলের পর এম.এন.এ, এ.পি.এ. আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে মুজিবনগর চলে যান। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জেলার ভেতর থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা এবং ফরিদপুর জেলার একাংশ নিয়ে নবম সেক্টর গঠিত হয়। মেজর এম.এ. জলিলকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্তি হন।

www.pathagar.com

নবম সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন নুরুল হুদাকে সহঅধিনায়ক, ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ সাতক্ষীরা ও খুলনা, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন আহমেদকে বাগেরহাট ও সুন্দরবন অঞ্চলে, ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমামকে পটুয়াখালী জেলা এবং ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরকে বরিশাল জেলা সাব-সেক্টর কমান্ডার এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক এম.পি. কে অ্যাডজুট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন লে. সৈয়দ কামাল উদ্দীন, লে. নুরুন্নবী, লে. শচীন কর্মকার, লে. মোহাম্মদ আলী, লে. শাহ আলম, লে. মঈন। নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আহমেদ এজি মুহাম্মদ খুরশীদ, এস.আই. মুহাম্মদ বাদশা মিয়া। সচিবের দায়িত্বে ছিলেন ওবায়দুর রহমান মোস্তফা এবং প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন আলতাফ হোসেন খান অরুন। বরিশাল বিভাগের প্রত্যেক থানায় একজন বেইজ কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। বেইজ কমান্ডার ছিলেন–আবদুল মন্নান, কোতোয়ালী। মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাকেরগঞ্জ। আবদুল ওহাব খান, আবদুল মজিদ খান, বাবুগঞ্জ। নিজামউদ্দীন, গৌরনদী। কুতুবউদ্দিন, মুলাদী। আনোয়ার হোসেন বীর প্রতীক, হিজলা। কুদ্দুস মোল্লা বীরপ্রতীক, মেহেদিগঞ্জ। হাবিবুর রহমান খান ও মুহাম্মদ আবদুল অদুদ সর্দার, উজিরপুর। বেণীলাল দাশগুপ্ত, বানারীপাড়া। সুলতান মাষ্টার, ঝালকাঠি। আবুল কালাম আজাদ, রাজাপুর। সেকান্দার আলী, নলছিটি।

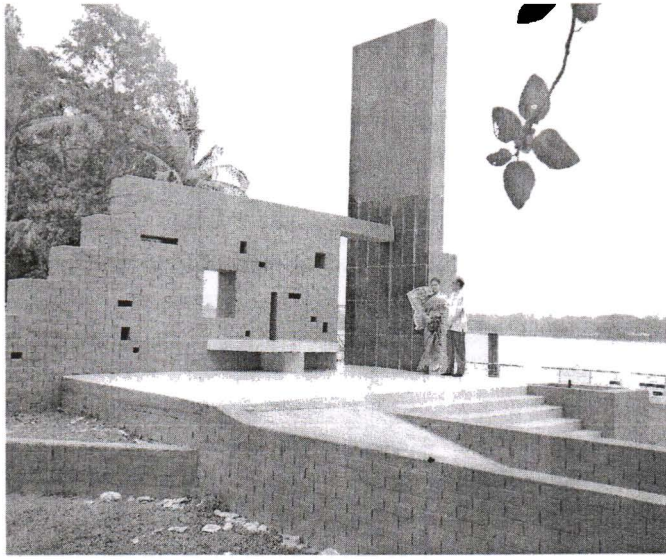

বরিশাল ব্রিশ গোডাউন বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ

সুবেদার এম.এ. জলিল, কাঁঠালিয়া। জাহাঙ্গীর বাহাদুর, স্বরূপকাঠি-নাজিরপুর। হাবিবুর রহমান, কাউখালী। আবদুল আজিজ, ভাণ্ডারিয়া। আলতাফ হোসেন, মঠবাড়িয়া। আবদুল মান্নান, পিরোজপুর। সুবেদার আবদুল কাদির, আলী আকবর,

www.pathagar.com

তজুমদ্দিন, ভোলা। আবদুল আজিজ, বোরহানউদ্দীন। সিদ্দিকুর রহমান, চরফ্যাশন। কাজী আফতাব উদ্দিন, লালমোহন। নুরুল হুদা, পটুয়াখালী। আলতাফ হায়দার, মির্জাগঞ্জ। পঞ্চম আলী (পি আলী), বাউফল। আবদুর রব, নুরুল হুদা, গলাচিপা। সুবেদার হাতেম আলী, খেপুপাড়া আমতলী। জুলফিকার জুলফু, আবদুস সাত্তার, বরগুনা। আবদুল মতলেব, বেতাগী। আবদুল মজিদ, বামনা। আবুল কাসেম, পাথরঘাটা। বরিশাল অঞ্চলে আবদুর রহমানকে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে মুজিব বাহিনীর প্রধান, রেজায়ে সাত্তার ফারুককে সুইসিডাল দলের প্রধান এবং সৈয়দ আবুল বাসারকে নৌ কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। বরিশালের সংসদ সদস্যগণ, রাজনৈতিক কর্মী ও খুলনা জেলার সংসদ সদস্যগণ নবম সেক্টর গঠনে এবং যুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নবম সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য বরিশরহাট মহকুমা, ভারতের তকিপুর, টাকি, আমলি, হাসনাবাদ, পিপা, টেটরা প্রভৃতি স্থানে ক্যাম্প ছিল। বরিশাল-পটুয়াখালীর হাজার হাজার ছাত্র যুবক সুন্দরবন ও ফরিদপুর-যশোর হয়ে ভারতে ট্রেনিং ও অস্ত্রের জন্য যায়। ভারতীয় বাহিনীর লে. জে. দলবীর সিং ও সহ-অধিনায়ক মেজর জেনারেল সালেক নবম সেক্টরকে সর্বপ্রকার সহায়তা করেন। বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালী জেলায় অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাগণ নবম সেক্টরে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য সেক্টরেও বরিশালের অনেক মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অষ্টম সেক্টরের সহ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন কে.এন. হুদা, সাব-সেক্টর কমান্ডার মাহবুব উদ্দীন আহমেদ, ৭ম সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ৬ষ্ঠ সেক্টরের ক্যা. দেলওয়ার হোসেন, জেড ফোর্সে ক্যা. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং হেড কোয়াটারে ছিলেন মেজর নুরুল ইসলাম শিশু।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নির্বাচিত পার্লামেন্টের নেতৃত্বে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। সংসদ সদস্যগণ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। বরিশাল বিভাগের সংসদ সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাদ, তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, আবদুল মন্নান, এনায়েত হোসেন খান, আসমত আলী সিকদার, নুরুল ইসলাম ভাণ্ডারী, সওগাতুল আলম সগীর, শাহজাদা আবদুর মালেক খান, মীর আবুল হাশেম, আবদুল বারেক তালুকদার, খন্দকার আবদুল আজিজ, আবদুল করিম সর্দার, নজরুল ইসলাম, মোতাহার উদ্দিন, বেজায়ে করিম চৌধুরী, মো. ফজলুল হক, অ্যাডভোকেট ইসমাইল, ডা. ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, আবদুল হাই, ডা. শাহ মোজাহার উদ্দীন আহমেদ প্রমুখ সংসদ সদস্যগণ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মুজিবনগর সরকার পরিচালনায় এ জেলার অনেক কর্মকর্তা দায়িত্ব পারন করেছেন। বাংলাদেশ বেতারে ইংরেজি সংবাদ পাঠ ও পর্যালোচনা করতেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবীর। আবদুল গফফার চৌধুরী, কবি আসাদ চৌধুরী, সাদেক খান মুক্তিযুদ্ধের উপর কথিকা পাঠ করতেন। গাফফার চৌধুরী ও কবি

www.pathagar.com

আসাদ চৌধুরী মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত জয়বাংলা পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের আগুনঝড়া লেখনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগায়।

নবম সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বরিশাল-খুলনার সংসদ সদস্যদের নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম জোনাল কাউন্সিল গঠন করা হয়। আঞ্চলিক চেয়ারম্যান ছিলেন আবদুর রব সেরনিয়াবাদ এম.এন.এ। মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান ছিলেন তোফায়েল আহমেদ ও আমির হোসেন আমু। নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিল ও সাব-সেক্টর কমান্ডারগণ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খুলনা সীমান্তে ও অভ্যন্তরে একের পর এক বিজয় লাভ করেন। তীব্র যুদ্ধের পর ৯ম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মহকুমা মুক্ত করে। এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী খুলনা শহর দখল করে। ১৭ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক দলবীর সিংহ ও নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিলের নিকট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার হায়াত তার বাহিনীর ৮ হাজার সৈন্য নিয়ে খুলনা সার্কিট হাউজে আত্মসমর্পণ করে।

আগস্ট হতে বরিশাল থানাগুলির ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হয় এবং থানার অস্ত্র কেড়ে নিতে থাকে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জেলা ও মহকুমা শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমগ্র গ্রাম অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর অধীনে চলে যায়। বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালী জেলা ৭ মাস ১২ দিন দখলদার বাহিনীর অধীনে ছিল। এ সময় তাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের শতাধিক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ খেত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো নলছিটি থানার চাটৈর ও দরগাবাড়ী, ভোলার দেউলী, টনির বাজার ও ঘুইগারহাট, বাবুগঞ্জ, দোয়ারিকা, গৌরনদী থানার জয়শ্রী, কসবা, কাউখালীর কেন্দুয়া, স্বরূপকাঠির ইন্দেরহাট, উজিরপুরের হারতা, বানারীপাড়ার শর্ষিনা, বাকেরগঞ্জ, শ্যামপুর, বাউফল থানার কালীশুরী, পানপট্টি ও শরণখোলা প্রভৃতি। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে আলতাফ হোসেন, জোবায়ের আহমেদ টিপু, মীর মোস্তাক হোসেন ছেন্টু, আবি আবদুল্লাহ প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। অন্যান্য সেক্টরের যুদ্ধে বরিশালের অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, আখাউরার যুদ্ধে সিপাহী মোস্তফা কামাল, তিস্তা ব্যাজেজের যুদ্ধে আতাহার আলী মল্লিক বরিশালের প্রমুখ বীর শহিদ হয়েছেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বরিশাল বিভাগের সকল থানা দখল করে নেয় এবং পাক সেনারা বরিশাল শহরে ওয়াপদা অফিসে বন্দি হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর বরিশাল মুক্তিবাহিনীর দখলে চরে যায়। ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম করার পর বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য বৃহত্তর বরিশালের ২ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ, ১ জনকে বীরোত্তম, ৬ জনকে বীর বিক্রম ও ১০ জনকে বীর প্রতীক পদক প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের ৭ জন বীরশ্রেষ্টদের ২জন বরিশালের–এঁরা হলেন : বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধে পদকপ্রাপ্তগণ : শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ। শহিদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ। মেজর (অব.) শাহজাহান ওমর, বীরোত্তম। কর্ণেল খন্দকার নজমুল হুদা, বীরবিক্রম। মেজর (অব.) মেহেদী আলী ইমাম বীরবিক্রম। মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম। মেজর (অব.) মুহম্মদ হাফিজ উদ্দীন আহমেদ, বীরবিক্রম। নায়েক শহিদ আতাহার আলী মল্লিক, বীরবিক্রম। সুবেদার আবদুল হক, বীরবিক্রম। মেজর (অব.) ওয়ালীউল ইসলাম, বীরপ্রতীক। লে. কামরুল ইসলাম সেলিম, বীরপ্রতীক। শহিদ আলতাফ হোসেন, বীর প্রতীক। ফ্লাইট সার্জেন্ট রত্তন শরীফ, বীরপ্রতীক। এ.কে.এম. মহিউদ্দীন মানিক, বীরপ্রতীক। কুদ্দুস মোল্লা, বীরপ্রতীক। রফিকুল আলম বাদশা, বীরপ্রতীক। আনোয়ার হোসেন, বীরপ্রতীক। দেবদাস বিশ্বাস খোকন, বীরপ্রতীক, আবদুল মন্নান, বীরপ্রতীক।

চ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথের সময়কাল সপ্তম শতক বলেছেন। যদিও এর সঙ্গে পণ্ডিতদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে দশম/একাদশ শতকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাথাচার্যের অবির্ভাব। নাথ মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মতে আদিনাথ শিব, তাঁর শিষ্য মীণনাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের আরেক শিষ্য হাড়ি পা বা জালঞ্জরী পা, তাঁর শিষ্য কাহ্নপা। এই চার শিষ্যের কাহিনিই নাথগীতিকার উপজীব্য বিষয়। নাথ গীতিগায় দু'টি বিভাগ লক্ষ করা যায়। এক বিভাগে গোরক্ষ নাথ, মীননাথের কাহিনি, যেমন–গোর্খ বিজয়, মীন চেতন ইত্যাদি। উল্লিখিত মীণনাথের জন্ম বরিশাল অঞ্চলে। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম খণ্ড, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদক–অমিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপর্ষদ, কলিকাতা, নবম সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬) বলেন–কাহারো কাহারো মতে মীন নাথের বাড়ি বাকেরগঞ্জ ছিল। এ বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেক পণ্ডিত এবং আঞ্চলিক ঐতিহাসিক মীণনাথকে বরিশাল অঞ্চলের মানুষ বলে স্বীকার করেছেন। সে সূত্র ধরে বাংলা গীতিকার শুরু হয়েছিল মীণনাথ কে দিয়ে। অর্থাৎ বরিশাল বা চন্দ্রদ্বীপকে কেন্দ্র করে। নাথ গীতিকার অন্য বিভাগে আছে গোপীচন্দ্র ময়নামতির কাহিনি। এ কাহিনি মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপী চন্দ্রের অন্যাস নামে পরিচিত। পণ্ডিতেরা এই কাহিনির সাথে সম্পৃক্ত রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে বঙ্গাল দেলের রাজা বলেছেন। বঙ্গাল বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ সম্পৃক্ত নাম। সে সূত্রে এ কাহিনির উৎস ভূমিও বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল বা দক্ষিণ বঙ্গ।

বৃহত্তর বরিশালে ব্যক্তিগত সংগীত রচনায় যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে নিজস্বধারার সৃষ্টি করে নিজ নামে সংগীত প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো–অধরমনি বৈষ্ণবীর গান, অনাথ বন্ধুর গান, আ. লতিফের গান, গণি বয়াতির গান, উমেশ চন্দ্রের গান, কালু রায়ের গান, কালোযামিনীর গান, কেশব দত্তের গান, চন্দন বিবির গান, চন্দ্রকান্তের গান, কালীসাধকের গান, দক্ষবালার গান, দক্ষিণারায়ের গান, নকুল সরকারের গান, নাগর মোল্লার গান, প্রীয়বালার গান,

www.pathagar.com

মনমোহিনী বৈষ্ণবীর গান, মনোহরা বৈষ্ণবীর গান, যামিনী বৈষ্ণবীর গান, রশিদ ফকিরের গান, রাখাল আচার্যের গান, লক্ষ্মী বৈষ্ণবীর গান, শরৎবালার গান, হরিচরণ সরকারের গান, হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান, হিরণবালার গান, ক্ষিরোদা খেমটাওয়ালীর গান প্রভৃতি। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বরিশাল অঞ্চলের স্বনামধন্য করিয়াল ছিলেন ষষ্ঠীচরণ খরাতী, কুঞ্জলাল দত্ত ও শরৎচন্দ্র সরকার। ষষ্ঠীচরণ খরাতী চরিত্রবান ও কৃতিত্ব শক্তিসম্পন্ন স্বভাবকাবি ছিলেন। তার উপস্থিত অনুপ্রাসে তৎকালীন ঢাকার কবিয়াল সম্রাট হরিচরণ আচার্য–পর্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তার আদি বাড়ি ছিল বরিশাল জিলার বানারীপাড়ার কাছে আলতা গ্রামে। তিনি ঝালকাঠি কবিগানের দলপতি যামিনীকান্ত নট্টের দলে বেতনভোগী সরকার ছিলেন।

কবিয়াল কুঞ্জলাল দত্তের বাড়ি ছিল বর্তমান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে। কেশবলাল দত্ত নামে তাঁর এক ভাই স্বনামধন্য কবিগায়ক ছিলেন। কুঞ্জলাল দত্ত ঝালকাঠির অধরমনি বৈষ্ণবীসহ অন্যান্য কবিওয়ালীদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। কুঞ্জলাল দত্তের দলে যে সব বৈষ্ণবীরা সংগীত পরিবেশন করতেন তাঁরা বেস্যার অপেক্ষা সম্মানিতা ছিলেন। কারণ গান বাজ নাই ছিল তাদের ব্যবসা। ওইসব বৈষ্ণবীরা একজনের সঙ্গে স্বামী–স্ত্রী ভাবে কালযাপন করতেন। কুঞ্জলাল দত্ত খুব বড় মাপের কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু আসরে তিনি দ্রুত বক্তৃতা করতে পারতেন। তাছাড়া ভদ্র সন্তান বিধায় তিনি খুব সম্মান পেতেন।

কবিয়াল শরৎচন্দ্র সরকারের জন্মস্থান ঝালকাঠিতে। বেশ্যায় গর্ভে তার জন্ম। শরৎ সরকার যামিনী বৈষ্ণবীকে নিয়ে দল করতেন। যামিনীর ডাক নাম ধলা যামিনী। যামিনীর বোন ছিল কামিনী। কামিনীর মেয়ে ছিল বেঁচা বা সুরধ্বনী এরা মাঝারী ধরণের গায়িকা ছিলেন। কামিনীর ছেলে জ্ঞানেন্দ্র তবলার ওস্তাদ ছিলেন। শরৎ সরকার কোন স্থায়ী গান রচনা করেন নি। কিন্তু উপস্থিত বক্তৃতা শক্তিতে বলিয়ান শরৎ সরকার দর্শক শ্রোতার হৃদয়ে স্থান পায়। তাঁর মিষ্টি গলায় স্বর এবং বক্তৃতায় ত্রিপদী ছন্দের এমন মিল ছিল যা সমসাময়িক কোন সরকারের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

শরৎসরকারের শিষ্য ছিলেন চন্দ্রকান্ত দাস বা দিগবিজয় চন্দ্র সরকার। তিনি লক্ষ্মী বৈষ্ণবীকে নিয়ে দল গঠন করে ছিলেন। দিগবিজয় চন্দ্র সরকারের কবি গানের পাল্লায় একমাত্র ঢাকা জেলায় কবিয়াল সম্রাট হরি আচার্য ছাড়া আর সকলেই পরাজিত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। চন্দ্র সরকারের রচনা মনোমুগ্ধকর। তিনি ডাকগান,মালসী গান, সখী সংবাদ গান, ভোর গান, গোষ্ঠ গান জুতার কবি প্রভৃতি রচনা করে ছিলেন। চন্দ্র সরকার এবং লক্ষ্মীর অল্প বয়সে মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

বাংলা ১৩৩০ সালে কবিয়াল রাখাল চন্দ্র আচার্য গান শুরু করেন। চন্দ্র সরকার, হরিচরণ দাস, নকুলেশ্বর দাস, বৈষ্ণব সরকার প্রমুখ শিল্পীরা রাখল চন্দ্র আচার্যের তুলনায় বয়সে ৭/৮ বছরের বড়। জানা যায়, উল্লিখিত সময়ে তারা যুবক ছিলেন। তবে উমেশচন্দ্র শীল ছিলেন ওই সময়ে পৌঢ়। উমেশ চন্দ্র শীল কালো যামিনীকে নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। কালো যামিনীকে ওই সময়ে শ্রোতাগণ কোকিলকণ্ঠী বলে সম্বোধন করতেন। উমেশ চন্দ্র শীল এবং কালো যামিনী স্বামী–স্ত্রীরূপে একত্রে থাকতেন।

www.pathagar.com

সমসাময়িককালে ঝালকাঠি অঞ্চলের অন্যমত গায়িকা ছিলেন ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী তার নাচে ও গানে শ্রোতাকূল ছিল মুগ্ধ। একই সময়ে ঝালকাঠিতে সরলা নাম্মী মুসলীম গায়িকা যশ অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বরিশালের বাকেরগঞ্জের সাহেবগঞ্জে ক্ষীরোদা নাম্মী আরো একজন সুগায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়।

গতশতাব্দীর ত্রিশের দশকে ঝালকাঠির স্বনামখ্যাত লোকগায়িকা ছিলেন মহিলা-কবি গায়িকা মনোমোহিনী বৈষ্ণবী। তিনি বেতনভোগী সরকার রেখে নিজেই দল গঠন করেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন রাধালক্ষ্মী বৈষ্ণবী। মনোমোহিনীর মতো তারও মধুর কণ্ঠস্বর এবং গানের ছন্দ ছিলো। এই রাধালক্ষ্মী মনোমোহিনীর দলে গান গেয়ে মাসিক ১শ টাকা বেতন পেতেন। মনোমোহিনীর কন্যা হরিদাসীও সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন। তিনি নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। ওই সময়ে ঝালকাঠিতে দক্ষবালা নাম্নী আরো একজন গায়িকা ছিলেন। তিনি অনাথবন্ধু নাগকে নিয়ে গান করতেন। হরিচরণ দাস বেতনভোগী হয়ে ঝালকাঠির বিভিন্ন দলে সরকারি করতেন। তিনি ছড়াকাটায় ওস্তাদ ছিলেন। রাখাল চন্দ্র আচার্যের সাথে বহুবার তার গানের পাল্লা হয়েছিল। ওই সময়ে রাখাল চন্দ্র, নকুল সরকারসহ স্থানীয় সরকাররা সকলেই পাঁচালীতে হরিচরণকে সমীহ করতেন। রুক্ষভাষী হরিচারণ পালায় অশ্লীলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

বরিশাল জেলার শুয়াকাটিতে নকুল সরকারের বাড়ি। তিনি প্রথমে কৃষ্ণ সরকার এবং পরে কবিয়াল সম্রাট হরিচরণ আচার্যের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নকুল সরকার বেদ-পুরান-কোরআন- বাইবেল ইত্যাদি শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। তার ভাষাবোধ, রুচীসম্মত শব্দচয়নসহ তাল-মান-রাগ-রাগিনীতে যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি তাল, রস ও অলংকারযুক্ত বহু মনোমুগ্ধকর সংগীত রচনা করেছিলেন। যা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর কবিগান ও টপ্পা পাঁচালীতে সন্তুষ্ট হয়ে করিমগঞ্জ মহাকুমা মেজিস্ট্রেট তাঁকে একটি স্বর্ণপদক এবং একটি দোনালা বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। দেশভাগের কিছুকাল আগে তিনি কোলকাতা চলে যান এবং সেখানেও তিনি খ্যাতির সঙ্গে তার সংগীতে শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

মনোহরা বৈষ্ণবী নাম্মী আর একজন সুগায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিশ্চিত করে জানা যায় নি। একই সময়ে শরৎবালা (শরতী) বলে আরও একজন সুগায়িকা ঝালকাঠিতে ছিলেন। নৃত্য-গীতি পটিয়াসী ওই গায়িকার জুড়ি ছিল না। শরৎবালা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক দলে বেতনভোগী শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন। একই সময়ে প্রিয়বালা (ডাক নাম চেড়া বোচা) নাম্মী অপর এক সুগায়িকার অস্তিত্ব জানা যায়। তিনি অধিকাংশ সময়ে ঢাকার কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের দলে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে গান করতেন। ঝালকাঠিতে তাঁর বাড়িঘর থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিম বাংলায় থেকে রাজেন্দ্র সরকারের দলে গান করতেন। ঝালকাঠির অপর এক নৃত্য-গীতি পটিয়সী সুগায়িকার নাম হিরণবালা। তিনি যামিনী নট্টের পালিতা কন্যা। তিনিও দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং বিভিন্ন দলে গান করেন। দেখা

www.pathagar.com

যায়,দেশভাগের পূর্বে অর্থাৎ গতশতাব্দীর প্রথম ভাগে ঝালকাঠিতে প্রায় ১০/১৫ টি দল সুনামের সাথে পালা পরিবেশন করেছেন।

দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে ঝালকাঠি অঞ্চলে দু'টি ভাল জারির দল গড়ে ওঠে। একটি এ অঞ্চলের জারি সম্রাট বলে খ্যাত গণি বয়াতির। অপরটি পোনাবালিয়ার নাগর মোল্লার। ওই সময়ে ঝলকাঠির অন্যতম গায়িকা ছিলেন গৌরী । তিনি গণি বয়াতির সাথে গান করতেন। এছাড়া ঝালকাঠির মারাসাতা নিবাসী আলম শরীফ ও তারপুত্র কলম শরীফ, সঞ্জয়পুরের আকুব্বার ও তার পুত্র মোনসেক, কল্যাণ কাজী, নাদের আলী, উত্তমনগরের রাজাউল্লাহ বয়াতি, ভৈরবপাশার হিঙ্গলদ্দিন বিখ্যাত জারি গায়ক ছিলেন।

পঞ্চাশের দশকে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে অধ্যাত্মিক গান, তত্ত্বসংগীত, দেহতত্ত্বগান, ভাবগানসহ বন্দনাগানের অন্যতম শিল্পী ছিলেন বরগুণার মাতানচাঁদ গোসাঁই। সমসাময়িক সময়ে বরগুণার পুরাঘাট এলাকার হেউলিবুনিয়া গ্রামের রাধাবল্লভ গোঁসাই, বরিশালের উজিরপুর উপজেলার প্রিয়নাথ বৈরাগী এবং বামরাইলের মাধব গোসাঁই আধ্যাত্মিক গানে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গত শতাব্দির শুরুরদিকে বরিশালে বৈষ্ণব সাধনরীতি জনপ্রিয়তা পেলে নগরীতে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি আখড়া। এসব আখড়ায় মধ্যে ভাটিখানায় রাধা গোবিন্দ আশ্রম, বাজার রোডের রাধা গোবিন্দ জিউর আখরা, চকবাজার মদনমোহন আখড়া, সদর রোডের জগন্নাথ আখড়া অন্যতম।

এসব আখড়ায় নামকীর্তন, কৃষ্ণলীলা, ভোরকীর্তন, বৈষ্ণব সংগীতসহ স্মরণসংগীত ও আধ্যাত্মিক গানের চর্চা চলতো ব্যাপক ভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় চল্লিশের দশকে বরিশাল শহরকেন্দ্রিক বৈষ্ণবগানে রাধারামন বৈষ্ণব, মাখম গোসাঁই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তাদের শিষ্য মহামায়া বৈষ্ণবী, রাইধ্বনী বৈষ্ণবী, কালি বৈষ্ণবী গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহামায়া-রাইধ্বনীর লোটকীর্তন একসময়ে নগরীতে সাড়া তুলেছিল।

সমসাময়িককালে ঝালকাঠি অঞ্চলে লক্ষ্মীকান্ত ঢেপ'র পালাকীর্তন, টপ্পা, রঙ্গরসের গান এবং পুতুলনাচের গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। লক্ষ্মীকান্ত ঢেপ'র পুতুলনাচের দল ছিল বলে জানিয়েছেন প্রবীন যাত্রাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ রায় হিটলার। তিনি বলেন, ৪০-এর দশকের মেলা লক্ষ্মীকান্ত ঢেপে'র পুতুলনাচ ছাড়া জমতো না। ওই সময়ে দূরদূরান্ত থেকে মেলায় আগত সাধারণ মানুষ তার পুতুলনাচ এবং এর সঙ্গে গীত কাহিনি নির্ভর সংগীত উপভোগ করতো প্রাণ ভরে। সমসাময়িককালে বরিশালের বাকেরগঞ্জের শিয়ালঘুনি এলাকায় বসন্তশীল নামে পালাকীর্তনীয়ার নৌকা বিলাস, কৃষ্ণলীলা, রামায়ন এবং টপ্পা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

গতশতাব্দির ষাটের দশকে বরিশালের বাকেরগঞ্জের দাঁড়িয়াল এলাকায় মনোরঞ্জ শীল ও নিরঞ্জন শীলের কীর্তনের দল এলাকা চষে বেড়াত। ওই সময়ে বাকেরগঞ্জের কলসকাঠিতে জগদ্ধাত্রী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে পালাগানের আসর বসত যা মনোরঞ্জন শীল ও নিরঞ্জন শীল ছাড়া জমতো না। শিল্পীদ্বয় ওই আসরে গীতকাহিনির বিভিন্ন চরিত্র সেজে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন।

www.pathagar.com

পঞ্চাশের দশকে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার খোরশেদ বয়াতির তরজা গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এর কিছুকাল পরে একই এলাকার মনু শীল, প্রেমানন্দ, ত্রৈলোক্য গায়েনের কবিগান, বৈঠকী গান দুই দশক আগ পর্যন্ত এলাকায় প্রচলিত ছিল। তাদের মৃত্যুর পর থেকে এ অঞ্চলে কবিগান ও বৈঠকীগানে ভাটা নামে। তবে তাদের পরবর্তী বংশধরেরা কর্মজীবনের পাশাপাশি কবিগান–বৈঠকীগানের ধারা অব্যাহত রাখছে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাও বিপন্ন হবার পথে। বর্তমানে বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় রবি সরকারের কবিগানের দল রয়েছে। যারা এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে কবিগান করে থাকেন।

জারি সম্রাট আবদুল গণি বয়াতি ১৯০৯ সালে তৎকালীন বরিশাল জেলার নুরুল্লাপুরে (মেহেদীপুর)–জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি গানের চর্চা শুরু করেন। লোকসংগীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ থাকলেও তিনি জারি গানে সর্বাধিক পরিচিত লাভ করেন। শুধুমাত্র জারি শিল্পী হিসেবেই নয় তিনি জারি গানের রচয়িতা হিসেবেও সুখ্যাত। তিনি অসংখ্য পল্লীগীতির রচয়িতা। আবদুল গণি বয়াতির পিতাও ছিলেন একজন নামকরা জারি গায়ক। পিতার কাছে জারির হাতে খড়ি হলেও তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন হরিচরণ সরকার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে জমিদার হীরালাল চৌধুরীর বাড়িতে গান গেয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯২১ সালে তিনি একটি ক্ষুদে গায়ক দল গঠন করেন। বাংলা ১৩৫০ সালের আকালকে নিয়ে তিনি একটি মর্মস্পর্শী গান রচনা করলে সে গান মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন বরিশালের ডি.এম তাকে ১০ একর জমি দান করেন। খ্যাতিমান এ জারি গায়ক পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর লে. জে. আজম খানের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সংগীত পরিবেশন করেন। ৬৯ বছর বয়সে নিজ গ্রামে ১৯ আগস্ট ১৯৭৮-এ জারি সম্রাটের দেহাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ৯ পুত্র এবং ৮ কন্যা রেখে গেছেন। আবদুল গণি বয়াতির গানগুলোর মধ্যে তাঁর জারি, পল্লীগীতি, ধূয়াগান এবং বিচ্ছেদগান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বরিশাল অঞ্চলের অপর এক জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী আবদুল লতিফ–এর জন্মও বরিশালে। আধুনিক মানষিকতায় পরিশীলিত এ শিল্পীর সৃষ্টি মূলত লোক জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ১৯৩০ সালে আব্দুল লতিফ বরিশালের রায়ের পাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আজীবুন্নেছা, পিতা আমিন উদ্দিন। টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই তিনি ১৬ নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে যোগদেন। ১৯৩৯ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যান বোম্বে ও হায়দ্রাবাদ। ১৯৪১ সালে ১৬নং ব্যাটালিয়ন ভেঙে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর পালিয়ে যান কোলকাতায় ভূজঙ্গভূষণ বসুর আশ্রয়ে। এই ভূজঙ্গভূষণ বসুই তাঁর প্রথম সংগীতগুরু। আবদুল লতিফের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে সংগীতমুখী করে তোলে। কোলকাতায় দীনেশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় তিনি ওস্তাদ সুরেন্দ্র নাথ দাসের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বরিশালে ফিরে আসেন। সংগীত পরিচালক আবদুল হালিম চৌধুরীর সহায়তায় তিনি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায় গান গাওয়া শুরু

www.pathagar.com

করেন। অচিরেই তিনি সংগীত জগতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আবদুল লতিফ বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে রেডিও প্রোগ্রাম বর্জন করেন এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমিক ভুলিতে পারি...* অমর গীতিকার প্রথম সুরারোপ করেন। এছাড়া তিনি ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে গানও রচনা করেন। আবদুল লতিফের দীর্ঘ সংগীত জীবনের অবসান ঘটে ২০০৫সালে। তাঁর পুথি পাঠরীতি, লোকসংগীত বর্তমান সময়েও সমধিক জনপ্রিয়। আবদুল লতিফ একাধারে শিল্পী, রচয়িতা এবং লোকবাংলার অন্যতম লোককবি।

গতশতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়েকজন লোকশিল্পী বরিশাল অঞ্চলের লোকসংগীতাঙ্গন সরব রেখেছিলেন তাদের মধ্যে রাজাউল্লাহ বয়াতি, মফিজুদ্দিন, কলম ওরফে গোলাম আলী শরীফ, আবদুল কাদের বয়াতি, মোনাসেফ বয়াতি, খোরশেদ আলম, নগরমোল্লা, আজিমুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব লোকশিল্পীরা পূর্বসূরীদের রচিতসংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি নিজস্ব সংগীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

রাজাউল্লাহ : ঝালকাঠি জেলার উত্তর মগর গ্রামের রাজাউল্লা বয়াতি আলম বয়াতিয় শিষ্য। পরে তিনি নিজস্ব জারি ও আধ্যাত্মিক গানের দল গঠন করেছিলেন।

মফিজ উদ্দিন : ঝালকাঠি জেলার বালিঘোনার মফিজউদ্দিনও আলম বয়াতির শিষ্য। পরে তিনি নিজস্ব দল গঠন করে ওস্তাদের সাথে বহু প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সফলতা লাভ করেন *চাপান* জাতীয় কুশলতায় তার নাম স্মরণীয়।

কলম ওরকে গোলাম আলী শরীফ : আলম বয়াতির পুত্র। অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের অধিকারী। গত শতাব্দীর ৩য় দশকে তিনি তাঁর সুরে বরিশাল অঞ্চল তথা আশপাশ এলাকার মানুষকে মোহিত করে রেখেছিলেন। এই গুণী শিল্পীর জন্মও ঝালকাঠি জেলায়।

আবদুল কাদের বয়াতি : ১৯৪৯ সালে তিনি জারিগান শুরু করেন। ৫১–তে নিজস্ব দল গঠন করেছিলেন। বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বরাকোঠা গ্রামে সদাহাস্যময়, মৃদুভাষী বিনয়ী–বিনম্র এই জারি শিল্পী প্রথমজীবনে গৌরনদীর জারি শিল্পী খোরশেদ আলমের কাছে জারি, আধ্যাত্মিক, তত্ত্বসংগীতে তালিম নেন। গুরুসংগীত গাওয়ার পাশাপাশি তার নিজস্ব সংগীত পরিবেশন করে তিনি এই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বরিশাল অঞ্চলসহ আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের জারিঅঙ্গনে নিজস্ব পালা বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোনাসেফ বয়াতি : আবুবকর বয়াতির পুত্র মোনাসেফ অগাধ পণ্ডিত্য, অপার সুরমাধুরী এবং বেহালার সুর মুর্ছনায় এককালে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন দক্ষিণ লোকসংগীতাঞ্চলকে। তাঁর স্থায়ী নিবাস ছিল ঝালকাঠি অঞ্চলে।

খোরশেদ আলম : বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বড়পাইকা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিরক্ষর খোরশেদ বয়াতির জারির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শালিনতা। অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নাগর মোল্লা : ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা গ্রামে তার জন্ম। নাগরমোল্লা ছিলেন মোনাসেফ বয়াতিয় শিষ্য। শাস্ত্রীয় কূটতর্কে তিনি ছিলেন কুশলী। প্রতিপক্ষকে সুন্দরভাবে ঘায়েল করতে তিনি তার ওই অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

তাঁর জারিতে এমন ধাঁধা সৃষ্টি করতেন যে, শ্রোতামন্ডলী অবাক বিস্ময়ে ভাবতো এর বুঝি আর উত্তর নেই।

রশিদ ফকির : গত শতকের ত্রিশের দশকে মরমী সাধক রশিদ ফকিরের জন্ম বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের সুজনকাছি গ্রামে। প্রতি বৃহস্পতিবার আমন দিতেন। ওই আসনে গান গাইতেন কোন বাদ্যযন্ত্র ছাড়া। তাঁর গানের দর্শন ছিল মানুষ। তিনি এই মানুষকেই খুঁজে ফিরেছেন সারা জীবন। তাদের জন্য তিনি অবিরাম আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন। আর এর মাধ্যম ছিল। তাঁর অসংখ্য গান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বরিশাল অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে। তাঁর রচিত গানগুলো লোকসংগীতের অসাধারণ সংযোজন। তিনি মূলত ৩ ধরনের গান রচনা করেছিলেন- ভক্তিমার্গ ও সাধনামার্গের গান, প্রেমমার্গ ও জ্ঞানমার্গের গান এবং বিচ্ছেদ বা আত্মবঞ্চণাপ্রসুত অভিমানী গান। তিনি খান জাহান আলী (রা) কে পীর হিসেবে মানতেন। ১৯৯৫ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি লোক কবি ও শিল্পী রশিদ ফকিরের মৃত্যু হয়।

পরেশ চন্দ্র বাইন : বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার মোল্লাপাড়ার নাগরা গ্রামের লোক কবি ও শিল্পী পরেশ চন্দ্র বাউল অসংখ্য গান রচনা করেছেন। যা লোক বাংলারে অমূল্য সম্পদ। সহযোগিতা ও প্রচারের অভাবে তাঁর জীবন এবং রচিত সংগীতের পাণ্ডুলিপি বিপন্ন। ইতোমধ্যে অযত্ন অবহেলায় অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত লোকশিল্পী পরেশ চন্দ্র বাইন আজ মৃত্যুশয্যায়।

আজিমুদ্দিন : বরিশাল সদর উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রথমে তিনি কবিদলের হয়ে গান গাইতেন। পরে জারির দল গঠন করেন। শাস্ত্রজ্ঞানী আজিমুদ্দিনের বিকাশ জারির অস্তাচলের যুগে। তবুও তিনি পুরান বয়াতিদের মোকাবেলায় অনন্য নৈপুন্য দেখাতেন। আজিমুদ্দিনের সমসাময়িককালে বরিশালের উজিরপুর উপজেলার আবদুল কাদের বয়াতি ও মন্নান বয়াতি বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে বেড়াতেন।

পেয়ারা বেগম : পটুয়াখালী জেলার পাঙ্গাশিয়ায় ১৯৬৪ সালে পিয়ারা বেগমরে জন্ম। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই তিনি জারি শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে পটুয়াখালী এক্সজিবিশনে তিনি ছোট বয়সে গেয়ে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১১ জন সদস্য নিয়ে ওই অঞ্চলে একটি দল গঠন করেন।

১৯৭৭ সালের ২৪ থেকে ২৬ জুন এবং ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে সরকারের জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত ছয়দিনব্যাপী লোকসংগীত উৎসবে বরিশাল অঞ্চলের লোকসংগীত শিল্পীদের একটি বিরাট অংশ উপস্থিত হয়ে তাদের সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা হতে অংশগ্রহণ করেন–জারি শিল্পী আবদুল মান্নান, আবদুল কাদের, জয়নাল আবেদীন, আজাহার বয়াতি, মতলেব, মোসলেম বয়াতি আলউদ্দিন বয়াতি, কিশোর জাকির হোসেন, মোশরফ হোসেন, রয়ানী গায়ক অনন্ত দেউরীর দল, কবিগায়ক রবীন্দ্রনাথ, মনিন্দ্র নাথ, পল্লীগীতি শিল্পী আনোয়ার হোসেন, নিত্যানন্দ, হাবিবুর রহমান, মোশারেফ হোসেন প্রমুখ। জেলার গৌরনদী উপজেলার–ইউসুফ বাউল, সুলতান বয়াতি,

www.pathagar.com

বেলায়েত বয়াতি, সৈয়দ আলী বয়াতি, মোসলেম বয়াতি, জয়নাল বয়াতি, কিশোর শিল্পী সাইফুল আলম প্রমুখ। মুলাদী উপজেলার–পল্লীগীতি শিল্পী ফরিদউদ্দিন, জারি শিল্পী হাচান বয়াতি, হাচেন বয়াতি, পল্লীগীতি শিল্পী এ ফারুক, আবদুল বাসেত, সিরাজল হক, সারি ও পুথি শিল্পী ফয়জুদ্দিন, রঙ্গরসশিল্পী কালাচাঁদ ও শ্যামসুন্দর প্রমুখ। বরিশাল সদর থেকে অংশগ্রহণ করেন–পল্লীগীতি শিল্পী আবদুল জব্বার (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী), রুনা লায়লা। বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়ালী শিল্পী আবুল হোসেন, বাবুগঞ্জের জারি শিল্পী মোশারেফ হোসেন, ধামশর গ্রামের জারি শিল্পী ভাসাই বয়াতি লোক সংগীত পরিবেশন করেন।

লোকসংগীত উৎসবে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা গ্রামের পল্লীগীতি শিল্পী ফোরকান আহমেদ, ঝালকাঠির জারি শিল্পী আবদুল বারেক এবং পটুয়াখালী জেলার পল্লীগীতি শিল্পী ইউনুস তালুকদার, জারিশিল্পী পিয়ারা বেগম অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে জীবিত অনেকেই নিজ লোকসংগীত পরিবেশন করছেন। এছাড়া বর্তমান সময়ে জলিল বয়াতি, কাজল রেখা বয়াতি, মুজিব বয়াতি সুনামের সাথে লোক সংগীত রচনা ও পরিবেশন করে যাচ্ছেন। আঞ্চলিক গানের স্রষ্টা হিসেবে অসিত দাস, বশিরুল হক বাদল, স্বয়ম্ভু সরকার, পংকজ কর্মকার এখনও কাজ করে যাচ্ছেন।

তথ্যসহায়ক

১. কমল চৌধুরী (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

২. রুসেলি রহমান চৌধুরী, বরিশালের প্রয়াত গুণীজন, ইউনিভার্সিটি বুক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

৩. মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পাদক), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, জেলা প্রশাসন, বরিশাল

৪. নিখিল সেন (আহ্বায়ক), *বরিশালে মুক্তিদ্ধের সূচনাকেন্দ্র উৎসব*-৯৩, বরিশাল

৫. মিন্টু বসু (সম্পা:), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর স্মারক গ্রন্থ*, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, বরিশাল, ১৯৯৬

৬. বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

৭. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস, জেলা প্রশাসন, বরিশাল

৮. শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বরিশাল- ১৯৯২

৯. ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধ কথা, ঢাকা- ২০০৭

১০. সৈয়দ দুলাল (সম্পাদক), আনন্দ লিখন, বরিশাল

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

এক ধীবরকন্যা ও চন্দ্রশেখর

যখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশ স্থল সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগনায় চন্দ্রশেখর নামে একজন ধার্মিক, শুদ্ধাচার এবং তপানুশীলন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাকে সুপাত্র দেখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত স্বীয় সর্বগুণসম্পন্না সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে তাঁহার নবোঢ়া পত্নীর যে নাম, তাঁহার উপাস্যা দেবীরও সেই নাম; ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। যে উপাস্যা দেবীকে তিনি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে শয়নে-স্বপনে সর্বদা আরাধনা করিয়া থাকেন, আজ সেই উপাস্যা দেবীকে চিন্তা করিলে স্ত্রীর নাম স্মৃতিপথে উদয় হইবে, যাহাকে, মা বলিয়া ডাকিলের স্ত্রীর নাম মুখে আসিবে, আজ তিনি কেমন করিয়া সেই স্ত্রীসহবাসে মহাঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন? অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইলে, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন; তাঁহার হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত মহাপাপে এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে। এখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে স্থির সংকল্প করিলেন।

ধীরে ধীরে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল, স্ত্রী-আচার পর্যন্ত নির্বাহ হইয়া গেল; বর-কন্যা বাসর ঘরে যাইবার পূর্বে চন্দ্রশেখর কৌশলে পলায়ন করিলেন। বরবেশেই সেই গভীর নিশিথ সময়ে ধার্মিক ব্রাহ্মণ একাকী স্বগৃহে আসিয়া, একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণপূর্বক একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষেপণি সহযোগে উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল সমুদ্রতুল্য নদীবক্ষে ভাসমান হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি, স্ফীতবক্ষে দিগদিগন্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও উদ্বেলিত তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের সহিত মিশিতেছে, আবার কোথাও উচ্ছৃঙ্খল গতিতে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণভীতিকর শব্দেও কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া, ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। জনমানব দূরে থাকুক, এমনকি আকাশে কোনো উড্ডীয়মান পক্ষী পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপ দুইদিন গত হইল, তৃতীয় দিনে সূর্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে ক্ষুদ্র তরণীতে আরূঢ়া অসামান্য রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতুহলী হইলেন।

www.pathagar.com

দেখিতে দেখিতে তাঁহার তরণী উক্ত রমণীর নিকটবর্তী হইলে, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন সাহসে একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আসিয়াছ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?'

রমণীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক তাঁহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন।

ধীবরকন্যা তাঁহার কথায় হাস্য করিয়া বলিল, 'ঠাকুর, দেখিতেছে আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন; এই সামান্য রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন? আপনি কি জানেন না যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিত। আপনার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি যাবতীয় নারীতেই তিনি সমভাবে বিরাজ করেন, ইহা কি বুঝিতে পারেন না? আবার যে প্রত্যেক পুরুষদেহে ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ হইত তবে বিধাতা কিছুই সৃষ্টি করিতেন না। যান ঠাকুর! বাড়ি গিয়া স্ত্রীর সহিত স্বধর্ম পালন করুন।'

ধীবরকন্যার বাক্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার কাটিয়া গেল। অল্প বয়স্কা, অশিক্ষিতা, ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একলম্ফে ধীবরকন্যার নৌকায় গিয়া দুই হস্তে তাঁহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন, 'মা, তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে। ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না, তুমি নিশ্চিতই কোনো দেবী, ছল করিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ; তোমার সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।' এই বলিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহার চরণদ্বয়ের উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ধীবরকন্যা, ব্রাহ্মণের একম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আমি অস্পৃশ্যা ধীবরকন্যা, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার অকল্যাণ করিতেছেন? শীঘ্র আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করুন।'

চন্দ্রশেখর কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই দেবী; অভাগাকে ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে পদযুগল পরিত্যাগ করিব না। এখন পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটিবে।

রমণী তথাপিও আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইল না। এই প্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে যখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন, যে ইনি কিছুতেই আত্মপরিচয় দিবেন না, তখন আত্মত্যাগ করবার জন্য নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন সেই রমণী বলিল, 'বৎস চন্দ্রশেখর! আমি এতক্ষণ তোমার ভক্তি ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাঁহাকে দিবানিশি ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া থাক, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী। বৎস, আত্মহত্যা মহাপাপ, তুমি নৌকায় আরোহণ কর।'

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্লাদেরসহিত দেবীর আদেশ অনুসারে নৌকায় উঠিলেন ও ভক্তিভরে উপাস্য দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে মনে মনে অহোরাত্র অবিচ্ছিন্ন

www.pathagar.com

চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার শ্রীপদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ দিবানিশি আরাধনা করেন, ব্রাহ্মণ আজ সেই দেবদুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন ভক্তিরসে ভিজিয়া উঠিল। দেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রণতি শিরোধরাংসা চন্দ্রশেখর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'মা, যাঁহার স্বরূপ হৃৎপদ্মে বিকশিত হইলে সর্ববিধ বাসনা পরিপূর্ণ হয়, আজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। মাগো, কৃপা করিয়া এ দাসকে একবার স্বরূপে দেখা দাও।'

ভক্তবৎসলা দয়াময়ী তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণা করিয়া ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ বলিলেন, 'বৎস, আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে আমার অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।'

চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণত হইয়া বলিলেন, 'মাতঃ! যখন পূর্বপুণ্যফলে এ পবিত্র চরণ দর্শন পাইয়াছি তখন রাজ্যভোগে আর আমার স্পৃহা নাই কেবল এই বর দাও যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই, তবে এই কর মা যেন এই ভূখণ্ড তোমার এই দীন সন্তানের নামে প্রসিদ্ধ হয়।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং চন্দ্রশেখরও হৃষ্টমনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীর আশীর্বাদে অতি শীঘ্র সেই বিশাল জলরাশি অপসারিত হইল। সেই নবাবিষ্কৃত ভূমি চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

ছবি খাঁ ট্র্যাজেডি

'চারদিকে শুধু বন আর বন, আর কিছু নেই, শুধু বন। কড়ই, সেগুন, গর্জন প্রভৃতি বৃক্ষের সমারোহ। দিনে সূর্যের আলোর কণার মাটি ছুঁতে কষ্ট হয়। ছোট ছোট খাল চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরীসৃপের মতো। খালের দুপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বৃক্ষ। খালপাড়ের গাছগুলোতে ঝুলে আছে বিশাল মৌচাক। চারদিক থেকে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পড়ছে চাকের ওপর। আবার ছুটে যাচ্ছে মৌ সংগ্রহ করতে। মাঝে মাঝে না জানা অনেক পাখির ডাক কানে ভেসে আসে। বড় বড় সাপ সামনে থেকে চলে যায় শির উঁচু করে। এ জঙ্গলে চলাচল করার মতো কোনো পথ নেই। নিজেদেরই পথ তৈরি করে নিতে হয়। একটু দূরে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ায় ছবি খাঁ। বড় আকৃতির একটি শূকর। ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয়। শূকর নিশ্চিত হয়ে তীর ছোড়েনি। বাঘ হলে এতক্ষণ ছবি খাঁর তীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। একটা মাদি শূকর। আস্তে আস্তে পাশ থেকে হেলেদুলে চলে যায়। বুক দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। এমন তো কোনো দিন হয়নি। মনে চাপা ভয় কাজ করে। কী যেন একটা অঘটন ঘটে যাচ্ছে। সামনে থেকে একটা মাদি শূকর চলে যাওয়া একটা অশুভ লক্ষণ মনে হয়। তার পরও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। একটা শব্দ টের পায়। আবারও আঁতকে ওঠে। নিশ্চয়ই হিংস্র কোনো জানোয়ার হতে পারে। ধনুক তাক করে। একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে তার সামনে। মরা ডাল। কয়েক দিন হয় ডালটির পাতা শুকিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ছবি খাঁ শুধু একা নয়। আরো বেশ কয়েকজন অনুচরসহ বের হন ভ্রমণ করতে। একসময় চলতে চলতে প্রবেশ করে গহীন অরণ্যে। তার সামনে ও পেছনের সব সহযোগীকে পেছনে হাঁটার নির্দেশ দেয়। ছবি খাঁ জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে থাকে। বিরাট এক বৃক্ষ। গাছটির নাম বলতে পারে না কেউ। ছবি খাঁর চোখ স্থির হয়। অনুচররা কেউ কিছু দেখছে না। তারা ছবি খাঁর দিকে তাকায়। বিশিষ্ট এক অনুচর জিজ্ঞেস করে, আপনি কি অসুস্থ?

না, অনুচরবর্গ।

তাহলে অন্য কিছু!

হ্যাঁ।

বলুন।

সামনে ওই বিশাল গাছটাকে লক্ষ করছ।

জি করেছি। সব অনুচর একসাথে জবাব দেয়।

কারো চোখে পলক পড়ছে না। শুধু একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাদের চোখ সতর্ক। কখন জানি আবার হিংস্র কোনো জন্তু থাবা বসিয়ে দেয়। আবারও একই প্রশ্ন করে ছবি খাঁ।

জি, সকল অনুচর একযোগে জবাব দেয়।

ওই বিশাল গাছটার গোড়ায় মানুষের মতো মনে হয়। আমাদের দেখে আড়ালে গেল। সবাই সতর্ক হও। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। আমার মনে হয় মানুষই হবে। তাও আবার স্ত্রীলোক। এ গহীন অরণ্যে মানুষ? সবাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তীর-ধনুক উঁচু করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। গাছের গোড়ায় আসতেই অবাক হয়ে যায় সকলে। এক পরমা সুন্দরী প্রৌঢ়া। লোকের উপস্থিতি টের পেয়ে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অনুচরবর্গ মহিলার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানতে চায় কে তুমি রমণী, এ গহীন অরণ্যে!

আমি এক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী। সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ। দস্যুগণ আমাদের বাড়িঘর লুণ্ঠন করছে। স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেছে। মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমি পালিয়ে এ অরণ্যে প্রবেশ করেছি। জবাব দেয় মহিলা।

প্রশান্ত নয়নে মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকায় ছবি খাঁ। মুখে কোনো কথা সরছে না। মহিলাও স্তব্ধ হয়ে যায়। দুরু দুরু কাঁপতে থাকেতোর বক্ষকমল। কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। অপূর্ব সুন্দরী রমণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয় ছবি খাঁ। চোখ ফেরাতে পারছে না। মহিলার শরীর ঘামে জমে গেছে। অপূর্ব সুন্দরী রমণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয় ছবি খাঁ। চোখ ফেরাতে পারছে না। মহিলার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। তাপে মুখের বর্ণ বদলে গেছে। গায়ে জমে আছে ধুলোবালি। তার পরও এ জঙ্গলের রমণীর মতো লাগছে মহিলাকে। এই রমণীকে বেহেস্তের হুরের মতো লাগছে ছবি খাঁর।

ছবি খাঁ পশ্চিম দেশবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান বণিকের সন্তান। জোর-জুলুম-অত্যাচারের দেশের লোকজন অতিষ্ঠ, বিশেষ করে ছেলে ধরার ভয়ই সবচেয়ে বেশি। অপহরণকারীরা ছোট ছেলেদের পিতামাতার সামনে থেকেই অপহরণ করত, আবার কখনো কখনো তাদের পিতামাতাকে খুন করে সন্তানদের তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিত

www.pathagar.com

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ছেলে ধরার ভয়ে সকলেই আতঙ্ক ছিল। চোরগণের হাত থেকে রেহাই পায়নি ছবি খাঁ ও তার পিতামাতা। তারা তার বাবাকে হত্যা করে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে ছবি খাঁকে। সুন্দর ও সুশ্রী সুঠাম দেহের অধিকারী ছবি খাঁকে তারা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। এক ধনাঢ্য মুসলমান ক্রয় করে ছবি খাঁকে। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে, তারপর যৌবনে পদার্পণ করে ছবি খাঁ। দেখতে রাজপুতের মতো।

ছবি খাঁ ও তার অনুচরবর্গ বাড়ি নিয়ে যায় মহিলাকে। বসনবিহীন শরীরে পেড়ে শাড়ি পরায়। প্রৌঢ়া হলেও একন পর্যন্ত যৌবনে ভাটা পড়েনি। শরীরের বাঁধন মজবুত। মহিলার প্রেমে পড়ে ছবি খাঁ। প্রথমে তার অনুচরবর্গের কাছে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে। পরে মাতা ও পিতার কাছে। একমাত্র ছেলের ইচ্ছাকে তারা ফেলতে পারে না। রাজি হয়ে যায়। মহিলার সাথে বিয়ে দেয় ছবি খাঁকে। খুব সুন্দরভাবে কাটে তাদের দাম্পত্য জীবন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। একজনের চোখের মণি হয়ে ওঠে অন্যজন। জঙ্গলে এতদিন জংলী জীবজন্তুর সাথে তার জীবন কেটেছে। আর এখন সময় কাটে স্বামীর সোহাগে। পৃথিবীর সব সুখ যেন তাদের সংসারে। অতীতের ঘটনাও তাকে পীড়া দেয় না এখন। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

ভোর রাত। সুঠাম দেহের অধিকারী স্বামী ছবি খাঁ ঘুমিয়ে আছে। ঘন্টাখানেক পরই পাখিরা সকালকে স্বাগত জানাবে। আপন করে দেখছে স্বামীর মুখ। তাকে আদর-সোহাগে ভরিয়ে দেয়। একসময় তার চোখ স্থির হয় ছবি খাঁর ডান পায়ের তলায়।

বুকের মধ্যে ধপাস ধপাস আওয়াজ হয়। গলা শুকিয়ে যায়। কয়েকটি কাক ডেকে ওঠে, পরিবেশটা আরো থমথমে। নিজের কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে মহিলা। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সজাগ হয় ছবি খাঁ। একি, তুমি কাঁদছ কেন?

মহিলা আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

এত রাতে তুমি কাঁদছ কেন! বলো কী হয়েছে, কোনো দুঃস্বপ্ন। কাঁদে না লক্ষ্মীটি। আমার প্রিয়তমা। এ বলেই ছবি খাঁর স্ত্রীর চোখের পানি মুছতে যায়। খপ করে মহিলা তার হাত চেপে ধরে। তুমি এসব কথা বলো না।

কী হয়েছে তোমার? আমাকে খুলে বলো।

তোমার পায়ের তলায় কিসের দাগ?

এটা আমার জন্মদাগ।

জন্মদাগ। আচ্ছা তোমার বাবা, তোমার মা এদের কথা বলো? মহিলার চোখে জিজ্ঞাসু ভাব।

শুনবে। তাহলে শোনো। তখন আমি শিশু। বাল্যকালে ছেলে ধরারা আমাকে অপহরণ করে। আমার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে। তাদের কথা আমার মনে নেই। তারা আমাকে বিক্রি করে দেয় এই ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে, তুমি যাকে আমার বাবা বলে জানো সে আমার জনক নয়। আমার পালক পিতা। আমি আমার আসল পিতার নাম বলতে পারব না।

রমণী শিরে কশাঘাত হানে। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করতে থাকে। একসময় মূর্ছা যায়। বাড়ির সমস্ত লোক জড়ো হয়। এ ঘটনায় সকলে বিহ্বল হয়ে যায়। বাড়ির সব লোক সেবা-শুশ্রূষা করে। সুস্থ হয় মহিলা। ছবি খাঁ আবার জানতে চায়, তোমার কী হয়েছে?

www.pathagar.com

সে আমি বলতে পারব না।

কেন না?

না, পারব না।

পারতে তোমাকে হবেই। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় ছবি খাঁ।

বড়ই সর্বনাশের কথা, বড়ই লজ্জার কথা। এ কথা আমি কোনো মুখে তোমাকে বলি। বাল্যকালে যার কোল থেকে তুমি অপহৃত হয়েছে সে আর কেউ নয়, এই তোমার পাপীয়সী জননী, বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মহিলা।

ছবি খাঁ উঠে দাঁড়ায়। ওপরের দিকে মুখ করে তাকায়। দুহাত তুলে চিৎকার করে, ইয়া আল্লাহ, আমি একি করলাম! একি করলাম! হে খোদা, এ সংবাদ শোনার আগে তুমি আমাকে কেন তুলে নিলে না। পৃথিবীতে এ পাপীর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। এ জঘন্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করবে? পাগলের মতো হয়ে গেল। দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। অজানার উদ্দেশে হাঁটতে থাকে। একসময় হাজির হয় এক ধার্মিক মুসলমানদের কাছে। তিনি একজন ফকির। দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে ফকির জানতে চান, তোমার আগমনের কারণ?

সব ঘটনা খুলে বলে ছবি খাঁ। এক মনে সবই শোনে মুসলমান ফকির। তিনিও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। ছবি খাঁ জানতে চায়, এ পাপ থেকে কি মুক্তি নেই ফকির বাবা!

কোনো জবাব দেন না তিনি।

আবারও একই প্রশ্ন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। একটু মৃদু হাসেন ফকির।

একটা কিছু বলেন, ফকির বাবা?

না, মুক্তি নেই। এ পাপের ক্ষমা নেই। তবে একটা উপায় আছে, তাতে হয়তো কিছুটা হলেও খোদা ক্ষমা করতে পারেন। যেহেতু তুমি অজ্ঞাতেই এ পাপ করেছ। আর এ জন্য তোমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

আপনি বলুন ফকির বাবা!

খোদার আরাধনা করো। আর তোমার সঞ্চিত সব অর্থ জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করতে হবে। তাতে এ জঘন্য পাপের লেশমাত্র লাঘব হতে পারে।

ফকিরের উপদেশ মেনে নিতে রাজি হয় ছবি খাঁ। জীবনের সমস্ত অর্থ সে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করে। স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থনিবাস, মসজিদ, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করে। একসময় তার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়। পরে ছবি খাঁ ফকিরি বেশ গ্রহণ করে এবং মক্কায় গমন করে। সেখানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিল।

ছবি খাঁর ওপরের কাহিনিটি গ্রিক ট্র্যাজেডি ইডিপাসের ক্লাইমেক্সকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যতদূর সংগ্রহ করা গেছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত কাহিনিতে ছবি খাঁ সম্বন্ধে কিছুটা হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে।

ছবি খাঁ একসময় নলচিড়া এসে কুতুব শাহের নিকট রাজস্ব দাবি করে। কুতুব শাহ রাজস্ব দিতে পারলেন না। অসামান্য সাধনা ছিল কুতুব শাহের। ছবি খাঁ তা জানত না। পরীক্ষা করতে চায় কুতুব শাহকে। সে তাঁকে বলল যদি গরম তেলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন তবে রাজস্ব দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

www.pathagar.com

একটা বড় পাত্র ভর্তি তেল। ছবি খাঁর শরীরে ফোস্কা পড়া শুরু করল। সে কুতুব শাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ছবি খাঁ এই অলৌকিক শক্তি দেখে তার মুরিদ হলো এবং তার জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি বন্দোবস্ত করে দেয়। ছবি খাঁ গৈলা ফুলশ্রী গ্রামে বাস করত। লোকমুখে জানা যায়, কসবায় তার শ্বশুরবাড়ি ছিল।

অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী ছিল ছবি খাঁ। না হলে সে সামন্ত ও রাজতন্ত্রের যুগে এত কীর্তি রেখে যেতে পারত না। অদম্য কর্মক্ষমতা দ্বারা বাকলার জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এ ব্যক্তির কোনো জীবন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুধু তার কীর্তিসমূহ অমর হয়ে আছে।

মোগল সুবেদার ছবি খাঁ ও দ্বিগঙ্গা নিবাস কিংকর ভুঁইয়ার পুত্র মদন মোহনকে রাজস্ব আদায়ের জন্য চন্দ্রদ্বীপে প্রেরণ করেন। সতেরো শতকের প্রথম ভাগে ঢাকার সুবেদার ছবি খাঁকে চন্দ্রদ্বীপের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সে পীর-দরবেশের ভক্ত ছিল। সে ঝালকাঠির উদচাড়ার দরবেশ হযরত মোশায়েফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

ছবি খাঁ পূর্তকাজে অসামান্য অবদান রেখেছে। বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে গৌরনদী, উজিরপুর, কোতোয়ালি, মুলাদী ও কোটালীপাড়ায় তার অনেক কীর্তি বর্তমান। তার মধ্যে রাস্তাঘাট, দিঘি, পুল ও মসজিদ প্রধান। ছবি খাঁর রাস্তাগুলো এ অঞ্চলে জাঙ্গাল নামে পরিচিত।

টর্কি বন্দর হতে কসবা, গৈলা, ধামুরা, ওটরা হয়ে রাজধানী মাধবপাশা পর্যন্ত বৃহৎ একটি রাস্তা নির্মাণ করে। বাকেরগঞ্জ হতে ঝালকাঠি, ঝালকাঠি হতে রহমতপুর, শিকারপুর এবং গৈলা হয়ে কোটালীপাড়া পর্যন্ত একটি রাস্তা ছিল। গৈলা গ্রামে ছবি খাঁর তিনটি জাঙ্গাল ছিল। একটি রামদাসের হাটখোলা হতে দক্ষিণে ধামুরা ও ওটরা। একটি পশ্চিমে কোটালীপাড়ার মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে। অন্যটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান গৈলা-গৌরনদী রাস্তা। এই রাস্তাকে নিয়েও আছে লোককাহিনি। রাস্তা নির্মাণ করে ছবি খাঁ রাস্তার দুপাশে সোনার মোহরের কলসি পুঁতে রাখত। সে বলত যার ভাগ্যে আছে সে এই স্বর্ণ পাবে। সেই রাস্তাগুলোর মধ্যে গৈলা-মশাং রাস্তা এখনো আছে। রাস্তাটি টর্কি, কসবা, গৈলা, ধামুরা ও চাখার হয়ে মশাং পর্যন্ত ছিল। একশ বছর আগেও রাস্তাটির পাশ প্রায় পঞ্চাশ ফিট ছিল। এখন বিশ ফিটের বেশি নেই। রাস্তার দুপাশে জনসাধারণ ও সৈন্যদের জন্য পুকুর ও দিঘি খনন করা হয়। একটি দিঘির পাড়ে গ্রাম গড়ে উঠেছে। গ্রামের নাম ছবি খাঁর পাড়। ছবি খাঁ ভুরঘাটা হতে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেন, যার ওপর দিয়ে ঢাকা-বরিশাল সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

ছবি খাঁ সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৈলা গ্রামে থাকতো। এখানে গোলাবারুদ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হতো। তাই গ্রামটির নাম হয়েছে গৈলা। গৈলার পাশেই একটি দিঘি আছে, যার নাম গোলার দিঘি। এখানে দাসের বাড়ির চারদিকে ইটের দেওয়ালের ভিত পাওয়া গিয়েছে। ধারণা করা হয়, দাসের বাড়িতে ছবি খাঁর বাড়ি ছিল। চাঁদশী গ্রামে নির্মিত করিয়ার জাঙ্গাল ও দিঘি আছে। তার নির্মিত রাস্তায় ইট ও লোহার পুল ছিল। গৌরনদী থানার নিকটে একটি ইটের পুল ছিল। একশ বছর আগে পুলটি নদীতে ভেঙে যায়। ঘটেশ্বর গ্রামে ছবি খাঁর নির্মিত একটি ইটের পুল এখনো বর্তমান আছে। সে মহাজিরার দরগায় দিঘি খনন করে। তার সময় শরিকলের কেল্লা হতে নলচিড়া হয়ে

www.pathagar.com

গৌরনদী পর্যন্ত রাস্তা ছিল। সে গৈলা, কসবা, কোটালীপাড়ার মসজিদ নির্মাণ করে। এ এলাকার পুরোনো আমলের সব মসজিদই ছবি খাঁর বলে দাবি করা হয়।

এ এলাকায় প্রচলিত আছে, বাদশাহ ছবি খাঁকে প্রচুর অর্থ দিয়ে জনহিতকর কাজ করার জন্য বাকলায় প্রেরণ করেন। বাদশার অর্থ দিয়ে যে কাজ করে ছবি খাঁ, সব কাজ তাকে স্মরণ করিয়ে রাখে। বাদশা দেখলেন তার অর্থ ছবি খাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, টাকা বাদশাহর, নাম ছবি খাঁর।

রাগান্বিত রাজা ছবি খাঁকে বন্দি করার আদেশ দেন। গৌরনদী থানায় একটি দিঘি আছে। নাম ধরাধরি। অন্ধকার রাত। দিঘির পাড় শুয়ে আছে ছবি খাঁ। গভীর নিদ্রায় থাকা অবস্থায় নবাবের সৈন্যরা তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে বন্দি করে। কথিত আছে, গৈলার মিশ্র বংশের আদি পুরুষ রাম মিশ্র নবাবের সৈন্য ছিল।

সে কৌশলে ছবি খাঁকে ধরিয়ে দেয়। রাজা খুশি হয়ে রাম মিশ্রকে গৈলা গ্রামে ভূমি প্রদান করেন। নবাব ছবি খাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। কিছুদিন পর রাজা তার ভুল বুঝতে পারেন। পরে ছবি খাঁকে মুক্ত করে দেন। তার শেষ জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে সতেরো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিল সে।

নিঃসন্দেহে ছবি খাঁ প্রজাবৎসল শাসক ছিল। মগ, পর্তুগিজদের বিরুদ্ধেও অনেক যুদ্ধ করেছে। এলাকায় প্রবাদ রয়েছে– দুর্গাপাশার জনৈক কবিরাজ তার সাথে মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়। কবিরাজ পুরারীদের নির্দেশ দিল, তার কবুতর যদি ফিরে আসে তবে মনে করতে হবে যে সে পরাজয়বরণ করেছে। যুদ্ধে ছবি খাঁ মগদের পরাজিত করে। কিন্তু হঠাৎ কবুতর ছুটে আসে কবিরাজ বাড়ি। সেই বাড়ির নারীরা তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কবিরাজের দিঘিতে আত্মহত্যা করে। একসময় দূর্গাপাশায় ভবি খাঁর একটি দিঘিও ছিল। আজ আর এ সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না।

নাচমহলে নাচনেওয়ালি

তুর্কিস্তানের অধিবাসী আগা বাকের খাঁ ভাগ্যের অন্বেষণে ভারত আগমন করেছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যে থাকাকালে আগা বাকেরকে ক্রয় করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট তিনি রাজ্য শাসন করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মুর্শিদাবাদে থাকাকালে তিনি আরামবাগে নাচ দেখতে গিয়ে নাচনেওয়ালি খনি বেগমের প্রেমে পড়ে যান। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ জানতে চান আরামবাগের রূপসী নাচনেওয়ালি খনি বেগমের সাথে তার পুত্রের প্রাণের চেয়েও বেশি সম্পর্ক। নবাবের উজির জাহানদার খাঁর ছেলের নাম জয়নুল খাঁ। সে রায়েরকাঠির নায়েব দয়াল দাসের সহযোগিতায় কুলবধূ ও সুন্দরী কুমারীদের হরণ করে তাদের সতীত্ব বিনাশ করত। গোপন বর্গীয় ও মগ দস্যুদের অত্যাচারে সহযোগিতা করত। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এসব কিছুই জানতেন না।

এক সন্ধ্যায়, নাচনমহলে বসে আছেন নবাব। আরামবাগের উদ্যানের নহরে উচ্ছল পানিতে চাঁদের আলো পড়ছে। আলোতে চিক চিক করছে নহরের পানি। মনে হচ্ছে চাঁদের টুকরা ছিটকে পড়ছে। আলোতে চিক চিক করছে নহরের পানি। মনে হচ্ছে চাঁদের টুকরা ছিটকে পড়ছে পানির মধ্যে। বাতায়ন পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ

www.pathagar.com

করেছিরেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ। আস্তে আস্তে চলে আসে নর্তকীর দল। শুরু হলো নাচগানের আসর।

নবাব নর্তকীদের দিকে তাকান। কোথায় যেন শূন্যতা অনুভব করছেন। কী যেন দেখছেন না তিনি। কেদারায় সোজা হয়ে চারদিকে দৃষ্টি দিলেন। একি, দলের সেরা সুন্দরী খনি বেগম নেই! হুঙ্কার ছাড়েন নবাব। জানতে চান, আরামবাগের সেরা সুন্দরী খনি বেগম কোথায়?

নবাবের হুঙ্কার শুনে দৌড়ে আসে খেদমতদার আদিল। নবাবকে কুর্নিশ করে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো উত্তর সাহস পায় না। আবারও হুঙ্কার ছাড়েন নবাব। খেদমতগার মুখ খোলেন। তিনি বলেন, আমি জবাব দিচ্ছি শাহান শাহ, তার সাথে আমার পুত্র হত্যার অভিযোগ।

কিছুই বুঝতে পারলাম না খেদমতদার।

গোস্তাকি মাফ করবেন শাহেন শাহ। বেশ আগে থেকেই শাহজাদা বাকেরের সাথে খনি বেগমের মহব্বত চলছে। আজ ঠিক সন্ধ্যায় গোপনে বাকের খাঁ ও খনি বেগম পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার পুত্র নগর কোতোয়ালী জয়নুল খাঁ তাদের বাধা দিতে গেলে সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারের আঘাতে জয়নুল খাঁর মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করে দেয় আগা বাকের। আমি আপনার দরবারে পুত্র হত্যার বিচার চাই শাহান শাহ্।

তাই হবে। গর্জে ওঠেন নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ। প্রাণাধিক বাকেরের জন্য একটুও অনুকম্পা হয়নি তার। নিরাপরাধ নগররক্ষী কোতোয়ালীকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ তিনি বাকের খাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। প্রেম হৃদয়ের ব্যাপার। প্রেমের বিষয়, খানদান বড় কথা নয়। নবাব এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু অকারণে নরহত্যা? বাকের ও খনি এখন কোথায়? নবাব জানতে চান।

তাদের বন্দি করা হয়েছে শাহান শাহ্। আপনি যদি আদেশ করেন এ মুহূর্তে তাদের হাজির করতে পারি। নবাব আদেশ দিলেন দুজনকে দরবারে হাজির করতে। এ কথা বলেই নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ চলে যান। দরবারগৃহে উপস্থিত করা হলো বাকের খাঁ ও খনি বেগমকে। শুরু হয় বিচার।

বাকের! তুমি কি এই নাচনেওয়ালি খনি বেগমের প্রেমাসক্ত?

জি হ্যাঁ, শাহান শাহ্।

তুমি কি রাতের অন্ধকারে খনি বেগমকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

জি না, শাহান শাহ্।

পথিমধ্যে তোমার যাত্রায় বাধা দিলে নগর কোতোয়াল জয়নুল খাঁর মুণ্ডু তোমার অসির আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়নি?

সব মিথ্যে কথা শাহান শাহ্। জয়নুল খাঁ খনি বেগমের সতীত্ব বিনাশের চেষ্টা করে। আমি তাতে বাধা দিই। যুদ্ধে আমার সাথে সে পরাজয় বরণ করে। আমি তাকে হত্যা করিনি। আর আমরা যে রাতের আঁধারে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, এ অভিযোগও সত্য নয়।

হ্যাঁ শাহান শাহ্, আমরাও তাই দেখেছি। শাহাজাদার কোনো দোষ নেই। আদিল খাঁ বলল। কিন্তু আপনি যে বললেন জয়নুল খাঁ বাকেরের অসির আঘাতে প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

হ্যাঁ শাহান শাহ্, তা সত্যি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি। আর এ সত্য আরো প্রমাণিত হয়, কাল রাতে জয়নুল প্রাসাদে ফেরেনি।

নিঃশ্বাস ছাড়েন নবাব, তাই বলুন। খারাপ চরিত্র ধারণ করার জন্য জয়নুলের অন্য শাস্তি হতে পারত। কিন্তু তার তো আর প্রাণদণ্ড হতো না। আমার ছেলে হলে কী হবে! আমি ন্যায়বিচারই করব। বাকেরকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য শাস্তি পেতে হবে। তাকে খাঁচায় রক্ষিত বাঘের মুখে প্রাণদণ্ড দেব।

বড় নির্মম বিচার শাহান শাহ্। কিন্তু আমার বিচার? কেঁদে ওঠে খনি বেগম।

তুমি নাচনেওয়ালি। যতদিন বাঁচবে এই রংমহলেই নাচবে। খনি বেগমের কথার উত্তর দিয়েই নবাব চলে যান অন্দরমহল। সেখানে গিয়ে শয্যায় ঢলে পড়েন।

পরদিন সকালবেলা। উন্মুক্ত মাঠ। চারদিকে লোক থৈ থৈ করছে। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বিরাট একটা বাঘের খাঁচা আনা হলো। তার মধ্যে একটি বিরাটকায় হিংস্র বাঘ। এখনই বন্দি শাহজাদাকে নিক্ষেপ করা হবে বাঘের মুখে। একজন উদারমনের মানুষ বাকেরের এ করুণ অবস্থা দেখতে এসেছে হাজার লোক। সবার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে টপটপ করে। বাকেরকে আনা হলো। তার শৃঙ্খল খুলে দেয়া হলো। উন্মুক্ত মাঠে নিস্তব্ধ পরিবেশ বিরাজ করছে। মনে হয় চারদিকের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। খনি বেগম শাহজাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে সাহস জোগায়। আমি জানি, তুমি খাঁচার বাঘকে মেরে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসবে। তোমার সামান্য ক্ষতি হবে না। আমি তোমাকে ফিরে পাবো। কাঁদছে না খনি বেগম। চোখে-মুখে তার দৃঢ়তার ছাপ। করুণ দৃষ্টিতে কিছু সময় একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে খাঁচার দিকে এগিয়ে যায় বাকের। বাঘে-মানুষে যুদ্ধ হয় খাঁচার মধ্যে। বাঘের থাবায় জখম হয় বাকের। তার পরও একটুও ক্লান্তবোধ করে না। লড়ে যাচ্ছে প্রাণপণে। একসময় হার মেনে যায় বিরাটাকায় বাঘটি। বাকেরের হাতের আঘাতে প্রাণ হারায় শক্তিশালী বাঘ।

বাকেরের এ বিজয়ে আরামবাগজুড়ে আনন্দধ্বনি হতে থাকে। আদিল খাঁ এসে মালা পরিয়ে দেয় বিজয়ী বাকেরের কণ্ঠে। দৌড়ে আসেন নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ। পালিত পুত্রের বিজয় দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। বুকে জড়িয়ে নেন বাকেরকে। এতসময় ধরে যুদ্ধ করে ক্লান্ত দুচোখ খোঁজ করছে খনি বেগমকে। জানতে চান, খনি কোথায়? আমার খনি কোথায়?

খনি বেগম তার মহলেই আছে। এখানে দাঁড়িয়ে আপনার মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না। তাই মহলে চলে গেছে। আদিলের কথা শুনে মৃদু হাসে বাকের। মুর্শিদ কুলি খাঁ বাকেরের হাত চেপে ধরে। চলো বাকের। আমিও খনির কাছে যাবো। খনির হাতে তোমার হাত মিলিয়ে দেব। খনি আমার পুত্রবধূ হবে। এই বলে সবাই মহলের ভেতর প্রবেশ করে।

খনি বেগম নেই। কোথায় গেল খনি বেগম। সবাই অবাক হয়ে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়।

খনি তুমি কোথায়? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বাকের।

ধৈর্য হারাবে না, আমার গর্বিত পুত্র। আশ্বাস দেন নবাব।

মেঝেতে একখণ্ড চিরকুট খুঁজে পায়। সেটি তুলে নেন নবাব। চিরকুটটি তাকে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য করে লেখা। লিখেছে আবার জয়নুল। নবাব অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। মিথ্যাবাদী জয়নুল তাহলে এখনো বেঁচে আছে। তার মৃত্যুসংবাদটি বানোয়াট? বাকেরকে মৃত্যুদণ্ডের কবলে ফেলে জয়নাল মুর্শিদাবাদের তখত এবং খনি বেগম দুটোই লাভ করতে চায়? বাকের বাঘের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে ওঠায় খনিকে অপহরণ করে সে পালিয়ে গেছে।

কুলাঙ্গার, বেইমান। তোকে আমি নিজ হাতে খুন করব। উত্তেজিত হয়ে মহল থেকে বেরিয়ে যান জাহানদার খাঁ।

আমিও চললাম খনিকে উদ্ধার করতে। এ কথা বলতেই নবাব জিজ্ঞেস করে, কোথায় খোঁজ করবে খনি বেগমকে?

জয়নুল এর মধ্যে হয়তো মগ বর্গীদের আস্তানা ভাটি অঞ্চলের গভীর অরণ্যে খনিকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমরা সেই গহীন অরণ্যে যাব। তাদের খুঁজে বের করবই আব্বা। অশ্ব নিয়ে দ্রুত ছুটে চলে আগা বাকের খাঁ। তার পেছনে ছুটছে কালাগাজী খাঁ। সাথে রয়েছে বিরাট সেনাবাহিনী ও জাহানদার খাঁ। চলে যান ভাটি অঞ্চলে। একসময় গহীন অরণ্যে খোঁজ পেলেন তাদের। দুদল সামনাসামনি হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। পরাজিত হয় মগ ও জলদস্যুরা। কিন্তু খনি বেগম জয়নুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে তাদের।

বিরাট জঙ্গল। দস্যুদের আস্তানা। একটি নিঝুম প্রকোষ্ঠে বন্দি খনি বেগমের আর্তচিৎকার শুনে চুপি চুপি এগিয়ে যান জাহানদার খাঁ। অন্ধকারে পা টিপে হাঁটছেন তিনি। তার পেছনে রয়েছে বাকের খাঁ। বৃক্ষের আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন। সেখান থেকেই শোনা যায় কথোপকথন।

এখনো সময় আছে সুন্দরী। আমার সাথে পালিয়ে আরাকান চলো। তোমাকে আমি রাজরানী করে রাখব। আর আমার প্রস্তাবে যদি রাজি না হও তাহলে এই বিষাক্ত সাপের ছোবলে তোমার প্রাণ বিনাশ করব। ডান হাতে ধরা বিষাক্ত সাপটি নিয়ে খনি বেগমের কাছে এগিয়ে যায় জয়নুল। খনি বেগম শিউরে ওঠে।

তুমি আমাকে খুন করতে পারো, সেটা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আমি এ প্রাণ রাখতে চাই না। তুমি আমায় খুন করো।

তাহলে ধরা দেবে না সুন্দরী?

তুমি সর্প দিয়ে আমাকে দংশন করাতে পারো। তলোয়ারের আঘাতে আমার শরীর ছিন্নভিন্ন করে এই গহীন অরণ্যে হিংস্র প্রাণীদের খাইয়ে দিতে পারো। তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এ প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারবো না, শয়তান। জয়নুল একটু দূরে সরে দাঁড়ায়।

তোমাকে খুন করার ইচ্ছা পোষণ করলে আগেই করতে পারতাম। সে ইচ্ছে আমার নেই। তবে তোমাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি খনি বেগম। পাগলের মতো ভালোবাসি। তুমি আমার প্রেমের খনি। চোখের মণি। আমার সাথে চলো, খনি।

এ জীবন থাকতে আমি তোমার সাথে যাবো না, বেইমান।

দাঁত কটমট করে ওঠে জয়নুলের। রাগে মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায়। হাতে ধরা বিষধর সাপ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় জয়নুল। ভারী কণ্ঠে উচ্চারণ করে, এ জীবনে তোমাকে আমি যদি না পাই, অন্যের ভোগের জন্য তুমি বেঁচে থাকবে সে আমি

www.pathagar.com

হতে দেব না। মৃদ্যু পায়ে হেঁটে এসে সাপটি মুখের কাছে ধরে জয়নুল। প্রচণ্ডবেগে চিৎকার করে ওঠে খনি বেগম। তার আর্তচিৎকারে সমস্ত বনভূমি যেন কেঁপে ওঠে।

যখনই সাপ দংশন করতে যাবে খনিকে, তখনই জাহানদার খাঁর তীক্ষ্ণ তলোয়ার বিদ্ধ হয় পুত্র জয়নুলের বুকে। পেছন ফিরে তাকায় জয়নুল। বিষাক্ত সাপের ছোবল এসে পড়ে জয়নুলের বুকে।

খনি বেগম এখনো অক্ষত। গলার স্বর আড়ষ্ট হয়ে যায় জয়নুলের। আস্তে আস্তে বলে ওঠে, এ জীবনে তোমাকে যখন নাই পেলাম খনি বেগম তবে তুমিও আমার সহযাত্রী হও। এ বলে হাতের সুতীক্ষ্ণ তরবারি বসিয়ে দেয় খনি বেগমের বুকের ওপর। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খনি বেগম।

উজির জাহানদার খাঁ পুত্রের কীর্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। নিজেকে প্রচণ্ড অপরাধী মনে করেন তিনি। বুঝতে পারলেন স্বীয় পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাকে সর্পে দর্শন করে। এ কলঙ্কিত মুখ তিনি কাউকে দেখাতে চান না। বাধ্য হয়ে জাহানদার খাঁ আত্মঘাতে প্রাণ বিসর্জ দেন।

দ্রুত বেগে ছুটে আসে অশ্ব। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বাকের। খনির কোমল দেহখানি কোলে তুলে নেয়। বাকেরের কোলে মাথা রেখে খনি বেগম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করে, অল্প সময় পরই আমার জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে। আমি আর বাঁচব না। শাহজাদা, বড়ই কষ্ট। বড় দেরি করে ফেলেছেন। এসেছেন যখন আর একটু আগে আসতে পারলেন না! যন্ত্রনায় খনি বেগমের কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। তখনো ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে খনি বেগমের বুক থেকে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে তার।

প্রিয়তমার মুখের দিকে চেয়ে আছে শাহজাদা। দুচোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বৃক্ষের পাতারা লজ্জায় নুয়ে যাচ্ছে। নদীর কল্লোলধ্বনি কেমন করুণ সুরে বাজছে। সমস্ত বনভূমিতে যেন শোকের ছায়া নেমে আসছে। কাঁদতে পারছে না শাহজাদা। দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে খনি বেগমের মুখের ওপর। আবারও ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে উচ্চারণ করে খনি বেগম, কাঁদবেন না শাহজাদা, এ জীবনে আপনার সাথে আমার মিলন হলো না। জীবন সাগরে ওপারে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। সেখানে আমাদের মিলন হবে। কথা বলতে বলতে বলে ওঠে, ইয়া আল্লাহ্। শেষবারের মতো এ উচ্চারণ করে চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় খনি বেগম।

খনি বেগমের মৃত্যুতে পাগলের মতো হয়ে যায় আগা বাকের খাঁ। যে অরণ্যের ছায়ায় খনি বেগমকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে গিয়ে সে শুয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদের শাহী তখতের মালিকানা ত্যাগ করে বাকের খাঁ ভাটি অঞ্চলেই থেকে গেল। মগ বর্গীয় দস্যুমুক্ত করে এ অঞ্চলটিকে মুর্শিদ কুলি খাঁ আগা বাকের খাঁকে দিয়ে যান। তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় বাকেরগঞ্জ।

ইংরেজরা ১৭৯৭ খ্রি. আগা বাকেরের নামানুসারে বারগঞ্জ জেলা সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, আগা বাকের একবার ঢাকা থেকে বাকেরগঞ্জ আসবেন। তিনি এমন খাবার তৈরি করতে বলেন যা লোনা আবহাওয়ায় নষ্ট না হয়ে যায়। তার কথা মতো অনেক দিন টিকে থাকার জন্য ঢাকার বেকারিগুলো এক প্রকার রুটি তৈরি করে দেয়। বাকের খাঁ ও খনি বেগমের নামের মিশ্রণে সেই রুটির নাম রাখা হয় বাকেরখনি। এই

www.pathagar.com

রুটি ঢাকায় এখনো বেশ সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। বিশেষ করে পুরান ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ খাবারের মধ্যে বাকেরখনি একটি।

কুঁড়িয়ার কাহিনি

এক দেশে এক মাতারী আছিল। হেই মাতারীর এক পোলা আছিল। পোলায় আছিল একটু কুঁইড়্যা। অরা আছিল খুব গরীব। অর মায় কোনো রহম খরাত-টরাত কইর‍্যা আনে, ঐয়া দিয়া কোনো রহম খায়।

তহন একদিন অর মায় কয়, তুই মাইনষের বাইত গিয়া গরু-টরু রাইখ্যাও ত দুগগা ভাত খাইত পার। আমি আর কত তোরে খরাত কইর‍্যা খাওয়াইম।

তহন অয় এক বাইতে গিয়া গরু-টরু রাখে আর খায়। এইভাবে এক দেড় বছর গেল। তনে একদিন ঐ গরু লইয়া একটা বাগানের মইদ্যে গেল ঘাস খাওয়াইতে। তহন অয় চাইয়া দ্যাহে কি, একটা অজগর হাপ আইতে আছে। ঐয়া দেইক্যা অয় ওরে কি করব না করব ঠায়র পায় না। তহন চাইয়া দ্যাহে এক গারলী সাপটারে দৌড়াইয়া আইতে আছে। যখন হাপটা অর সামনে আইল, তহন আল্লাহর হুকুম মতো হাপটার যবান খুইল্যা গেল। তহন হাপটায় অরে কয়, ভাই তুই আমারে বাঁচা।

তহন অয় ডরের চোডে কয়, এইডা কি হাপ না অন্য কিছু। হাপ আবার কথা কয়। হাপটায় আবার কইল, ও বাই, তুই আমারে বাঁচা, তোরে এমন একটা জিনিস দিম তুই বইয়া বইয়া খাইতে পারবি। তোর কোনো কাম করন লাগব না। তানে অয়' কয়, কেমনে তোমারে বাঁচাম?

তহন হাপটায় কয়, তোর গরুর দড়িগুলি পেঁচাইয়া রাখ আমি বিড় পাহাইয়া থাহি। তুই দড়িগুলি আমার ওপর দিয়া বইসা থাক।

তহনে হাপটায় বিড় পাহাইল। অয় দড়িগুলি দিয়া হাপটার উপরে বইল। যহন গারলী আইয়া জিগায় যে, এহান দিয়া একটা অজগর যাইতে দেখছত, তহন অয় কয়, অজগর-টজগর আমি চিনি না। তহন গারলী চলিয়া গেল। তহন হাপটায় জিগায়, ভাই কতদূর গেছে। তহন অয় কয়, বেশি দূরে যায় নাই। তনে আবার জিগায়, কতদূর গেছে। তহন অয় আবার কয়, অনেকদূর গেছে। তনে হাপটায় কয় এ্যালা তুমি ওড।

তহন অয় উঠল। তহন হাপটায় কয়, তুই আমার লেংগুর দইর‍্যা টান দে। যত জোরে পারছ। দেখবি একটা আনডি পড়ব, ঐ আনডিডারে যা কবি হেয়াই ঐব। আর হেইয়ায় করিয়া দিব। এই কথার পর অয় হাপটার লেংগুর ধরিয়া দিল টান। টান দেয়ার লগে লগে একটা ছিরি আনডি লেংগুর তনে বাইর ঐয়া আইসা পড়লো। তনে হাপটায় গেল গা। অয় আনডি লইয়া গেল গা। তানে অয় মনে মনে চিন্তা করে যে আনডিডা আনলাম, কিন্তু দেখলাম না কি অয় না অয়। তহন আনডিডা কয়, ভাই আমি এহন তোমার। তুমি যা কও হেইয়াই আমি করতে রাজি।

তহন অয় একদিন বাইত গিয়া আর মারডে কয়, মা এই ব্যাপার। তহন অর মায় কয়, হেইলে একদিন জিগাইয়া দেখ না।

তহন দিন গিয়া রাইত ঐল। তহন অয় কয়, বাই আনডি আগে আছিলে ক্যের? বোলে আগে আছিলাম অজগরের। কলে, এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে আমি ত

www.pathagar.com

গরিব মানুষ। আমারে কিছু টাহার যোগাড় করিয়া দেও। তহন আংডিডায় কিছু টাহা আনিয়া দিল। অয় এই টাহা দিয়া চাউল-পাত আনল। আর কিছু গরু-ছাগল কিনিয়া আনল। এই রহমভাবে আছতে আছতে অর আবছ্তা বাল ঐয়া গেল।

তহন একদিন কয়, বাই আনডি আগে আছিলি ক্যের? বোলে, আগে আছিলাম অজগরের। বোলে এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে, আমার বাইতে ঘর দরজা, কাচারী, পুস্করিণী কাটাইয়া বাশ্শার বাড়ির মতো করিয়া দাও।

তহন আনডিডায় সব করিয়া দিল। এইয়া দেইখ্যা মাইনষে কয়–আরে অয় আছিল কি গরিব। এহন অর বাইতে এত কিছু ঐল কেমনে? তহন অয় একদিন চিন্তা করে, আল্লায় যা করে বাশ্শার মাইয়া বিয়া করুম। এই চিন্তা কইর‍্যা অয় ঘটক বিচরাইতে লাগল।

তহন ঐ দ্যাশে আছিল এক আরবান আলী কইরা নাম, খুব নামকরা ঘটক। তহন অয় একদিন ঐ ঘটকের কাছে গেল। গিয়া কয়–ভাই আরবান আলী, তুমি একটা কাজ করবা? তহন ঘটক কয়, কি কাজ? অয় কয়, রাজার মাইয়া বিয়া করুম, তুমি ঘটকালি করবা।

তহন ঘটক হুইনা কয়, আরে ভাই তোর মাথা খারাপ ঐছে? তহন অয় কয়, কি কও রাজার মাইয়া বিয়া করুম–এইডা মাথা খারাপ কি? তুমি যাও। ঘটক কয়, ভাই যাইমও ঠিকই। রাজায় আবার কোনডা কয় না কয়। তানে অয় কয় যা কইব হেইয়াতেই রাজি ঐবা। তহন ঘটক মনে চিন্তা করে, অয় কি কিছু পাইছে টাইছে নাকি কে জানে? তানে ঘটকে কয়, ঠিক আছে যাইম।

তহন একদিন ঘটক বাশ্শার বাড়ি গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের খান্দান আমার গর্দান। আমি আমনের মাইয়ার বিয়ার ঘটকালি লইয়া আইছি। তানে রাজায় কয় ক্যের লগে? তহন অয় কয় এ কুঁইড়ার লগে। বাশ্শায় হুইনা রইছে চাইয়া। অয় ত ডরে কাঁপতে আছে। তহন বাশ্শায় কয়, তুমি যাও, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেহি।

এই কথা হুইন্যা অয় মনে মনে চিন্তা করে, আই ত বাঁচলাম। অয় কাঁপতে কাঁপতে রাস্তা দিয়া আইতে আছে। এদিকে অয়ও পথের দিগে চাইয়া রইছে। যহন অর সামনে আইল তহন জিগায়, কি খবর ভাই আরবান আলী? তহন অয় কয়, ভাই আইজ ত বাঁইচ্যা আইছি। আর কোনো দিন ঐ কইবা না।

তহন অয় কয়, আরে বেডা কি ঐছে, এত ডরাস কেয়া? তহন অয় বাইত গেল গা।

চাইর পাঁচ দিন যাওয়ার পর একদিন রাজায় কয়, আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি এক শর্তে। আমার বাড়রি তনে অর বাড়ি তমাইত যদি টাহা, আটআনা, সিহি দোয়ানীদিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি। এই কথা হুইনা আরবান আলী–

হের পাঁচ-ছয় মুরছা নি খাইয়া
আরবান আলী রইছে চাইয়া
খোদার আছে কাম
আল্লাহর আছে মর্জি

www.pathagar.com

তে পথে বইয়া রইছে
কাছা ছাড়া দরজি।

এহন আরবান আলী আডে আর চিন্তা করে, এইয়া অয় পারব না, আর রাজার মাইয়াও বিয়া করতেও পারব না। আরবান আলী ত আধামরা কোনো রহম আঁটিয়া আছ। এক পাও আউগায় এক পাও পাউছায় আর এদিগে অয় রইছে চাইয়া। দ্যাহে আরবান আলী কাঁপতে খাঁপতে আইতে আছে। যহন সামনে আলি, কিরে ভাই তোর অইছে কি? তহন অয় কয়, আর কইয়োনা ভাই, রাজায় যা কইছে হেইয়া তুই পারবি না। তহন জিগায় আরে কি ঐছে ভালো করিয়া ক দেহি। হেরপর অয় কইতে আছে–রাজায় কইছে যদি এই সমবার তনে-শুক্কুর বারের মইদ্যে হ্যের বাড়ি তনে তোর বাড়ি তমাইত টাকা আধুলী সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে পারলে হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব।

তহন অয় হুইনা কয়, এ্যার লাইগ্গা এত চিন্তা করছ? অয় মনে মনে চিন্তা করে, অয় এইয়্যা কেমনে পারব?

কুঁইড়্যায় করল কি, বাইতে গিয়া আনিডর কাছে জিগায় হে, আনডি আমারে রাজার বাড়ির তনে আমার বাড়ি তমাইত টাহা-আধলা সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে ঐবে। তহন আনডিতে কয়, এইয়া মাত্র এক দিনের কাম। গটনী হুইনা মূর্ছা খাইয়া পইড়া গেল। এদিকে যহন সমবার দিন গিয়া রাইত ঐল, হেরপর দুইডা লোয়া লইয়া ঘষা দেওয়া মাত্র কতগুলি দেও-দানব আইয়া পড়ল, আইয়া কয় মহারাজ, কিসের জইন্য আমাগ বোলাইছেন? তহন অয় কয় যে, আমার বাশ্শা বাড়ি তনে আমার বাড়ি তমাইত টাহা-আধলা সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে ঐবে। তহন অয় কয় যে, মহাশয় এইয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের কাম।

এক রাইতের মদ্যে রাস্তা বান্দা ঐয়া গেল। ব্যাহানে দ্যাহে যে রাস্তা বান্দা কমপিলিট, তহন বাশ্শায় মনে মনে চিন্তা করে যে অয় আমার মাইয়া নিব।

তহন উজিরেরে বোলাইয়া কয়-উজির এহন কি করি। উজির কয়, মহারাজ, এহন তমাইত কি ঐল। এদিকে আরবান আলী দেইখ্যা ত মহা ফূর্তি। এইবার বাশ্শায় মাইয়া না দিয়া যাইব কই? আহাদিনও যেইমনে যাউক আর না যাউঁক।

আইজজ আরবান আলী যান আর পথের দিকে চান,
বাশ্শার বাড়ি গিয়া দিল দরশন।

গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের খান্দান আমার গর্দান। মহারাজ, বিয়ার তারিখ দেন। মহারাজে কয়, এই আরবান আলী, এত হক্কালে কি ঐল।

তহন আরবান কয়, কি ঐছে মহারাজ আমনে যা কইছেন হেইয়াই ত করছি।

তহন বাশ্শায় কয়, আরবান আলী আর একটা কথা। আমার বাড়ি আর অর বাড়ির মধ্যে একটা সরবরী কাডাইয়া হেইয়ার মইদ্যে দুধ দিয়া পাজাই করা লাগব। যদি এইয়া পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে রাজি আছি।

আরবান আলী এই কথা হুইন্না গেছে আধা মরা ঐয়া। কোনো রহম এক পাও দুই পাও করিয়া বাশ্শার বাড়ি তনে বাইর ঐয়া রাস্তায় আইয়া পড়িয়া গেল। এদিগে কুঁইড়্যায় চাইয়া দ্যাহে আরবান আলী রাস্তায় পইড়া গেছে। তহন অয় দৌড় দিয়া গিয়া

www.pathagar.com

কচুপাতা করিয়া পানি আনিয়া অর মাথায় দিয়া জিগায়, কি আরবান আলী কি খবর? তহন কয়, আর কইছ না, এই আমিও গেছি আর তুইও গেছত।

আরে বেডা কি ঐছে ক দেহি। তহন অয় কয়, বাশ্‌শায় কইছে তোর বাড়ি আর বাশ্‌শার বাড়ির মইধ্যে সরবরী কাডাইয়া হ্যের মধ্যে দুধ দিয়া ভরাইয়া দিতে ঐব। হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব। এই কথা হুইনা অয় কয়, আরে বেড্যা এইয়ার লাইগ্‌গা এত কি চিন্তা করছ?

তহন আরবান আলী মনে মনে চিন্তা করে, টাহা-পয়সা হয় অইল। কিন্তু এত দুধ পাইব কই? থাকতে পারে তার কাছে টাহা-পয়সা কিন্তু দুধ পাইব কই? তহন অরে হইয়া বাইতে আইয়া গরম ভাত খাইয়াইয়া থুইছে হোয়াইয়া। তহন অয় আনডির কাছে কয়, এহন কি উপায়? তহন আনডি কয়, কি চিন্তা কর এই কথা হুইনা? আল্লাহর নাম লইয়া বিহানে উইট্যা আরবান আলী দুগগা ভাত খাওয়াইয়া দিল বাশ্‌শার বাড়ি পাডাইয়া।

আস্তে আস্তে যায়, আরবান তুড়িতে গমন
বাশ্‌শা বাড়ি গিয়া দিল দরশন।

বাশ্‌শায় কয়, মহারাজ তারিখ দেন কবে সরবরী কাডাইম। তহন বাশ্‌শায় কয়, আগামী শুক্কুরবার ঐতে সমবারের মইদ্যে। এই কথা আরবান আলী কইল পর অয় রাইতে শ্রী আনডিরে কইল। এহন কি করি। তহন আনডি কয়, আমার কাছে কিনু না। শক্তি আমনের কাছে। তহন অয় ঐ লোহা দুইডা ঘষা দেওয়া মাত্র যত দেও দানব আইসা কয়, মহারাজ কি করতে ঐব। তহন অয় কয় রাজার বাড়ি আর আমার বাড়ির মইদ্যে একটা সরবরী কাডাইয়া দুধ দিয়া ভরতে ঐব। এই কথা হুইনা কয়, মহারাজ এইয়া এক রাইতের কাম আমনে আমাগ লইগ্‌গা দুগ্‌গা খৈর যোগাড় করেন। এই কথা কইয়া অরা লাইগগা গেল সরবরী কাটতে। অর্ধেক রাইতের মইদ্যে সরবরী কাটা শ্যাষ কইর‍্যা আইয়া কয়, মহারাজ দেন দেই দগ্‌গা খই-টই খাইয়া লই। তহন খাই আবার ম্যালা করল দুধ আনতে। হারা দেশে যত গাই আছিল সব দুধ দোয়াইয়া আইনা সরবরীতে হালাইল।

দুধে সরবরী ভইর‍্যা ঢেউর চোডে কাঁচার উপরে দিয়া পইর‍্যা যায়। যহন ব্যাহান ঐল তহন বাশ্‌শায় চাইয়া দ্যাহে–কুঁইড়্যার বাড়ি দেহা যায় না। সরবরীর কাঁচ এত উঁচা। বাশ্‌শায় উজিরেরে বোলাইয়া কয় উজীর, কেমন ঐল মাইয়া ত এইবার দিয়া দেয়ান লাগব। এদিকে আরবান আলী ঘোমের তন উট্যা দেহে বাশ্‌শার বাড়ি দেহা যায় না। তহন অর কাছে জিগায়, এইয়া করছত কি? তহন অয় কয়, আরে ব্যাডা কথা কইছ না। তারা তমোইতে বাশ্‌শার বাড়ি যা। অয় বাছ দুগ্‌গা গরম ভাত নি খাইয়া বাশ্‌শার বাড়ি ম্যালা করল। আস্তে আস্তে যায় আর আল্লার নাম লয়। গিয়া কয়, মহারাজ মাইয়া দেন, বিয়ার দিন তারিক ঠিক করেন।

বাশ্‌শায় কয়, আরে আরবান আলী, তুমি যাইয়া কও আমার মাইয়ারে এই গেরামডা লেইখ্যা দিতে ঐব। তহনে অয় কয় মহারাজ, এহন এইয়া কন আগে, আগের কাম কন পরে, পরের কাম আগে। এইয়া তো মোডে একদিনের কাম। বাশ্‌শাও আইজ আর বেশি রাও-চাও করে না। আরবান আলী আইয়া কয়, এই রহম কইছে বাশ্‌শায়। অয় হুইন্যা কয়, আরবান আলী কিন যতো টাহা লাগে। এক টাহারডা দশ টাকায় কিন। অয় বাছ রাইতে শ্রী আনডিরে কয়, আমারের টাহা আইন্যা দেও। হেরপর দিন কিনা ধরল। কিনতে কিনতে দুই

www.pathagar.com

তিন গেরাম কিইন্যা হালাইলে আরবান আলীরে কয়, বাশ্‌শার বাড়ি তারিখ ঠিক কইর‍্যা আহ। আরবান যাইয়া তারিখ লইয়া আইল। আগামী শুক্কুর বার দিন বিয়া। আগামী শুক্কুর বার আইল আর বাশ্‌শার বাড়ি বিয়ার ধোম-ধাম আরম্ভ ঐয়া গেল। বিয়া-শাদী ঐয়া গেল। হউর বাড়ি বেড়াইতে আছে। তহন একদিন দ্যাহে কোলপাতের পোলার লগে কন্যার ছিল ভালোবাসা। হারাদিন একটা বাক্সের মইদ্যে রাহে। আর রাইতে কথা কয় আলাপ সালাপ করে। এইয়া নি অয় দেইখ্যা পরদিন ব্যাহানে গিয়া কয়, মহারাজ–এত দিন ত বেড়াইলাম, এহন আমারে বিদায় দেন, বাইত যাই। তহন বাশ্‌শায় কয়, ঠিক আছে যাও। তহন পালকি টালকি আইনা রেডি করল।

তহন অয় কয়, মহারাজ আমার একটা কথা। কি কথা? আমারে এই বাক্সডা দেয়ন লাগব। বাশ্‌শায় কয়, একটা বাক্স নিবা হেইয়া আবার জিগান লাগে। তহন ঐ বাক্সডা লোকজন দিয়া অর বাইতে পাডাইয়া দিল। আর কন্যারেও পালকি দিয়া পাডাইয়া দিল। তহন অর বাইতে থাহে। একদিন কন্যায় কয়, আমনের আতে ঐ যে একডা আনডি, ঐ আনডিডা আমার আতে দিন। বাশ্‌শার মাইযায় ত দেইখ্যা চিনছে। তহন এই রহম দুই-তিন দিন কাইশ্বে মত-অয় বাছ থুইয়া দিল। তহন একদিন রাইতে মনে মনে কন্যায় চিন্তা করে এই আনডিডা ঐ কোনো কিমমতি আনডি, আমার জীবনেও এই রহম আনডি দেহি নাই। আমার বাহে বাশ্‌শা, হের আতেও এই রহম আনডি দেহি নাই। দেহি একটু পরীক্ষা করিয়া। তহন অয় জিগায় আনডি আগে আছিলো ক্যের?

কয় যে কুঁইড়্যার। এহন? এহন আমনের। তহন কন্যায় বুঝল যে, এইয়ার মইদ্যে কিমমতি আছে। তহন কোতপালের কাচে কয়–আমারে কুঁইড়্যার কাছে বিয়া দিছে কিন্তু কুঁইড়্যার নামডা ত আর ডাহে না। লও, তুমি আমি এই দ্যাশ ছাইড়্যা চইল্যা যাই। আসল জিনিস পাইছি। অয় বাছ কলল কি, আনডিরে কইল, আনডি আগে আছিলা ক্যের? কয় কুঁইড়্যার। বোলে এহন ক্যার? কয় যে এহন আমনের। বোলে আমার ঐলে এই দেশর তনে গিয়া তেরছা মুল্লুকে-ঘরবাড়ি দালান কোডা কইর‍্যা দিবি। এই কতা কইছে মতন অগ ঐ মুল্লুকে নিয়া দিল। আর দালান-কোডা কইর‍্যা এইককারে ফিটফাট কইরা দিবি।

এদিগে ব্যাহানে উইট্যা অয় বউ টউ কিছুই দ্যাহে না। আর বাক্সর মইদ্যে কোতয়ালের পোয়ারেও দেহে না। তহন দৌড় দিয়া আরবান আলী কাছে গিয়া কয়, ব্যাডা এহন কি করি। আরবান আলী কয়, এইয়ার ব্যবস্থা আমার কাছে নাই। অয় এহন মাথা খারাপের মতো করতে আছে, বাশ্‌শায় হুইনা কয়, আমার মাইয়া কি করছে, আমার মাইয়া দিতে ঐব। এইভাবে কয়েকদিন গেল। অয়, এহন পাগলের মতো ঘোরে। একদিন কিছু টাহা পয়সা লইয়া ম্যালা করছে। তহন যাইতে দ্যাতে কতডি ছ্যামড়া। একটা উনদুর দইর‍্যা মারতে আছে।

তহন অয় গিয়া কয়, কিরে ছ্যামড়ারা, তোরা এই উনদুরডারে মারছো কেয়া? এইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালা। তন অরা কয় কি, উনদুর কিনবা?

অয় কয়, কত দাম চাছ? তহন অগ মইদ্যে এক ছ্যামড়ায় আছিল চালাক, কয় একশ টাহা দিবেন। অয় একশ টাহা দিয়া উনদুরডা কিইন্যা আবার ঐ হানতন ম্যালা করল। যাইতে যাইতে আবার দ্যাহে কি, এক ব্যাডায় একটা লুইমা বিলাই দইর‍্যা মারে। এইয়া অয় দেইখ্যা কয়, এই মিঞা এইভাবে বিলাইডারে মারেন কেয়া? বিলাইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালান।

www.pathagar.com

কয় টাহা দামন চান? ব্যাডায় কয়, একশ টাহা। তহন অয় একশ টাহা দিয়া বিলাইডারে কিইন্যা আবার ঐ হান তনে ম্যালা করল। আবার যাইয়া দ্যাহে কতডি ছ্যামড়া একটা কুত্তা দৌড়াইতে আছে। অয় এইয়া দেইখ্যা কয় কিরে ছ্যামড়ারা, তোরা কুত্তাডারে দৌড়াছ কেয়া? আমার কাছে বেইচ্যা হালা। কয় টাহা দাম চাছ? তহন তারা কয়, একশ টাহা দিবেন। আবার একশ টাহা দিয়া কুত্তাডা কিইন্যা লইয়া ম্যালা করল।

যাইতে যাইতে একটা আডের মইদ্যে যাইয়া ঐহানে একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাহে। আর কুত্তা, ইনদুর পালতে পালতে অগ পোশ লওয়াইয়া হালাইছে। তহন অরা দ্যাহে যে, অগ পালক একটু কেমন জানি চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে। তাহা অরা খনার গনা গইন্যা দাহে অগ পালক বাশ্শার মাইয়া বিয়া করছিল। হেই মাইয়া কোতপালের পোর লগে অমুক দ্যাশে গিয়া থাহে। আর একটা হেকমতি আনডি আছিল। হেই আনডিডা লইয়া গেছে। এই গনা গইন্যা অরা পালকের কাছে না কইয়া ম্যালা করল। যাইতে যাইতে দ্যাহে সামনে একটা নদী। তহন অরা কয় আরে বাহ। এই নদী পাড় ঐম কেমতে? উনদুরডায় কয়থ–ভাই,; আমি যদি নদীর মইদ্যে নামি হেইলে আমারে মাছে খাইয়া হালাইব। বিলাইডায় কয়, আমিও যদি নামি হেইলে আমারে ওত খাইয়া হালাইব। তহন কুত্তাডায় কয়, হেইলে এক কাম কর, আমার উপরে বিলাই ওড, বিলাইর উপরে উনদুর ওড। তহন অরা এই রকম কইর‍্যা নদী হাতরাইয়া ওপাড় গেল।

যাইতে যাইতে ঐ কন্যা আর কোতপালের পোয় যেইহানে থাহেথ–হেইহানে গেল। তহন একদিন বিলাইডায় যাইয়া দ্যাহে যে কন্যা ঐ শ্রী আনডিডা মোহের মইদ্যে লইয়া ঘুমায়। তহন অয় আইয়া কইল এই রহম ব্যাপার। ভাই হেইলে এক কাম কর, উনদুরডায় কয়–আমার লেংগুরও চিহন। যহন অরা ঘুমাইত তহন আমি গিয়া কন্যার হানের মইধ্যে লেংগুর দিম। দিলে কন্যায় আছি দিয়া উঠব। আর অমনেই আনডিডা পইড়্যা যাইব। বিলাই ভাই তুমি আনডিডা লইয়া দৌড় দিবা। এই বুদ্ধি কইর‍্যা অরা আল্লাহর নাম লইয়া ম্যালা করল। যহন বাড়ির সামনে গেল তহন উনদুরডায় কয়, এই বাইতে যদি বিলাই থাহে হেইলে ত আমাদে দেখলে খাইযা হালাইব। তহন বিলাইডা গিয়া দেহে একটা মোডা বিলাই। তহন অয় কুত্তাডারে কয়, আমি বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনুম, তুমি ঐডারে কামর দিয়া দইর‍্যা মাইর‍্যা হালাইবা। তহন বিলাইডায় গিয়া ঐ বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনল। আর অমনেই কুত্তায় দইর‍্যা আছড়াইতে আছড়াইতে মাইর‍্যা হালাইল।

তহন উদনদুরডায় আর বিলাইডায় গিয়া ঘরের বেড়ার লগে বইয়া রইছে। যহন দ্যাহে অরা গভীর নিদ্রা আইছে তহন উনদুরডা আল্লার নাম লইয়া গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যে দিছে লেংগুর। আর অমনেই কন্যায় আঁছি দিছে, দিছে মতনই আনডিডা গেল পইড়্যা, আর বিলাইডায় আনডিডা লইয়া আইজও দৌড় কাইলও দৌড়। তহন আনডি লইয়া তিনজনে ম্যালা করছে। তহন উনদুরডায় কয়, ভাই আনডিডা আমার কাছে দেও। যদি কেহ দ্যাহে হেইলে আমি দৌড়াইয়া একডাআদের মইদ্যে যাইতারুম। তোমরা তো আর হেইয়া যাইতে পারবানা। তহন অরা দুইজনে চিন্তা কাইরা আনডিডা দিল। এবার আইতে আইতে ঐ নদী পড়ল। তহন উনদুরডায়, কুত্তাডারে কয়, ভাই এবার আনডিডা তুমি লও। আমি ঐলাম উনদুর, আমারে যদি মাছেলইয়া যায়। তহন কুত্তায় আনডিডা লইয়া যাআনের সময় যেই রহম নদী পার ঐছে হেই রহম নদী পার ঐল। যহন এ পাড় আইয়া ওঠল-আর কতগুলি ছ্যামড়ারা দেইখ্যা লইল দৌড়ানী। উনদুরডা করল কি, আনডিডা থাবা দিয়া লইয়া একটা

www.pathagar.com

ইছ্যার ছোঁপার বোগলে আছিল একটা অদ, এই অদের মইধ্যে গিয়া পলাইয়া রইল। বিলাইডায় গিয়া ওটল একটা গাছে আর কুত্তাডায় রইল দৌড়ানী। তহন ছ্যামড়ারা কতক্ষণ দৌড়াইয়া অরান ঐয়া গেল গা। বিলাইডায় চাইয়া দ্যাহে কেঐ নাই। তহন গাচের তন নাইমা আবার তিনজনে ম্যালা করল।

আইতে আইতে ঐ অর কাছে আইল, অয় অগ দেইখ্যা লইছে কান্দন। কয়, তোগ এত আদর কইর‍্যা পালতাম। তোরা আমারে ছাইড়্যা কই গেছিলি? আমার সব গেছে, তোগ লইয়া আমি আছিলাম। তোরাও আমারে ছাইড়্যা গেছিলি গা। এই কথা কইয়া অয় লগ লাইগা ভাত-টাত রাইন্দা অগ সামনে দিল। তহন কুত্তাডার মোহে আছিল ঐ আনডিডা। কুত্তায় মোহের তনে অর সামনে আনডিডা হালাইল। এইয়া দেইখ্যা অয় বোঝদে পারল যে অরা কই গেছিল। তহন করল কি, আনডিডার মইদ্যে কেরামতী আছে কিনা হেইয়া দেহনের লাইগগা ঘরের পিছে গিয়া জিগায়, আনডি আগে আছিলা ক্যের? বোলে কন্যার। এহন? তহন বোলে এহন আমনের। তহন অয় মনে কর ঠিকই আছে। তহন আবার বাড়ির দিগে ম্যালা করল। বাইত আইয়া যহন বাশ্‌শার বাড়ি গেল বাশ্‌শায় জিগায়, আমার মাইয়া কই? তহন অয় কয়, আমানের মাইয়া আছে। বাশ্‌শায় রাগের চোডে ওরে নিয়া বন্দী কইরা থইল। অয় বাইতে আনডির কাছে জিগায়, আনডি আগে আছিলি ক্যের? বোলে অজগরের। এহন? এহন আমনের। বোলে আমার ঐলে কও-রাজার কন্যায় কোনো দ্যাশে? কয় অমুক দেশে আছে। হের পর দিন অরে রাজার দরবারে আনা ঐল। রাজায় কয় আমার মাইয়া আইনা দেও। তহন অয় কয়, আমনের মাইয়ায় কোতপালের পোর লগে ভালোবাসা করিয়া হের লগে গেছে গা। রাজায় ত হুইনা কয়, তুমি এই দরবারের মইদ্যে আমারে শরম দিলা? তোমার দ্যাহান লাগব। তহন শ্রী-আনডিরে কয়, তুমি গিয়া নিয়াআহ। তহন আনডি কয়, আমার দিনে চলাফিরা করতে অসুবিধা, আমনে ঐ লোয়া ঘষা দেন। হেইলে আতশী জাত আইব, হ্যেগ পাডাইয়া দেন।

তহন অয় লোহা ঘষা দিছে মতন আতশী জাত আইয়া পড়ল। হ্যেগ পাডাইয়া দিল। গিয়া দ্যাহে দোনজনে পালংগে হুইয়া রইছে, ঐ পালং শুদ্ধা লইয়া আইল। আইন্যা রাজার দরবারে থুইল। রাজায় দেইখ্যা আরও লজ্জা পাইল। তহন রাজায় করল কি, সিপাইগো বোলাইয়া কইল যে দুইডা অদ কর। তহন সিপাইরা রাজার কথামত অদ করল। ঐ অদের মইদ্যে অগ দুই জনের জ্যাতা গাইড়্যা তুইল। আর রাজার আর এক ছোড মাইয়া আছিল, অর হেই মাইয়ার কাছে বিয়া দিল। এহন বেশ খোশ-খোশালিতে দোন জনের দিন কাডে।

হিয়াল দোস্তের কাহিনি

এ্যাক জোঙ্গলে এ্যাকটা বিলই আর একটা হিয়াল আলহে। বিলই আর হিয়ালের মইদ্যে আলহে দোস্তি। হেই জোঙ্গোলের ধারেই আলহে এ্যাক রাজার বাড়ি। একদিন বিলই হিয়ালডারে কইল যে, দোস্তো রাজার বাড়িতে রাজার মাইয়ার বিয়া। হিয়াল কয় যে, দোস্তো হ্যাত মোর কি! মুইতো আর খাইত পারমুনা। তুমি তো বিলই, তুমি তো যাইয়া খাইতে পারবা আনে। বিলই কয়, হোনো দোস্তো মুই এ্যালহা খামু না তুমিও য্যাতে খাইত পারে হেই বোন্দোবস্তা কইর‍্যা আমু আনে। হিয়াল জিগায়–হ্যা ক্যামনে? বিলই

www.pathagar.com

কয়, হোনো দোস্তো, মুই চুরি হইর‍্যা খাইয়া আওয়ার সোমায় ব্যাড়া এট্টুহানে ভাইঙ্গ্যা থুইয়া আমু আনে য্যাতে তুমি যাইয়্যা চুরি হইর‍্যা খাইত পারো। এদিকে রাজায় হ্যার মাইয়ার বিয়ায় পোসাবারেগো খাওয়ানের লইগ্যা শালুন, কোর্মা, পোলাউক এই ব্যাবাকতা রাইন্দ্যা ওসশায় এ্যাকছের হাইর দিয়্যা থুইয়া দেছে।

বিলইর যেই কথা হেই কাম। রাইন্দ্যা-বাইর‍্যা ব্যাবাকতে যতন পোসাবারগো আউগাইয়্যা আনতে গ্যাছে হেই ফাহে বিলইতে যাইয়া ওসশায় হানছে আর খায়োন যদ্‌দূর পারছে হেদদুর খাইছে। যহন দ্যাহে যে আর খাইত পারে না। হ্যাই সোমায় বাইর আইয়্যা আইছে। বাইর অইয়্যা আওনের সোমায় ওসশায় ব্যাড়াড্যারে এট্টুহানে ভাইঙ্গা থুইয়া আইছে, য্যাতে হিয়াল হাইন্দ্যা যাইত পারে।

হেইয়ার পর হিয়ালডার গ্যাছে। যাইয়্যা হ্যাই ভাঙ্গা বাড়াইদ্যা হানছে ওসশার মইদ্যে। ওসশায় এ্যাতো খাওন দ্যাইখ্যা হিয়াল গ্যাছে আটাশ আইয়্যা। কোন্‌ডা থুইয়া কোন্‌ডা খাইবে হে আর বাইব্যা কূল হরতে পারে না। খাওয়া ধরছে এ্যাক মুরাইদ্যা এ্যাকছের জোলায় খাওন খাইছে। খাইতে অছেরদো অইয়্যা গ্যাছে। হেইয়্যার পর এ্যাহোন বাইর অইবে। হ্যাতো আর বাইর অইত পারে না। ব্যাড়ার ভাঙ্গাইদ্যা মাতা বাইর অয় প্যাটতো আর বাইর অয়না। অনেক মোড়ামুড়ি হরছে তও বাইর অইত পারে না। হ্যাসম্যাস কি হরবে, ওসশায় মাচায় উইট্যা দাউরের মইদ্যে হুইয়া রইছে।

এদিগে পোসাবারেগো খাওন দিতে যাইয়্যা দ্যাহে যে খাওন নাই। হ্যারা তো আটাশ। খাওন অইলো কি! হ্যাস-ম্যাস আর কি হরবে। আবার খাওন-টাওন রাইন্দ্যা পোসাবারেগো খাওয়াইয়া বিদ্যায় দেয়।

এদিগে অইছে কি! যহন ব্যান রাইত আয়জান দেছে হেই সোমায় জোঙ্গোলের ব্যাবাক হিয়াল এ্যাক লগে হওয়াক-কা-হুয়া হইর‍্যা উটছে। এই বুলি ঐ হিয়ালে যহন মাচায় গনে হোনছে হে আর টিইক্যা থাকতে পারে না। ওডায়ও মাচায় বইয়া হওয়াক-কা-হুয়া কইর‍্যা ডাক মারছে। রাজা বাড়ির ব্যাবাক মানসে তো এইয়্যা হোনছে। হ্যারা কয় কিরে। ঘরের মইদ্যে হিয়াল বোলে মোনে অয়। দ্যাখতো কোনো জায়গায়। বিচরাইয়া বাইর হর। ব্যাবাককে বিচরা-বিচরি শুরু হরছে। হ্যাস-ম্যাস দ্যাহে কি দাউরের মাচায় বইয়া হিয়াল বোলতে আছে হেইয়া পরতো ভ্যাবাককে ব্যার দিয়া হিয়ালডারে ধরছে। রাইতে আর কিছু না হইর‍্যা হেইডারে দরজার মাতার এ্যাকটা খুড়ির লগে নিয়্যা বাইন্দ্যা থুইছে।

হিয়ালডার নিয়্যা বাইন্দ্যা থোয়োনের কতকুন পরই ঐ পোইদ্যা এ্যাকটা বাগ যাইতে আছিল। হে হিয়ালডারে ঐ রহম বান্দা দেইখ্যা জিগ্যায়–কি মামু। তোমার এই দশা ক্যা।

হিয়াল কয়–আর কইসনা ভাইগনা! মোরডে এই রাজা বাড়ির মাইয়া বিয়া দেতে চায়। মুইতো বিয়া হরমু না। হেইর লইগ্যা মোরে বাইন্দ্যা থুইছে। মোরডে জোর হইর‍্যা মাইয়া বিয়া দেবে।

বাগে হুইন্যা কয়–মামা মোর এ্যাকটা কতা আলহে।

হিয়াল কয়–কি কতা?

বাগে কয়–মোর এ্যাকটা বিয়া হরতে মোল্‌লয়।

এইয়া হুইন্যা হিয়ালে মোনে মোনে কয় পাইছিতো সুযুগ।

www.pathagar.com

হিয়াল কয়–তয় হোন্ ভাইগনা, মোর ধারে আইয়া বান্‌ডা খোল।

বাগে জিগায়–ক্যা, বান্ খোললে কি অইবে।

হিয়াল কয়–মোর বান খুইল্যা তোর গলায় দিয়া দিমু। হেইলে অইব কি! তোর লগে রাজার মাইয়্যা বিয়া দিয়া দেবে।

বাঘ এই কথা হুইন্যাতো খুউব খুশি। হে হিয়ালের গলার বান্ খুইল্যা দেছে আর হিয়াল বাঘেরে বাইন্দ্যা থুইছে। যাওনের সোময় হিয়াল বাঘেরে কইয়া যায় কি–হোন্ ভাইগনা বেইন্যাহালে হালা-হালীরা কোলোম মশকারী হরতে পারে। হ্যাগো লগে বুঝি রাগ অও। হেইলে কোলোম মাইয়া বিয়া দেবে না।

বাঘেরে এইয়া কইয়া হিয়ালতো গ্যাছেইগ্যা। এদিকে অইছে কি, বাইন্যহালে রাজার বাড়ির গুড়া-গাড়ারে বোলাইয়া রাজায় কইছে কি! এই তোরা হোন্। দরজায় একটা হিয়াল বাইন্দ্যা থুইয়া আইছি। হেইডারে তোরা মার যাইয়া। গুড়া-গাড়ায় হুইন্যা তো খুশি। হ্যারা লাডি-সোডা লইয়া গ্যাছে হিয়াল মারতে। যাইয়্যা দ্যাহে দরজায় কোনো হিয়াল বানদা নাই।

দ্যাহে এ্যাকটা ডাঙ্গোর বাঘ। হ্যারাতো বাগ্ দেইখ্যা দেছে দৌড়। আইজো দৌড় কাইলো দৌড়। বাড়িতে আইয়্যাতো বাগের কতা কইছে। গুড়া-গাড়ায় কয় আমনেরা বোলে হিয়াল বাইন্দ্যা থুইয়াছেন। ওডা দেহি একটা বাগ।

রাজার মানসে হুইন্যা কয় তোরা কি কও। তোরা গুড়া-গাড়া, বাগও চেনো না আর হিয়ালও চেনো না। বেইন্যা রাইতে থুইয়াইলাম এ্যাকটা হিয়াল বাইন্দ্যা আর এ্যাহোন অইয়া গেল হেডা বাগ! ল দ্যাহি দ্যাইক্যা আই যাইয়্যা।

হ্যারাও যাইয়্যা দ্যাহে হাচ্চয়ই এ্যাকটা বাগ। হিয়ালের নাম-গোন্দোও নাই। হ্যারাতো বাগ দেইক্যা গ্যাছে ভ্যাগা-চ্যাগা খাইয়া। বাগ মারোনের আর সাওস কেউ পায় না। এ্যাক পাও আউগায়তো দুই পাও পাউছায়। এই রকম হরতে হরতে মোনে এ্যাকটু সাওস লইয়্যা এ্যাকজন ব্যাকটা ডাঙ্গোর লাডিদ্যা দূরে গেনে এ্যাকটুহানে খোঁচা দেছে। হ্যারপরও বাগে কিছু কয় না। বাগে কইবে কি! বাগে তো মোনে হরছে হালা-হালীরা মশকারী হরে।

বাগে কিছু কয় না দেইক্যা ব্যাবাক্কের মোনে এ্যাকটু সাওস অইছে। হ্যারা এ্যাহোন লাডিদ্যা জোরে জোরেই খোঁচা মারে। কেউ আবার দুই এ্যাকটা পিডানো দেয়। যতো জোরেই খোঁচা মারে। কেউ আবার দুই এ্যাকটা পিডানো দেয়। যতো জোরেই খোঁচা দেয় আর পিডান দ্যায় বাগ ততো বেশিই নরোম অইয়া যায়। য্যানো এ্যাককারে নতুন জামাই।

যহোন বেশি জোরে জোপরে পিডাইন্যা শুরু হরছে, বাগে আর সহ্য হরতে পারে না। হে মোনে মোনে কয় এ্যারে কয় ক্যামোন মশকারী। মশকারীরোতো এ্যাকটা সীমা আছে।

মোনে মোনে এইয়্যা কইয়্যা হালুম কইর‍্যা দেছে এ্যাক লাপ। লাপের চোডে বান বোন গ্যাছে ছিঁড়্যা। এ্যাহোন দৌড়ায় আর কয়, খাড়াও মামু হালার পোলা, তোমারে য়্যাহানে পামু হ্যাহানে শ্যাষ করমু। দৌড়াইতে দৌড়াইতে এ্যাককালে জোঙ্গলের হেই মাতায় গ্যাছে। যাইয়্যা হিয়ালরে পাইছে। দ্যাহে কি, হিয়াল য্যানো কি হরে। আসোলে হিয়াল ভেউংরালের বাসা আতে লইয়া খাড়াইয়া রইছে।

www.pathagar.com

হিয়াল বাগরে আইতে দ্যাইক্যা মনে মনে কয়, কাম অইছে, আইজগো আর আমারে বাগে ছাড়বে না। হে মনে মনে এ্যাটা বুদ্ধি হরে।

আর বাগ হিয়ালের আগে ঐ বাসাডা দেইখ্যা হিয়ালরে মারোনের কতা গ্যাছে ভুইল্যা।

বাগ হিয়ালের ধারে আইয়া জিগ্যায় মামু কি হরো? হিয়াল কয় হারে ভাইগনা আর কইস না। দাদার কাইল্যা এ্যাকটা সারিন্দা আলহে হেইডারে বাজাই।

বাগ কয়, মামু মোরদে এ্যাকটু দ্যাও না। মুই এ্যাকটু বাজাই। হিয়াল কয়, দেতে পারি। তয় এ্যাকটা শর্ত।

বাগ কয়, কি শর্ত মামু? হিয়াল কয়, মুই যে সোমায় বারি দেতে কমু হেই সোমায় বারি দেবা। হ্যার আগে দেবা না।

বাগ কয়, হয় হেইয়াই হরমু।

হিয়াল হেইয়ার পর দেছে ভেউংরালের বাসাডা বাগের আতে। বাসাভরতি ভেউংরাল। বাগের আতে দিয়া হিয়াল ম্যালা দূরে গ্যাছে। যে সোমায় দ্যাহে হে হ্যারে আর ভেউংলাল ধরতে পারবে না হেই সোমায় কয়, ভাইগনা দে বারি।

যেই বাসায় দেছে বারি, বাসা গ্যাছে ভাইঙগা। আর বাসায় যত ভেউংরুল আলহে ধরছে বাগেরে লিইক্যা-পিইক্যা। বাগের কামড়াইন্যা শুরু হরছে। বাগে দৌড়ায় আর বাগেরে কামরায়। কামড়াইত কামড়াইত এ্যাককালে মাইর‍্যাই হালাইছে।

হিয়াল রায়বারের কাহিনি

এ্যাক মাতারীর এ্যাউককা পোলা আলহে। এ্যাকদিন পোলাউগ্গায় আডে গ্যাছে। আডে গনে কতডি হোয়ার আডি কিইন্যা আনছে। আডিডিরে লাগাইছে ঘরের পিছকুলে। কেরমে কেরমে হোয়ার গাছ বড় অইছে, গাছে কড়া লইছে। পোলাউগ্গা পেরতেক দিন হোয়ার কড়া দ্যাহে যাইয়্যা। এ্যাকদিন পোলাউগ্গায় মায়রে কয় কি, যে মা, হোয়াডা ডাঙ্গর অইছে, হোয়াডারে খামু। মায় কয়, আইজ থাউক, কাইল খাইস।

এদিগে অইছে কি, এ্যাকটা হিয়াল ঐ রাইতে বাইর অইছে খাওন বিচরাইতে। বিচরাইতে বিচরাইতে এককারে হারা গেরাম গোরছে। কোনোহানে কোনো খাওনের জোগাড় হরতে পারে না। প্যাডেও খিদা। খাওনের আশা ছাইড়্যা দিয়্যা হ্যাসম্যাস আইয়া বইছে হেই হোয়া গাছটার তলে। বইয়া বইয়া চিন্তা করে কি হরবে। আচমকা দ্যাহে কি এ্যাকটা হোয়া মোলতে আছে। হিয়ালডার আর বার সমনা। এ্যাক লাফে হোয়াডারে ছেরছে।

পরদিন বাইন্যাহালে মাতারী গাছে হোয়া গাছটার তলে। যাইয়া দ্যাহে হোয়াডা নাই। আইয়া পোলাডারে জিগায়, এই হোয়াডা খাইলি ক্যা? তোরে না কাইল খাইতে মানা হরলাম। তও খাইলি?

পোলাউগ্গায় কয়, অ কওকি। মুই খাইলাম কোনো সোমায়! মায় কয়, তয় হোয়াডা খাইলে কিতে!

গাছে আবার কড়া লইছে। পোলাউগ্গায় কয়, আবার তো কড়া লইছে, এইফির দ্যাকমু, কিতে খায় হোয়া। পেরতেক দিন পরি দিমু।

www.pathagar.com

পোলাউগ্গায় হরছে কি, ঘরের পিচকুলে একটা ছোডো কুয়া হরছে। কুয়াডার মোহে এ্যাকটা ফুহা চালৈন দিয়্যা থুছে, য্যান নিচে গনে দ্যাখতে পায়। এ্যাহন পেরতেক রাইতে পোলায় পরি দেয়।

একদিন অইছে কি হিয়ালডায় আবার আইছে হোয়া খাইতে। আইয়া বইছে হেই চালৈনের উপরে, ওল দুগগা ঝুলায়্যা। ঐ পোলায় হরছে কি, ওল দুগগারে ধরছে জোরে চাইপ্যা। ওল ধইর‍্যা এ্যাহোন এ্যাকছের পাতিহালডারে ঘুরায় আর ঘুরায়, পাতিহাইল্যায় জোড়াজুড়ি হইর‍্যাও ছোটতে পারে না। হ্যাসম্যাস কয়, আমারে যদি তুমি ছাইড়্যা দ্যাও হ্যাইলে তোরে মুই বিয়া হরাইয়া দিমু। পোলাউগ্গায় রাজি অইয়া ছাইড়্যা দ্যায়।

হিয়াইল্যায় ছাড়া পাইয়্যা এ্যাকছের দৌড়ায়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাইত গ্যাছে পোহায়্যা। যাইতে যাইতে এ্যাক রাজা বাড়ির ধারে গ্যাছে। যাইয়্যা দ্যাহে কি এ্যাক রায়বার ব্যাডা জামা কাপুড় খওয়াইয়া থুইয়া আগদে বইছে। হিয়ালডায় হরছে কি, ঐ ব্যাডার ব্যাবাক কাপুড়ডি পেনছে। পিইন্দ্যা এ্যাহোন রাজার বাড়ির হোমকইদ্যা যায়। এ্যাক ব্যাডা দেইক্যা বোলাইছে, এ্যায় মেয়া হুইন্যা যাও। ঐ ব্যাডায় হিয়ালডারে লইয়া গ্যাছে রাজার বাড়ি।

রাজার বাড়িতে যাইয়্যা হিয়ালডায় কয় আমনেগো বাড়িতে সোমোর্ত মাইয়্যা থাকলে দ্যাহাইত পারেন। মোর দারে এ্যাউক্যা ভালো পোলা আছে। এ্যাইয়া হুইন্যা হ্যারা মাইয়্যা দ্যাহাইছে। মাইয়্যা দ্যাইক্যা হিয়ালডার পোছোন্দ অইয়া গ্যাছে। হিয়াইল্যায় কতা-বার্তা পাহা-পাহী হইর‍্যা হোয়া-আলা পোলাউগ্গার ধারে ম্যালা হরছে। যাইতে যাইতে পোতে দ্যাহে কি এ্যাকটা বাগের বাসায় দুইগ্গা ছাও বইয়া রইছে। হিয়াইল্যায় মোনে মোনে এ্যাকটা বুদ্ধি হরে দ্যাহি কোনো মিত্যা কতা কইয়া বিয়ার লাইগ্যা কতোডি ধান জোগাড় হরন যায় কিনা। হে বাগের ছাও দুইডরদ্যে যাইয়্যা কয়, চুতমাড়াইন্যা ছ্যাড়ারা তোর বাহে কোম্মে? তোর বাহেরডে মুই দশ কাডি ধান পামু। হে যে মোর ধান দেলে না? এ্যাহোন তোরা দিয়্যা দে। ছাও দুইগ্গায় কয়, দ্যাহেন, হে এ্যাহোন তো মোগো কোনো ধান নাই। তয় মোরা বাবারডে কমুআনে। হিয়ালে আর কোনো সুবিধা হরতে না পাইরা কতকুন গাইল-টাইল পাইর‍্যা আবার ম্যালা হরছে। যাইতে যাইতে হেই পোলার ধারে গ্যাছে। যাইয়্যা কয়, তোমার বিয়া ঠিক হরছি। যাবা কবে?

পোলাউগ্গায় কয়, যামু আনে শুক্কুরবার।

হিয়ালডায় এইয়া হুইন্যা গ্যাছে দাওয়াত দেতে। কতদূর যাইয়্যা দ্যাহে এ্যাকটা বিল বগে ধলা অইয়্যা গ্যাছে। এ্যাকছের বগ আর বগ।

বগের যে রাজা হিয়ালডায় যাইয়্যা হ্যার ঠ্যাং ধরছে।

বগের রাজায় জিজ্ঞায়, তুমি কী চাও? হিয়ালডায় তারে কয়, তোমাগো পোসাবার যাইতে অইবে মোর লগে।

বগের রাজায় কয়, অইলো, যামুআনে।

এহোন হিয়াল ব্যাবাককেরে লইয়া রাজার বাড়ি ম্যালা হরছে। হ্যাহানে পোলাউগ্গারে বিয়া হরাইবে।

এদিগে অইছে কি, বাগে হ্যার ছাওরডে হিয়ালের কতা হুইন্যা গ্যাছে চেইত্যা। আর যেই হিয়াল পোসাবার লইয়া বাগের বাসায় সামনিদ্যা ম্যালা হরছে, ওমনে বাগে

www.pathagar.com

দেছে লড়ানী। এ্যাহোন এ্যাকছের হিয়ালডারে লড়ায়। লড়াইত লড়াইত হালাইছে নিয়া এ্যাকটা ওডা পুহৈরের মইদ্যে। বাগও ঝোহের মাতায় পড়ছে যাইয়া হেই পুহৈরে। কিন্তুক হিয়ালরে তো আর ধরতে পারলোই না, আরো নিজেই পুহৈরে পইর‍্যা মরলো। হিয়াইল্যায় বহুত কষ্টে হাতোইর‍্যা পুহৈরের আরেক পারে যাইয়্যা ওডলো।

হ্যার পর আবার হিয়ালডায় পোসাবার লইয়া ম্যালা হরছে। যাইয়্যা ওডছে হেই রাজার বাড়ি। হ্যাহানে যাইয়্যা পোলাউগ্গারে বিয়া টিয়া হরাইয়া মাইয়া লইয়া আইছে বাড়িতে।

জোলা ও জোলানীর কাহিনি

এক দেশে আছিল এক জোলা আর জোলানী। জোলার নাম ছিল বছির। বছিরের কোনো মাইয়া-পোলা নাই। ঘরে-বাইরে মাত্র দুইজন খাওয়াইয়া। বছিরের ব্যবসা ছিল মাছ ধরার জাল বুনিয়া হাটে হাটে বিক্রি করা। হাটে গনে সুতা কিন্যা আইন্যা জাল বুইন্যা আবার ঐ জাল নিয়া হাটে বিক্রি করত। এই কারবারে যে আয় অইত হেইয়া দিয়াই দুইজনের সংসার চাইল। বছিরের স্ত্রী জোলানীও জাল বুনার কাজে বছিরকে খুব সাহায্য করত। বছিরের প্রায়ই হাটে যাইতে অইত। বছিরের স্ত্রী বাড়ি বইয়া বইয়া হারা দিনই[১] জাল তৈয়ার করত আর ডাইল-ভাত পাক করত। নিজে খাইত আর বছিরের লাইগ্যা রাইখ্যা দিত। বছির হাটে গনে আইয়া খাইত। বছিরের মেজাজ ছিল খুব কড়া। হাটে গনে আইয়া যদি দ্যাখত যে খাত রান্না অয় নাই তহনী জোলানীরে ধইর‍্যা মারতে আরম্ভ করত। মারতে মারতে এক এক দিন একেবারে বেহুঁশ কইর‍্যা হালাইতো। ভাত রান্ধনে দেরি অইলেও মারতই। হে ছাড়া যে কোনো কামে একটু দোষ পাইলেই মারতে আরম্ভ করত। মাইরের চোটে জোলানীর গা-গতর ফাইট্যা রকতও বাইরাইত। একদিন এমন মাইর দেছে যে একটা হাতের আঙুলই ভাইঙা গ্যাছে। জোলানী জোরে জোরে চিক্কের[২] দেতে আছে। চিক্কের হুইন্যা জোলানীর ভাইরা পাশের বাড়িতে গনে আইয়া বছিরেরও আচ্ছা রহম মাইর দ্যাহে। মাইরের চোডে বছির কয় আমি কছম করলাম। আর কোনো দিন তোমাগো বুইনেরে মারমু না। আর যদি কোনো দিন তোমাগো বুইনেরে আমি মারি, হ্যা অইলে তোমরা আমারে খুন কইর‍্যা হ্যালাইও। এইয়ার পর কয়েকদিন ভালো গেল। গ্যার পর আবার মাইর। এই কারণে বছিরের লগে হ্যার স্ত্রীর মোটেই মিল ছিল না। দুইজনের মধ্যে জীবনে কোনো দিন বনিবনাও অয় নাই। বছিরের স্ত্রী বছিরকে দুই চোকের আগায়ও দেখতে পারত না। একদিন রাত্রে ইন্দুরে জাল কাইট্যা হালাইছে হ্যাতেও জোলানীকে ধইর‍্যা মাইর লাগাইছে। একটা ইন্দুর আইয়া প্রতি রাত্রেই জাল কাইট্যা হালাইতে আছে। বছির মহাবিপদে পড়ছে। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না।

রাত্তিরে আন্ধারের মধ্যে একটা ল্যাজা কান্ধে কইর‍্যা খাড়াইয়া রইছে ইন্দুর মারবার লাইগ্যা। জাল কাটতে আছে এমন সময় বছির ল্যাজা দিয়া ইন্দুরকে ঠাইস্যা ধরছে। ইন্দুর চিক চিক কইরা বোলতে আছে। চিক চিক শব্দ থাইম্যা গ্যাছে পর বছির মনে করল যে ইন্দুর মইর‍্যা গ্যাছে। বাতি জ্বালাইয়া দ্যাহে সত্য সত্যই ইন্দুরটা মরছে। তহন আর বছিরের আনন্দের সীমা রইল না। আনন্দের চোটে জোলানীরে ঘুমে গনে জাগাইয়া কয়, দ্যাখ, আইয়া, কি কাণ্ড করছি। ল্যাজা দিয়া এক কোপেই ইন্দুররে শেষ

www.pathagar.com

কইরা দিছি। জোলানী ঘুমে গনে উইঠ্যা দ্যাহে সত্য সত্যই ইন্দুরডারে ল্যাজা দিয়া মাইর‍্যা হালাইছে। বছির কয় দেখলিত আমার হাত কি রকমেই সই। আন্ধারের মধ্যে এক কোপে ইন্দুর মারছি। এডা কথা না। আমি এহন পালোয়ান অইছি। এহন আর আমি জাল বুনমু না। পালোয়ানগিরি চাকরি করমু। জাল বুইন্যা কোনো ছাই অইবে। কোনো রাজা-মহারাজার বাড়িতে গেলে অনেক টাহা মায়না দিয়া আমারে পালোয়ানগিরি চাকরিতে রাখবে। আমি যেভাবে শিকারে ওস্তাদ, হ্যা জানতে পারেল আমারে খুব আদর কইর‍্যাই রাখবে। আমার হাত যে এত শক্তি হ্যা আগে বোঝতে পারলে অনেক আগেই জাল বুনার কাম ছাইর‍্যা পালোয়ানগিরি করতে যাইতাম। আগে আমি বোঝতেই পারি নাই যে আমার হাত শিকারে এত পাকা। কাইল হাটে এই জালডা বেইচ্যা পালোয়ানগিরি করতে যামু। খুব সকারে ঘুম গনে উইঠ্যা জোলানীরে কয় শিগগির শিগগির ভাত রাইন্ধা দেও।

ভাত খাইয়া আমি জাল লইয়া হাটে যামু। জোলানী তাড়াতাড়ি ভাত-ডাইল রাইন্ধা দেয়। ভাত খাইয়া ল্যাজাডা কান্দের উপর হালাইয়া জালখানা লইয়া হাটে গেল। বছিরের কান্ধে একটা ল্যাজা দেইখ্যা হাটের লোক অবাক। হগলে কওয়া-কওই করে ব্যাপার কি? বছিরত প্রত্যেক হাটেই আয়। ল্যাজা কান্ধে লইয়া রাইতের কোনো দিন দ্যাহি নাই। হগলে জিগায় কি বছির, ব্যাপার কি? বছির কয় হ্যা বুঝি হোনেন নাই। কাইল রাইতে এই ল্যাজা দিয়া একটা ইন্দুর একেবারে গাইয়্যা রাখছি। হ্যাও আবার একবারে আন্ধারের মধ্যে। এহন দ্যাহি যে আমার হাত খুবই পাকা। হেই লাইগ্যা পালোয়ানগিরি করতে যামু, জাল বুনানের কাম আর করমু না। আমার নাম এখন বছির পালোয়ান। তেহই লাইগ্যাই ল্যাজা কান্ধে লইয়া আইছি। ল্যাজা কান্ধে কইর‍্যা হারা হাটে তিন-চাইর বার ঘুইরা বেড়াইল। হগলরে জানাইয়া দিল হ্যার নাম এহন বছির পালোয়ান। বেডা বেডি ঠাট্টা কইর‍্যা পালোয়ান সাব, পালোয়ান সাবও কয়। জাল বেইচ্যা আইজ আর জালের সুতা না কিইন্যাই বাড়ি আইছে। বাড়ি আইতে আইতে সন্ধ্যা অইয়া গ্যাছে। সন্ধ্যার পরই ভাত খাইল। আইজ আর জাল বুনানোর কাম নাই। ভাত খাইয়া সকাল সকাল ঘুমাইল। এক ঘুমে রাইত পোয়াইয়া গ্যাছে। ঘুমে গনে উইঠ্যা জোলানীরে কয়, তাড়াতাড়ি ভাত রাইন্ধা দেও। ভাত খাইয়াই আমি পালোয়ানগিরি চাহরির লাইগ্যা বিদেশ রওয়ানা করমু। দেশি মানুষে সহজে আমারে পালোয়ান সাব কইয়া বোলাইব না আর দেশে চাহরিও পাওয়া যাইব না। হেই লাইগ্যাই বিদেশে যামু। আর একটা কতা কই চাউল ভাইজ্যা কিছু লাড়ু বানাইয়া আমার গামছার গাইতে বাইন্ধ্যা দেও। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খিদা লাগলে ঐ লাড়ু খাইয়া থাকমু। কিছু লাড়ু লইয়া গেলেই ভালো অইবে। হেই লাইগ্যাই লাড়ু বানাইতে কইলাম। বছিরের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ডাইল-ভাত রাইন্ধ্যা দিল। ভাত খাইয়া বিদেশে যাবার লাইগ্যা বছির তৈয়ার অইতে লাগল। এদিকে বছিরের স্ত্রী চাউল ভাইজ্যা চাউলের গুড়ি কইড়া লাড়ু বানাইতে বইল। বছিরের স্ত্রী বছিরকে দুই চৌকের আগায়ও দ্যাখতে পারত না। মাইর-ধইর খাইতে খাইতে হের মন সব সময়ই খারাপ থাকত। মনে মনে কইত ওডা মরলেই আমি বাঁচতাম। এই বছিরকে মারনের একটা সুযোগ পাইল। চাউলের গুড়ির লগে কিছু দারমুজ বিষ মিশাইয়া লাড়ু বানাইয়া বছিরের

www.pathagar.com

গামছার গাইতে বাইন্ধ্যা দিল। চাউলের গুড়ির লগে দারমুজ বিষ মিশাইয়া লাড়ু বানানের উদ্দেশ্য অইল বছির যেন ঐ বিষ মিশানো লাড়ু খাইয়া মরে। এই আশা কইর‍্যাই লাড়ুর লগে দারমুজ বিষয় মিশাইয়া দিল। বছিরের মাইর-ধইর সহ্য করতে না পাইরাই বছিরের স্ত্রী এই কাম করল।

বছির মাথায় একটা পাগড়ি বাইন্ধ্যা লাড়ু বান্ধা গামছাডা কান্ধের লগে ঝুলাইয়া ল্যাজাডা কান্ধে লইয়া পালোয়ানগিরির চাহরি লওয়ার আশায় বিদেশে রওয়ানা করল। যাইতে যাইতে অনেক দূর গ্যাছে। রাস্তার পাশে দ্যাহে একটা গুইল যাইতে আছে। পালোয়ান মানুষ। গুইল দেইখ্যা গুইল শিকারের ইচ্ছা হইল। কান্ধে গনে ল্যাজাডা হাতে লইয়া গুইলের পাছে পাছে ছেঅটল বছির পালোয়ান। গুইলডা ঢুইক্যা গ্যাছে একটা অধের মধ্যে। বছির পালোয়ানও গুইল শিকার না কইর‍্যা ছাড়বে না। ল্যাজা দিয়া অধের খুইট্যা খুইট্যা উঠাইতে আরম্ভ করল। কাণ্ড কি দ্যাহার লাইগ্যা অনেক লোক জমা অইল। বছির পালোয়ান খুইট্যা খুইট্যা মাটি উঠাইতেই আছে গুইলের পিঠ দ্যাহা মাত্তরই ল্যাজা দিয়া মারছে এক কোপ। কোপ মাইর‍্যা ল্যাজা টাইন্যা উঠাইল। ল্যাজার লগে লগে গুইল উঠছে ল্যাজার লগে গঁইথ্যা গুইলডা মইরা গেল। গুইলের পিঠে গনে ল্যাজা খুইজ্যা হালাইয়া ল্যাজাডা লগে গাঁইথ্যা। গুইলডা মইরা গেল। গুইলের পিঠে গনে ল্যাজা খুইল্যা হালাইয়া ল্যাজাডা কান্ধে হালাইয়া বড় একজন বীরের মতো লোকজনের দিগে চাইয়া রইল। লোকজন কয়, আপনি কি গুইলের চামড়ার ব্যবসা করেন নাকি? বছির পালোয়ান কয়, আমি গুইলের চামড়ার ব্যবসা করমু ক্যা? আমি অইলাম পালোয়ান মানুষ। আমার কাম অইছে জীব-জন্তুর শিকার করা। বছির পালোয়ান নাম হোনছেন ত। আমিই হেই বছির পালোয়ান। লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ কয়, না বছির পালোয়ানের নাম তো হুনি নাই। বছির পালোয়ান কয়, না হুইন্যা থাকলে এহন হোনবেন। শিকারে আমার হাত কিরহম পাকা নিজেগো চৌক দিয়াইত দ্যাখলেন। আমার পাকা হাতের লাইগ্যা চাইরেদিগেই আমার নাম আছে। কাইল রাইতেই ল্যাজার এক কোপে একটা ইন্দুর শিকার করছিলাম। হ্যাও আবার আন্ধারের মধ্যে। বছির পালোয়ানের কথা হুইন্যা লোকজন হাসতে হাসতে চইল্যা গেল। বছির পালোয়ানও আবার রাস্তা দিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল। গুইল মাইর‍্যা বছির পালোয়ানের মনে খুব আনন্দ অইল। পর পর দুইটা শিকার কইর‍্যা আনন্দে হ্যার বুক একেবারে ফুইল্যা উটছে। কান্ধের উপর ল্যাজাডা লইয়া ছিনা টান কইর‍্যা হাঁটতে লাগল। যাইতে যাইতে অনেক দূরে গ্যাছে। চত্তির মাইর‍্যা রৌদে সমস্ত শরীল ঘামাইতেছে আর প্যাটেও লাগছে খিদা। দ্যাহে রাজবাড়ির মতো একটা বাড়ি। বাড়ির পুহৈরের পারে দ্যাহে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। বটগাছ দেইখ্যা বটগাছের ছায়ায় যাইয়া বইল। বটগাছের ছায়ায় অনেকক্ষণ বইয়া জিরাইল। দক্ষিণাবাতাসে শরীল একেবারে ঠাণ্ডা অইছে। হাঁটতে হাঁটতে শরীল খুব কেলান্ত অইছে। গাছের তলায় হুইয়া পড়ল। শরীল কেলান্ত হওয়াতে ঐহানে একেবারে ঘুমাইয়া পড়ছে। অনেকক্ষণ পর ঘুমে গনে উইঠ্যা ইচ্ছা করল গামছায় বান্ধা লাড়ুতে গনে কিছু লাড়ু খাইয়া লইবে। হ্যার পর রাজবাড়িতে যাইয়া চাহরির সন্ধান করবে। ঘুমাইয়া উটছে। লাড়ু খাবার আগে হাত-মুখ ধুইয়া লওয়া দরকার। লাড়ু বান্ধা গামছাডারে বটগাছের গোড়ায় থুইয়া ল্যাজাডারে

www.pathagar.com

বটগাছের লগে ঠ্যাহাইয়া থুইয়া বছির পালোয়ান গেল পুহৈরের গাটে হাত-মুখ ধুইতে। শান বান্ধানো ঘাট। ঘাটে বইয়া ধীরে ধীরে হাত-মুখ ধুইয়া আইয়া দ্যাহে কি কোম্মে গনে একটা হাতি আইয়া গামছা সমেত হগল লাড়ুগুলা খাইয়া হালাইছে। লাড়ুগুলা খাইয়া হাতিটা যেহানে খাড়াইয়া আছিল হেইখানেই খাড়াইয়া রইছে। আর হাঁটে চলে না। বছির পালোয়ানের পেটে লাগছে খিদা। হ্যার লাড়ুগুলা খাইয়া হালাইছে হাতিতে। রাগের চোটে বছির পালোয়ানের চৌক-মুখ একেবারে লাল। কি করবে কিছু দিশা করতে পারে না। রাগের চোটে দিশা হারাইয়া লাফাইতে লাফাইতে যাইয়া হাতিডারে মারছে এক ঘুষি। ভীষণ জোরে ঘুষি মারছে। দ্যাহে যে হাতি একেবারে কাইতাইয়া পড়ছে। বছিরের তহন খেয়াল হইছে। ব্যাপার কি। হাতিও মোটেই লড়েচড়ে না। তয় কি হাতিডা মইর‍্যা গ্যাছে নাকি। খুব লক্ষ কইর‍্যা দ্যাখল। দ্যাহে সত্যইত। হাতিত মইর‍্যা গ্যাছে। কাণ্ড কি? বছির কিছুই ঠিক করতে পারে না। মনে মনে কয় আমিত এমন একটা বড় বীর না এমন বড় একটা পালোয়ানও না যে, আমার ধাক্কার চোটে একটা হাতি মারা যাইতে পারে। হাতিডা দ্যাখলাম লাড়ু খাইয়া খাড়াইয়া রইছে। একটা ঢ্যালা মারলাম হ্যাতেই হাতিডা কাইতাইয়া পড়ল। আমার হাতের ঠ্যালায়ই একট হাতি কাইত্যাইয়া পরতে পারে। না হ্যা অইতেই পারে না। বছির মহচিন্তায় পইর‍্যা গেছে। অনেক চিন্তা করতে আছে। চিন্তা করতে করতে ঠিক করলে সে হাতিডার নিশ্চয়ই কোনো ব্যারাম আছে। সন্ন্যাস রোগ অইয়াই হাতিডা মারা গ্যাছে। হ্যা না অইলে আর কিছু অইতে পারে না। হাতিডার নিছ্চয়ই সন্ন্যাস রোগ অইছে আর আমিও হেই সময়ই ঠ্যালা মারছি। বছিরত জানে না যে বিষের লাড়ু খাইয়া হাতি মরছে। বছির মহাচিন্তায় পইড়া গেল এহন। এই হাতিত নিচ্চয়ই এই রাজবাড়ির। আমি ঠ্যালা মারছি আর হাতিডা পইড়্যা মারা গ্যাছে এইয়া যদি কেউ দেইখ্যা থাহে হ্যা অইলেত আমারে খাইছে। হ্যা অইলেত অহনই আমারে ধরবে। মনে করেছিলাম এই রাজার বাড়িতে যাইয়্যা চাহরির অনুসন্ধ্যান করমু এহন চাহরির অনুসন্ধানত দূরের কথা, আমারেই লইয়া টানাটানি আরম্ভ অইবে। এই সব কথা চিন্তা করতে আছে বছির ঐহানে বইয়া বইয়া। রাজা হ্যার সিংহাসনে বইয়া দ্যাখছে এই ঘটনা। হে কোৎওয়ালেরে বোলাইয়া কয়, তুমি শিগরি যাইয়া ঐ হানে কি ব্যাপার অইছে দ্যাহ। আমি দ্যাখলাম আমার সাদা হাতিডা ঐ বটগাছের ধারে যাইয়া যেন কি খাইতে আছে আর একটা লোক হাতিডারে ঠ্যালা দিয়া কাইত কইর‍্যা হালাইছে। হাতিডা ঐ জায়গায় পইড়্যাই রইছে। এহন পর্যন্ত ওঠে নাই। এমন মানুষটা কোত্থে গনে আইলে যে হ্যার ধাক্কার চোটে হাতি কাইত্যাইয়া পড়ছে। এই লোকটা নিশ্চয়ই একজন বীর পুরুষ অইবে। হ্যা না অইলে হ্যার ধাক্কায় একটা হাতি কাইতাইয়া পড়বে ক্যা। তুমি তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্যাহ ব্যাপার কি। রাজার কাছে এই কথা হুইন্যা কোৎওয়াল দৌড়াইয়া গ্যাছে বটগাছের ধারে। যাইয়া দ্যাহে একটা লোক একটা ল্যাজা হাতে লইয়া বটগাছের তলায় বইয়া রইছে আর হাতিডা কাইতাইয়া পইড়্যা রইছে। কোৎওয়াল লোকটারে কয় তুমি রাজার হাতি মারছ। এহন বোঝবা আনে মজা। তুমি কত বড় বীর অইছ দ্যাহা যাইছে। বছির খুব সাহস কইর‍্যা কয় বীর অইছি না কি অইছি হ্যা আমি কেরৈত কইতে যাই নাই। আমার যে একেবারে সর্বনাশ করছে

www.pathagar.com

হাতিডি হেই বিচার রাজায় করবে না? লও দ্যাহি রাজার ধারে। আমি হ্যার কাছেই বিচার চামু। দ্যাহি কি বিচার করে রাজায়, তুমি না আইলেও আমি নিজেই রাজার কাছে যাইয়া বিচার চাইতাম। এই কথা কইয়াই ল্যাজাডা কান্দে লইয়া বছির পালোয়ান মেলা করছে রাজার কাছে বিচার চাইতে। বছির পালোয়ান যায় আগে আগে আর কোৎওয়াল যায় পাছে পাছে। কোৎওয়াল যাইয়া রাজার কাছে কয় মহারাজ হাতিডা মইর‍্যা গ্যাছে। এই লোকটাই হাতিডারে মারছে। বছির পালোয়ান কয় মহারাজ। আপনার হাতিতে আমার সর্বনাশ করছে। আমার বগু ট্যাহার মাল খাইছে আপনার হাতিডায়। আমি পালোয়ান মানুষ আমার এতগুলো ট্যাহার মাল খাওনে আমি রাগ কইর‍্যা হাতিডারে একটা ঠ্যালা মারছি। হাতিডা কাইত অইয়া পইড়্যা গ্যাছে, আমি কি মনে করতে পারছি যে আমার হাতের একটা ঠ্যালাতেই একটা হাতি পইড়্যা মইর‍্যা যাইবে। আমি কোনো মিথ্যা কথা কই নাই। এহন আপনার বিচার য্যা অয় হেইয়া করেন।

আপনার হাতিতে আমার অনেক ট্যাহার মাল খাইয়া হালানে আমার মন খুবই খঅরাপ অইয়া পড়ছে। আপনার হাতিতে আমার যে কি খ্যাতি করছে মহারাজ, হ্যা আমিই জানি। আমি বছির পালোয়ান, আমার জীবনে এই রহম বিপদে আর কোনদিন পড়ি নাই মজারাজ। রাজা কয়, তুমি কইতে আছ আমার হাতিতে তোমার অনেক ট্যাহার মাল খাইছে। তোমার হেই মাল দেবার সাধ্য আমার নাই। কারণ হাতিতে যা খাইছে হ্যা আমি এহন পামু কৈ। তুমিও আমার লাখ টাহার হাতিটা মাইর‍্যা হালাইছ। আমি হ্যাডারও বিচার করতে চায়লে পঞ্চাশ ট্যাহা মাস মায়নায় তোমার আমি রাখতে পারি। খাবা লবা, রাজবাড়িতে আর মাস মাস পঞ্চাশ টাহা ময়না পাবা। বছির পালোয়ান চাহরিতে বহাল অইল। রাজা বছিরকে খুব পছন্দ করল। মনে মনে রাজা ভাবে এই পালোয়ান আমার বাড়িতে থাকলে আমার অনেক কাজে লাগবে। রাজ খুশি অইয়া বছির পালোয়ানকে একটা পোশাক তৈয়ার করাইয়া দেছে। বছির পালোয়ান বিশেষ কোনো কাম নাই। রাজার বাড়িতে খায় দায় ঘুমায় আর রাজার দেওয়া পোশাকটা পইড়্যা রোজ বাজারের মধ্যে একবার টহল দিয়া আয় ল্যাজাডা কান্ধে লইয়া।

এদিকে রাজার রাইজ্যে একটা রাক্ষস আইয়া ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করছে। আইজ এক মহাল অইতে প্রজারা আইয়া কইয়া যায় রাক্ষসে আমাগো গ্রামছাড়া করছে। কাইল আবার আর এক মহাল হইতে লোকজন আইয়া রাজার কাছে কান্দকাটি কইর‍্যা জানায় গত রাত্তিরে রাক্ষসে আমাগো গ্রামের তিনজন খাইছে। মাঝে মাঝে রাক্ষস আজার বাজারের মধ্যে আইয়াও মানুষ খাইয়া যায়। রাজবাড়িতে আইয়া সমস্ত লোকজন কান্দাকাটি করে। রাজ্যের মধ্যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড আরম্ভ অইছে। লোকজন বাড়ি-ঘর ছাইড়া অন্য রাজ্যে যাইতে আছে রাক্ষসের ডরে। লোকজন সব ভয়েতে অস্তির। সব বাড়িতে কান্দাকান্দি। রাত্তিতে মানুষ ঘরে গনে বাইর অয় না। কারে কোনো সময় রাক্ষসে খায় হ্যার ঠিক নাই। রাজা পড়ছে মহা মুস্কিলে। রাক্ষস মারতে না পারলে রাজ্যই ছাড়া অইয়া যাইবে। অনেক লোকজন লাগাইছে রাক্ষসের তালাশে। রাজ্যের দক্ষিণ দিগে একটা মস্ত বড় জঙ্গল আছে। দিনের বেলায় রাক্ষস থাহে হেই জঙ্গলে। হেই জঙ্গলে রাক্ষস বিচরাইতে যাইবে এমন সাহস কারো নাই। হেই জঙ্গলে রাক্ষস

www.pathagar.com

বিচরাইতে যাওয়াও যে কথা আর ইচ্ছা কইর‍্যা মরতে যাওয়াও হেই কথা। রাজ্যে যদি প্রজাই না থাহে হেই রাজ্যে রাজা থাকবে কেমন কইর‍্যা। রাজা কোনো কূলকিনারাই পায় না। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। দিন-রাইত রাজার মন অস্তির। চিন্তা কইর‍্যাই কুলাইতে পারে না। রাজা রাজ্যের লোকজনের জানাইয়া দিল যে রাক্ষস মারতে পারেব হ্যার লগে রাজকন্যার বিয়া দেবে আর হ্যারে রাজ্যের অর্ধেক লেইক্যা দেবে। আর কোনো উপায় নাই দেইখ্যাই রাজা এই প্রস্তাব দেতে বাধ্য অইছে। এই প্রস্তাবেও কেউ সারা দেয় না। কেডা যাইবে রাক্ষস মারতে। রাজকন্যার বিয়ার আশায় কেডা যাইবে জান খুয়াইতে? কোনো লোকই রাক্ষস মারতে স্বীকার করে না। সকলেই কয় মানুষে পারে নাকি রাক্ষস মারতে। অসম্ভব কথা। বছির পালোয়ান মনে মনে ভাবে এই এটা মস্ত বড় সুযোগ। রাক্ষসডারে মারতে পারলে রাজকন্যার বিয়া করতে পারতাম আবার রাজ্যেরও পাইতাম অর্ধ আনী। হ্যা অইলে আমি বছির জোলা এক চোটে বছির বাদশা অইয়া যাইতে পারতাম। তয় আমার আম কি রাক্ষস মারা! যে রাক্ষস মানুষ খায় হেই রাক্ষস কি আর আমি মারতে পারি। আমি যে কেমন পালোয়ান হ্যাত আর কেউ জানে না। জীবনে মারছি একটা ইন্দুর আর একটা গুইল। হেইয়ার পর নিজেই নাম কালাইতে আমি পালোয়ান। একবার চেষ্টা কইর‍্যা দ্যাখলে মন্দ অয় না। রাক্ষস কোনো রহম মইর‍্যা গেলেও কাম অইবে। হাতিটা যে রহম মরছে রাক্ষসডাও তো ঐ রহম মরতে পারে। যাই একবার রাজার কাছে কই- যাইয়া দ্যাহি। এই চিন্তার পর বছির রাজার কাছে যাইয়া কয় আমি এত দিন কিছু কই নাই। এহন দ্যাহি যে এই রাজ্যের মধ্যে এমন কোনো লোক নাই যে রাক্ষস মারতে পারে। একটা লোকেরও সাহস নাই। আমারে হুকুম দেলে আমি চেষ্টা কইরা দ্যাখতাম রাক্ষসডারে মারন যায় কিনা। রাক্ষডায় খুবই উৎপাত আরম্ভ করছে। রাজা কয় তুমি চেস্টা কররৌ ভালোই অয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করছি হ্যা ঠিকই থাকবে। রাক্ষস যে মারতে পারবে হ্যার লগে রাজকন্যার বিয়া দিমু আর রাজ্যের অর্ধ আনি দিমু হ্যারে। বছির পালোয়ান কয় আচ্ছা আমি চেষ্টা কইর‍্যা দেখমু। এই কথা কইয়া বছির চইলা গেল। রাজবাড়ির দরজার মাথায় রাস্তার পাশে যে বউল গাছ আছে বছির পালোয়ান রাত্তিরে যাইয়া ওঠলে হেই গাছে। গাছে উইঠ্যা একেবারে আগায় যে ডাল আছে হেই ডালের লগে নিজেকে একটা দড়ি দিয়া শক্ত কইর‍্যা বাইন্ধ্যা ল্যাজাডা হাতে লইয়া রাক্ষস মারবার লাইগ্যা বইয়া রইল বউল গাছের ডালের উপর। অনেক রাত্তির অইছে। সমস্ত মানুষ ঘুমাইছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নাই। চাইর দিকে একেবারে নিঝুম। বছির পালোয়ান একলা বাউল গাছের উপর বইয়া রইছে। একটু ভয় ভয়ও করে আবার ঘুমেও ধরে। বইল্যা বইল্যা জানাক। বছির পালোয়ান গাছে বইয়্যা দ্যাহে দক্ষিণ দিগে গনে কি যেন একটা দৈত্যের মতো রাস্তা দিয়া আইতে আছে। আইতে আইতে একেবারে বউল গাছের গোড়ায় আইয়া থামেছ। মুনিষ্যের গন্ধ পাইয়া ঐ হানে থামছে। ঐহানে থাইম্যা চাইরে দিগে চায়। মুনিষ্যের গন্ধ পায়। মুনিষ্যে দ্যাহে কোনো দিগে। হ্যার পর রাক্ষসটা উপরের দিকে চাইয়া দ্যাহে গাছের উপর একটা মানুষ বইয়া রইছে। গাছের উপরে মানুষ দেইখ্যা রাক্ষস গাছে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। রাক্ষসজাত গাছে উঠতে পারে না। এহন উপরের দিগে চাইয়া হা কইর‍্যা রাক্ষসটা গাছ ধইর‍্যা লারাইতে আছে।

www.pathagar.com

ব্যাপার দেইখ্যা বছির পালোয়ানের কাঁপ ওঠছে। ডরে বছিরের সমস্ত শরীল কাঁপতে আছে। কাঁপলেন চোডে বছির পালোয়ানের হাতে গোপনে ল্যাজাডা আছে। ছুইট্যা রাক্ষসের মুখের মধ্যে পইড়্যা গলা দিয়া একেবারে প্যাট ভঅরাইয়া গ্যাছে। রাক্ষসটা চিক্কের দিয়া কাইতাইয়া পইড়্যা গ্যাছে। কাইত্যাইয়া পড়ার লগে লগেই রাক্ষস মইর‍্যা গ্যাছে। বছির পালোয়ান এহন আর রাক্ষসের আলাপ পায় না। বছিরের কাঁপনও থামছে। এদিকে রাইতও পোয়াইয়া গ্যছে।

বছির পালোয়ান আস্তে আস্তে গাছে গনে নাইম্যা দ্যাহে রাক্ষস মইর‍্যা গ্যাছে। রাক্ষস মইর‍্যা গ্যাছে দ্যাইখ্যা বছির পালোয়ান 'খবরদারি' কইর‍্যা এমন এক ডাক মারছে সে ডাকের আওয়অজ হুইন্যা রাজবাড়ির আর বাজারের সমস্ত লোকজন দৌড়াইয়া আইছে ব্যাপার কি দেখার জন্য। হ্যারা আইয়া দ্যাহে বছির পালোয়ান মরা রাক্ষসডার চাইরে দিগে ঘুইর‍্যা লাফাইতে আছে আর জোরে জোরে ডাক মারতে আছে। লোকজন দ্যাহে অবাক কাণ্ড। বছির পালোয়ান রাক্ষস মারছে। বছিরের মুখে কোনো কথা নাই। কেবল লাফায় আর হাঁক দেয়। বছির পালোয়ান যে পাগল হইয়া গ্যাছে। বছির পালোয়ান রাক্ষস মারছে এই খবর রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ছে। অনেক দূরে গনে মানুষ আইছে রাক্ষস মারছে হেইয়া দেখতে। রাক্ষস মারা পড়ছে হুইন্যা রাজাও দেখতে আছে। রাক্ষস মারা পড়লে রাজা প্রজা সবাই খুব খুশি। চাইরে দিকে বছির পালোয়ানের খুব নাম পইড়্যা গ্যাছে। হগলেই কয় বছির পালোয়ানের মতো বীর ভূ-ভারতে আর নাই। রাজা খুব খুশি অইয়া বছির পালোয়ানের লগে রাজকন্যার বিয়া দিল। আর রাজ্যের অর্ধেক লেইখ্যা দিল বছির পালোয়ানের নামে। বছির পালোয়ানের এহন আর কেউ পালোয়ান কয় না। হগলেই কয় রাজার জামাই। রাজার জামাইয়া হে এহন জামাইর মতই চলে। হগলেই জামাইর মতো সম্মান করে।

রাজকন্যারে লইয়া খুব আনন্দে সুখ-ভোগ করতে আইছে। রাজ্যের কাজ-কাম সবই এহন জামাই করে। রাজা বুড়া মানুষ। মাঝে মাঝে দ্যাহে কাজকর্ম কীভাবে চলতে আছে। এইভাবে আনন্দে বছিরের দিন কাটতে আছে। এমন সময় রাজবাড়িতে আর এক বিপদ আইয়া উপস্থিত। ডাকাইতেরা রাজার নামে এক চিঠি দেছে সাতদিনের মদ্যে রাজার বাড়িতে ডাকাতি অইবে। রাজবাড়িতে মহাবিপদ। সবাই কান্দাকাটি করে। ডাকাইতে আইয়া ত সব লুইট্যা লইয়া যাইবে। ডাকাইতেরা খুন-জখমও করতে পারে। মহা অনুপায়। এবার কেডা রক্ষা করবে। সব লোকজন বোলাইয়া রাজা জিগাইল কি করা যায়। কেউ কোনো উত্তর দিতে পারে না। রাজা পড়ছে মহাচিন্তায়। বাড়ির হগলের কান্দাকাটিতে রাজা টিকতে পারে না। জামাইরে বোলাইয়া রাজা জিগাইল কি করা যায়? জামাই কইল ডরের কিছু নেই। ডাকাইতে কিছু করতে পারবে না। আমার ল্যাজা ত আছেই। এইবার ডাকাইতগো দেইখ্যা লুম ক্যাম্নে ডাকাতি করে। জামাই নিজেই ল্যাজাডায় ধার দিয়া রাখল। জামাইয়ের কথায় রাজা কিছু ভরসা পাইলেও রাজবাড়ির অন্যান্য হগলের মনে ভয় যায় না। হগলের মনেই দিন-রাত হা-হুতাশ। কারো খাওয়া-দাওয়া নাই। রাইতে কারো চৌকে ঘুম নাই। সব সময়ই কান্দাকাটি। আমাই হগলের নানা কথা কাইয়া বুঝ দেয়। জামাই এত বুঝায় কিছুতেই অয় না। সত্য সত্যই এক রাত্তিরে ডাকাইত আইয়া উপস্থিত।

www.pathagar.com

চাইর দিগে মশাল জ্বালাইতেছে। ধর ধর মার মার কইর‍্যা ডাকাইতেরা রাজবাড়ির দিগে আইতে আছে। হগলেই ডরে অস্তির। জামাইর মনেও খুব ডর আইয়া গ্যাছে। ডাকাইত কিছুতেই ফিরান যাইবে না। জামাই রাজকন্যারে কয় এহানে থাকলে ডাকাইতেরা আমাগো খুন কইরা হালাইবে। চল আমরা একটা ঘোড়ায় চইড়্যা অন্য জায়গায় যাই। সত্যই জামাই রাজকন্যারে লইয়া গোপনে পিছের দুয়ার দিয়া একটা ঘোড়ায় চইড়্যা বাড়ির বড় অইছে। রাজবাড়ির ব্যার পারাবার লইগ্যা ঘোড়ায় দেছে এক লাফ। জামাই ঘোড়ার পিঠে গনে ব্যারের মধ্যে পইড়্যা কয় ব্যার ব্যার। ডাকাইতেরা ব্যার ব্যার আওয়াজ হুইন্যা কয় আমাগোত ব্যার দিতে আছে। এই কথা মনে ভাইবা ডাকাইতেরা পলাইতে আরম্ভ করছে। জামাই তাড়াতাড়ি আইয়্যা ল্যাজাডা কান্ধে লইয়া রাজবাড়ির উঠানে লাফায় আর কয় ডাকাইতগুলোরে ধাওয়াইছি। জামাই হের ল্যাজা দিয়া ডাকাইত ফিরাইছে দেইখ্যা হগলেই মহাখুশি। বিপদ কাইট্যা গ্যাছে দেইখ্যাহগলের মনেই আনন্দ। রাজার মৎনেও খুব আনন্দ। রাজা মনে করল জামাই খুবই উপযুক্ত কথা কইছে। আমি এখন বুড়া অইছি। আমার আর রাজবাড়িতে কাম নাই। রাজার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। রাজদাইর বাকি অর্ধ আনীও জামাইরে লেইখ্যা দিল। জামাই এহন ষোল আনা রাজত্বের মালিক অইয়া বইল। এহন জামাইর নাম অইল বছির বাদশা। বছির জোলা বাদশা অইল।

নকীব রাফেজা ও পরির কাহিনি

এক দেশে এক রাজা আছিল। সেই রাজার একটা পোলা আছিল। পোলার নাম নকীব। এখন পোলা বড় অইছে। এখন রাজার পোলারে বিয়া করাইবে। কিন্তু রাজায় অনেক মাইয়া দেখল। বিভিন্ন দেশের রাজার বিভিন্ন মাইয়াও দেখল। কিন্তু একটা মাইয়াও পছন্দ অইল না। ঐ মাইয়াগো একটা দিক পছন্দ অয় তো অন্য দিক পছন্দ অয় না। এইভাবে অনেক মাইয়া দেখা সত্ত্বেও একটা মাইয়াও পছন্দ অইল না।

এখন রাজায় হের পোলার অনেকগুলি ছবি তুইল্যা এখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজার ধারে পাডাইয়া দিল। আর ওদিকে এক দেশে এক রাজা ছিল। হের রাজত্ব অইল এক বিরাট পাহাড়ি এলাকা লইয়া। এই রাজার এক মাইয়া আছিল। মাইয়াডার নাম রাফেজা। এই মাইয়াডা অপরূপ সুন্দরী। এর এমন কোনো অঙ্গই আছিল না যার মইদ্যে কোনো খুঁত আছে। মোডের উপরে মাইয়াডা তহনকার দিনেই খুব বিরলই আছিল। হের রূপ দেখলে চক্ষু ঝলসে যাইতে চায় এমন রূপই আছিল হেই মাইয়ার। এখন এই মাইয়ার বাপেতে পোলা খোঁজতে লাগল মাইয়া বিয়া দিবার লাইগ্যা। কিন্তু এই মাইয়ার বাপেরত কোনো পোলাই পছন্দ অয় না। হে অনেক রাজার অনেক পোলাই দেখল কিন্তু একটা পোলাও হের পছন্দ অইল না। পছন্দ না হওয়ায় হে ঐ মাইয়ার অনেকগুলো ছবি তুইল্যা বিভিন্ন দেশে দেশে বিভিন্ন রাজার পোলার ধারে পাডান অইল। এখন ঐ রাজার পোলা নকীবের ধারেও ঐ রাজার মাইয়া রাফেজার একটা ছবি গেল। আর ঐ রাজার পোলা নকীবের একটা ছিব ও রাজার কাছে আইল।

এহন নকীবের ছবি দেইখ্যা এই রাজার খুবই পছন্দ অইল। রাজায় ভাবল যে, এই পোলার ধরেই হের মাইয়া বিয়া দেবে। এইয়্যা ভাইব্যা হে এই নকীবের বাপের ধারে

www.pathagar.com

একটা চিঠি লিখল। আর ওদিকে নকীবের বাবার ঐ রাফেজার ছবি দেইখ্যা হের খুব পছন্দ আওয়ার পর হেও ভাবল যে, যেভাবেই অউক এই মাইয়া হের পোলার লইগ্যা আনতে অইব। হেইতে যা লাগে। এইয়্যা হে ঐ রাফেজার বাবার ধারে একখানা চিঠি লিখল। রাফেজার বাবা হের পছন্দ করা জামাইর বাবার হাতের চিঠিতে বিয়ার প্রস্তাব দেখতে পাইয়া আনন্দে আটখান। আর ওদিকে নকীবের বাপে হের পছন্দ করা পোলার বউর বাপের হাতের পত্রতে বিয়ার প্রস্তাব দেইখ্যা হেও খুশিতে আটখানা অইয়া গেল। হেরা উভয়ই সম্মতি জানাইয়া আবার পত্র দিল। দেওয়ার পর হেরা দুই রাজায় একসাথে বিয়ার কথাবার্তা পাকাপাকি কইর‍্যা ফারাইল। এরপর দিন ঠিক অইয়া গেল।

নিদিষ্ট দিনে বিয়া অইয়া গেল। নকীব রাফেজারে বিয়া কইর‍্যা বাড়ি লইয়া আইল। নকীবের আবার শিকারের খুব নেশা আছিল। তাই হে বিয়া কইর‍্যা বউ লইয়া বাড়ি আওয়ার পর দিনই শিকার করতে বন্দুক লইয়া বনে চইল্যা গেল। যাইয়া শিকার করতে লাগল। শিকার করতে করতে সন্ধ্যা অইয়া গেল। তহন নকীব বাড়ি ফিরা আইতে লাগিল। ঠিক এমন সময় হে দেখতে পাইল যে, বনের একপাশে একটা মাইয়া বইয়া রইছে। মাইয়াডা অপরূপ সুন্দরী। এই মাইয়ারে দেইখ্যা রাজার পোলা নকীব হের রূপে মুগ্ধ অইয়া গেল।

তহন হে এক দৃষ্টিতে কতক্ষণ মাইয়াডার দিকে চাইয়া রইল। হেইয়ার পর হে আস্তে আস্তে ঐ মাইয়াডার কাছে গেল। যাইয়া হে মাইয়াডারে যেই হাত দিয়া ধরতে গেল অমনি মাইয়াডা একটা কাক অইয়া গেল। এহন কাক হইয়া হে উড়াল দিল। উড়াল দেওয়ার পর ঐ রাজার পোলা নকীবও হের পিছে ছুটল যে, কোথায় যায়।

এই রকম যাইতে হে অনেক দূর পর্যন্ত গেল। যাইয়া দেখে যে, কাকটা একটা কাঠুর‍্যার ঘরের চাইরো পাশে ঘুরতে লাগল যে, কাকটা কোনো সময় বাইর অয়। এই রকম যে অনেকক্ষণ কাঠুর‍্যার ঘরের চাইরো পাশে লাল গে, কাকটা বাহির অয় নাহি। কিন্তু কাক বাহিরই অয় না।

এদিকে রাত অইয়া গেল। রাতেও ঐ রাজার পোলা নকীব অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোনো সময় কাঠুইর‍্যার ঘরে গনে বাইর অয়। কিন্তু হে রাত্তিরও কাইট্যা গেল। কিন্তু কাক আর বাইর অয় না। হতন হে রাত্তির কাইট্যা গেল। ভোর অইল। এখনও রাজার পোলা নকীব অপেক্ষা করতে লাগল যে, কাক বাইর অয় নাহি। কিন্তু কাকতো কিছুতেই বাইর অয় না। এমন সময় ঐ কাঠুইর‍্যার বউ ঘরে গনে বাইর অইল। এহন রাজার পোলা নকীব হেরে দেখতে পাইল। নকীব দেখল যে, কাঠুর‍্যার বউর পেটে উঁচা। তহন হে ভাবল যে, কাইল গো বহন শিকার করতে আইছিলাম, তহন তো দেখলাম যে, কাঠুর‍্যার বউর পেট উঁচা না। কিন্তু আইজগা এরহম কাঠুর‍্যার বউর পেট উঁচা অইল কেমন কইর‍্যা তা অইলে নিশ্চয়ই ঐ কাক যে, কাঠুর‍্যার ঘরে ঢুকতে দেখছি, হেই কাকই যাইয়া কাঠুর‍্যার বউর পেটে ঢুকছে। এ ছাড়া আর কিছুই অয় নাই। ঠিক এই কামই অইছে। না অইলে কাক বা কাঠুইর‍্যার ঘরে ঢুইক্যা আর বাইর অইব না ক্যা? আর কাঠুইর‍্যার বউর পেট উঁচা অইবে ক্যা? নিশ্চয় ঐ কাক যাইয়া কাঠুর‍্যার বউর পেটে ঢুকছে। এইয়া ভাইব্যা তহন হে কাঠুর‍্যার কাছে গেল। যাইয়া এহন হে কাঠুর‍্যার কইল ও কাঠুর‍্যা তোমার বউর তো সন্তান অইবে।

www.pathagar.com

তহন কাঠুর‍্যা কয়-অইলে অইবে। সন্তান অইবে হেতে আর কি আছে। তহন রাজার পোলা নকীব কয়: তয় তোমার পোলা অইলে তুমি আমার নগে দোস্ত বানাব। আর মাইয়া অইলে আমার ধারে বিয়া দিবা।

কাঠুর‍্যা কইল যে, আচ্ছা দিমু।

তহন রাজার ছেলে আর কিছু কইল না। তহন যে যাইয়া ঐ বনেই অপেক্ষা করতে লাগল যে, কবে কবে দশ মাস দশ দিন উত্তীর্ণ অয়। হে এখন আর কাঠুর‍্যার বাড়ির চাইরো পাশ দিয়া লড়ে না। এহন দেখতে লাগল যে, কবে কাঠুইর‍্যার সন্তান অয়।

এহন এই রহম অপেক্ষা করতে করতে একদিন দশ মাস দশ দিন পর অইল। এহন ঐ কাকটায় ঐ কাঠুইর‍্যার বউর পেটের মাইদ্যে বইয়া ভাবল যে, আজি তো দশ মাস দশ দিন পার অইয়া যায়। আইজতো আর আমি কাঠুইর‍্যার বউর পেটের মধ্যে থাকতে পারি না। আইজতো আমার বাইর অইতে অয়।

এইয়া ভাইব্যা হে কাঠুইর‍্যার বউর পেট দিয়া বাইর অইল। এহন সবাই এই সন্তান দেইখ্যা তো অবাক। হেরা ভাবল যে, মানুষের পেটের মধ্যে কাক অইল কেমন গনে।

এহন ঐ রাজর পোলা নকীব ঐ কাঠুইর‍্যার কাছে আইল। আইয়্যা কইল: কি মিয়া কাঠুইর‍্যা তোমার লগে আমার কথা আছিল কি?

তোমার লগে আমার কতা আছেল না যে, তোমার পোলা অইলে আমার লগে দোস্ত পাতায়া আর মাইয়া অইলে আমার ধারে বিয়া দিবা। হেয় তোমার বাউর কি সন্তান অইল? আইজতো দশ মাস দশ দিন পার অইয়া গেল।

তহন কাঠুইর‍্যা কইল: সন্তান অইয়া গেল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমার যে সন্তান অইছে, হেয়াতো তোমার লগে বন্ধু পাতানোর মতোও না। আর বিয়া দেয়ার মতোও না। আমার বউর পেটে একটা কাক সন্তান অইছে। এহন হেডা আপনার লগে বন্ধু বানাইয়া দিমু কেমন কইর‍্যা, আর বিয়া দিমু কেমন কইর‍্যা? মানুষের লগে কি কাকের বিয়া দেওয়া সম্ভব?

তহন রাজার পোলা কইল: অসম্ভব কেন? মানুষের যহন একটা কাক অইতে পারছে তহন মানুষের লগে কাকের বিয়া অইতে পাইরব না কেন? আমি বিয়া করমু।

তহন কাঠুইর‍্যা বাবল যে, কাকটাকে ঘরে রাখলে তো হের ক্ষতি ছাড়া লাভ অইবে না। এহন এই রাজার পোলায় যহন হেই কাকই বিয়া করতে চায় তহন আমার বিয়া দিতে ক্ষতি কি। বিয়া দিলে তাও একটি ঝঞ্ঝাট যায়। এইয়্যা ভাইব্যা হে রাজার পোলার লগে আর ঐ কাকটার লগে বিয়া পরাইয়া দিল।

এই ঐ রাজার পোলা কাকটারে বিয়া কইর‍্যা কাকটারে লইয়া বাড়ি আইল।

আইল পর এহন সবাই কাকটা দেইখ্যা জিগাইল যে ওডা কি? তহন রাজার পোলা নকীব সবাইর কতার জবাবে কইল যে, এডা আমার বউ। তহন সবাই এইয়া হুইন্যা হাসতে লাগল। আর হেরা ভাবল যে, রাজার পোলার মাথা খারাপ অইয়া গেছে।

তহন রাজার পোলার বাড়ি আইয়া এহন আর হে আগের বউরে ভালোবাসে না। এহন হে বড় বউরে ঢেঁকির ঘরে জায়গা দিল। ঘরে আর থাকতে দিল না। আর বড় বউরে এক মুঠ চাউলের ভাত দিল। আর একটা কইর‍্যা কাঁচা কলা সিদ্ধ কইর‍্যা দিত ঐ ভাত খাইতে।

www.pathagar.com

এই রকম কষ্ট দিতে দিতে একদিন বড় বউর বাপের বাড়ি এই খবর যাইয়া পৌঁছল।

এই খবর পাইয়া বড় বউর ভাই আইয়া বড় বউরে বাপের বাড়ি লইয়া গেল। এহন বড় বউ বাপের বাড়ি যাইয়া থাকতে লাগল।

আর এদিকে রাজার ছেলের কাক বউ রোজ ভোর অইলে যখন রাজার ছেলে বাইরে চইলা যায়, তহন হে কাকে গনে মানুষ অইয়া যায়।

এই মানুষ অওয়ার একটা পদ্ধতি আছিল।

ঐ কাক বউর একটা পোশাক আছিল। পোশাকটা পরলে কাক বউ কাক অইয়া যাইত। আর পোশাকটা খুইল্যা থুইলেই হে আবার মানুষ রূপ ধরত।

এহন রোজ যহন রাজার পোলা ঘর দিয়া বাইর অইয়া যাইত। তহন ঐ কাক কাক পোশাক খুইল্যা ফালাইত। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অইয়া যাইত।

মানুষ অইয়া হে বাড়ির কাজকর্ম করতে থাকতে। আর যহন রাজার পোলা নকীব বাড়ি আওয়া ধরত তহন কে বোঝতে পারত যে নকীব আইতে আছে। তহন হে আবার দৌড়াইয়া হের ঐ পোশাক পরত। পোশাক পইর‍্যা হে আবার কাক অইয়া বইয়া থাকত।

আর রাজার পোলা নকীব এর কিছুই বুঝতে পারত না। হে বোঝাত যে, এ বুজি হের হেই কাকটাই তার আর কিছুই কইত না।

আর ওদিকে বাড়ির সব লোক যহন দেখতে পারল যে কাক মানুষ অইয়া কাম কাইজ করে, তহন হেরা এইয়া দেইখ্যা অবাক অইয়া যায়। তহন হেরা এত রহস্য জানবার লাগ্যা কৌতূহলী অইয়্যা পরে। এই রহম অনেক দিন কাইট্যা যায়। একদিন রাজার ছেলে নকীবের কানে এই খবর গেল যে, কাকে রোজ মানুষ অইয়া বাড়ির কাজকর্ম করে। তহন নকীব ফন্দি করতে লাগল যে, কিভাবে ঐ কাকের মানুষ অবস্থায় যহন থাকে তহন ধইর‍্যা ফালান যায়।

হে খালি সুযোগ বিচারাইতে থাকে যে কিভাবে ঐ কাকেরে মানুষ অবস্থায় হাতে-নাতে ধইর‍্যা ফালান যায়। তাই হে এক একদিন ভান কইর‍্যা হের কাক বউরে দেহাইলে যে হে বাইরে যাইতে আছে। কিন্তু আসলে হে বাইরে গেল না। হে ঐ কাক বউর কোডার পাশেই রইল।

হে কেবল অপেক্ষা লাগল যে, কোনো সময় ঐ কাক বউ মানুষ অইয়া ঐ কোনা দিয়ে বাইর অইবে। আর তহনেই হে ঐ মানুষ অবস্থায় হের বউরে হাতে নাতে ধইর‍্যা ফালাইবে। আর যে সমস্ত পোশাক পইর‍্যা হে কাক অয়, হেই সমস্ত পোশাক পোড়াইয়া ফালাইবে। এই রহম ভাইবা হে ঐ কাক বউ যে কোডায় থাকত হে কোডারই পাশে চুপে পলাইয়া রইল।

কিন্তু এদিকে ঐ কাক বউ বোঝতে পারল যে, রাজার পোলায় হের কোডার পাশেই পলাই আছে। আর এহন যদি হে মানুষ অইয়া নামে তা অইলে রাজার পোলায় হেরে ধইর‍্যা ফালাইবে। এইয়া ভাইব্যা হে আর মানুষ অইল না। হে কাক অইয়াই বইয়া রইল। তহন রাজার পোলায় সারাটা দিন অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোনো সময় ঐ কাক বউ মানুষ অইয়া নামে। আর ওদিকে কাক বউত এইয়া টের পাইয়া সারা দিন মানুষ অইল না। হে দিন হে কাকই রইল।

www.pathagar.com

এহন রাজার পোলায় অনেক অপেক্ষা করল। কিন্তু হে দেখলে যে ঐ কাক বউ আর মানুষ অইয়া বাইর অয় না। এই রহম অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা অইয়া গেল। তহনও যহন ঐ কাক বউ মানুষ অইয়া বাইর অইল না, তহন রাজার পোলা নকীব ভাবল যে, কাক বউ আর মানুষ অইয়া বাইর অইবে না।

তহন এইয়া ভাইব্যা হে আর অপেক্ষা করল না। হে বাড়ির মইদ্যে আইয়া পড়ল।

এরপরও কয়েকদিন রাজার পোলা নকীব এই রহম পলাইয়া অপেক্ষা করল যে, ঐ কাক বউ মানুষ অয় কিনা, হেইয়া দেখবার জইন্যে। কিন্তু এ কয়দিনও ঐ কাক বউ বোঝতে পারল যে, রাজার পোলা পলাইয়া রইছে। তাই হে এ কয়দিনও আর মানুষ অইল না, তহন হে বিরক্ত অইয়া আর ওরহম অপেক্ষা করল না পলাইয়া পলাইয়া।

হে বোঝতে পারল, কাক বউ এডা ধরতে পারছে যে, হে ঐ জায়গায় পলাইয়া থাহে কাক বউ মানুষ অয় হেইয়ার অপেক্ষা করে। তহন হে এইয়া বোঝতে পাইর‍্যা আর কাক বউ মানুষ অয় কহন হের জইন্য অপেক্ষা করে না।

এইভাবে কইতে কইতে দীর্ঘ বারো বছর কাইট্যা যাইতে লাগল। বারো বছরের আর মাত্র চাইর দিন বাকি আছে আর চাইর দিন পর বারো বছর পুরো অইবে। এহন ঐ কাক বউ আছিল এক পরি। এই পরির আছিল সাত বুইন। এই পরি অইল ছোট বুইন। এই পরিরা সাত বুইনে আসমানে হেগো রাইজ্যে বইয়া নাচ করত।

হেগো এইটা নিয়ম আছিল। হেরা কোনো পুরুষ মানুষের উপরে নজর ফালাইতে পারত না। যাদি হেরা কেউ কোনো পুরুষ মানুষের উপর নজর ফালাইত হে অইলে ঐ সাত বুইনের সমাজে গনে বাদ দিয়া দেওয়া অইত।

অথবা হেরে শাস্তি দেওয়া অইত।

কারণ হেরা যদি কোনো পুরুষ উপর নজর ফালাইত হে অইলে হেগো সতীত্ব নষ্ট অইয়া যাইত।

এহন এই ছোড পরি (কাক বউ) একদিন আসমানে হেগো রাইজ্যে বইয়া হেরা সাত বুইনে নাচ করতে আছিল। এমন সময় ঐ ছোড পরির নজর পরে দুনিয়ায়। যে বনে ঐ রাজার পোলা নকীব শিকার করতে আছিল।

নজর পরা মাত্তর বাকি ছয় বুইনে ওরে দুনিয়ায় নামাইয়া থুইল। আর কইল যে, তোমার বারো বছরে তুমি আর আমাগো রাইজ্যে আইতে পারবা না।

এই বারো বছর এর তোমার রথ পাডাইয়া দেওয়া অইবে। আনবার লাইগ্যা হেও এই শর্তে যে, তুমি যদি বারো বছর সতী থাকতে পারো, হে অইলে তোমাতে আমাগো রাইজ্যে আনা অইবে। না অইলে তুমি যদি এই বারো বছরের মইদ্যে অসতী অইয়া যাও, হে অইলে তোমার আর কোনোদিন আমাগো রাইজ্যে আনা অইবে না। তোমার জীবনই হে অইলে ঐ দুনিয়ায়া কাডাইতে অইবে।

এইয়া কইয়া হেই বাকি ছয় পরি হেরে ঐ বনে ফালাইয়া থুইয়া হেরা চইল্যা গেল হেগো রাইজ্যে। এইয়ার পর ঐ রাজার পোলা নকীবের লগে হের দেখা অইছিল এবং নকীব হেরে বিয়া করছিল।

এহন এই বারো বছর যাতে হে অসতী না অইতে পারে হেই জইন্যে কাক অইয়া রাজার পোলার কাছ অইতে এড়াইয়া রইছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু যেদিন হের বারো বছরের চাইর দিন বাকি হেইদিন হে ভাবল যে, আইজতো আমার বারো বছরের চাইর দিন বাকি। তয় আমার রথ তো আইজগা আইবে আনে। কারণ আমাগো রাইজ্যে যাইতে যাইতে তো আমার চাইর দিন লাগবে আনে। কাজেই এইয়া ভাইব্যা ঐ কাক বউ (ছোট পরি) ভাবল যে, আইজগা আমি রাজার পোলার ধারে গিয়া আমার সকল ঘটনা হের ধারে কইয়া যামু। কারণ এতদিন হের ধারে রইছি এহন হের ধারে কইয়া না গেলে কেমন দেহায়। হেডা খুবই খারাপ দেখায়। আর রাজার পোলায় বা আমি যদি না কইয়া যাই হে অইলে ভাববে কি। আর আমি না কইয়া গেলে হে মনে দুঃখ পাইবে।

যদিও আমি হেরে ভালোবাসি নাই। তবুও হেতো আমারে ভালোবাসছে। কাজেই আমি যদি এখন না কইয়া যাই, হে অইলে হে খুব মনে আঘাত পাইবে। হের চাইয়া আইজ আমি হের ধারে কইয়া বইল্যা নিয়া যাই। হেইয়াই ভালো অইবে।

এইয়া ভাইব্যা হে আইজ মানুষ অইয়া বাড়ির নানান কাইজ করল। কইয়্যা এহন হে রাজার পোলার ধারে ধরা দেবার জইন্যে আর হে কাকের বেশ ধরে না।

হে মানুষ অইয়াই অপেক্ষা করতে লাগল যে কহন রাজার পোলা নকীব বাড়ি আয়।

অপেক্ষা করতে করতে একসময় নকীব বাড়ি আইয়া আরল। বাড়ি আইয়া হে কাক বউরে মানুষ বেশে দেইখ্যা আর আর হেরে চিনতে পারল না। চিনতে না পাইর‍্যা হে হঠাৎ একটা অপরিচিত মাইয়ালোক হের ঘরে দেখতে পাইয়া হে থ খাইয়া খাড়াইয়া রইল। তহন হে আর সামনে আউগ্যাল না। হে মাথা নত কইর‍্যা ঐ জায়গায়ই খাড়াইয়া রইল। তহন এইয়া দেইখ্যা ঐ কাক বউ বোঝতে পারল যে রাজার পোলায় হেরে চিনতে পারে নাই। হেইতে ঐ রহম করতে আছে। তাই হে রাজার পোলারে কইল, আমারে আপনি চিনতে পারলেন না? আমি অইলাম হেই যে, আপনারই ঘরে এতদিন কাক বউ হিসেবে আছিলাম এবং যারে আপনি অনেকদিন চেষ্টা কইর‍্যাও মানুষ বেশে ধরতে পারেন নাই। হেই কাক বউই আজ নিজেই ইচ্ছা কইর‍্যা আপনার লগে মানুষ বেশেই ধরা দেছে।

আমার ধরা দেওয়ার কারণ অইল এই যে আইজ আমি আমার রাইজ্যে চইল্যা যাইত্যা আছি। আইজ আমার রথ আইবে আমারে নিতে। আমি হেই রথে চইর‍্যা আইজ আমার রাজ্যে চইল্যা যামু। আপনি হয়ত দুঃখ করতে পারেন যে, আমি এতদিন আপনারে ধরা দেই নাই। এবং ধরা না দিয়া এতে আপনার মনে দুঃখ লাগাডা স্বাভাবিক। কারণ আপনি আমারে ভালোবাসছেন। কিন্তু আমি আপনারে ধরা না দেওয়ার কারণডা কি আপনি জানেন? আমি আপনারে ধরা না দেওয়ার আসল কারণ অইল এই যে আমি একজন পরি। আমার আরও ছয় বুইন মিলাইয়া আমরা মোট সাত বুইন। এই সাত বুইনে আমরা আমাগো রাইজ্যে বইয়া রোজ নাচ করি। আমাগো একটা নিয়ম আছে। আমরা যদি কেউ কোনো দুনিয়ার পুরুষ মানুষের উপর নজর ফালাই হে অইলে হেরে আমাগো সাত বুইনের সামাজে গনে বাদ দেই বা হেরে আমাগো একটা শাস্তির ব্যবস্থা করি।

আমি অইলাম এই সাত বুইনের মইদ্যে সবচেয়ে ছোট বুইন। একদিন আমরা সাত বুইনে আমাগো রাজ্যে বইয়া নাচ করতে আছিলাম। হঠ্যাৎ নাচ করতে করতে

www.pathagar.com

আমার নজর নিচে বনের মইদ্যে আপনি যহন শিকার করতে আছিলেন, তহন আপনার দিকে পরছিল। এতে আমার ছয় বুইনে আমারে ঐ বনে ফালাইয়া থুইল। আর কইল আমি নাকি অসতী অইয়া গেছি। হেই জন্যই আমারে হেরা বারো বছরের জন্য এই দুনিয়ায় থুইয়া গেছে। এবং কইয়া গেছে যে, বারো বছর যদি আমি সতী থাকতে পারি হে অইলে হেরা আমারে হেই রাইজ্যে নেওয়ার জন্যই বারো বছর অওয়ার চাইর দিন আগে রথ পাঠাইয়া দেবে। আর আমি যদি এই বারো বছরের মইদ্যে কোনরূপ অসতী অইয়া যাই, হে অইলে আমারে আর জীবনে হেই রাইজ্যে নেবে না। এবং আমারে নাকি হারা জীবন হে অইলে এই দুনিয়ায় থাকতে অইবে। এই জন্য আমি একদিন আপনারে ধরা দেই নাই।

আজ আমার বারো বছর পুরা অওয়ার চাইর দিন বাকি। আইজ আমারে আমাগো রাইজ্যে নিতে রথ আইব। আমি হেই রথে চইড়্যা আমাগো রাইজ্যে যামু। আমার রথ রাইতে আইবে। আপনি তহন একটু বাড়ি থাইক্যা আমারে বিদায় কইর‍্যা দিবেন। কারণ আমি আপনার কাছে বিদায় না লইয়া চইল্যা যাই হে অইলে হেডা ভালো দেহায় না। আর হেই জন্যেই আমি আজ আপনার কাছে মানুষের বেশে ধরা দিলাম। আপনি আমারে তো ভালোবাসছেন। যদিও আমি আপনারে ভালো না বাইস্যা থাকি তবুও। এহন আপনি আমাগো দেশে যাইতে চায়ন, হে অইলে আপনি যাইতে পারেন। আমি যাওয়ার সময় আপনারে একটা কাগজে নকশা আইক্যা এবং বিস্তারিতভাবে লেইখ্যা দিয়া যামু, আনে কেমন কইর‍্যা আমাগো রাইজ্যে যাইতে অইবে। আপনি হেই নকশা এবং লেখা দেইখ্যা আমাগো রাইজ্যে যাইতে পারবেন। আমাগো রাইজ্যে যাইতে অইলে সাতটা সমুদ্র তেরডা নদী আপনার পার অইতে অইবেক। এর মইদ্যে একটা নদী লবণের। এই নদীডা লবণে ভরতি। এডা পার অইতে আপনার পায়ের মাংস ক্ষয় অইয়া যাইবে। এইভাবে আপনি আমাগো রাইজ্যে যাইতে পারবেন। কিন্তু যাইবেন যে, আপনি যাইয়া আমাগো রাইজ্যে ঢুলি হিসেবে থাকতে পারবেন। এক ঢুলি ছাড়া আমাগো রাইজ্যে অন্য কোনো পুরুষ লোক থাকতে দেওয়া অয় না। তাই আপনি যদি যান হে অইলে যাওয়ার সময় একটা ঢোল লইয়া যাইবেন সঙ্গে কইর‍্যা। আর আমার সাত বুইনের ধারে কইবেন যে, আপনি ভালো ঢোল বাজাইতে পারেন। হে অইলে আপনারে হেরা রাখবে ঢুলি হিসেবে। আর আপনি রাতে আমি যহন রাইজ্যে যামু তহন বাড়ি থাকবেন কিন্তু। আমি তহন আপনারে ঐ নকশা দিয়া যামু।

তহন রাজার পোলা নকীব কইল: আচ্ছা কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হে বাড়ি গনে ঐ কাক বউর কাছে না কইয়্যা বাইর অইয়া গেল যে, হে অইলে তো ঐ কাক বউ হের কাছে না কইয়া কাক বউর রাজ্যে যাইবে না আনে। আর যদি না যায় হে অইলে তো রথ আইজগা রাইতে আইয়া যদি ফিরা যায় এবং কাক বউ না যাইতে পারে হে অইলে তো কাক বউ আর জীবনে হের রাইজ্যে যাইতে পারবে না এবং হে অইলেই তো কাক বউর জীবনের জইন্য পাইয়া যাইবে আনে। এইয়্যা ভাইব্যা হে অনেক দূরে চইল্যা গেল।

এদিকে রাইত অইয়া হেল। কাক বইরে নিতে হে গো রাজ্যে গনে হের ছয় বুইনে রথ পাডাইয়া দিল। রথ আইয়া ঐ রাজার পোলা নকীবের বাড়ি পৌছল।

www.pathagar.com

এহন রথে কাক বউরে কইল যে, আমারে আপনার বুইনেরা পাডাইয়া দেছে আপনারে নিতে। এহন আপনি চলেন। তহন ঐ কাক বউ দেখল যে, রাজার ছেলে বাড়ি নাই। তহন হে অপেক্ষা করতে লাগল রাজার পোলার জইন্যে যে, রাজার পোলায় আয় নাকি। তাই হে একটা বড় কড়াইয়ে এক কড়াই পানি লইয়া হেই কড়াই চুলার উপর দিয়া রথরে বুঝ দিতে লাগল যে, একটু খাড়াও রথ। আমি চুলায় পানি দিছি। এই পানিটুকু টানলেই আমি তোমায় উডমু। হে এইয়া কইয়া রথের বুঝ দেয় আর কাগজে হের রাইজ্যে যাওয়ার নকশা আঁকতে থাকে আর বিস্তারিত বিবরণ লিখতে থাকে। এবং ভাবে যে, দেখি এর মইদ্যে রাজার পোলা আয় নাকি।

এইভাবে পানি জ্বাল দিতে দিতে যে, তিন কড়াই পানি জ্বালে দিয়া রথের বুঝ দিল। কিন্তু এর পরও যহন রাজার পোলা আইল না, তহন ঐ কাক বউ কাগজে লেখা ঐ নকশা আর বিস্তারিত বিবরণ রাজার পোলার বিছানা বালিশের তলে রাইখ্যা হে রথে উইঠ্যা হের রাইজ্যে চইল্যা গেল।

আর এদিকে রাজার পোলায় আর হে দিন রাইতে বাড়ি আইল না। পরদিন ভোরে হে বাড়ি আইল। বাড়ি আইয়া হে দেখল যে, হের কাক বউ নাই। তহন হে বোঝতে পারলে যে, কাক বউ চইল্যা গ্যাছে। তহন হে কাক বউরে না পাইয়া পাগলের মতো অইয়া গেল। এবং খালি হে হের কামরার মইদ্যে পায়চারি করতে লাগল। পায়চারি করতে করতে একসময় হে দেখতে পাইল যে, বালিশের তলে কয়টা কাগজ। তহন হে কাগজ কয়ডা প্রথম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখতে লাগল। হে দেখতে পাইল যে, ঐ কাগজে ঐ কাক বউর লেখা। এবং কাক বউ কাগজে কীভাবে হের রাইজ্যে যাওয়া যাইবে হের নকশা এবং বিস্তারিত বিবরণ লেইখ্যা থুইয়্যা গেছে।

তহন হে এইগুলোর নকশাডা দেখল এবং লেখাগুলো পড়ল। পইড়্যা হে এহন কাক বউর কতা অনুসারে একটা ঢোল লইয়া এবং নকশা ও বিস্তারিত লেখা কাগজগুলো লইয়া হেই কাক বউর রাইজ্যের দিকে রওয়ানা অইল।

যাওয়ার পথে হে যাইয়া হের বড় বউ রাফেজার বাড়ি ওডলো। হে ভাবল যে যহন পরিগো দেশ যাইতে আছি তহন হয়ত আর দুনিয়ায় ফির‍্যা নাও আইতে পারি। কাজেই যাওয়ার সময় একটু বড় বইর হাতের রান্না খাইয়া যাইতে অয়। তাই হে যাইয়া বড় বউর বাড়ি উইঠ্যা বড় বউরে কইল, বড় বউ আইজ আমি আইছি।

তহন বড় বউ কইল, বেশ, এতো খুব সুখের কথা। আইজ আপনি আমার হাতের রান্ধন খাইতে আইছেন এতো বারী আনন্দের কতা। আপনি বন। আমি আপনারে পাক কইর‍্যা খাওয়াইতে আছি।

এইয়া কইয়্যা বড় বউ যাইয়া পাক করতে লাগল।

হের আজ কত আনন্দ। আইজ হের স্বামী হের হাতের পাক খাইতে চাইছে। এর চাইয়া আনন্দের কতা হের কাছে কি আছে। তাই সে খুব খুশিতে খুশিতে পাক করতে লাগল। আইজ খুব ভালো কইর‍্যা হের স্বামীর লইগ্যা পাক করতে লাগল।

পাক অইয়া গেলে হে ঐ পাক করা খাবার আইন্যা হের স্বামীরে খাইতে দিলে এবং ভালো কইর‍্যা হের স্বামীর ধারে বইয়া হের স্বামীরে খাওয়াইল এবং নিজেও

www.pathagar.com

খাইল। স্বামী খাইয়া উইঠ্যাই হের বউর কাছ দিয়া বিদায় নিয়া এ কাক বউর রাইজ্যের দিকে চললে।

এতে বড় বউ খুব দুঃখ পাইল মনে। হে ভাবল যে হের স্বামী এতদিন পর আইয়া হের হাতের ভাত খাইল। এবং খাইয়াই চইল্যা গেল। নিশ্চয় এর মইদ্যে একটা কারণ আছে। ওদিকে রাজার পোলা নকীব হের বড় বউর বাড়ি দিয়া হের খাপড়া অইয়া উইঠ্যা গেছে। এইয়ার পর কোনো মতে হে যাইয়া ঐ কাক বউর রাইজ্যে ওডলো। উইঠ্যা যে দেখেছে, কাক বউ হেই হানে আছে। আর কাক বউ আর হে বাকি ছয় বুইন নাচ করতে আছে।

ঠিক এমন সময় ঐ রাজার পোলা ঢোল লইয়া হেইহানে উপস্থিত অইল। পরিরা হেরে দেইখ্যা হের কাছে জিগাইল, তুমি কেডা এবং কি চাও?

তহন রাজার পোলায় কইল যে, আমি একজন ঢুলি। আমি আপনে গো এই জায়গায় ঢোল বাজাইতে চাই।

তহন পরিরা কইল বেশ তা অইলে তুমি বাজাও আমরা শুনি। তোমার বাজনা যদি আমাগো ধারে ভালো লাগে, হে অইলে তোমারে আমরা আমাগো ঢুলি হিসেবে রাখমু। হেতে আর কি আছে। আগে তুমি আমাগো ঢোল বাজাইয়া শোনাও। তারপর দেখি তোতার বাজনা আমাগো পছন্দ অয় কিনা। যদি পছন্দ অয় তয় তোমারে আমরা রাখমু।

তহন রাজার পোলা নকীব হেগো ঢোল বাজাইয়া শুনাইল। হের বাজনা শুইন্যা সবার কাছে খুব ভালো লাগল।

এহন এই বাজনা শুইন্যা হেগো ছোড বুইনে (কাক বউ) এক্কেবারে মত্ত অইয়া গেল। বাজনা শেষ অইলে হে হের পরনের কাপড় খুইল্যা রাজার পোলারে পুরস্কার দিল। আর অন্য ছয় বুইন হেরে ঢুলি হিসাবে রাইখ্য দিল।

ছোড বুইনের হের পরনের কাপড় পুরস্কার দিয়া এহন পরদিন হের বইনেগো ধারে যাইয়া কইল। বুইনেরা আমার কাপড় তো ঢুলিরে পুরস্কার দিয়া দিছি। এহন আমি আইজ কি পইর‍্যা নাচ করুম। তোমাগো কাপড়ের অর্ধেক আমাকে দও না আমি হেইয়া পইর‍্যা নাজ করি।

তহন বুইনেরা হেরে কইল ডে, তোমার কাপড় তুমি পুরস্কার দেও ক্যা? এহন আমরা কেমন কইর‍্যা আমাগো কাপড়ের অর্ধেক তোমারে দিমু নাচ করতে। এই রহম পরের দিনও নাচ করার পর ঢুলির বাইদ্য খুব ভালো লাগায় ঐ ছোড বুইনে হের কানের দুল রাজার পোলারে পুরস্কার দিল। দিয়া যাইয়া হের বুইনেগো ধারে কইত- বুইনেরা আমি তো আমার কানের দুল ঢুলিরে পুরস্কার দিয়া দিছি। এহন আমি নাচ করব কি দিয়া? তোমাগো কানের দুলের অর্ধেক আমাকে দাও না আমি নাচ করি। এই রহম রোজ রোজ এক একটা জিনিস ঢুলির পুরস্কার দিত আর হের বুইনেগো ধারে যাইয়া হেই জিনিস চাইত।

এতে বুইনেরা ঢুলির লগে আর ছোড বুইনের লগে বিয়া দিয়া দিল। বিয়া দিয়া হেগো আর পরির রাইজ্যে না রাইখ্য হে গো আবার দুনিয়ায় নামাইয়া দেওয়া অইল।

www.pathagar.com

দুনিয়া পাইয়া এহন রাজার পোলায় ঐ ছোডা পরির (কাক বউরে) লইয়া হের নিজের দেশে আইল। আইয়া এহন হের আগের বউরে আবার বাপের বাড়ি গনে আনল। আইন্যা এহন হের বড় বউ আর ছোড বউ দুজনেরই একই নজরে দেখতে লাগল। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করল না। এইভাবে রাজার পোলা নকীব দুই বউরে লইয়া সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

খ. কিংবদন্তি

কমলা রানীর সাগরদিঘি

বিশাল এক দিঘি, অনেক অনেক বড়। তার এক পাড় হতে অন্য পাড় আবছা আবছা দেখা যায়। দিঘির পাড়ে বড় বড় লোকালয় গড়ে উঠেছে। একসময় এখানে শান বাঁধানো ঘাট ছিল যার অবশিষ্ট এখনো আছে। দিঘিটা মজে গেছে। এর ভেতরে কৃষকরা এখন ধান চাষ করে। ফসল ফলায়। দিঘির পাড় এখনো বিশ থেকে পঁচিশ ফিট উঁচু। দিঘিটি যেখানে অবস্থিত জায়গাটির নাম কালাইয়া। পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানায়। দিঘিটির সুন্দর একটা নাম, কমলা রানীর দিঘি। দিঘিটি কমলা দিঘি নামেই পরিচিত।

রাজা জয়দেবের পূর্বপুরুষ রামনাথ দনুজমর্দন ঢাকার বিক্রমপুর পরগনা হতে এ এলাকায় এসে রাজত্ব করেন। গড়ে তোলেন রাজবাড়ি শিবমন্দির। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক। দানে-ধ্যানে ছিলেন অতুলনীয়। প্রজারা তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। রাজ্যে সুখ ও শান্তির কোনো অভাব ছিল না। রাজা জয়দেবের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কমলা ও বিদ্যাসুন্দরী নামে দুই কন্যা ছিল। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কমলা ছিল অত্যন্ত প্রতিভাময়ী। পিতার নির্দেশে সে রাষ্ট্র পরিচালনা ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা লাভ করে। বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এমনকি রাজ পরামর্শক হিসেবেও তার প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। দিন দিন কমলা বড় হয়। একসময় তার বয়স ষোলো হয়। রাজা চায় না বিয়ের পর কন্যার শ্বশুরালয় অন্যত্র থাকুক। রাজা স্থির করলেন বিয়ে হবে দৈব রীতিতে।

রাজা জয়দেব কমলা দেবীকে বাবুগঞ্জ থানার দেহেরগতি গ্রামের উষাপতির পুত্র বলভদ্র বসুর সাথে বিয়ে দেন। এ এলাকার ঘোষ, গুহ ও বসু পরিবারের সাথেই রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো। বলভদ্র বসু বিদ্যোৎসাহী ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় সে বাকলা রাজ্যের মধ্যে অতুলনীয় ছিল। কথিত আছে, বলভদ্র বসু দেখতে কালো ছিল। তাই প্রজারা তাকে কালো রাজা বলেই ডাকত। গলাচিপা থানার কালো রাজার বিল তার নামেই সৃষ্টি হয়েছে।

রাজা জয়দেব তার জামাতা ও কমলার জন্য রাজবাড়ি নির্মাণ করে দেন। নবীন যুবক রাজবাড়িতে এসে নিজেকে রাজবন্দি হিসেবে মনে করতে থাকে। স্বভাবে হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর। নেশা হয় নিত্যসময়ের সঙ্গী। রাজা অনেক চেষ্টা করেও শোধন করতে পারলেন না। দিন দিন কমলার দুঃখ বাড়িতে থাকে।

এভাবে বছর দুই কেটে যায়। কমলা ফুটফুটে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। রাজা কিছুটা আশার আলো দেখতে পান। নাতির নাম রাখেন পরমানন্দ বসু। বয়সের ভারে

www.pathagar.com

রাজা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তার আয়ুতে টান পড়েন। কমলার হাতে রাজকার্য বুঝিয়ে দিয়ে ইহসংসার ত্যাগ করেন রাজা।

রাজকার্যে কোনো আনন্দ নেই বলভদ্র বসুর। সে নাচ, গান আর মদ নিয়ে কাটিয়ে দেয় সময়। প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে অন্ধকারের রাজা বলতো। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে কমলা রাজকার্য চালায়। বিকেলে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনে, দান-ধ্যান করে সাধ্যমতো। পূজা-অর্চনা করে নিয়মিত।

চৈত্র মাস। দেশে আকাল লাগে। মাঠ-ঘাট রোদে পুড়ে খাঁ খাঁ করছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। নারকেল-সুপারি গাছের মাথা রোদে পুড়ে খসে পড়তে থাকে। না খেয়ে গবাদিপশু মারা যাচ্ছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেলে মরছে অনেক প্রজা। মরা মানুষ, পশুর কঙ্কাল পড়ে থাকে পাশাপাশি। দিনের বেলাও শেয়াল-কুকুর টেনে ছিঁড়ছে অর্ধমৃত জীবজন্তু। প্রজারা বলাবলি করছে রাজার পাশেই এত ঘটনা ঘটছে।

এক রাতে স্বপ্নে মা গঙ্গাদেবী কমলার সাথে দেখা দেন। দেবী বলেন, প্রজাদের শুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করে দিলে এ মন্বন্তর কেটে যাবে। তুমি একটি দিঘি খনন করো। কাল প্রভাতে উঠে হাঁটতে থাকবে। কিন্তু ঘুরতে পারবে না। যেখান থেকে শুরু করেছিলেন আমি ঠিক সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব। যত পথ তুমি অতিক্রম করবে সেটাই হবে দিঘির সীমানা।

পরদিন সকালবেলা। দিঘি প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান হলো। শাহবাজপুরের বিখ্যাত খনক কালা বদরীনাথকে খবর দেয়া হলো। খনককে খবর দিতে গেল বৃদ্ধ মন্ত্রী। স্বপ্নাদেশ এমনই ছিল। তারাই দিঘি খনন করবে। দিঘি খনন করার সংবাদ রাজ্যের মধ্যে প্রচারিত হলে হাজার হাজার লোক রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে।

যজ্ঞ শেষ হলো। কমলা নগ্ন পদে হাঁটা শুরু করে। তার পেছনে বাড়ির পরিচালক জলধর সদলবলে এলাকা চিহ্নিত করছে। রাজার মেয়ের এত হাঁটার অভ্যাস নেই। চৈত্রের খরতাপে লাল হয়ে ওঠে কমলার মুখ। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যায়। শরীর থেকে টপ টপ করে পানি পড়ে। মিলিয়ে যায় মাটিতে। মাথার ওপর পিপাসার্ত কাক উড়ছে। কমলা এদিক-ওদিক তাকায় না। মাঝে মাঝে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে আসে। তবুও এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব তাকে ঠেলে নিয়ে যায় সামনের দিকে। গরম মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। কাঁঠালতলায় টেনে ধরে পরনের কাপড়। খাঁ খাঁ রোদে মনে হয় এখনই মাথা থেকে মগজ ছিটকে পড়বে মাটিতে। সামনে জনমানবহীন ধূ ধূ মাঠে মরীচিকারা খেলা করছে। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের দল। শিউরে ওঠে কমলা। মনে মনে বলে, শক্তি দাও হে মা গঙ্গা, আমাকে আরো শক্তি দাও।

চলতে থাকে কমলার পা। পিছু ডাকার আদেশ নেই। মাঝে মাঝে হোঁচট খায়। আবার সোজা হয়ে হাঁটে। এই প্রচণ্ড রোদে মনে পড়ছে মাকে। যেদিন তার মা স্বর্ণকুমারী মারা যায়, সেদিনের মতো মহাচ্ছন্নতা গ্রাস করে কমলাকে। চারদিক ঝাঁপসা হয়ে আসে। কমলা অন্ধকার দেখছে। ভয় পেয়ে যায় জলধর। এই প্রচণ্ড গরমে সে অনেক চাষিকে মরতে দেখেছে। এভাবে যদি চলতে থাকে কমলাকে আর বাঁচানো যাবে না। এই প্রচণ্ড রোদ্দুরে মানুষ খুব কমই চলাচল করে, তাও ছায়ায় ছায়ায়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় গাছতলায়। এমন ঊষর মাটির ওপর দিয়ে নয়। এমনকি পাখ-পাখালিও

www.pathagar.com

একটু ছায়ার জন্য পাতার আড়ালে লুকিয়ে ঝিমুচ্ছে। জলধরের পোশা পায়রাগুলো আকাশে পাক দেয়। জলধর ডাকতেই পায়রাগুলো নেমে আসে হাতের ওপর। খপ করে একটি পায়রা ধরে। পায়রাটির মাথা ছিঁড়ে ফেলে জলধর। পায়রার রক্ত পেছন থেকে ছুড়ে দেয় কমলার পায়ে। জলধরের মন হাহাকার করে উঠলেও কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকে, মা ঠাকুরণ! পা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে।

কমলা মুখ ফিরে তাকায়, উহ

পা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে, মা।

কমলার চোখে আঁধার নামে। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে, পিছু ডাকলি ক্যান?

কমলা দেখতে পায় যেখান থেকে শুরু করেছে সেখানেই ফিরে এসেছে। প্রজাদের উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে মূর্ছা যায় কমলা। বিশাল পথ অতিক্রম করে সে। চার ক্রোশের মতো পথ। প্রায় চৌষট্টি কানি এলাকা। কালা বদরীনাথের সাতাশ পুত্র বারো পৌত্রসহ অনেক খোদক বছরভর ঘুরে দিঘির গভীরতা আনে। বিরাট উঁচু পাড়। এত বড় দিঘি দক্ষিণবঙ্গে কেউ কোনো দিন দেখেনি। ঘাট ও পাড় সুন্দর করে বাঁধানো হলো। জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য পাড়ে লাগানো হলো গাছ। মোট ব্যয় হলো নয় লক্ষ টাকা। রাজা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়। এ এক বিশাল অপচয়।

যার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হলো তার কিছুই হলো না। এত গভীর করলেও দিঘিতে জল উঠছে না। রানি ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের দিয়ে পুজা করালো। কাঙালিভোজ দিল। প্রজারা রানিকে দোষারোপ করতে থাকে। রানি চিন্তিত হয়ে পড়ে।

এক রাতে আবারও মা গঙ্গা দেখা দেন কমলার সঙ্গে এবং বলেন, তুই দিঘিতে নেমে আমাকে পূজা দে এবং এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে হেঁটে যা। দিঘি জলে ভরে যাবে। আনন্দে কমলা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় তার। সে যজ্ঞের দিনের মতো হাঁটার অনুভূতি পায়। স্বামীকে ডেকে বলে, আমি চললুম, তুই পরমানন্দকে দেখো। দিঘিতে জল আসবে। মা গঙ্গা স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, আমি যাচ্ছি জল আনতে। বলভদ্র বসুর বিশ্বাস হয় না। তার কাছে মনে হয় এসব নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। মুচকি হাসে বলভদ্র।

কমলা আজ দিঘিতে নামবে। যে নদীতে জলের লেশমাত্র দেখা যায় না সে দিঘি থেকে জল তুলে আনবে। এই দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার প্রজা দিঘির চারদিকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যথাসময় শিশুপুত্র কোলে নিয়ে কমলা দিঘির পাড়ে আসে। সখীদের হাতে তুলে দেয় ছেলেকে। কাউকে তার পিছু নিতে নিষেধ করে। আস্তে আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে দিঘিতে নামছে কমলা।

রানি দিঘিতে নেমে গঙ্গাদেবীকে পূজা দেয়। এক পাড় হতে অন্য পাড় হেঁটে যায়। ঠিক যখন দিঘির মাঝখানে তখন চারদিক থেকে তীর তীর করে জল উঠে আসছে। আস্তে আস্তে কমলার পায়ের পাতা, তারপর হাঁটু, তারপর কোমর পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কমলা যখন গলা জলের মধ্যে জলপদ্মের মতো ফুটে উঠেছে তখন স্বামী ও আত্মীয়রা উঠে আসার আমন্ত্রণ জানায়। স্বামী কম্পিত কণ্ঠে আহ্বান জানায়, উঠে এসো কমলা!

কমলা হাসিমুখে জবাব দেয়, উঠতে পারছি না।

www.pathagar.com

কমলার স্বামী অনেক আকুতি-মিনতি করে। অনেক প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। কমলা সব কিছু হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করে। রাজা দিশেহারা হয়ে যান, জানতে চান তোমার পরমানন্দের কী হবে? ওকে প্রতিদিন সকালে ঘাটপাড়ে নিয়ে এসে। আমিই ওকে দেখব। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কেউ যেন আশপাশে না থাকে। এ কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে কমলা তলিয়ে যায় জলের মধ্যে। পরদিন সকালবেলা। ঘাটপাড়ের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হলো। শিশুটিকে দিঘির পাড়ে রেখে যাওয়া হলো। সন্ধ্যায় সকলে দেখল সত্যিই শিশুটি সহাস্যে খেলা করছে। এভাবে দিন কাটে। শিশুটি রাতে থাকে কমলার সখীদের সাথে। দিনে থাকে দিঘির পাড়ে। সবই ঠিকমতো চলছে। কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। অস্থিরতা তাকে গ্রাস করছে। সহ্য ক্ষমতা লোপ পায়। রাজা ভাবে দেখি কী হয়, কী করা যায়।

একদিন সকালবেলা। রাজা পরমানন্দকে কোলে তুলে নেয়। লুকিয়ে থাকে ঘাটপারের ঝোপের কাছে। শিশুপুত্রটিকে ছেড়ে দেয় দিঘির পাড়ে। কমলা জল থেকে উঠে আসে। রাজা অবাক হয়ে তাকায়। অপূর্ব কমলা। আগের মতোই সুন্দর, মনোরমা। শুধু জলের মধ্যে থাকে, তাই সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শিশুটি আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। কমলা চারদিকে একবার তাকায়। তারপর শিশুটিকে মুখে স্তন গুঁজে দেয়। মা ও শিশু নীরব। ওই তো কমলা। চঞ্চলা হরিণীর মতো সেই চোখ, চাঁদের মতো মুখ, লতানো শরীর। ঠিক থাকতে পারে না রাজা। দৌড়ে গিয়ে কমলার বাহু সজোরে চেপে ধরে। চমকে ওঠে কমলা। শিশুটিকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। কাপড় টেনে শরীর ঢাকে। শুধু একটা কথা উচ্চারণ করে, ছিঃ! রাজাকে ধাক্কা মেরে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। এরপর কেউ কোনো দিন কমলাকে দেখেনি।

ফলে রাজার ঘাড়ে বোঝা বাড়িতে থাকে। এভাবে সে বাঁধা-বন্ধনহীন হয়ে যায়। অন্যায় অপকর্মে বেশি করে লিপ্ত হয়। পরমানন্দ বড় হতে থাকে পরিচারিকার হাতে। একদিন এক জ্যোতিষী আসে। রাজাকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, রাজার মৃত্যু হবে জলে ডুবে। রাজা ভয় পেয়ে যায়। সেই থেকে রাজা জলের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। শিব মন্দিরের উপরিভাগে রাজার আদেশে শক্ত প্রকোষ্ঠ তৈরি করে। রাজা এখানেই থাকে। যুবরাজ পরমানন্দ প্রাসাদ থেকে এসে মাঝে মাঝে বাবার সান্নিধ্যে কাটিয়ে যায়। একদিন মহাপ্লাবন দেখা দেয়। তেঁতুলিয়ার বান ডাকে। জ্যোতিষী বর্ণিত নির্দিষ্ট দিনেই বান ডাকে। মন্দিরের নিম্নভাগ জলে ডুবে যায়। রাজা প্রকোষ্ঠ ছুঁয়ে যায় জলে। ভীতসন্ত্রস্ত রাজা জড়োকায় আসে। দেখতে থাকে জলের অবস্থা। হঠাৎ মা গঙ্গা রাজার হাত ধরে টান মেরে জলের মধ্যে নিয়ে যায়। সাথে সাথে জলও টান মারে। চারদিকে জল খুব দ্রুত নেমে যায়। রাজা মিলিয়ে যায় জলের সাথে। তারপর থেকে কোনো দিন কালো রাজা বল ভদ্র বসুকে দেখা যায়নি। এ ঘটনার সময়টি ধরা হয় ইংরেজি ১৫৮৩ সালে।

দপ্তর খান দিঘি

'আড়িয়াল খাঁ থেকে কচা-মাঝখানে সন্ধ্যা নদী, নদীর অথৈ বহমান স্রোত। এই প্রমত্ত সুন্দরী নদী সন্ধ্যার দুতীর ঘেঁষে স্বরূপকাঠি উপজেলা। পশ্চিমপাড়ে ইন্দুরহাট বন্দর পেরিয়ে দক্ষিণে এক কিলো অতিক্রম করলেই দপ্তর খান দিঘি। সাত বিঘা আয়তনের

www.pathagar.com

এই দিঘির ওপর এখন শুধুই সবুজের ঢেউ খেলে যায়। বিস্তৃত ফসলের মাঠ আর বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে এ দিঘি এখন আর অতীতের মতো দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে সময়ের ব্যবধানে এ দিঘি এখন দস্তর খান মাঠ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছে।

১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মোগল সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন দস্তর খান ছিলেন তার গৃহশিক্ষক। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী দস্তর খান তাঁর আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে রেখে গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সম্রাট আকবরের দৃষ্টি এড়াতে পারেননি। আকবর লক্ষ করলেন যখন শিক্ষক দস্তর খানের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করেন তখনই সে কাজে সফলতা পান। আর যখন গুরুকে না জানিয়ে কাজ করেন তখনই প্রত্যাশিত সফলতাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সম্রাট আকবর এ রহস্যময় ঘটনার ব্যাপার জানতে চাইলে তিনি থাকেন বাকরুদ্ধ। আর এ বাকরুদ্ধতার কারণেই সম্রাট তাকে পাথরের গৃহে বন্দি করে রাখতে পারেননি। তিনি তার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পাথরের দরজা ভেঙে দুটুকরা পাথর বগলে করে অলৌকিকভাবে ভাসতে ভাসতে স্বরূপকাঠির সোহাগদল গ্রামে চলে আসেন। অবশ্য তখনো এলাকার নাম সোহাগদল হয়নি। সবুজাভ বৃক্ষ আবৃত এলাকাটিতে ঝিলগাছ, নলখাগড়া, হোগলার বন, বিভিন্ন প্রকার লতাপাতা আর বনজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে অল্পকিছু জনবসতি। আর এ রকম গ্রামীণ পরিবেশে তিনি আস্তানা গড়ে তুলে শুরু করেন ধর্ম প্রচার।

তখন এ এলাকায় খাবার পানির দারুন অভাব ছিল। ছিল লবণাক্ত জল আর জল। পানির তীব্র সংকটের জন্য তিনি অলৌকিকভাবে এক রাতের মধ্যে সাত বিঘা জমির ওপর দিঘিটি খনন করেন। তখন থেকেই লোকমুখে এ দিঘির নাম দস্তর খান দিঘি।

দিঘির উত্তর পাশে তিনি পাকা সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তবে দিঘি খননের সাত দিন অতিবাহিত হবার পর একবিন্দু জলও দিঘিতে দেখা দিল না। ধর্মীয় এ সাধক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, সাদা ঘোড়ায় চড়ে যদি কোনো ব্রাহ্মণের ছেলে এ দিঘিটি সাতবার প্রদক্ষিণ করে তবেই এ দিঘিতে জল উঠবে। পরদিন প্রাতে তাঁর এ স্বপ্নের কথা অনুসারীদের জানালেন। তারপর অনুসারীরা অনেক কষ্টে বাওন নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিয়ে এলেন। তারপর ধর্মসাধকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করার জন্য দিঘির পাড়ে সাদা ঘোড়ার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলেকে উঠিয়ে দিল। শুরু হলো সাতবার দিঘি প্রদক্ষিণের দৌড়। সাতবার প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে দিঘির কানায় কানায় জল পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণের ছেলে সাদা ঘোড়া নিয়ে আর ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারলো না। পরে ব্রাহ্মণের সেই বাওন নামের ছেলেটি ও সাদা ঘোড়াটিকে শ্রীরামকাঠি, দেহারী ও বেলুয়া নদীর মোহনা দেওদরিয়ার ঘোপে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। জনশ্রুতি রয়েছে, ওই স্থান থেকে যে খালটি দেওদরিয়ার ঘোপে মিলিত হয়েছে সে খালটিকে এখনো লোকে বাওনের>বাওনার খাল বলে। কথিত আছে, আধ্যাত্মিক সাধক দস্তর খান যে পাথর দুটি বগলে করে এ এলাকায় এসেছিলেন সে পাথর দুটি সব সময় দিঘির জলে আসত। অমাবস্যার রাতে দিঘিটি থেকে এক ধরনের মায়াবী সুরও কানে ভেসে আসত। সাধক দস্তর খান দিঘির পাড়ে বড় ঝিলগাছটির নিচে বসে অধিকাংশ সময় ধ্যান করতেন। আশ্চর্য বিষয়, এই

www.pathagar.com

ঝিলগাছটির পাতা কখনো ঝরতো না। কেউ যদি গাছটির পাতা ছিঁড়তো তাহলে তা দিয়ে শুধু লাল লাল রক্ত ঝরতো। তাই ভয়ে লোকজন কখনো গাছটির পাতা ছিঁড়তো না। এ দিঘিটির আরো রহস্য রয়েছে। এ এলাকায় বড় ধরনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হলে তখন অনেক থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিলের প্রয়োজন হতো। কিন্তু মজার ও আশ্চর্য ব্যাপার হলো, একজন ইমানদার যদি ওজু করে দিঘির জলে কাঁচা দুধের ছিটা দিত তাহলে প্রয়োজনীয় থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল দিঘির শান বাঁধানো ঘাটে উঠে আসতো। খাওয়াদাওয়া শেষে ওগুলো দিঘির ঘাটে রেখে দিলে দিঘির জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুনরায় দিঘিতেই বিলীন হয়ে যেত। একবার এক মজার ঘটনা ঘটলো, একদা এক দুষ্ট লোক এর রহস্য জানার জন্য চালাকি করে খাওয়াদাওয়া শেষে দুতিনটি বাসন গোয়ালঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিদিনের মতো বাসন আর দিঘির জলে বিলীন হয় না। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই রীতিমতো অবাক। উপস্থিত জনের মধ্যে একজন গোনে দেখল বাসন কম। এ ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সবাই বাসন খুঁজতে থাকে। অবশেষে হারানো বাসন গোয়াল ঘরে খুঁজে পায় এবং সেগুলো তৎক্ষণাৎ দিঘির ঘাটে রাখতেই অতীতের মতো বাসনগুলো দিঘির জলে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। সেই থেকে আর কখনো এ দিঘি থেকে থালা-বাসন উঠতো না।

আধ্যাত্মিক সাধক দস্তুর খান এ এলাকায় বিয়ে করেছিলেন কি না এর কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে অনেকে মনে করেন তিনি এ অঞ্চলে বিয়ে করেছিলেন। এ এলাকায় খান বংশই তার উত্তরসূরি। খান বংশের লোকেরাও তাই বলে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, তিনি বিয়েই করেননি। ধর্ম প্রচার ও ধ্যান মগ্নতার মধ্য দিয়ে তার সময় কাটতো। দস্তুর খান এ এলাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছেন সে ব্যাপারেও রয়েছে অজানা রহস্য। তবে এখানে তার কোনো মাজার না থাকার কারণে লোকজন ধরে নিয়েছে, তিনি হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।

সাধক দস্তুর খান, দিঘি আর তাঁর পাথর দুটির রহস্য এখানেই শেষ নয়। তার অনুপস্থিতিতে সাত বিঘার এ দিঘিটি আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যায়। আর পাথর দুটো পড়ে থাকে দিঘির পাশেই। এভাবে সময় চলতে থাকে হঠাৎ দেখা দেয় বন্যা। চারদিকে পানি থৈ থৈ করে। এ সময় এ এলাকায় খান বংশের এক লোক দুটি পাথরের একটির ওপর বসে মল ত্যাগ করলে সে পাথরটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহামাড়ি কলেরা। তখন অনেক লোক মারা যায়। এ ঘটনার পর অন্য পাথরটির প্রতি সবার ভক্তি এসে যায়। পাথরটিকে তারা বাড়িতে নিয়ে আসে এবং রীতিমতো সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রামের অধিকাংশ লোক রোগমুক্তির জন্য এই পাথরটির ওপর কাঁচা দুধ দিত। সাথে সাথে আকস্মিকভাবেই পাথরটি দুধ চুষে নিত। তবে এ প্রথা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, কেননা এলাকার মৌলভীরা একে পুজা প্রথা এবং শিরক গুণাহ বলে অভিহিত করলে এ প্রথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে এই পাথরটি খান বাড়ির মসজিদে সংরক্ষিত রয়েছে। পাথরটির দৈর্ঘ্য ৩৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ইঞ্চি আর উচ্চতা ৫ ইঞ্চি। পাথরটি আগের মতো এখন আর দুধ চুষে নেয় না। লোকে বলে এটি একসময় জীবিত ছিল তাই দুধ চুষে নিত, এখন মৃত তাই দুধ চুষে নেয় না। দস্তুর খানের এ কাহিনি প্রথমে তালপাতা এবং কাঠের বাকলে

www.pathagar.com

লেখা হয়। পরে কাগজের ওপরও কালি দিয়ে লেখা হয়েছিল কিন্তু তা এখন আর সংগ্রহে নেই। এখন দস্তুর খানের একটি পাথর ছাড়া তাঁর ধ্যানরত স্থান, ঝিলগাছ, দিঘি ও বাড়ি কোনোটিরই অস্তিত্ব নেই। সঠিক করে এখন আর কেউ বলতে পারে না কোনো জায়গায় তার ঘর আর ঝিলগাছটি ছিল, ছিল শান বাঁধানো ঘাট। তবে কেউ কেউ বলেন, ৫০ বছর আগে এ দিঘির কিছু জায়গায় খনন করলে পুরোনো ইট আর প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। এ এলাকার লোকদের ভেতর এখনো এ রহস্য বিদ্যমান যে, দিঘিটি পুনঃখনন করলে মুদ্রা, পুরোনো ইট এবং সে যুগের কিছু অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যেতেও পারে।

গ. লোকছড়া

লোক সাহিত্য অঞ্চল ভেদে তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে ওঠে। আর এই আঞ্চলিকতার কারণে এর মধ্যে ফুটে ওঠে সেই অঞ্চলের জীবনাচরণের নানা বৈশিষ্ট্য। লোকছড়ার আলোকে বরিশালের লোকজীবনের অনেকটাই ধরা পড়ে আমাদের চেনা জগতের পরিসরে। ঘরোয়া ভাষায় রচিত এইসব ছড়া ও ধাঁধার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে গেছে সেই সময়ের সমাজচিত্র। জানি ধান, নদী, খাল এই তিনে বরিশাল। নদীর দেশ, ভাঙনের দেশ, আবার শস্যের দেশ বরিশাল। এ অঞ্চলের মানুষ নিত্য সংগ্রামী। অভাবের সাথে লড়াই করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায় সাধারণ মানুষ। বরষার সময় অবিরাম বর্ষণে শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে ঘরে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট। ধার কর্জ করে সংসার চালাতে গিয়ে নানা টানা পোড়েনের ভেতর দিয়ে দিন পার করতে হয়। বরষা তাই সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে সবচেয়ে ভয়ানক সময়। এই সময়টাকে বোঝানো হয়েছে এভাবে–

যার না ধরি আতে
হের ধরি পায়
দেহিনি বাইশ্যার কয় মাস যায়।

(এখানে আতে,অর্থ হাতে, হের অর্থ তার, বাইশ্যার অর্থ বরষার)

বউ, শাশুড়ির সম্পর্ক নিয়ে বরিশালে প্রচলিত আছে প্রচুর ছড়া। বেশিরভাগ ছড়াতে বধূকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং শাশুড়িকে সামাজিক মানদণ্ডে যে অবহেলা করা হয তা নিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরিশালেও শাশুড়ি বৌয়ের সম্পর্ককে তেতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে। শাশুড়িকে আধুনিক বৌয়েরা যে উপেক্ষা করে এবং মান্যগণ্য করে না বারবার সে প্রসঙ্গ এসেছে। ধারা যায় ছড়াগুলো প্রবীণ ব্যক্তিরা মুখে মুখে রচনা করায় অর্বাচীনদের দোষ ত্রুটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমাজ দেহে চিরকালই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ। তাই এদের চোখে প্রবীণ শাশুড়ি অপেক্ষ নবীন বধূই কোনঠাসা। তারাই নিয়ম ভাঙার কারণে অপরাধী। তাই বধূকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে–

হাউরী মরছে হয়ালে
নাইয়া, ধুইয়া, খাইয়া লইয়া
যাইমু আনে বিয়ালে।

(হাউরী– শাশুড়ি, হয়ালে– সকালে, খাইমু– খাব)

www.pathagar.com

ছড়াটিতে বধূর নির্বুদ্ধিতা, এবং স্বার্থপরতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যখনকার কাজ তখন না করে অন্য সময়ে করলে সেটা যে দায়সারা হয়ে ওঠে সেকথাটি বোঝাতে শাশুড়ি বৌ এর প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। শাশুড়ির প্রতি বধূর মমতার অভাব এ ধরণের ছড়ায় প্রকট হয়ে উঠেছে। আবার ছেলের বৌকে সামলাতে গিয়ে যে নানা রং ঢং করতে হয় সে বিষয়ে একটি মজার ছড়া হচ্ছে–

বুড়ি লো বুড়ি
দাও হান দে
দাও দিয়া হরবি কি?
পাতা কাডমু
পাতা দিয়া হরবি কি?
বউরে আগামু, হোচামু
তুইল্লা তুইল্লা নাচামু।

শ্বশুর বাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অনেক বধূ নিরবে অশ্রু বিসর্জন করে। মেয়ে মা বাবার যত আদরেরই হোক শ্বশুর বাড়িতে তাকে গঞ্জনা সহ্য করতেই হবে। তাই ভবিষ্যৎ মেয়ের কথা ভেবে পিতা-মাতার অন্তর কেঁদে ওঠে–

আমার মাইয়া দুধের সর
কেমনে করবে পরের ঘর
পরের পুতে মারিবে
ছাইছনায় বইয়া কান্দিবে।

বরিশালের লোক সামান্য কারণে জড়িয়ে পড়ে মামলা-মোকদ্দমায়। এ ছাড়াও অন্যের কাছে নিজের শক্তি প্রকাশ করে ভয় দেখাতে পছন্দ করে।

মোগো বাড়ি বরিশাল
মোর দাদায় চহিদার
মুই আইনের লোক।

বরিশালের গ্রামে গঞ্জে বড় বড় অনুষ্ঠানে কলা পাতায় খাওয়ানো হতো, খেতে বসে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলত। তাই অতি তরাশের সমালোচনা করে ছড়ায় বলা হয়েছে–

তড়াইশ্যা গেছে বরগ আনতে
মোরে দে বারতে।

ফুফু ও খালার ভেতরে ফুফুর প্রতি সমাজে বেশি ভালোবাসা ছিল। দুজনের সম্পর্কের তারতম্য নিয়ে বলা হয়–

মার বুইন মাসি
কাদার তলে ঠাঁসি
বাপের বুইন পিসি
ভাত কাপুরে পুষি।

বরিশালের সমাজ জীবনে মেয়ে জামাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উৎসব আনন্দে তো বটেই নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জামাই থাকে সকলের আগে। শ্বশুর বাড়িতে জামাই খুবই সম্মানিত অতিথি। জামাই প্রসঙ্গে তাই ছড়ায় বলা হয়েছে–

www.pathagar.com

জামাই আইছে ঘামাইয়া
ছাতি ধর টানাইয়া
ছাতির উপর বল্লা
ধর জামাইর কল্লা।

রসিকতার মাধ্যমে এখানে জামাই যে সকলের আদরের জন তা বোঝানো হয়েছে। তাই জামাইয়ের কল্লা ধরে বল্লার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বরিশালের মানুষ রসিকতা পছন্দ করে। নানা কাজে কর্মে তারা রসবোধের পরিচয় দিয়ে অন্যকে তো বটে নিজেও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। জামাইকে নিয়ে লেখা এ ধরণের আরো একটি ছড়া রয়েছে।

জামাই বাবু কমলা লেবু
একা খাইও না
ঘরে আছে ছোট শালী
ভুলে যেও না।

সমাজে প্রচলিত ছিল বহু বিবাহ। বরিশালের অতীত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় বহু বিবাহ এমনভাবে বিস্তার করেছিল যে একে এক সময় সকলে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। যে বুড়ো হাঁটতে পারে না সেও বিয়ের কথা শুনলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। যেমন–

আটতে পারে না বুড়ায়
ছ্যাচা গুয়া খাক্ষু
বিয়ার কথা হুনলে বুইড়্যায়
তুরতুরিয়া যায়।

(আটতে– হাঁটতে, গুয়া– সুপারি)

বহু বিবাহের মতো বাল্য বিধবার সমস্যাও ছিল প্রকট। বহু বিবাহের কারণে অনেক নারী অল্প বয়সেই বিধবা হত। কারণ তাদের বিয়ে হত বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে। অকাল বৈধব্য ও অসময়কে বোঝাতে ছড়ায় বলা হয়েছে–

আইচার ভিতর বুইচা মাছ
কিবা দিয়া রানমু
যৈবনকালে পতি মরলে
কিবা কইয়া কানমু।

পয়সা থাকলেও অনেক ধনী ব্যক্তিরা পয়সা খরচ করতে চায় না। বরিশালের মানুষেরা বিশ্বাস করে আদরে আপ্যায়নে, খেতে এবং খাওয়াতে এ অঞ্চলের মানুষেরাই সেরা। অন্যান্য অঞ্চলের মানুষেরা টাকা-পয়সা থাকলেও অনেক কৃপণ। তাই তারা ছড়া সাজায়–

উততোরেতে দেইখ্যা আইছি
বড় বড় ধনী
মাছ কেনেনা পয়সার ডরে
চারা চাডে হুনি।

পিঠা পুলির জন্য বরিশাল বিখ্যাত হলেও মায়ের প্রতি রয়েছে পিঠার চেয়েও বেশি মমতা।

মিডা কও পিডা কও
ভাতের হোমান না

www.pathagar.com

মাসি কও পিসি কও
মায়ের হোমান না।

চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল সমাজে। আর এইসব চোর ডাকাতেরা সাধারণ গেরস্ত ঘরেরই সন্তান। যেখানে সেখানে ছিল চোর - ডাকাতের আনাগোনা। ডাকাত ভীতিও ছিল সমাজে।

ওপারে গেছি খেলাইতে
পোতে পাইছে ডাহাইতে
ডাহাইতের নাম কালাচাঁন
গিরস্তের সন্তান।

বরিশালে প্রচলিত এ ধরণের ছড়ায় ফুটে উঠেছে জীবনের সজীবতা। এক ঘেয়েমীর আলসে মুহূর্তগুলোতে ছড়াগুলো বেঁচে থাকার ঔষধ হিসেবে ফিরিয়ে দিত জীবনীশক্তি আর এর পরতে পরতে চিত্রময় হয়ে উঠতো লোকজীবনের ছবি। নিচে বরিশাল অঞ্চলের সংগৃহীত লোকছড়া তুলে ধরা হলো–

১.
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি আমাগো বাড়ি যাইও,
ঠাই নাই পিঁড়ি নাই খোকার চোখে বইও।
বাটা ভইরা পান দিমু গাল ভইরা খাইও,
চাউল কড়াই ভাজা দিমু যত খাইতে চাও।
দাঁত থাকে নাতো গুড়াইয়া দিমু ভয় নাহি পাও।
যত ছেলের চোকের ঘুম খোকার চোকে দ্যাও।

২.
আল্লাদির পোঁটলা
কাইন্দো না।
চিড়া খাইয়া শুইয়া থাকো
রাইন্দো না।

৩.
কান্দিও না কান্দিও না খোকা, প্যাদায় ধইরা নেবে,
তোমার বাবা সওদাগর, বালা গড়াইয়া দিবে।

৪.
ঘুঘু সই –দা কই?
দা দিয়ে করবি কি?–পাত কাড়ুম।
পাত দিয়ে করবি কি?–বউ ভাত খাইবে।
বউ কোথায়?–জলে গেছে।
জল কোথায়?–ডাউকে খাইছে।
ডাইক কোথায়?–তারাবনে গেছে।
তারবন কোথায়?–পুড়িয়া গেছে।
ছাই মাডি কোথা?–ধোবায় নিছে।

www.pathagar.com

ধোবা কোথায়?–যুদ্ধে গেছে।
যুদ্ধ কোথায়?–ভাইঙ্গা গেছে।
ভাঙ্গা যুদ্ধা ভাইঙ্গা গেছে,
বুড়ীর ঘরে আগুন লাগছে।
৫.
ঘুঘু সই, বাসা কই?
শিমূল গাছে–শিমূল গাছ কই?
সূতার নিছে–সূতার কই?
পিঁড়ি চাছে–পিঁড়ি কই?
বৌ ভাত খায়–বৌ কই?
জলে গেছে–জল কই?
ডাউকে খাইছে।–ডাউকে কই?
বনে গেছে।–বন কই?
পুইড়া গেছে।–ছাই মাটি কই?
ধোপায় নিছে। ধোপা কই?
হাটে গেছে।–হাট কই?
মিইল্যা গেছে।

বুড়িলো বুড়ি। (তোর) হাঁড়ি পাতিল সরা
কোন্ খোটে?–সোনার না রূপার?
সোনার!–এই পড়ল।
৬.
দিদিলো দিদি, একটা কথা,
কি কথা? ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ? সবু ব্যাঙ।
কি সবু? বামন গুরু।
কি বামন? ভাট বামন।
কি ভাট? গুয়া কাট।
কি গুয়া? চিকি গুয়া।
কি চিকি? সোনার চিকি।
কি সোনা? ছাই সোনা।

তার অর্ধেক ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে করবি কি?
তোর ভাগ তোরে দি।
৭.
খালে জল নাইরে–আমার বৌ আনতে যাই।
বৌ আনতে গেলাম আমার খোকনের শ্বশুর বাড়ি,

www.pathagar.com

তারা কাপড় চোপড় কাইর‍্যা নিল মারল জনতার বাড়ি।
খালে জল নাইরে–
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ি,
তারা ফ্যানে ফ্যানে ভাত দিল (আর) আমসী ধোয়া পানি।
খালে জল নাইরে–
বৌ বাহির কর, বৌ বাহির কর;
দেখি, বৌয়ের বদলে খোকনের শাশুড়ি বুড়ী,
বেসাতি বাহির কর; বেসাতি বাহির কর,
দেখি, তিনটা ক্ষুদের হাঁড়ি।
খালে জল নাইরে–।

৮.
আয় ঘুমনি আয়,
শেয়ালে তেঁতুল খায়।
তারা নুন পাবে কোথায়?
সাগরের বালি ঝুর ঝুরানি
নুন বলে বলে খায়।–

৯.
অতিত আইছে নারাইন্যা,
চাউল নাই কারাইন্যা
চাইল রইছে ঠিলায়,
তোরে ধইরা কিলায়।

১০.
আম পাতা জাম পাতা
কাঁঠাল পাতা যে
আমরা দুইজনে
কলকি করছ কি?
বেইচ্চা হালাইছি
পয়সা করছ কি?
পান কিনিছি।
পান করছ কি?
খাইয়া হালাইছি।
চিবডি করছ কি?
বগার মার হোগায় দিয়া
লাল করেছি।

১১.
অলি অলি বদনি
ছোড দেওর ঘুমানী

www.pathagar.com

আইতে আছে বাইদার নাও
গেদুরে লইয়া চইললা যাও।
১২.
বাপ্‌ফুরে মা তালইজী
চুলার মধ্যে হোসায় কি?
পাগলা হালায় কয় কি?
১৩.
নাচতে জানি নাচি না
কোমর ব্যথায় বাঁচি না।
ভাই দেছে তাই
কোমর ব্যথা নাই।
১৪.
প্যাট ব্যাতা খুদের নারী
ঝাইররা দিলাম মামুগো বাড়ি
মামু দেছে আই
প্যাট বাতা নাই।
১৬.
নাপতার বাড়ি ছিরামপুর
আইতে যাইতে অনেক দুর
বব্‌রা নাপতায় খেউরে দিছে মন।
নাপতা বইছে ফিরিতে
নাপতার হোগা খাইছে উলিতে
বব্‌রা নাপতায় খেউরে দিছে মন।
নাপতা যাইবে মৌকরণ
বইয়া গেল অকারণ
বব্‌রা নাপতায় খেউরে দিছে মন।
১৭.
আম্বি টাম্বি তালের আঁশ।
আম্বির বিয়া ভাদদুর মাস॥
আম্বির মনে বড় খুসী।
শাড়ি আনছে বানারসী॥
১৮.
তোর বাফে গ্যাছে আডে,
বাইজ্জা পরছে ফাডে
উডাইবে আনে কেডা।
আডে আছে বাইন্না,
উডাইবে আনে টাইন্না।

www.pathagar.com

১৯.
মোল্লা বাড়ি তললা বাঁশ
মোল্লার বৌ কাশে ঠাশ ঠাশ।
মোল্লায় কয় অকি?

হাইছা হাগে বাগার দি।
নাইয়া ধুইয়া খাবা কি?
২০.
ও মাইয়া হরো কি?
দুধ আউডাই।
ক্যা?
আমার বোলে বিয়া
কবে?
মায় কয় কাইল
বাবায় কয় পরশু
আমি কই আইজ
অইলেও ভালো।
২১.
গ্যাল্লাহ কৈ?
হউর বাড়ি
খাইছো কি?
মুরহা
পাখ খান হরছ কি?
বিলাইডে নিছে
বিলাইডার হল্লা কি?
এ্যাকটা কিল দিলাম
বিলইডা হল্লে ক্যামন
ম্যাও ম্যাও ম্যাও----।
২২.
ঐ ছ্যামড়ারে ধর
চুঙ্গার মধ্যে ভর
চুঙ্গা যেনো লরে না
ছ্যাড়া যেন মরে না।
বাপ গ্যাছে উত্তারে
বাপ বোলাবি কুত্তারে।
কুত্তা গ্যাছে মইররা
তোরে নেবে ধইররা ॥

www.pathagar.com

২৩.
ঘুঘুর সই ঘুঘুর সই
গেল্লিহ কৈ?
মামু বাড়ি
খাইছ কী?
আম জাম ক্যালা
দেছে কেডা?
মামু
দুয়ারে বইয়া খাই
মামি পরছে ঠ্যাঙ্গা লইয়া
উগইর তলা যাই
মাইট্টা হাপে কামর দিছে
ওজা বাড়ি যাই।
ওঝায় বলে নারে বিষ তারে বিষ
পান্‌তে পইররা ডুব দিস।
চালে উইট্টা বাগ দিস,
তয় যাইবে তোর হাপের বিষ।
বড়িলো বুড়ি দাহান দে,
দাইদদা হরবি কি?
বাঁশ কাডমু।
বাঁশ দ্যা হরবি কি?
বৌ ঢাকমু।
বৌ গ্যাছে কৈ?
ঘাডে।
ঘাড গ্যাছে কৈ?
জলে গ্যাছে।
জল গ্যাছে কৈ?
ডাউকে খাইছে।
ডাউক গ্যাছে কৈ?
বনে গ্যাছে।
বন গ্যাছে কৈ?
পুইড়্যা গ্যাছে।
ছাই-মাডি গ্যাছে কৈ?
ধোপায় নেছে।
ধোপা গ্যাছে কৈ?
আডে গ্যাছে।

www.pathagar.com

আড গ্যাছে কৈ?
মিললা গ্যাছে।

বুড়িলো বুড়ি
তোর পাইলা-আড়ি সরা।
মোর পাইলা আড়ি সরা
বড় তাল গাছটা লরে-চরে
ছোড তালগাছটা কডমড করে
দুপ্‌দুত।

২৪.
ল্যাংডা ডেহি তালে ডোগ।
তাল দিয়া যা পিডা ভাজি॥
পিডা অইছে গান্দা।
তোর হউরেরে লইয়া হান্দা॥

২৫.
হালা বোলাইয়া ক্যালা খাও।
বাপ বোলাইয়া ডাংগর হও॥
ক্যালা নেছে কামারে
বাপ বোলাবি আমারে॥
ক্যালা গ্যাছে পইচ্চা।
বাবা বোলাবি কইশ্যা॥

২৬.
হালা হালা হালার ভাই
বাড়ির উফুর দিয়া পোত নাই
হালায় বোলায় তালই জি
খোপে খোপে পাড়া দি
তোমো হালায় না বোলায় বাবাজি।

২৭.
এ্যাক আল্লেহ মুইল্লা
হোগা ওরছেলে ফুইল্লা
আমে দেলাম গাইল্লা
মুইল্লা হালাইলে গিলুলা

২৮.
আগে যায় ঠালি ঠুলি
পিছে যায় সোনার লড়ি
আয় মোরা ডাক পড়ি হি-ও-ও-ও॥

২৯.

www.pathagar.com

আধ কলসী নব ঢং।
পাড়ায় পাড়ায় চৌ ঢং॥
যদি পাড়ায় ফুল হয়।
হাজার টাকার মূল হয়॥
৩০.
এক শালিকে রাধে-বাড়ে
আর এক শালিকে খায়॥
আর শালিকে না পেয়ে
বাবার বাড়ি যায়॥
বাবার বাড়ি তেল-সিঁদুর॥
মালি বাড়ির ফুল।
এমন খোপা বেঁধে দিব
হাজার টাকার মূল॥
৩১.
আদা পাদা লবণ চাঁদা,
কুরাইল্যা বোলছে হায় হুই
পাঁচজন ব্যাডা তায় তুই।
৩২.
ভাত নাই পাইলা ডাংগর
শব্দ গ্যাছে ঢাহাই নগর॥
উগইর তলা রাঙ্গা বুড়ি।
ধইর‍্যা আনো কাপড় পুড়ি॥
৩৩.
চিন্তা কর শ্যাষে
এবার বরগী এলো দ্যাশে॥
ধান ফুড়াল পান ফুরালো।
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।
৩৪.
উত্তার কান্দার কুততার ছাও।
দহিনের কান্দার হালিহের ছাও
খাজনা দেতে ব্যাতা পাও?
৩৫.
উততার ধারে গরু মরছে
হগুন আইছে খাইতে॥
বারো মাইস্যা মাইয়া চায়।

www.pathagar.com

দুলার লগে যাইতে ॥
৩৬.
আইছে কেডা বেয়াই ছাব।
রাইন্দা দেলাম হুঁউল মাছ ॥
বেয়াই হউলাইতে হউলাইতে।
যায় বেয়াই বাড়িতে।
আইছে কেডা বেয়াই ছাব ॥
রাইন্দা দেলাম চিঙ্গইর মাছ।
বেয়াই চিংড়াইতে বিংড়াইতে
যায় বেয়াই বাড়িতে ॥

সুন্দরবনে বাঘের অত্যাচার এবং বাঘের নামে মাগন সংগ্রহের ছড়া–

হাট্যা হাট্যা চরলে? ধ্রু ॥
হ্যট্যা চল পাঁচিল পাড় ॥
ঝপৎ গিয়ে রে।
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সুন্দের বনে রে। ধ্রু ॥
সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হুম্বুর করে রাও।
য়্যাক বাঘরে। ধ্রু ॥
য়্যাক বাঘ চৈতা।
বাওন মার‍্যা নিলো পৈতা।
য়্যার বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি ॥
য়্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর ॥
পুড়্যা খায় বাত্যা ইন্দুর ॥
আর য়্যাক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার‍্যা খাইল দে ॥
আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে ॥
আর য়্যাক বাঘের গলায় ব্যাত।
আর য়্যাক বাঘ বাপে-পুতে।
আর য়্যাক বাঘ হিজল গাছে।
আর য়্যাক বাঘ রাইঙ্গা।
কাড় ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা ॥
আর য়্যাক বাঘের হাতে মিঠা।

www.pathagar.com

মোরে য়্যাকখান চিতে পিঠা ॥
আর য়্যাক বাঘ কাল্যা
গাঙ্গের মারে জাল্যা ।
আর য়্যাক বাঘের মাথাফাটা ।
ধান দেবারে কত কাঠা ॥
বার বাঘের লেখা পড়ি ।
চাউল দেও একবুড়ি ॥
(সমবেত কণ্ঠে)- ঠাকুর কুলাই তো ।

ব্রতের ছড়া (নবান্ন)

১.
মাগন ডাল, মাগন ডাল, সোনার কুণ্ডাল ॥
সোনার কুণ্ডালে ভৈরা লাড়ু,
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু;
বাপ রাজা বা মহেশ্বরী ॥
চন্দ্র সূর্য দিয়া ফুল ।
ভৈরা উঠুক দুই কূল ।
চন্দ্র সূর্য যত কাল ।
বাপ ভাই তত কাল ।
চাম্পা গাছে কাটলাম কুটলাম ।
বিষ্ণু আমার রাজা ।
দইস্যাল দইস্যাল বাপ ভাই লক্ষেশ্বর ।
জাঁইট কাটট্যা ভইটি পাইলাম ।
ভাইয়ের শত্রু নখে থুইলাম ।
সূর্য উঠে কোন দিক দিয়া?
সূর্য উঠে পূব দিক দিয়া
উঠ সূর্য উদয় দিয়া ।
বামুনের ঘরের কোণ ছুঁইয়া ।
বামুনের ঘরের বড় সেয়ান ।
পইতা কাটে বিয়ান বিয়ান ॥
উঠ সূর্য উদয় দিয়া ।
বইদ্যের ঘরের কোণ ছুঁইয়া ।
বইদ্যের মাইয়া বড় সেয়ান ।
ব্রত করে বিয়ান বিয়ান ॥
উঠ সূর্য উদয় দিয়া ।
ধোপার ঘরের কোণ ছুঁইয়া ।
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান ।

www.pathagar.com

কাপড় কাচে বিয়াম বিয়ান।
উঠ সূর্য উদয় দিয়া।
ভূইমালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া।
ভুঁইমালীর মাইয়া বড় সেয়ান।
খোলা চাঁছে বিয়ান বিয়ান ॥

উঠ সূর্য উদয় দিয়া।
কুমারের ঘরের কোনো ছুঁইয়া।
কুমারে মাইয়া বড় সেয়ান।
পাতিল গড়ে বিয়ান বিয়ান ॥
উঠ সূর্য উদয় দিয়া।
তেলীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া।
তেলীর মাইয়া বড্ড রাগী।
খাড়ার আগে ঢালে পানি ॥
ডালে পানি না লো চাল ধোয়নী।
চাল ধোয়নী না লো মেলে পাত।
উঠ সূর্য জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়ি।
সুবর্ণ নবান্নে পেট ভরি ॥

২.
কো কো কো,
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা
কাক বলি লবা
পাতি কাউয়া লাথি খায়,
দাঁড় কাউয়া কলা খায়,
কো কো কো
মোর গো বাড়ি শুভ নবান্ন।

পৌষ সংক্রান্তির ছড়া
১.
আইলাম লো শরণে।
লক্ষ্মীদেবীর বরণে ॥
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর।
ধানে চাউলে ভরুক ঘর ॥

www.pathagar.com

ধান দিয়া দিলেন কড়ি।
কড়ি হৈল সোনার লড়ি ॥
সোনার লড়ি রূপার মালা।
সব খাটালে টাকার ছালা ॥
একটা টাকা পাইরে।
কণ্যা বাড়ি যাইরে ॥
কণ্যাবাড়ী ধূপের মোচা।
টাকা ভাঙ্গাইলাম নুন পয়সা ॥
নুন পয়সা কত ধন।
কুলাইরে দেবা কত ধন ॥
(কোরাস) ঠাকুর কুলাই ভোঁ ॥

২.
হাট্যা চলরে। ধ্রু ॥
হাট্যা চল পাঁচিল পাড় । ঝপাৎ গিরিরে ॥ ধ্রু ॥
ঝপাৎ গিরি সজাগ হয়। সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সুন্দের বনেরে। ধ্রু ॥
সুন্দের বনে বাঘের ছাও। হাম্বুর হুম্বুর করে রব ॥
(বার বাঘের বর্ণনা)
য়্যাক বাঘরে। ধ্রু ॥
য়্যাক বাঘ চৈতা।
বাওন মার‍্যা নিলো পৈতা ॥
য়্যাক। বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি ॥
য়্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর।
... ... বাত্যা ইন্দুর ॥
আর য়্যাক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার‍্যা খাইল দৈ ॥
আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে ॥
আর য়্যাক বাঘের গলায় বাড়।
... ... ॥
আর য়্যাক বাঘ হিজল গাছে।
... ... ॥
আর য়্যাক বাঘ বাপের পুতে।
... ... ॥

www.pathagar.com

আর য়্যাক বাঘ বাইঙ্গা।
কাড় ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা ॥
আর য়্যাক বাঘের হাতে পিঠা।
মোরে য়্যাকখানা চিতৈ পিঠা ॥
আর য়্যাক বাঘ কাল্যা।
গাঙ্গের মারে জাল্যা ॥
আর য়্যাক বাঘের মাথা কাটা।
ধান দেবারে কত কাঠা ॥

বার বাঘের লেখাপড়ি।
চাউল দেও এক বুড়ি ॥
(কোরাস) ঠাকুর কুলাই ভোঁ ॥
আর য়্যাক বাঘ অমুক রায়।
জোতা পায় দিয়া বাহ্যে যায় ॥
আর য়্যাক বাঘ অমুকের মায়।
মায়্যা হৈয়া চসমা দ্যায় ॥

ঘ. লোককবিতা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এমনকিছু কবিতা রয়েছে যা লোকমুখে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। এসব কবিতায় বরিশাল অঞ্চলে লোককবিতা হিসেবে পরিচিত। নিম্নে কয়েকটি লোককবিতা তুলে ধরা হলো।

১.
দাঁড় কাউয়ারে আহবান কর্যা
পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া
কো কো কো
আজ কৈলাম মোগো বাড়ি শুবো নবান্নে
আইয়ো যাইয়ো কাক বলি লইয়ো

আত বর্যা সন্দেশ দিমু
পেটটী বর্যা খাইয়োঁ
কি মোহিনী জানোরে যাদু
কি মোহিনী জানো
মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলিয়া
ডাঙ্গায় বইসা টানো।

www.pathagar.com

২.
খাল জলে নাইরে– আমরা বৌ আনতে যাই ।
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ি ।
তারা কাপড় চোপড় কাইর‍্যা নিল মারল জুতার বাড়ি ।
খালে জল নাইরে–

বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ি
তারা ফ্যানে ফ্যানে ভাত দিল (আর) আমসী ধোয়া পানি ।
খালে জল নাইরে–

বৌ বাহির কর, বৌ বাহির কর;
দেখি, বৌয়ের বদলে খোকনের শাশুড়ি বুড়ি,
বেসাতি বাহির কর ; বেসাতি বাহির কর ।
দেখি, তিনটা ক্ষুদের হাঁড়ি ।
খালে জল নাইরে–

৩.
আমারে নিলনারে তোমার নায় ।
আমি কান্দি বইসে নদীর কিনারায়॥
কত আতুর লইছো খোড়ারে লইছো ।
আমারে লইয়া নৌকা বোঝাই হয়॥

কত নেকী লইছো বদীরে লইছো ।
আমারে লইয়া নৌকা বোঝাই হয়॥ ঐ
কত কোরান লইছো কেতাব লইছো ।
আমারে লইয়া নৌকা বোঝা হয়॥ ঐ

কত আগুন লইছো পানিরে লইছো ।
আমারে লইয়া নৌকা বোঝাই হয়॥ ঐ
আগা-পাছায় এমাম গো হোসেন ।
মা ফাতেমা বাদাম টেনে গো দেয় ॥ ঐ

৪.
আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নায় চড়তাম না,
দূরের পাড়ি ধরতাম না মাঝি ভাইয়া ।

www.pathagar.com

আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নায় চড়তাম না।
কাছি লইলাম, কোরা লইলাম, আরো লইলাম গুণ
সারা জীবন বাইলাম নাও নাহি পাইলাম কূলরে ঐ
মাদারের নাও মাদারের বৈঠা ভ্যারণের গুড়া।

জনম ভরে বাইলাম নাও না পাইলাম মুরারে ঐ
কোন মেসতরী পড়ছে নাও নাহি তার চিন
আগা গাছায় লেখা আছে রাব্বুল আলামিন রে।

৫.
জনম দুঃখি কপাল পোড়া গুরু আমি একজনা
গুরু আমার উপায় বল না,
শিশুকালে মরে গেছে মায়,
গর্ভে থুইয়া মরছে পিতায় চক্ষে দেখলাম না।

আমায় কে করবে লালন পালন
গুরু আমায় কে করবে সান্তনা ঐ
গিয়াছিলাম ভবের বাজারে
ছয়ও চোরা চুরি করল বানলো আমারে
ও তারা আপিল কোর্টে খালাশ পাইল
আমারে নেয় জেলখানায়। ঐ

৬.
কি কারণে ঘুচবে রে দুঃখ মুক্তি পাওয়া যায় রে
সোনা বন্ধু কইয়া যাওরে কি আছে উপায়।
সকল ধনের চাইতে খাটি নাই আমাদের সোনার মাটি
পরের বাড়ি খাইটা খাইট জীবন মোদের যায় রে
সোনা বন্ধু কইয়া যাওরে কি আছে উপায়
রোদে পুড়ি ঝড়ে ভিজি ফসল কাটি বিজধান।
বুনি মোদের শ্রমের সোনার ফসল উঠে কার গোলায় রে॥

সোনা বন্ধুরে কইয়া যাওরে কি আছে উপায়
ক্ষুধায় বাছা গেল মরি বৌ দিয়াছে গলায় দঁড়ি
হৃদয়ে আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ সহন না যায় রে
সোনা বন্ধু কইয়া যাও কি আছে উপায়।

www.pathagar.com

৭.

ঝর ঝরিতন ঝরিতন
তাম্বুরা টানায় বিবি জরিনা খাতুন।
আমবুরা তলায় বইয়া পেত তামবুরা টানায়,
ফুলইল তলা বইয়া ছপেত বাবাজান মিলায়।
বাবাজান তো আপন আপন ২ মা-জননী পর,
বিদাতায় তো লেইখ্যা থুইছে জোর মন্দির ঘর।
জোর মন্দির ঘর নয়রে ব্যাতেরই বান্দন,
সেই না ঘরে বইয়া ছপেত জোড়িছে কান্দন।
এ্যাতো কানদন কান্দো চপেত বেলা অইছে শ্যাষ,
এ্যাহোন আলা ম্যালা করো আপনারই দ্যাশ।
মাচার তলে বইসা ছপেত ফিরে ২ চায়,
বাবাজানের দালান- কোঠা খালি হইয়া যায়।
থাইকো ২ দালান- কোঠা এ্যাক-বার বছর,
যদি থাকে বাবার মনে আনিবে নাইওর।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি
লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প

হস্তশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে মৃৎশিল্পকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। মাটিতে গর্ত করে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি থেকে সম্ভবত মানুষ মৃৎপাত্র তৈরির ধারণা লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে বিভিন্ন মৃৎপাত্রের উদ্ভাবন হয়। তারও অনেক পরে, প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র শিল্পদ্রব্য হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। এই অঞ্চলে লোক সমাজের বিস্তৃত এলাকায় মৃৎশিল্পের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সাধারণত কুম্ভকার বা স্থানীয়ভাবে কুমার নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের পেশাজীবী মানুষ মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে যে, শিব ঠাকুরের বিয়ের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায়, ব্রাহ্মণদেরব ব্যবহারের জন্য জলঘট সংগ্রহ করা হয়নি। কোনক্রমেই জলঘট সংগ্রহ না করা যাওয়ায় শিব ঠাকুর তার রুদ্রাক্ষ মালার দুটি গুটিকা থেকে একটি পুরুষ এবং একটি নারী সৃষ্টি করে। এই নারী পুরুষদ্বয় জলঘট তৈরি করে শিব ঠাকুরকে প্রদান করে। শিব ঠাকুর সৃষ্ট এই মানব-মানবীদ্বয়কে কুম্ভকারদের আদি পিতা-মাতা বলা হয়েছে।

রোদে শুকানো হচ্ছে মৃৎশিল্প

www.pathagar.com

বরিশালের কুমার সম্প্রদায় শুকনা ঋতুতে বিভিন্ন স্থান থেকে আঠালো মাটি সংগ্রহ করে, সুবিধা মতো সময়ে হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-খোরা ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। মাটির এই সকল দ্রব্যাদি ছাড়াও অবসর সময়ে মাটির খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। সাধারণত এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাই এই কাজে অধিক পারদর্শী বলে প্রতীয়মান। মেয়েদের তৈরি মাটির পুতুলসমুহ টেপানি পুতুল নামে পরিচিত।

বর্তমান সময়ে কল-কারখানায় তৈরি হওয়া ধাতক এবং প্লাস্টিক দ্রব্যাদি মৃৎ নির্মিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্থান দখল করে নেয়ায়, প্রাচীন এই শিল্পের সাথে জড়িত কুমার সম্প্রদায় ভিন্ন পেশা গ্রহণে বাধ্য হতে চলেছে।

একসময়ে বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠিতে জমিদারদের অনুগ্রহে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পী বসতি স্থাপন করলেও এখন পাল সম্প্রদায়ের অবস্থান বরিশাল জেলায় চোখে পড়ার মতো। সেই ব্রিটিশ আমলেই কলসকাঠির পালদের তৈরি গাঁজার কলকে কলকাতার বাজার দখল করেছিল। বর্তমানে কলসকাঠির পাল পাড়ার ২৫/৩০ পরিবার মৃৎশিল্পী উৎকৃষ্ট মানের মাটির হাঁড়ি, পাতিল, টালি, সড়া তৈরি করেন। তবে ৭০বছর বয়সী গুণরাজ নারায়ণ পাল ও তার ছেলে শুধুমাত্র প্রতিমা তৈরিতেই সিদ্ধহস্ত নন মাটির বুদ্ধমূর্তিসহ বিভিন্ন শোপিস সুনামের সাথে তৈরি করছেন। কলসকাঠিতে ধীমাণ পাল এবং সুখরঞ্জন পালও কলসকাঠির অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন।

কলসকাঠি পাল পাড়ার চোখে পড়বে বেশকয়েকটি শ্রীমণ্ডিত সামগ্রী নৌকাযোগে দেশের বিভিন্ন বাজারে যায়। কলসকাঠির পাল পাড়ায় মৃৎশিল্পীদের এই অসংখ্য মৃৎসামগ্রীর সমারোহ দেশের অন্য যে কোনো স্থানের চেয়ে আলাদা। এখানে মৃৎশিল্প ভালোভাবে টিকে থাকার অন্যতম আরেক কারণ মাটির সহজলভ্যতা এবং সহজ ও কম খরচের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা। কলসকাঠির মৃৎশিল্পের এই অফুরন্ত সম্ভাবনা নতুনভাবে কলসকাঠিকে পরিচিত করে তুলেছে। সে পরিচয় জমিদার আশ্রয়ী উচ্চবিত্তের আমোদ-সংস্কৃতি নয়। এই পরিচয় মাটি ও মানুষের কাছাকাছি তাদের প্রতিদিনের চাহিদার, সৌন্দর্যের, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হবার পরিচয় বহন করে। কলসকাঠির মৃৎশিল্পীদের এই দক্ষতা পুরো কলসকাঠিকেই মৃৎশিল্পীদের গ্রাম হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে যে চিহ্নিত করবে তাতে সন্দেহ নেই।

কাদামাটি ছেঁনে ছুঁনে যারা একটু একটু করে শিল্প আর সাধনার মিশেল দিয়ে সাধারণের কাছে দেব দেবীর হাসিমুখ বা ধর্মীয় অনুসঙ্গ সৃষ্টি করেন লোক সমাজে যুগ যুগ ধরে তারা পাল সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। মৃৎশিল্পের অনন্য ধারা সৃষ্টিকারী পালদের গুণরাজও বলা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নয়, বংশপরম্পরায় গুণরাজরা মূর্তি গড়েন।

বরিশাল নগরীর রামকৃষ্ণ মিশনের মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা সৃষ্টির কারিগর দক্ষিণাঞ্চলের (পিরোজপুরের) শ্রেষ্ঠ গুণরাজ অনীল পাল জানান, প্রথমে ভ্যানা (খড় বেঁধে প্রাথমিক আকৃতি দেয়া) বাঁধা, হের পর দোআঁশ মাটি ভালো করে ডইল্লা দেই। শুকাইলে বালিমাটি দিয়া গড়ন করি, কালো আডাইল্লা (এঁটেল মাটি) মাটি গুইলা ২বার লেপ দেই। একবার হাত দিয়া আরেকবার তুলি দিয়া। মাঝে একটু আধটু ফাট-ফোট

www.pathagar.com

ধরলে কাপড় দিয়া মিশাইয়া দেই। আবারও ফাটলে বালি মাটি দিয়া লেপ দেই। মাটি শুকিয়ে সাদা হলে খড়িমাটি (চকের গুঁড়োর সাথে তেঁতুলআঠিগুঁড়ো জ্বাল দিয়ে আঠা তৈরি করে মিশিয়ে নিতে হয়) দিয়ে লেপ দেই। তারপর রঙের কাজ শুরু। সবশেষে আঁকি চোক (চোখ)।

এই চোখ আঁকাই সবচেয়ে কষ্টের। গুণরাজ বলতে শুরু করেন– চোখ আঁকার সময়ে মনে মনে মায়েরে ডাইক্কা লই। মা দেখার মতো হইও। তোমার মুখখানা হগলে দ্যাখবে, হেইডা যেন হাসিমাখা মুখ অয়। আমার মায়েরে দেইখ্যা যেন হগলডি খুশি হয়। সেই সাথে আছে রঙের কাজ। রঙ কি হবে তা আগে থাকতে ভাবলে চলবে না। প্রথমে দেবী দুর্গার রঙের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে অন্যদের সাজিয়ে তুলতে হয়।

শুধু দেশীয় রঙ ব্যবহার করেন তিনি। বানিয়া দোকান থেকে কিনে আনতে হয়। সে সব রঙে তেতুলের আঠা, খড়ি মাটি মিশিয়ে বিভিন্ন শেডের কাজ করেন। আগে কিভাবে রঙ দিতেন? প্রশ্ন করলে তিনি বলেন– সে সব দিনে রঙ আর কই ছিল– তবে ডিমের কুসুম দিয়া লাল রঙ বানাতাম, আর ছিল খড়িমাটি, গেরুয়া মাটি, বুলু (ব্লু), চালতার ভেতরের অংশ ভিজিয়ে রঙ তৈরি করতাম। তবে এখন সব আধুনিক বাহারী রং বাইরাইছে। কেউ কেউ স্প্রেও করেন। আমার ওসব ভালোলাগে না। নিজে যা পারি সুবিধামত হাতে বানাইয়া লই।

দক্ষিণাঞ্চলে যারা মৃৎশিল্পী, নিদেনপক্ষে দেবীমূর্তি গড়েন, যারা পাল হিসেবে সুনাম ছড়িয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ধারা বহমান। এদের মধ্যে পিরোজপুর কেন্দ্রিক পাল সম্প্রদায় ও অন্যটি কলসকাঠি কেন্দ্রিক শিল্প শৈলী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অনিল পাল পিরোজপুর ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও এই দুই ধারারেই স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

আগুনে পোড়ানো ও আগুলে পোড়ানোর জন্য মৃৎশিল্প

www.pathagar.com

কি পিরোজপুর ও কলসকাঠি দুই জায়গাতেই জমিদারদের হাত ধরে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ আমলে কলসকাঠির পালদের খুব নাম-ডাক ছিল। এই পালেদের তৈরি গাঁজার কল্কে নৌকা বোঝাই করে কোলকাতায় যেত। খোদ কোলকাতায় কলসকাঠির গাঁজার কল্কের তখন বড় কদর। এছাড়া এখানে ছিল তেরো ঘর জমিদার। তাদের আত্মীয়-স্বজন, বাবু, নায়েব-পাইক- বরকন্দাজ সবকিছু মিলিয়ে কলসকাঠি তখন দ্বিতীয় কোলকাতা নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এখানকার জগধাত্রী পূজো খুবই জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই পূজা ও মেলাকে ঘিরে হাজার হাজার মানুষ কলসকাঠিতে আসতো বলে জানিয়েছেন সাংবাদিক সুশান্ত ঘোষ।

শিল্পবোধের নিপূণ ছোঁয়ায় কাদামাটি-খড়কুটো দিয়ে যাঁরা চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যে গড়ে তোলেন দেবী মূর্তি সে সব মৃৎশিল্পীদের সম্মাননা জানানোর রীতি শুরু হয়েছে বরিশালে। সাংবাদিক সুশান্ত ঘোষের প্রচেষ্টায় এবং বরিশালের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয় কৃষ্ণ দে-এর সহযোগিতায় মৃৎশিল্পীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় বেশ কয়েক বছর ধরে। ২০১০ সালে বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভাগৃহে দুর্গা পূজার মহাসপ্তমীর দিন সকালে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। বর্তমানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বরিশাল জেলা ও মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। গুণরাজ খ্যাত শিল্পীদের এমনিভাবে সংবর্ধনা প্রদান দেশে প্রথম বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। ২০১০ সালের প্রথম অনুষ্ঠানে বরিশাল অঞ্চলের প্রবীণ গুণরাজদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন স্পেন প্রবাসী শিল্পী শহিদ কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক আতিকুর রহমান, আয়োজক কমিটির সভাপতি রাখাল চন্দ্র দে, অ্যাডভোকেট শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

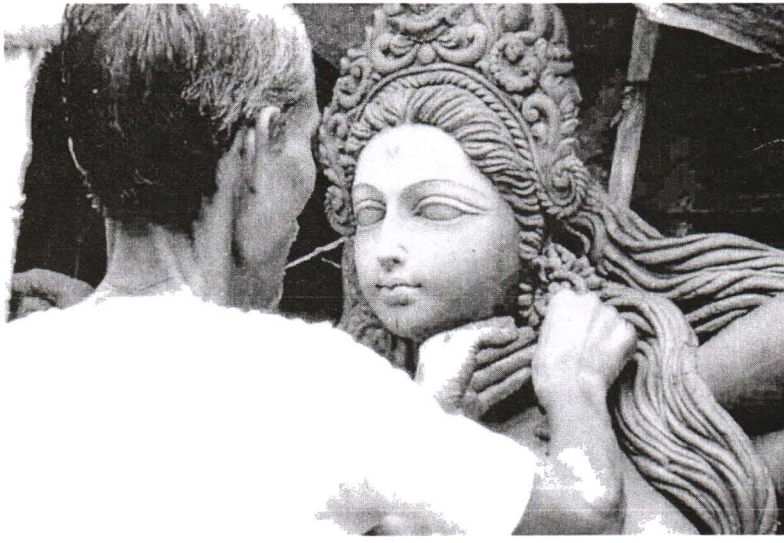

মৃৎশিল্পী গুণরাজ অনীল পাল

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে ৩৫জন মৃৎশিল্পীদের হাতে ক্রেস্টের পাশাপাশি নতুন পোশাক, নগদ টাকা এবং মিষ্টি তুলে দেয়া হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণরাজরা হলেন– অনিল পাল, নিতাই পাল, নারায়ণ পাল, বিনোদ বিহারী পাল, উত্তম পাল, প্রেমানন্দ পাল, অমল পাল, গোবিন্দ পাল, গোপাল পাল, বিমল পাল, গৌরাঙ্গ পাল প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় বক্তারা মৃতপ্রায় মৃৎশিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করে বলেন শিল্পীকে বাঁচাতে না পারলে শিল্প বাঁচবে না। তারা আরো বলেন, শিল্পের মেধাসত্ব নির্ণয় এবং শিল্প দ্রব্যের মূল্যমান নির্ধারণের মাধ্যমে বাঙালির লোকশিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

২. নৌশিল্প

নৌকা শিল্পের প্রসার ও বিকাশের মূলে ছিল অংসখ্য নদীপথ। নানাধরনের নৌকা নির্মাণে দেশীয় কারিগরদের খ্যাতি ছিল। মেনদিগঞ্জের দেবাইখালি এবং শামপুরে তৈরি হতো উচ্চমানের কোশা নৌকা। আগারপুরের কাছে ঘন্টেশ্বরে এবং পিরোজপুরের বরষাকাঠিতে তৈরি হয় পানসি।

বরষাকাঠি মালবহনের বড় আকারের নৌকা নির্মাণে সুনাম অর্জন করে। সুন্দরবনাঞ্চলে কেরুয়াকাঠি থেকে মগরা একরকম ডিঙি বানাত। ঝালকাঠিতে সুন্দরীকাঠ থেকে এক ধরনের ডিঙি তৈরি হতো। এসব ছাড়াও নানা ধরনের নৌকা পাওয়া যেত কালীগঞ্জ, বাকরগঞ্জ, ফালাগড়ে। নৌকা নির্মাণ বাকরগঞ্জ জেলার অন্যতম

www.pathagar.com

শিল্প। এই শিল্পের বিকাশ ঘটে বহু আগেই। অসংখ্য মানুষের জীবিকার মাধ্যম এই শিল্প। তাছাড়া নৌকা ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও কম নয়। নৌকা সব নদীতে চলাচল করতে পারে না। ছোট নদী এবং বড় নদীতে চলাচল উপযোগী নৌকার মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করেও নৌকা তৈরি হয়। বরিশালের বিভিন্ন স্থানে যেসব নৌকা তৈরি হয়, তার বিবরণে পাওয়া যায়–

১. গয়না নৌকা- বাংলার পরিচিত নৌকা। ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী নিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করে। অগভীর জলে চলাচল করে। ছোট ছোট খাল বিলে চলাচল করলেও বড় বড় নদী স্বচ্ছন্দে পারাপার করে। ৫০ থেকে ৬০ ফিট দৈর্ঘ্য এবং চওড়া ১২ ফিটের মতো।

২. গোলের নাও- ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তৈরি এই নৌকায় গোলপাতা বহন করা হয়। ২০ থেকে ২৫ ফিট লম্বা এবং ১০ থেকে ১২ ফিট চওড়া কাঠও বহন করা যায়। অর্থাৎ বেশি ওজনের জিনিস বহন করতে পারে। সেভাবেই তৈরি এই নৌকা।

৩. বাছরি নাও- সাধারণত নৌকা বাইচের জন্য তৈরি এই নৌকার দৈর্ঘ্য ও ৬০ থেকে ৭০ ফিট। চওড়ায় মাত্র ৪ থেকে ৫ ফিট। নৌকায় দাঁড় ও দাঁড়ির সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত দেখা যায়।

বরিশালের বানারিপাড়া এবং পার্শবর্তী আটঘর-কুড়িয়ানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা কিকিকিনি হয় এভাবে যাকে স্থানীয়রা নৌকার হাট বলে সম্বোধন করে। স্বরূপকাঠিতে বর্ষাকালে নৌকারহাট বসে নিয়মিত

www.pathagar.com

৪. পাটের নৌকা- বাংলাদেশে এই বিশেষ শ্রেণির নৌকায় পাট বহন করা হয়। রম্বায় ঘাসি নৌকা থেকে কিছু ছোট। ২৫ থেকে ৪৫ ফিটের মধ্যে থাকে। তবে চওড়ায় ১২ থেকে ১৩ ফিট।

৫. ঘাসি নৌকা– ছোট ছোট খাল বা বিলের ওপর চলাচলের উপযোগী। ৫০/৬০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। সাধারণ ৫০-৬০ ফিট লম্বা এবং ১২ ফিটের মতো চওড়া। স্বল্প দূরত্বে অগভীর জলে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে। পারিবারিক প্রয়োজনে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

৬. ডোংগা নৌকা– দৈর্ঘ্য ৯ থেকে ১২ ফিট। ছোট আকারের নৌকা। সব সময় ছোট ছোট নদী ও খালে-বিলে চলাচল করে। সাধারণত এসব নৌকায় কৃষকরা গরু, ছাগল, ঘাস, কাঠ বহন করে।

৭. টাবইরা নৌকা– সব ছোটখাট নদীতে এক দাঁড়ির ছই যুক্ত এই নৌকা চলাচল করে যাত্রী নিয়ে। এই নৌকা বেশির ভাগ সময় ভাড়া খাটে।

৮. পিনিস– এক সময় বাবুমহলের আদরের নৌকা ছিল। জমিদার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পিনিস রাখতেন নিজেদের প্রয়োজনে চলাচলের জন্য। মজবুতভাবে তৈরি এই নৌকা দেখতে হাউস বোটের মতো। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, ঘুমাবার এবং বসবার ব্যবস্থা, রান্না করার ব্যবস্থা থাকত এই নৌকায়। নৌকার ছাদে থাকত রেলিং। সেখানে বসে নদী সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত।

৯. কাথানি নৌকা– বেশ বড় নৌকা। মালপত্র বহন করে। গভীর নদীতে চলাচল উপযোগ। নৌকার ছই থাকে। ধান, চাল, সুপারি এবং অন্যান্য বহু মালপত্র বহন করে থাকে।

৩. শঙ্খশিল্প

হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকা শাঁখাশিল্পের উদ্ভব করে হয়েছিল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কে গ্রাম-বাংলায় অসংখ্য কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতি প্রচলিত। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, শিব-পার্বতীর বিয়ে উপলক্ষে, শিব নববধূর জন্য শঙ্খ নির্মিত অলংকার তৈরি করে। আর সেখান থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সধবা মহিলাদের হাতে শঙ্খ নির্মিত বালা, যা শাঁখা নামে পরিচিত সেই অলংকার পরার প্রথা শুরু হয়েছে বলে ধারণা হয়। ধর্মীয় অনুভূতি মিশ্রিত হওয়ার কারণে প্রাচীনকাল থেকে লোকপরম্পরায় এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানেও টিকে আছে এই শিল্প।

হিন্দু রমণীদের সধবার প্রতীক শাঁখার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসা কেন্দ্র ছিল বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠিতে। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এখানে হাতে গোণা কজন ব্যবসায়ী শাঁখার ব্যবসা শুরু করেন। যেহেতু ঝালকাঠি ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা তাই বিয়ে এবং পূজা পার্বনসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক আচারানুষ্ঠানে শাঁখা এবং শঙ্খজাত দ্রব্যাদির বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে শিল্পটির বিস্তৃতি ঘটে। বর্তমানে এক সময় এর সাথে প্রায় ৩/৪ শ কারিগর (শঙ্খশিল্পী) জড়িয়ে পড়ে সুখেই দিন যাপন করতে থাকে।

প্রথম দিকে অবিভক্ত বাংলার 'জিতপুর' (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত) থেকে গোটা শঙ্খ কিনে এনে এখানে শাঁখা তৈরি করা হতো। ঝালকাঠিতে

www.pathagar.com

তৈরি শাঁখার উপর তখন বৃহত্তর বরিশালের বরিশাল সদর, পটুয়াখালী, কলসকাঠি, কুশাংগল, গৌরনদী, মেদাকুল, উজিরপুর প্রভৃতি স্থানের পাইকাররা নির্ভরশীল ছিল। ১৯৫৮সালে ঝালকাঠিতে 'দি বরিশাল শঙ্খশিল্প সমবায় সমিতি লি.' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার রেজিঃ নং ২ বিডি/১৯৫৯/এটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন হিমাংশু দত্ত, অঞ্জন কুমার বর্ধন এবং অনিল বর্ধন। এদের মধ্যে হরিপদ দত্তের দোকান ঘরের একাংশেই সমিতির প্রারম্ভিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে সম্মিলিত উদ্যোগে নিজস্ব কার্যালয় সমিতির দপ্তর স্থানান্তর করে সেখানে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এই সমিতিই তৎকালীন সরকার কর্তৃক শ্রীলংকা থেকে আমদানীকৃত শঙ্খের কোটা ভিত্তিক বরাদ্দ উত্তোলন করে তা সমিতিভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সমবণ্টনের মাধ্যমে শাঁখা ব্যবসায়ে পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা সৃষ্টিতে এক বিরাট ভূমিকা রাখে।

সমিতি তখন শঙ্খ কাটার একটি মেশিনও স্থাপন করে। যার কল্যাণে শিল্পীদের আর শাঁখের করাত ব্যবহারের প্রয়োজন হতো না। সমুদ্রজাত বিশেষ ধরনের শঙ্খ বা শাঁখ থেকে শাঁখা তৈরি হয়। এই কাঁচামাল থেকে এক শ্রেণির পেশাজীবী সম্প্রদায় শাঁখা তৈরি করে থাকে। শাঁখারি নামে পরিচিত এই কারিগরেরা সামুদ্রিক শঙ্খকে করাত নামের বিশেষ অস্ত্রের সাহয্যে কেটে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে শাখাসহ নানা প্রকার অলংকার, বোতাম আংটি, ছাইদানী, চুলের ক্লিপ ইত্যাদি তৈরি হয়। এই অঞ্চলে শাঁখাশিল্পের প্রয়োজনীয় শঙ্খ প্রাকৃতিকভাবে সহজলভ্য নয়, তারপরেও এখানকার হিন্দু প্রধান এলাকায় প্রাচীনকাল থেকেই শাঁখাশিল্প বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বরিশাল নগরীর বাজার রোডে ১০টি দোকানে শাখা বিক্রি হচ্ছে। এদের মধ্যে মাত্র দুই ঘরে শাঁখার নকশা তৈরি করা হয়। যে দুই জন শাখা কাটেন এবং নকশা করেন তারা শঙ্খ শ্রীলংকা বা ভারত থেকে আমদানি করেন। এরা হলেন বরিশাল নগরীর বাজার রোডের রাধাহরি শঙ্খ ভাণ্ডারের সত্ত্বাধিকারী জহর শাঁখারি এবং বন্ধুহরি শঙ্খ ভাণ্ডারের সত্ত্বাধিকারী কানাই শাঁখারি। বাকিরা রেডিমেট শাঁখা বিক্রি করেন। উভয় শ্রেণির শাঁখা ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই পূর্বপুরুষের ব্যবসা পরিচালিত করে আসছেন। বাকিরা যা জেলার আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার শাঁখারিরা পাইকারি কিনে নেন। আগৈলঝাড়া এবং গৌরনদী, বাটাজোরে বেশ কয়েক ঘর শাঁখারি এখনো সরাসরি শাঁখা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে আগৈলঝাড়ার গৌরাঙ্গ দত্ত, গৌরনদীর নূপুর দত্ত, গোপাল দত্ত এবং বাটাজোরের শ্যামলাল শঙ্খ বণিক, সুনীল শঙ্খ বণিক অন্যতম। বর্তমানে একজোড়া মগরমুখ শাঁখার দাম ১শ টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতাদের মতানুযায়ী ৩/৪ হাজার টাকাতেও একজোড়া শাঁখা বিক্রি করা হয়। তবে সাধারণ মানের শাঁখার জোড়া ৪শ থেকে ৬শ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়া শঙ্খের গুঁড়া মুখ পরিস্কার রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে সৌদ নামের চর্মরোগ হলে শঙ্খের গুঁড়া ব্যবহার করার প্রচলন আছে। বর্তমানে ১০/১৫ গ্রামের এক প্যাকেট শঙ্খের গুঁড়ার দাম ২৫/৩০টাকা। অনেক জ্যোতিষি দেহ

www.pathagar.com

ও মন ঠাণ্ডা রাখার জন্য পুরুষদের শঙ্খের আংটি ব্যবহারের বিধান দিয়ে থাকেন। নকশা ভেদে একটি অংটির বর্তমান দাম এক'শ থেকে দেড়'শ টাকা।

এছাড়া শঙ্খের গুঁড়া মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে সৌদ নামের চর্মরোগ হলে শঙ্খের গুঁড়া ব্যবহার করার প্রচলন আছে। বর্তমানে ১০/১৫ গ্রামের এক প্যাকেট শঙ্খের গুঁড়ার দাম ২৫/৩০টাকা। অনেক জ্যোতিষী দেহ ও মন ঠাণ্ডা রাখার জন্য পুরুষদের শঙ্খের আংটি ব্যবহারের বিধান দিয়ে থাকেন। নকশা ভেদে একটি আংটির বর্তমান দাম একশ থেকে দেড়শ টাকা।

৪. বাঁশশিল্প

বাঁশ জন্মানোর মতো অনূকুল পরিবেশ থাকার কারণে এই এলাকায় প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের প্রচলন রয়েছে। অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যবহারের সুবিধা থাকায়, এখানকার বেশিরভাগ মানুষ তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে বাঁশের ব্যবহার করে থাকে। ঘরের খুঁটি, বেড়া ইত্যাদি ছাড়াও এই অঞ্চলে মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণ, মাথাল, পাখির খাঁচা, বিভিন্ন ধরনের ঝুঁড়ি,ডালা কুলা, চালুনি বাঁশ দ্বারা তৈরি হয়। সাধারণত এই অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বাণিজ্যিকভাবে বাঁশের বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে।

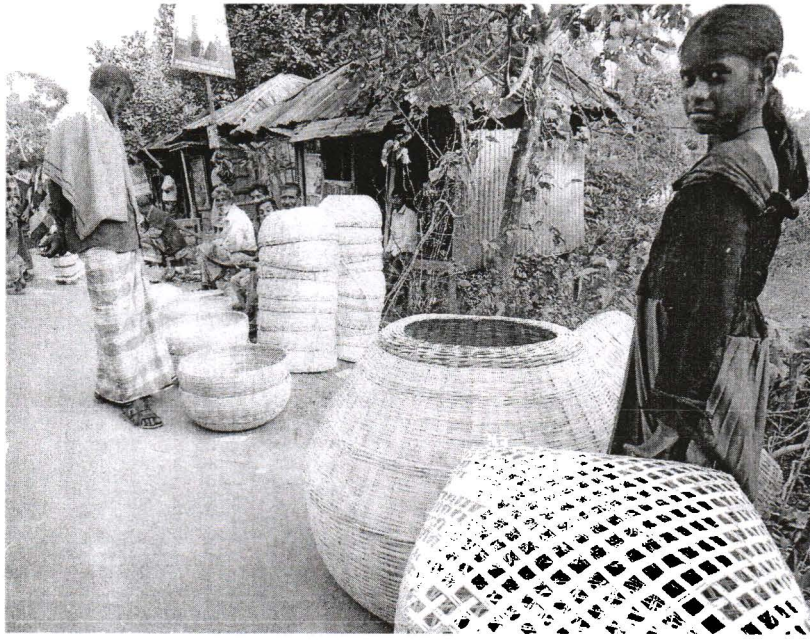

বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র

www.pathagar.com

৫. শোলাশিল্প

বরিশাল অঞ্চলের বিল এবং জলাভূমিতে শোলা নামের এক ধরনের জলজ উদ্ভিদের আধিক্য রয়েছে। এই জলজ উদ্ভিদ থেকে শোলাশিল্পের উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠানে শোলা নির্মিত বিভিন্ন উপকরণের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় বলে, প্রাচীনকালেই এই শিল্পের উদ্ভব হয়েছে ধারণা করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহে, বর-কনে উভয়ের জন্য শোলা নির্মিত মুকুটের ব্যবহারও প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ইংরেজ আমলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শোলার টুপির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। কাচা শোলা পানি থেকে তুলে, শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। এই শিল্পের সাথে জড়িত কারিগরেরা লোকসমাজে মালাকর নামে পরিচিত। যদিও বর্তমান সময়ে শোলাজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে এসেছে, তারপরেও এই অঞ্চলের লোকসমাজে শোলার তৈরি বিভিন্ন পণ্যের প্রচলন রয়েছে।

লোকবাংলার বহুমাত্রিক শিল্পের অন্যতম একটি শিল্প শোলাশিল্প। বিয়ের আসরে বর-কনের মাথার সুদৃশ্য মুকুট আর দুর্গা বা লক্ষ্মী পূজা যেন শোলার কদম ও ঝাড় ছাড়া আজো চলছে না। নিম্ন বা জলাভূমিতে জন্মানো শোলা গাছই এই শিল্পের একমাত্র কাচামাল। ৪/৫ ইঞ্চি ব্যাসের পরিণত শোলাগাছ কাটার পর কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে শিল্পপণ্য তৈরি জন্য উপযোগী করা হয়। শুকানো গাছের উপরের অংশ পাতলা করে কেটে ভেতরের সাদা-শুভ্র শোলা বের করে আনা হয়। শিল্পপণ্য প্রস্তুত করতে প্রয়োজন শুধুমাত্র ধারালো ছুরি।

শোলাশিল্প হাতে মাধব মালাকার

www.pathagar.com

এছাড়া বিভিন্ন রঙ (বিশেষ করে সবুজ, হলুদ, লাল, নীল) ব্যবহার করা হয়। আগে রঙগুলো প্রকৃতিকভাবে তৈরি করা হতো। বর্তমানে বাজার থেকে কিনে আনেন শিল্পীরা। সাদা শোলাকে রঙিন করতেই ওই রঙ ব্যবহার করা হয়। তার পরে শিল্পীর নিপুণ হাতের বংশপরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ফসল দৃষ্টিনন্দন শোলাশিল্প। লোকবাংলার এই শিল্পকে যারা বংশপরম্পরায় টিকিয়ে রেখেছেন তাদেরকে বলা হয় মালাকার সম্প্রদায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী এই সম্প্রদায় তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থায় শুদ্র শ্রেণিভুক্ত। তবে মালাকার সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। বরিশাল জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে শিল্পপণ্যের কম চাহিদা এবং শিল্পমূল্য নামমাত্র হওয়া ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ শিল্প আজ হুমকির মুখে। পেশা ছেড়ে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছে মালাকার সম্প্রদায়ের নবীন সদস্যরা।

সাক্ষাৎকার

মাধব মালাকার। বয়সঃ ৬১। পিতা : মৃত নারায়ণ মালাকার। ঠিকানা : নিয়ামতি বাজার, মালাকার বাড়ি, পোস্ট : নিয়ামতি, উপজেলা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল। বাড়িতে বাপ-কাকাদের শরিক মিলে বর্তমানে ৬ টি পরিবার রয়েছে। ওই ৬ পরিবারের সব পরিবারের কর্তারাই মৌসুমী শিল্পী হিসেবে শোলাশিল্প টিকিয়ে রেখেছেন। বছরে দুবার শোলার কাজ করেন। সময় দুটি হল– দুর্গা পূজা-লক্ষ্মী পূজা, কালি পূজা (শরৎকাল), জগদ্ধাত্রী পূজার সময় (চৈত্রমাস)। সেসময়ের বানানো শিল্পকর্মই পহেলা বৈশাখসহ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন উৎসবে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পূজার সময়ে সামান্য পরিমাণ এবং বিয়ের জন্য মুকুটের অর্ডার পেলে কাজ করেন। বর্তমানে তাদের শিল্পসম্ভার প্রস্তুত করতে সবকিছু গুছিয়ে দিচ্ছেন ঘরের নারীরা। গোছানোর ক্ষেত্রে পরিবারের ছেলে বা পুরুষদের আগ্রহ কম। চাহিদানুযায়ী অর্থ না পাওয়ায় পুরুষরা এই শিল্পের কাজে বেশি একটা সময় ব্যয় করতে চান না।

মালাকারদের তৈরি শিল্পপণ্যের মধ্যে– মালা, ঝাড় এবং কদমই মূখ্য। এগুলো পূজার জন্যই তৈরি করে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও শিশুদের খেলনা হিসেবে রঙিন জোড়া পাখি এবং পূজার জন্য ছোটখাট কিছু নির্দিষ্ট শিল্পপণ্য রয়েছে। মালা তৈরি জন্য অপেক্ষাকৃত সরু শোলার ডাট ব্যবহার করা হয়। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রঙের শোলা গেথে মাঝে মধ্যে ছোট ফুলাকৃতির কদম এবং পাতাকৃতির ঝুলমি ব্যবহার করা হয়। ফল-পাতাও বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কদমের মধ্যে এককদম, তিনকদম, পাঁচ কদমবিশিষ্ট ঝোলানো তোড়াই অন্যতম। এই কদম তোড়া পূজায় ব্যবহারের পর ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রঙিন ডাটে তিন কদম এবং এর সাথে তিনপাতার নকশা হিন্দু সম্প্রদায়ের দরজার আড়ায় শোভা পায়। অনেকে নবান্ন উৎসবের সময় এই তিন কদমের সাথে ধানের ছাড়াও ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রাখেন মঙ্গল কামনায়।

সাত কদম, চৌদ্দ কদম, একুশ কদম, সাতাশ কদমবিশিষ্ট ঝাড়বাতির আকৃতিতে ঝাড় বানানো হয়। এই ঝাড়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক কদম ছাড়াও রঙিন পাতা এবং বাহারি নকশার ঝুলমি ব্যবহার করা হয়। অনেক মালাকার শোলার সাথে জরি ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

পাটের সুতলির সাহায্যে বাধা পাটখড়ির কাঠামোয় শোলার পাত কেটে লাগিয়ে এই ঝাড় তৈরি করা হয়। দেখে মনে হয় যেন পুরোটাই শোলার তৈরি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের জন্য, ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপনয়নের (পৈতা পরিধান অনুষ্ঠান) সময় শোলার তৈরি মুকুটের প্রয়োজন হয়। এককালে ওই মুকট নেয়ার সময় মালাকার পরিবারকে ভুজ্য (পরিবারের একদিনের খাবার জন্য যাবতীয় দ্রব্যাদি) করার প্রদান করা হতো। বাদ্য-উলুধ্বনি সহকারে মুকুট নেয়া হতো। সাথে মিলতো ধুতি-শাড়ি, দক্ষিণা। মূল্য নিতাম পরে। এখন আর মালাকারদের সেই দিন নেই। নামমাত্র মূল্যে শোলার শিল্পকর্ম বরিশালের ফুটপাথে বসে বিক্রি করি।

গত কয়েক বছর ধরে তিনি (মাধব মালাকার) একবিঘা জলাভূমি বর্গা নিয়ে শোলার চাষ করে ছিলেন। সেখান থেকে উৎপাদিত শোলা দিয়ে শিল্পপণ্য তৈরি করেছেন। কিন্তু চলতি বছর থেকে জমি না পাওয়ায় শোলা যশোর থেকে কিনে আনতে হয়েছে অতিরিক্ত দামে যা দিয়ে উৎপাদিত শিল্পকর্মের দাম পড়েছে অনেক । কিন্তু বাজারে দাম মিলছে না আশানুরূপ। বর্তমানে তিন কদমের তোড়া ২০ টাকা, মালা ১০ টাকা, এবং ঝাড় ২শ/ আড়াইশ টাকায় বিক্রি করছেন তিনি। এছাড়া জোড়া পাখি ২০ টাকা এবং বিয়ের মুকুট ২শ থেকে হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। তবে বিয়ের মুকুট এখন ঢাকার শাঁখারি বাজার থেকে কিনে এনে দোকানীরা বিক্রি করায় মালাকার বাড়িতে অর্ডার আসে না তেমন একটা। বর্তমানে তিনি শোলা শিল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩০ হাজার টাকা রোজগার করছেন। তার মতে শোলার শিল্পকর্ম বানানোর আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে, ধোয়া কাপড়-চোপড় পড়ে গোবিন্দের নাম নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়।

মাধব মালাকার ছাড়াও বরিশাল নগরীর বাজার রোড এবং হাটখোলা হরি মন্দিরে পূজা উপলক্ষে শোলার শিল্পকর্ম নিয়ে এসেছেন ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার তালতলা বাহাদুরপুরের বাসীন্দা সুখরঞ্জন মালাকার (৫৫), পিতাঃ মৃত অনন্ত মালাকার। তার বাড়ির ৪ শরিকের মধ্যে তিনি একাই এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। তালতলা বাহাদুরপুরে টিকে থাকা মালাকারদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ বলে তিনি জানান। পান ব্যবসায়ী সুখরঞ্জন মালাকারের স্ত্রী আরতী রাণী মালাকার তার শিল্প কর্মের প্রধান সহায়ক। ছেলে মেয়েরা শোলাশিল্পকে ধরে রাখতে চাচ্ছে না। তিনি বছরে এই শিল্পের মাধ্যমে ২০/২৫ হাজার টাকার মতো রোজগার করেন।

বরিশালের বাজারে শোলার শিল্পকর্ম বিক্রি করতে আসা আরো দুজন মালাকার হলেন– সুশীল মালাকার (৫০) এবং পরিমল মালাকার (৩৫)। সম্পর্কে তারা ভাই। তাদের পিতার নামঃ মৃত শশীকান্ত মালাকার। ঠিকানাঃ গ্রাম– সরই, পোস্টঃ সরই, উপজেলাঃ নলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠি। এছাড়া সুশীল মালাকারের ছেলে বাবুল মালাকারও শোলাশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিবারটিও বংশ পরম্পরায় এই শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন। সুশীল মালাকারের স্ত্রী দিপালী মালাকার এবং পরিমল মালাকারের স্ত্রী টুলী রাণী মালাকার তাদের প্রধান সহায়ক। পারিবারিক অর্থনীতিকে সচল রাখতে তাদের এই প্রচেষ্টা। গত বছর তারা ১৫ হাজার টাকার মতো আয় করেছেন এই শিল্পের মাধ্যমে। মাধব মালাকার, সুখরঞ্জন মালাকার এবং পরিমল মালাকারের মতে–

www.pathagar.com

আশপাশ অঞ্চলের মধ্যে তারা ছাড়া ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার উত্তম মালাকার বাড়ির ১ ঘর, ঝালকাঠির ধিরেন এবং বাবুল মালাকার বাড়ির ৩ ঘর, নলছিটির আনন্দ ও নিকুঞ্জ মালাকার বাড়ির ২ ঘর এখনো শোলা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার আঙ্গারিয়া গ্রামের উত্তম মালাকার জানান– আঙ্গারিয়া গ্রামে এখনো ১০ গর মালাকার রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫ ঘর শোলাশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে তিনি ছাড়া– ধীরেন মালাকার, মহেন্দ্র মালাকার, পবিত্র মালাকার এবং গৌরাঙ্গ মালাকার উৎসব উপলক্ষে বরিশালে তাদের শিল্পকর্ম বেচা-কেনা করেন। তাদের মতে নলছিটি উপজেলার এককালীন বাসীন্দা ৬ বছর আগে মারা যাওয়া কেষ্ট মালাকারের শিল্পকর্ম বরিশাল অঞ্চলবাসীর নজর কাড়ত। বর্তমানে ঝালকাঠির ধীরেন মালাকারের শিল্পকর্ম নিখুঁত বলে তারা মনে করেন।

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতিতে নিরঞ্জন মালাকার, তার পুত্র লিটন মালাকার বরিশালে তাদের শিল্পপণ্য বিকিকিনি করেন। লিটন মালাকার জানান– নিয়ামতিতে এখনো ১০ ঘর মালাকার রয়েছেন। যাদের প্রত্যেকেই শোলাশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। তবে বরিশালের বাজারে বিকিকিনি করেন ২/৩ জন। বাকিরা বাড়িতে বসেই কদম, ঝালর বানিয়ে বরিশালে যাওয়াদের কাছে পাইকারি বিক্রি করেন। তিনি ছাড়া ওই ১০ মালাকার পরিবার হল– বলাই মালাকার, বীরেন মালাকার, নারায়ণ মালাকার, পঙ্কজ মালাকার, কানাই মালাকার, সন্তোষ মালাকার, মাধব মালাকার প্রমুখ। এছাড়াও বাকেরগঞ্জের হলতায় সুবল মালাকার, সীমান্তবর্তী পটুয়াখালীর লেবুখালীর পরিতোষ মালাকার, বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নে বিপুল মালাকার বরিশালে তাদের উৎপন্ন শিল্পপণ্য বিক্রি করেন। পরিতোষ মালাকার জানান– লেবুখালীতে ৮ ঘর মালাকার পরিবার রয়েছে। যাদের সবাই শোলাশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

কালের বিবর্তনে মালাকার সম্প্রদায়ের শোলাশিল্প হুমকীর মুখে হলেও বাজারে কিনতে পাওয়া থার্মোকল সিটের (কর্ক সিট) শিল্পকর্ম বিভিন্ন উৎসবসহ সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সাবেকি আলপনা থেকে আধুনিক ডিজাইনের নকশা, লেটারিং, গেট সাজানো, অনুষ্ঠান স্থান অলংকরণ এমনকি দোকানের আধুনিক ডেকোরেশনের কাজেও কর্ক সিটের শিল্পকর্ম ব্যবহার করা হয়। শুভ্র কর্ক সিটের শিল্পকর্মের সাথে বাহারি রং ব্যবহার করে ওগুলোকে আরো দৃষ্টিনন্দন তরে তোলা হয়। কখনো কখনো কর্ক সিটের মাধ্যমে টেরাকোটার কাজও করা হয়ে থাকে। যা বড় বড় রেস্টুরেন্ট এবং অভিজাত শ্রেণির ঘরের বসার ঘরেও শোভা পাচ্ছে।

৬. পাটি-চিকনি-হোগলা ও মাদুর শিল্প

দেশের যে কয়টি জেলায় শীতলপাটি, হাগলা, চিকনি, মাদুর তৈরি হয় তার মধ্যে বরিশাল অন্যতম। জেলার উপজেলা সদর, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী, আগৈলঝাড়া উপজেলার শতাধিক পরিবার আজো পাটি বুনন শিল্পকে তাদের বাঁচার অবলম্বন হিসেবে আকড়ে রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর, আমুয়া, কাঠালিয়া এবং পিরোজপুর জেলার কাউখালীতে পাটিশিল্প টিকে আছে।

www.pathagar.com

পাটি তৈরির উপকারণ হোগলা

শীতলপাটি তৈরি করছেন

www.pathagar.com

কাউখালীর সুবিদপুর শীতলপাটির গ্রাম হিসেবে পরিচিত। যারা বংশ পরম্পরায় পাটি বুননের কাজে সম্পৃক্ত তাদের স্থানীয় ভাবে পাটিকর বলা হয়। পাটি এবং চিকনির তৈরির জন্য পাইতরা, হোগলার জন্য হোগল এবং মাদুরের জন্য শন প্রয়োজন। পাইতরা নদীর তীরবর্তী নিচু জলাভূমিতে জন্মে। হোগলও একই প্রকার জমিতে জন্মে। আগে এগুলো চাষের প্রয়োজন হতো না। বর্তমানে পাইতরা চাষ করতে হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে সমান চওরায় পাইতরার উপরের অংশ কেটে সামান্য শুকিয়ে শীতলপাটি বোনা হয়। পুরুষ সদস্যরা পাইতরার চাষ, সংগ্রহ, কাটার কাজ করে। আর বাড়ির নারীরাই বুননের কাজ করে থাকেন। শীতলপাটি অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনত্বে বোনা হয়। দক্ষ পাটিকররা বুননে জ্যামিতিক নকশা করে থাকেন। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে সবুজ বা লাল রঙের চিকন পাড় ব্যবহার করা হয়। শীতলপাটির সুরক্ষায় এর চারদিক দুই ইঞ্চির সমমাপের লাল কাপড় দিয়ে বর্ডার দেয়া হয়। এই পাটি পাতলা হওয়ায় মুড়ে বা ভাঁজ করে রাখা যায়। গ্রীষ্মকালে শীতলপাটি পেতে ঘুমানোর সাধ সৌখিনমাত্রে এখনো বিদ্যমান। বর্তমান বাজারে চার হাত প্রস্থ এবং পাঁচ হাত দৈর্ঘ্যের ভালো মানের একটি শীতলপাটির বাজারমূল্য আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। মাঝারিমানের শীতলপাটির দাম দেড়হাজার থেকে বারশ টাকা।

শীতলপাটি অপেক্ষা চওড়া করে কাটা পাইতরা দিয়ে চিকনি বা পাটি তৈরি করা হয়। চিকনি আকারে বড়। অর্থাৎ খাটজোড়া আকারে তৈরি করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সাইজের পাটিও তৈরি করা হয়ে থাকে। চিকনির ক্ষেত্রেও রঙিন জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেন পাটিকররা। বর্তমানে বরিশালের খুচরা বাজারে চার হাত পাঁচ হাত পাটির দাম হাজার টাকা। ব্যবহার এবং তৈরির ক্ষেত্রে মাদুর বা পাটির সংগে হোগলার যথেষ্ট মিল পরিলক্ষি হয়। এই শিল্পদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু নির্মাণ উপকরণে।

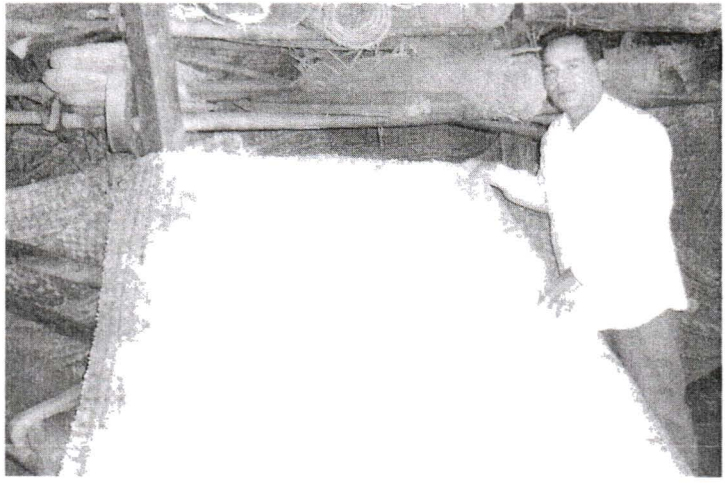

হোগলার প্রকারভেদ পর্যবেক্ষণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী দেবাশীষ চক্রবর্তী

www.pathagar.com

জলজ উদ্ভিদ হোগল হোগলা তৈরির একমাত্র উপাদান। নদীর তীরবর্তী নিচু জমিতে হোল জন্মে। পরিণত হোগল কেটে দুই থেকে তিন দিন শুকিয়ে গোড়ার দিকের এক থেকে দুই ফিট কেটে আলাদা করা হয়। ওগুলো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপরের অংশ দিয়ে হোগলা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে তিনকোণা হোগলের একটি কোণকে লম্বালম্বী কেটে ফেলা হয়। এর পর চলে বুনন কাজ। চাটাইয়ের মতো বুনন রীতি। চারদিকের বর্ডার হোগল দিয়েই পাকানো পদ্ধতিতে করা হয়। সাধারণত চার হাত পাঁচ হাত হোগলাই বেশি তৈরি করা হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের হোগলা কিনতে পাওয়া যায়। তবে সর্বোচ্চ নয় হাতের বেশি দৈর্ঘ্যের হোগলা পাওয়া যায় না। বরিশালের হাট-বাজারে চার হাত পাঁচ হাত মাপের একটি হোগলার দাম একশ বিশ টাকা। হেগলা, চিকনি বা শীতলপাটির জায়নামাজও তৈরি করা হয়। হোগল দিয়ে ঘরের বেড়া তৈরি করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের রান্নাঘরে হোগলেরবড়া দেখা যায়। মাদুর শন দিয়ে তৈরি করা হয়। বরিশাল জেলার মুলাদি, গৌরনদী এবং আগৈলঝাড়া উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শন দিয়ে মাদুর তৈরি করা হয়। তবে হোগলা, চিকনি বা শীতলপাটির মতো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হয় না।

দক্ষিণাঞ্চলে তৈরি শীতলপাটিসহ চিকনি, হোগলা, মাদুর স্থানীয়দের ব্যবহারের পাশাপাশি পাইকারদের হাত ঘুরে চলে যায় ঢাকাসহ বিভিন্ন মোকামে। রপ্তানিপণ্য হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও সৌখিন ব্যবসায়ী, বেড়াতে আসা অতিথিদের মাধ্যমে শীতলপাটি যাচ্ছে কলকাতা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ অনেক দেশে। অনেকে আবার নকশা করা শীতলপাটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখেন বসার ঘরের শোভা বাড়াতে। সৌখিন ব্যাগ, কাগজপত্র রাখার হাতব্যাগেও শীতলপাটি বা চিকনি ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭. কচুরিপানা-পাট-শন-সুতার তৈরি বাহারি পণ্যসামগ্রী

আগৈলঝাড়ায় ডোবা-নালা-পুকুরে জন্মানো কচুরিপানা থেকে লোকপ্রযুক্তি নির্ভর আকর্ষণীয় শিল্পসামগ্রী বরিশাল অঞ্চলের অন্যতম লোকশিল্প। ২০বছর ধরে আগৈলঝাড়ার নারীরা এসব সৌখিন পণ্য তৈরি করছেন। বর্তমানে দুই হাজারেরও বেশি নারী এসব পণ্য তৈরির কাজে যুক্ত। উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে এ্যালবাম, নোটবুক, গহনা, ঝুড়ি, মালা, গিফটবক্স, ব্যাগ, খেলনা, ওয়ালম্যাট, শুভেচ্ছাকার্ডসহ ২৭১টি পণ্য অন্যতম। আর এসব পণ্য তৈরি হয় কচুরিপানা, কচুরিপানার শেকড়, পাট, শন, সুতা, শোলাসহ লোকউপাদান দিয়ে।

এক সময় যারা ক্ষুধা নিবারণের জন্য এই কচুরিপানার শেকড় ও ফুল সিদ্ধ করে খেতেন, তারাই এখন এটা দিয়ে নানা রকমের পণ্য তৈরি করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন, স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাদের হাতে তৈরি পণ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। বড়দিন এলে এসব পণ্যের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে গ্রামের নারীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি এসব পণ্যসামগ্রী বিদেশীদেরও মন জয় করেছে। আগৈলঝাড়ার উন্নয়ন সংস্থা মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি) কচুরিপানাসহ লোকপণ্য দিয়ে হাতে তৈরি সৌখিনপণ্য তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

সংস্থাটি কুটির শিল্প গড়ে তুলতে কারিগরদের ঋণ সহায়তা দেয়। একপর্যায়ে দরিদ্র মানুষ ও কচুরিপানাকে ঘিরে ১৯৮৪ সালে এলাকায় গড়ে ওঠে জোবারপাড় এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নারীরা শুধুমাত্র ডোবা ও মজাপুকুর থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করে প্রথমেতা পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে মণ্ড তৈরি করে তা দিয়ে কাগজ তৈরি করেন। সেই কাগজ দিয়ে পুতুলবক্স, খেলনাসহ দেড়শ প্রকার হস্তজাত সৌখিনসামগ্রী তৈরি করতে সক্ষম হন। মাত্র ৩ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে ৫৫শতাংশ জমির উপর গড়ে তোলা এ প্রকল্প নিজেদের তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে লাভের মুখ দেখছেন ওই এলাকার নারীরা। একই বছর ২৫ শতাংশ জমির উপর স্থায়ীভাবে বাগধা এন্টারপ্রাইজ নামের আরো একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এ দুটি প্রকল্পের সাফল্য দেখে ১৯৮৭ সালে গড়ে ওঠে কেয়াপাম হ্যান্ডিক্রাফট নামের আরও একটি প্রকল্প। তবে এ প্রকল্পটি শুধু কচুরিপানার উপর নির্ভরশীল নয়।

এ প্রকল্পের অধীনে তালপাতা, মুলিবাঁশ, কেয়াপাতা ও সুতা ব্যবহার করে দেড় শতাধিক আকর্ষণীয় সৌখিন উপহারসামগ্রী তৈরি করা হয়। ১৯৯৩ সালে বিবর্তন নামের আরো একটি প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে উপজেলায় মোট ৫টি প্রকল্পের অধীনে দুই সহস্রাধি নারী এসব হস্তশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এসব নারী গড়ে প্রতি মাসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকো আয় করেন। এছাড়া প্রকল্পের মুনাফা থেকে লভ্যাংশ পান। প্রকল্পগুলোর নকশা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন সুরাইয়া চৌধুরি। সম্পূর্ণ দেশীয় বা লোকপ্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই পণ্য তৈরি করা হয় এসব প্রকল্পে। কুচুরিপানার মতো প্রাকৃতিক উপকরণের তৈরি জিনিসপত্র ক্রেতারা খুব পছন্দ করেন। এখানকার তৈরি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের ফেয়ার ট্রেড কোম্পানি বেশি ক্রয় করে থাকে। এছাড়া জাপানের পিপলস ট্রি লিমিটেড ও ইটালির সিটিএম-সহ ২০টি দেশের কোম্পানি তাদের পণ্য ক্রয় করে তাদের দেশে বাজারজাত করছে।

৮. পিঁড়িচিত্র

কাঠ নির্মিত বসার আসন পিঁড়ি নামে পরিচিত। রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে, অতিথি আপ্যায়নে পিঁড়ির ব্যবহার আগের মতো না থাকলেও এখনো বরিশাল অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্রাকৃতির এই আসনটিকে বিশেষভাবে চিত্রিত করে, বিভিন্ন ব্রতাচার এবং সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রত, পূজা, বিয়ে, অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে চিত্রিত কাঠের পিঁড়ির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সম্প্রদায় এবং অনুষ্ঠানভেদে এই পিঁড়ির রঙ ও চিত্রায়ণে ভিন্নতা দেখা যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে বর বা কনে যে পিঁড়িতে বসে গোসল করে, তাতে হলুদ ও আলতা দিয়ে চিত্রাংকন করা হয়। হিন্দু সমাজে কন্যা সম্প্রদায়ের সময়ে বর-কনেকে বসানো পিঁড়িতে পিটুলি গোলা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। এই সকল পিঁড়িতে একবৃন্তে দুই ফুল, পদ্ম ও ভ্রমর, প্রজাপতি, ময়ূর ইত্যাদি চিত্রও পরিদৃষ্ট হয়। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানেও শিশুকে মুখেভাত দেয়ার সময়ে যে পিঁড়িতে বসানো হয়, তাতেও নানা প্রকার চিত্র অংকন করা হয়।

www.pathagar.com

আলপনাশিল্পী বিপুল হাজরা

পিঁড়ির চিত্রায়ণে তেমন কোনো নির্দিষ্ট বিষয় আঁকা হয় না। বরিশাল অঞ্চলের লোকসমাজেও এই প্রকার পিঁড়ির প্রচলন রয়েছে। বরিশাল নগরীর বাজার রোডে চিত্রকর বিপুল হাজরা পিঁড়ি অলংকরণের কাজ করে থাকেন। তাঁর মতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের পিঁড়ি অলংকরণের কাজ বেশি আসে। এছাড়া অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের জন্যও পিঁড়িতে অংকরণ করে থাকি। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে অনেকে পিঁড়ি অলংকরণ করে থাকি। বিপুল হাজরা বলেন, ব্রতের পিঁড়িতে চালের গুড়োর আলপনা দেয়া হয়। ব্রত পালনকারী নারীরাই দিয়ে থাকেন। নকশা অলংকরণকারী বিপুল হাজরা ৪ ফিট বাই ২ ফিটের এক জোড়া পিঁড়িতে অলংকরণ বা আলপনা করতে দেড় হাজার টাকা মজুরী নিয় থাকেন। তার মতে, বিয়ের পিঁড়িতে পদ্ম-ভ্রমর, জোড়া ময়ূর, প্রজাপতি এবং সাবেকি আলপনা বিভিন্ন রংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি পিঁড়ি অলংকরণ করতে তেল রং বা প্লাস্টিক পেইন্ট ব্যবহার করেন।

৯. আলপনা

ধর্মীয় বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে আলপনা দেয়ার রীতি লোকসমাজে বিদ্যমান। বর্তমানে এই রীতি সামাজিকভাবেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। থেকেই। লোকচিত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে আলপনার পরিচয় অধিক। বাংলার লোকজীবনের নানা অনুষ্ঠান এবং গৃহসজ্জায় আলপনার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। মঙ্গলচিত্র হিসেবেই আলপনার মূল খ্যাতি। বাংলার গ্রামীণ হিন্দু নারী সমাজের বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দেয়ার রীতি রয়েছে। লক্ষ্মীপূজায় আলপনা আঁকা হয় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে। এছাড়া অন্নপ্রাশন এবং বিবাহ অনুষ্ঠানেও আলপনার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। আলপনায় রঙের বৈচিত্র কম হলেও চিত্রে বৈচিত্র পরিদৃষ্ট।

www.pathagar.com

আলপনাশিল্পী স্মরণ তালুকদার

পুরোনো কাপড়ের টুকরা ঘন করে গুলে নেয়া পিটুলী অর্থাৎ চালের গুঁড়িতে ভিজিয়ে, মধ্যমা, অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে আলপনা আঁকা হয়। বিভিন্ন এলাকার মতো বৃহত্তর বরিশালের লোকজীবনে আলপনার প্রচলন রয়েছে। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। তবে সম্প্রদায় এবং উদ্দেশ্যভেদে চিত্রের রূপভেদ দেখা যায়। বর্তমানে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানেও আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। এরমধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবেও আলপনা আঁকা হয়।

১০. ডালা/কুলাচিত্র

লোকসমাজে ডালা-কুলার ব্যবহার অতি প্রাচীন। বাঁশ ও বেত নির্মিত গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় এই উপকরণদ্বয় গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লৌকিক পূজায় ডালা-কুলার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লৌকিক পূজা কিংবা ব্রতানুষ্ঠানে কুলায় আলপনা আঁকা প্রাচীন রীতি। এই আলপনায় শিল্পীর তেমন স্বাধীনতা নেই। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্মীপূজায় সর্বত্র লক্ষ্মীদেবীর পদচিহ্ন এবং ধানেরশীষ আঁকার কথা বলা যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানাদিতে নানা বর্ণে চিত্রিত ডালা-কুলার ব্যবহার এই এলাকার পুরোনো প্রথা। ফুল, লতা-পাতা এবং জ্যামিতিক নকশায় চিত্রিত ডালা-কুলায় বিয়ের তত্ত্ব সাজানো হয়ে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত চিত্রিত ডালা-কুলায় শিল্পীর নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে বলে তুলনামূলকভাবে ব্রতানুষ্ঠানের চেয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের ডালা-কুলা অধিক সুদৃশ্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

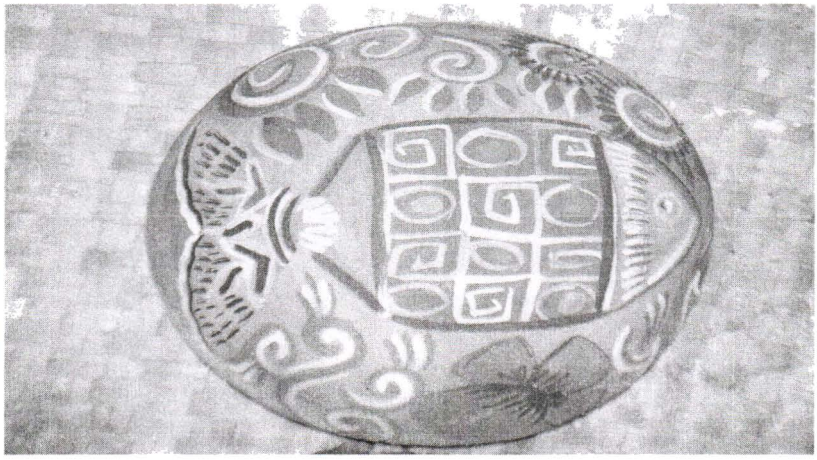

বৈশাখ উৎসবের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ব্যবহার করার জন্য অঙ্কিত একটি ডালা

বৃহত্তর বরিশালের গ্রামীণ মহিলাদের হৃদয় নিসৃত অনুভূতি দিয়ে ডালা-কুলায় যে চিত্রাংকণ করা হয়, সেই চিত্র নিসন্দেহে এখানকার লোকসংস্কৃতিকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে।

১১. সরাচিত্র

বাংলার লোক সমাজে মাটি নির্মিত হাঁড়ি-পাতিলের ঢাকনা, সরা নামে পরিচিত। গ্রামীণ জীবনের অতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় এই গৃহস্থালীর উপকরণটিকে চিত্রিত করে পূজা-পার্বণেও ব্যবহার করা হয়।

সরাচিত্র

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে, ধানের শিষ, কলসি, পদ্ম ও সবাহন লক্ষ্মীমূর্তি অংকিত সরা লক্ষ্মীসরা নামে পরিচিত। লক্ষ্মীপূজায় মাটির নির্মিত লক্ষ্মীমুর্তির স্থলে কোনো কোনো সময়ে লক্ষ্মীসরা পূজা করা হয়ে থাকে।[৬] সুরেশ্বরীসরার উপরিভাগে সপরিবারে মহিষর্দিনী এবং নিম্নভাগে লক্ষ্মীমূর্তি অংকণ করা হয়। ব্রাহ্মণ শিল্পীদের অংকিত আচার্যসরা অনেকটা সুরেশ্বরী সরার মতো হলেও, এতে লক্ষ্মী ও পেঁচার অর্ধেকটা মাত্র আঁকা হয়। স্থানীয় কুমার সম্প্রদায় নির্মিত সরার অংকণরীতি অনেকটা পটের মতো। সরার বিস্তৃত অংশে বহুবর্ণের অনুষঙ্গে বিভিন্ন বিষয় অংকণ করা হয়। শিল্পী নিজের মতো করে পাড় এঁকে মধ্যস্থলে দেব-দেবী মূর্তি, লতা-পাতা বা অন্যকোন মোটিফ ব্যবহার করে। এ ছাড়া অনেক সময় দেব-দেবীর মূর্তি অংকণ করে পূজা মণ্ডপে সরাকে চালচিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১২. ঘটচিত্র

ঘট শব্দের অর্থ পানি রাখার ছোট মাটির পাত্র। যদিও পানি রাখার পাত্র হিসেবে ঘটের পরিচিতি, তারপরেও লোকসমাজের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং লোক-আচার অনুষ্ঠানে ঘটের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে কুমার সম্প্রদায় মাটি থেকে ঘট তৈরি করে এসেছে। কুশলী হাতে তৈরি কাঁচা বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করে শুকিয়ে এবং পুড়িয়ে নেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এই নকশার উপর রঙ-তুলি দিয়ে ঘট অলংকৃত করা হয়। লৌকিক দেবতাদের পূজায় ঘট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অঞ্চল এবং অনুষ্ঠানভেদে ঘটচিত্রের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘটে সাধারণ নকশা এবং পূজার্চ্চনায় ব্যবহৃত ঘটসমূহ ধর্মীয় চিত্রাংকণের প্রবণতা দেখা যায়। বৃহত্তর বরিশালের হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে এই প্রকারের চিত্রিত ঘট এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ঘটচিত্র

www.pathagar.com

১৩. হাঁড়িচিত্র

বা নকশা করা হাঁড়ি এখন আধুনিক সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সাজসজ্জায় ব্যবহার করা হয়। বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে অনুষ্ঠিত প্রায় অনুষ্ঠানেই মঞ্চ সাজাতে নকশা করা হাঁড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌখিন ব্যক্তিবর্গ তাদের বসার ঘর বা দোতলার রেলিং সাজাতে নকশা করা হাঁড়ি ব্যবহার করে থাকেন। পহেলা বৈশাখসহ বিভিন্ন উৎসবে নকশি করা হাঁড়ি বিক্রি করা হয়ে থাকে। সৌখিন ব্যক্তিরা একএকটি হাঁড়ি আড়াইশ থেকে চারশ টাকায় কিনে থাকেন। উৎসবগুলোতে এর পাশাপাশি পাখা চিত্র, রঙ-বেরঙের মুখোশও বিক্রি করা হয়। তবে তা সামান্য পরিসরে বা ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরি করা।

১৪. অঙ্গচিত্র

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রসাধন চর্চার অঙ্গ হিসেবে অঙ্গচিত্রের প্রচলন দেখা যায়। অঙ্গচিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গচিত্রও এই অঞ্চলে বিরল নয়। মহিলাদের কপালে টিপ, চোখ কাজল, হাত-পায়ে মেহেদী এবং আলতার ব্যবহার অঙ্গচিত্রেরই বিষয়।[৭] সাধারণত লোকজীবনের সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষেই অঙ্গচিত্র অংকিত হয়ে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে কনেকে চন্দনের গুঁড়া দিয়ে সাজানো হয়।

বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে অনুষ্ঠিত মেহেদি উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গচিত্র

www.pathagar.com

বিয়ের দিনে কনের কপালে তেল-সিদুঁরের তিন শাখার গাছ বা ত্রিশূল আকৃতির গাছ-ফোঁটা দেয়ার প্রথা রয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাহে, বর-কনের করতল এবং করপৃষ্ঠ মেহেদি দ্বারা চিত্রিত করা হয়। এই ধরনের চিত্রে বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়। লোকসমাজে প্রচলিত কতিপয় অঙ্গচিত্রে ধর্মীয় প্রভাব পরিলক্ষিত। বিবাহিতা হিন্দু রমণীদের সিঁদুর সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত। ভাইফোটা নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে গণ্য।

এছাড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অষ্টাঙ্গে তিলক রেখা পবিত্রতার পরিচায়ক। অঙ্গচিত্রের মধ্যে যথার্থ বৈশিষ্ট্যবহনকারী হিসেবে উলকির নাম করা যেতে পারে। এখানকার অন্যান্য অঙ্গচিত্র ক্ষণস্থায়ী হলেও উলকিচিত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর মতো বাংলার আদিম জনগোষ্ঠীসহ এখানকার লোকসমাজের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে উলকির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ধর্মীয় প্রভাব ছাড়াও সোন্দর্যচর্চার অনুষঙ্গ হিসেবেও আদিম সমাজে উলকির প্রচলন লক্ষ করা যায়। রঙ-বেরঙের চিত্রে শোভিত হয়ে নিজকে আর্কষণীয় করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকারের অঙ্গচিত্র অংকণ করা হয়। সাধারণত সুঁচ বা সুঁচালো কাঁটার সাহায্যে উলকি আঁকার নির্দিষ্ট স্থানকে বিদ্ধ করে ক্ষতস্থানে রঙ লাগিয়ে উলকি আঁকা হয়। যদিও অঙ্গচিত্র শিল্পকলার কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ নয়, তারপরেও এই অঞ্চলের উলকি আঁকা সম্প্রদায় লোকচিত্রের ক্ষেত্রে, বিশেষ স্থানের দাবিদার।

১৫. কাঠচিত্র

কাঠের উপর অংকিত বিভিন্ন চিত্র, কাঠচিত্র নামে পরিচিত। এই প্রকারের চিত্রে রঙ-তুলির ব্যবহার ছাড়া হাতুড়ি-বাটালির সাহায্যে কাঠ কেটে বা খোদাই করে ছবি আঁকা হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সুতার সম্প্রদায় আবহমানকাল থেকে কাঠচিত্র নির্মাণের সংগে সম্পৃক্ত। এই কর্মে সম্পৃক্ত পেশাজীবীরা প্রাচীনকাল থেকে লোকসমাজের চাহিদা অনুসারে, দরজা, চৌকাঠ, খাট, পালংঙ্ক, বক্স, সিন্দুক, পুতুল, পালকি, ইত্যাদিতে চিত্রায়ণ করে আসছে। ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন কাঠের এই সকল দ্রব্যাদিতে অংকন বা খোদাই ক্ষেত্রের স্থানের উপর চিত্রের ধরন নির্ভর করে।

বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠচিত্রের প্রচলন রয়েছে। অতি সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে এখানকার সার সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন কাঠচিত্র, এখানকার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণত কাঠের দরজা, খাট, আলমারি, চেয়ার, ফটোফ্রেমের উপর নকশা বা চিত্র অংকন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কাঠের উপর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের ছবিও খোদাই করে থাকেন শিল্পীরা। ওই সব ছবির মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। এছাড়াও বিভিন্ন মেলা অথবা আধুনিক শো পিসের দোকানে গ্রামবাংলার দৃশ্য, আলপনা অথবা ধর্মীয় বাণী বা আরবী ক্যালিওগ্রাফী খোদাই করা অবস্থায় বিক্রি হতে দেখা যায়।

বরিশাল নগরীতে থাকা অসংখ্য ফার্নিচারের দোকানে কাঠশিল্পীরা হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে নকশা একে থাকেন। তাছাড়া কুন-এর মাধ্যমে কাঠচিত্রকে আকর্ষণীয় করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। বরিশাল নগরীর রায় রোডে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নকশাকরার কারখানা গড় উঠেছে। ওইসব কারখানায় নকশা করাসহ নকশার ছাপচিত্রও বিক্রি করা হয়। কাঠ শিল্পের নির্দিষ্ট করে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। নকশা, সময় এবং পরিশ্রমই এর মূল্য নির্ধারণ করে। শিল্পসম্মত দরজা-খাট বা ছবি উচ্চবিত্তের ঘরে শোভাবর্ধন করে আসছে।

কাঠে চিত্র আঁকার কাজে নিমগ্ন শিল্পীদ্বয়

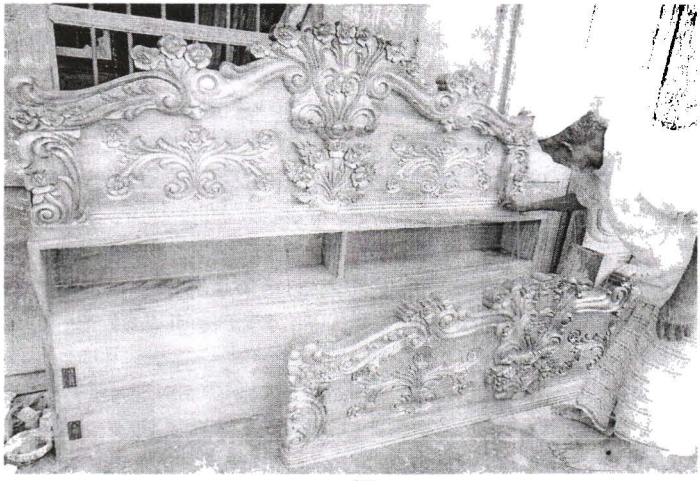

কাঠচিত্র

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর বরিশালের বিবরণ শীর্ষক লেখা হতে জানা যায়– "বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি চুলের গুচ্ছা গুছাইয়া রাখেন ও মস্তকের মধ্য দিয়া সিঁথি কাটিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহারদিগের সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ। অনেকেরই গলায় মাদুলি, হাতে কবজ, ও রূপ না করিলে জাতি রক্ষা হয় না। বাজুকে 'কবজ' এবং মাদুলিকে 'তাবিজ' কহে, ১২।১২।১৬ ছড়ার কৃষ্ণবর্ণের ঘুন্সি চন্দ্রহারের ন্যায় পরিধান করেন। রৌপ্য নির্মিত গোট গলদেশে প্রদান করেন, প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকেরা পায়ে মল ও হাতে বালা ধারণ করেন, সকলেরই অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি আছে, তাহার নাম 'আঙ্গট'।

স্ত্রী লোকেরা মোটাবস্ত্র দোবেড় করিয়া পরিধান করেন, মোমের দ্বারা কেশ সুশোভিত করত সিঁথির উপর এক অঙ্গুলি পরিমিত তৈল সিন্দুর লেপন করেন, কপালে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্রি তিলক অলকায় আবৃত, কেহ কেহ তৎপরিবর্তে মধ্যভাগে প্রশস্তরূপে সিন্দুরের এক ফোঁটা কাটিয়া শরীরের অতি চমৎকার শ্রী বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নাসিকায় মোটা এক নথ, তাহার নাম 'বুলক', হস্তে মোটা তাবিজ ও শঙ্খ। এই শঙ্খই মাঙ্গলিক অলঙ্কার, তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা, এরূপ এক জোরা শঙ্খ একবার ক্রয় করিলে জমিদারির ন্যায় পুরুষ পুরুষানুক্রমে অনায়াসেই তাহার ভোগ দখল হইয়া থাকে। গলদেশে কেবল মাদুলি মালায় মণ্ডিত। পায়ে বেড়ির ন্যায় বাঁকমল, হাতে চুড়ি পরিলে, পদে অলক্ত দিলে ও দন্তে মিশি দিলে অতিশয় নিন্দা হয়।"

সপ্তদশ শতকে বরিশাল অঞ্চলের সাধারণ পুরুষেরা সেলাইবিহীন একখণ্ড কাপড় পরিধান করত এবং গামছা জাতীয় একখণ্ড গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করত। নারীরা পরিধান করত ১০ হাত লম্বা শাড়ি। তবে ব্লাউজ এবং পেটিকোট পরিধান করত না। হিন্দু বিধবারা পুরুষদের মতো চুল ছোট রাখত। নারীরা অলংকার ব্যবহার করত। পুরুষদের মধ্যেও অলংকার ব্যবহারের প্রবণতা ছিল। নারীরা বর্তমানে সোনা-রূপাসহ বিভিন্ন ধাতুর গহনা ব্যবহার করেন। এসব গহনার মধ্যে চুড়ি, বালা, বাজু, সীতাহার, হাসুলিসহ বিভিন্ন প্রকার হার, কানপাশা, দুলসহ নানা ধরণ ও ডিজাইনের কানফুল, টিকলি, হাত বা পায়ের অঙ্গুলের আংটি, মল, নাকফুল, নথ, কোমরবিছা অন্যতম। তাবিজের ব্যবহার এখনো টিকে আছে। এছাড়া লোক বিশ্বাস অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়েই মাজায় তাগা বাধে। শিশুদের মাজা এবং গলায় তাবিজ-কবজের আধিক্য এখনো লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতক থেকে লুঙ্গির প্রচলন হয় মুসলমানদের মধ্যে। তবুও ধুতিই ছিল প্রধান পরিধেয় বস্ত্র। তাছাড়া গেঞ্জি ছিল উভয় সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধুতির তেমন একটা প্রচলন নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ধুতি পড়লেও, মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউই ধুতি পরিধান করে না। বর্তমানে পুরুষরা শধুমাত্র গেঞ্জির স্থলে জামা- পাঞ্জাবীসহ নানাধরণের পোষাক ব্যবহার করছে। ধুতি-লুঙ্গির পরিবর্তে প্যান্ট-পাজামার ব্যবহার বাড়ছে। তবুও সাধারণের মাঝে আজো লুঙ্গি অত্যন্ত জনপ্রিয় পোষাক। বর্তমানের নারীরা শাড়ির পাশাপাশি সালোয়া-কামিজ-ওড়নাসহ নানাধরণের আধুনিক পোষাক পরিধান করছে। গামছার ব্যবহার আগের মতোই রয়েছে।

শীতকালে নারী-পুরুষ উভয়েই চাদর ব্যবহার করেন। পাশাপাশি সোয়েটার-জ্যাকেটের ব্যবহার সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও মাফলার, উলেরটুপি, মোজা শীতকালীন বস্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এছাড়াও ধর্মীয় নিয়ম-নীতিভিত্তিক পোষাক যেমন– বোরকা, স্কার্ফ, গেরুয়া পোষাক, নামাবলীর ব্যবহার আছে।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পাদুকা হিসেবে ব্যবহৃত খরমের (কাঠের তৈরি পাদুকা) ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয়েই চামড়া-রেক্সিন-রাবার-প্লাস্টিকের জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করা হয়। জুতার সাথে মোজা ব্যবহার করা হয়। তবুও বরিশালের গ্রামীণ জনপদে আজো অনেকে খালি পায়ে চলাফেরা করে। উচ্চবিত্তের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা হাল ফ্যাসনের পোশাকের পাশাপাশি বিদেশি পোশাক-পরিচ্ছদে আকৃষ্ট হচ্ছে। ওই সব পোশাকের মধ্যে– কাবুলি, সেরওয়ানী, জিন্স, টিশার্ট, লেহেঙ্গা, স্যুট, সাফারিসহ বিভিন্ন ধরণের পোষাক অন্যতম। তদুপরি বিয়েতে কন্যাকে সাজাতে বেনারসী, জামদানীর বিকল্প বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন না।

বরিশাল অঞ্চলের বেশিরভাগ নারী এখনো তাদের চুল লম্বা রাখে। তদুপরি নারীদের কেশবিন্যাশে এসেছে বৈচিত্র। বিভন্ন ছাঁটের পাশাপাশি কেশবিন্যাশে ব্যবহৃত হচ্ছে নানাধরণের প্রসাধনী। বরিশাল নগরীসহ জেলার প্রতিটি উপজেলা সদরে গড়ে উঠেছে বিউটি পার্লার। ওইসব পার্লারে সম্মানির বিনিময়ে নারীদের চুল ছাঁটা থেকে রূপচর্চার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। অপরদিকে পুরুষের জন্য হাট-বাজার থেকে পাড়া-মহল্লায় সেলুন দেখতে পাওয়া যায়।

ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি, চাদর, গামছা সাধারণের গ্রহণযোগ্য পোশাক। আজো লুঙ্গি পড়ে, মাথায় গামছা বেধে কৃষক-শ্রমিকেরা কাজ করে। নারীরা ঘর থেকে অফিস সামলায় শাড়ি পড়ে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

লোকসমাজের মৌল-মানবিক চাহিদাসমূহের অন্যতম চাহিদা বাসস্থানকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে স্থাপত্য ভাবনা। নদী, জলাভূমি এবং সুন্দরবন সংলগ্ন হওয়ার কারণে বরিশালের লোকসমাজ বাসগৃহ বা অন্যান্য স্থাপনায় কাঠ এবং ছাউনির জন্য এই অঞ্চলের বনজ সম্পদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। লোকস্থাপত্যের অবকাঠামো নির্মাণে কাঠের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি। বেড়া বা ছাউনির জন্য ব্যবহার করা হয় হোগল, বাঁশের চাটাই। আর ছাউনির জন্য গোলপাতা। তবে যুগের পরিবর্তন এবং সময়ের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁশ-কাঠ-পাতা ব্যবহারের থেকে টিনের ব্যবহার বেড়েছে।

১. গোলপাতার ঘর

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় গোলপাতার ঘর বরিশাল অঞ্চলে এখনো দেখা যায়। সাধারণত বাঁশ, সুপারি গাছ বা গড়ান গাছের লম্বা কাণ্ডের কাঠামোর উপর গোলপাতা দিয়ে ছাউনি দিয়ে লোকসমাজ তাদের এই স্থাপত্য তৈরি করে থাকে। চালার কাঠামো সাধারণত বাঁশের চেরা দিয়ে তৈরি করা হয়। এরপর লম্বা লম্বা পাতা থরে থরে সাজিয়ে চালা তৈরি করা হয়। তৈরির পর অনায়াশে ৫/৬ বছর চালায় হাত দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এই ঘর একচালা বা দোচালা পর্যন্ত করা হয়। গোলপাতার ঘরে গরমের সময় অবস্থান করা আরামদায়ক।

বরিশাল অঞ্চলে গোলপাতা দিয়ে ঘরের চালা তৈরি করার প্রচলন রয়েছে এখনো

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্যের অন্যতম উপাদান বাঁশের চাটাই
যা দিয়ে ঘরের বেড়া দেয়া হয়ে থাকে

বরিশাল অঞ্চলের লোকস্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গোলপাতা কিনছেন একব্যক্তি

www.pathagar.com

২. টালির ঘর

বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত বলে বরিশাল অঞ্চলে মাটির ঘর নির্মাণের প্রচলন নেই। ঘরের কাঠামো তৈরিতে কাঠের ব্যবহার এখনো প্রচলিত। তবে মাটি দিয়ে তৈরি টালির ঘর একসময় বরিশাল অঞ্চলের লোকস্থাপত্যের ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত হত। বর্তমানে টালির স্বল্পতা এবং দাম বেশি হওয়ায় টালির ঘর আর নতুন করে কেউ তৈরি করেন না। তবে আধুনিক বাংলোবাড়ি নির্মাণে কেউ কেউ টালি ব্যবহার করেন। গ্রামাঞ্চলে টিকে থাকা টালির ঘরের মূল কাঠামো কাঠের তৈরি। বেড়া কাঠের ফ্রেমে টিন পেটানো এবং কাঠের তৈরি কাঠামোর উপর টালি সাজানো। সাধারণত এইসব ঘরের বেশিরভাগই তিন/চার ফিট উঁচু মাটির ভিতের উপর তৈরি করা। বর্ষার জল-কাদা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই উঁচু ভিতের উপর তৈরি করা হয়। টালির ঘর সাধারণত দোচালা হয়ে থাকে। কোন কোনস্থানে চৌচালা টালির ঘরও দেখা যায়। একসময় কলসকাঠি, কাউখালী, বানারীপাড়ার টালির সুনাম ছিল।

বরিশাল নগরীর স-রোডে শচীন দাসের বাড়িতে টালির দোচালা ঘর

৩. একচালা ঘর

কাঠের কাঠামোর উপর একপাশে পাশে কাঁত করা চালাই একচালা। একচালা ঘর সাময়িক বা স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ঘর নির্মাণ শৈলী সাদামাটা। কোন শিল্পকর্মের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। দক্ষিণাঞ্চলের হাট-বাজার বা খেয়াঘাটের বিশ্রামাগার হিসাবে এক চালার ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত বাঁশ কিংবা বাণিজ্যিক মূল্যহীন গাছ এবং খড় দ্বারা একচালা ঘর নির্মাণ করা হয়। গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘর, গরুর ঘর বা কাঠ রাখার ঘর একচালা করা হয়।

www.pathagar.com

৪. দোচালা

দোচালা ঘরের প্রচলন বরিশাল অঞ্চলের সব জায়গাতেই দেখা যায়। দুই চালের ছাউনি বিশিষ্ট ঘরকে দোচালা ঘর বলা হয়। বৃষ্টিবহুল দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পানি বা ঝাপটা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য দুই দিকে ঢালু চালাবিশিষ্ট দোচালা ঘর বসবাসের জন্য অধিকতর উপযোগী।

বসতির জন্য ব্যবহার ছাড়াও সাধরণ দোকানঘর, স্কুলঘর, হাট-বাজারের টলঘর বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ দোচালা। এই ঘর নির্মাণ পদ্ধতিতে তেমন কোন জটিলতা না থাকা এবং নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতার কারণে এই প্রচার এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঘর নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে মাটি ফেলে ভিত উঁচু করে তৈরি করা হয়। গৃহ এই তারপর মাপ অনুসারে সেই স্থানের চার কোণে বাঁশ বা অনুরূপ কোন গাছের গুড়ির খুঁটি বসানো হয়। ছাউনি বসানোর জন্য খুঁটিগুলিকে আরো চারটি বাঁশ বা কাঠের শক্ত দণ্ডের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। আয়তাকার এই কাঠামোর ঠিক মাঝামাঝি আর একটা বাড়তি বাঁশ বা ছাউনির জন্য লাগানো হয়। কাঠামোর উপর ত্রিভুজাকৃতিতে বেশ কয়েকটি বাঁশ বাঁধা হয়। এ খাঁচা সদৃশ কাঠামোর দো-চালা ঘরের মূল কাঠামো। কাঠামোর উপরের অংশে আড়াআড়ি এবং উপর নিচ করে সুপারি বা বাঁশের ফেড়ে নেয়া লম্বা ফালি বসানো হয়। বর্গাকৃতির কাঠামোর উপর গোলপাতা, ছন বা নারিকেল পাতা বা টিন বসানো হলেই দোচালা ঘরের ছাউনি তৈরি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ঘরের নিচের অংশে মাটি বা বাঁশ বেড়ায় দরজা বা জানালা বসিয়ে ঘর তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়। কোনো কোনো সময়ে ছাউনির নিচে বাড়তি একটি চালা স্থাপন করে ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়।

৫. চৌচালাঘর

চৌচালা অর্থাৎ চার চালাবিশিষ্ট। এই ঘর দোচালা ঘরেরই বর্ধিত রূপ। বরিশাল অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারের বসতঘরগুলো সাধারণত চৌচালা হয়ে থাকে। আকার এবং ছাউনি ছাড়া দোচালা ঘরের সংঙ্গে চৌচালা ঘরের তেমন কোন পার্থক্য নেই। চৌচালা ঘরে সাধারণত বাড়তি একচালা ব্যবহার করে বারান্দা তৈরি করা হয়। বারান্দা ঘরের চারদিকে তৈরি করা হয়।

সাধারণত কাঠের ফ্রেমে টিন দিয়ে চৌচালা ঘর তৈরি করা হয়। বরিশাল অঞ্চলের চৌচালা ঘরগুলোতে কিছু কারুকার্য দেখা যায়। এই ঘরের দরজা-জানালায় বিশেষ ধরণের নকশা আঁকা থাকে। চালার উপরিভাগের দুই কোণে ময়ুর-পাখি বা জীবজন্তুর নকশাও দেখা যায়। ঘরের সামনের অংশে টিনের ঝালর সাটানো হয়। বেশিরভাগ চৌচালা ঘরে পাটাতন থাকে। চৌচালা ঘর দোতলা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। দোতলা চৌচালা ঘরের সামনের দিটে টপ বারান্দা দেখা যায়। বরিশাল অঞ্চলের গ্রাম উপজেলা পর্যায়ের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বসবাস এখনো এই ঘরে লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

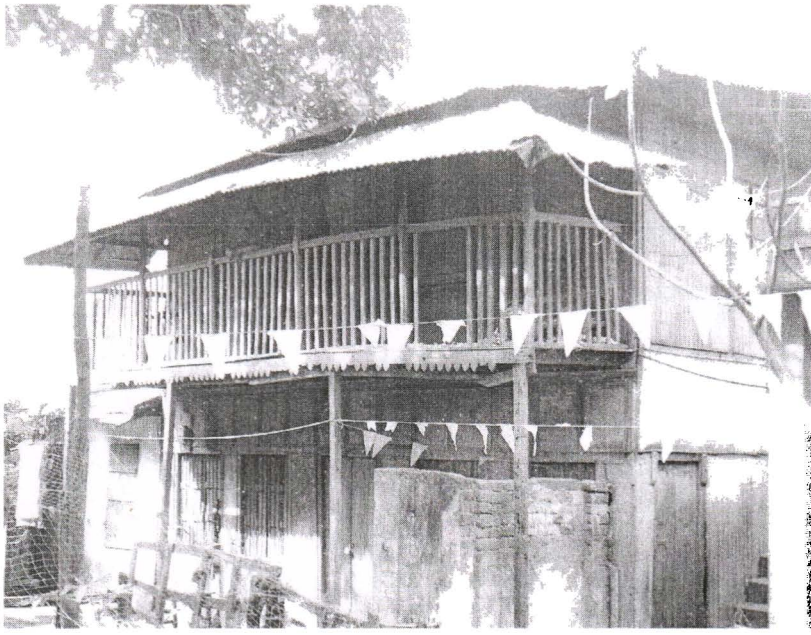

বরিশাল নগরীর দপ্তরখানায় প্রয়াত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষের চৌচালা ঘর

৬. আটচালা

চৌচালা ঘরের চতুর্দিকে বর্ধিত ঘরকে আটচালা বলা হয়। সাধারণত মন্দির আঙিনা বা বাজারের মূল কাঠামো বা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এমন আটচালা বিশিষ্ট স্থাপত্য দেখা যায়। আটচালার চতুর্দিক উন্মুক্ত থাকে। বহু লোকের সমাগমের সুবিধার্থে আটচালা নির্মিত হয়। এমনিভাবে বারো চালাও নির্মাণ করা হয়।

বরিশাল অঞ্চলের বেশিরভাগ উপজেলা সদরের প্রধান মন্দির প্রাঙ্গণ আটচালা বা বারোচালা নামে পরিচিত।

তাছাড়াও বরিশাল অঞ্চলে ঢেঁকিঘর, গোলাঘর, রান্নাঘর, আতুরঘর, টংঘর তৈরি করা হয়। বর্তমানে টিন দিয়েই বেশিরভাগ ঘর তৈরি হয়ে থাকে। পাশাপাশি পাকা স্থাপনার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তথ্যসহায়ক

১. সাইফুল আহসান বুলবুল, বৃহত্তর বরিশালের লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০
২. গৌতম ঘোষ, দপ্তরখানা, বরিশাল, বয়স ৫০
৩. শংকর দাস, স-রোড, বরিশাল, বয়স ৪৮

www.pathagar.com

৪. স্বপন শীল, কড়াপুর, বরিশাল সদর, বয়স ৫২
৫. মঞ্জু ঘরামি, বাটাজোর, গৌরনদী, বরিশাল, বয়স ৫৬
৬. এনায়েত মোল্লা, বাইশারী, বানারীপাড়া, বরিশাল, বয়স ৬০
৭. ফিরোজ মিয়া, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল, বয়স- ৫৫
৮. হিমাংশু দাস, মরণ দাসের কাঠের গোলা, বরিশাল, বয়স ৪৮
৯. চঞ্চল নাগ, মরণ দাসের কাঠের গোলা, বরিশাল, বয়স ৪২
১০. দেবাশীষ সাহা, মরণ দাসের কাঠের গোলা, বরিশাল, বয়স ৩০
১১. ইউসুফ আলী ঘরামী, নতুন বাজার, বরিশাল, বয়স ৫৫
১২. চুন্নু মিয়া, নতুন বাজার, বরিশাল, বয়স ৫০

www.pathagar.com

লোকসংগীত

বরিশাল অঞ্চলের লোকসংগীতের উপর এই স্থানের জলবায়ু, ভূ-অবয়ব, নদ-নদী, উদ্ভিদ, জীব-জন্তুর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভিত্তিতে সৃষ্ট লোকসংগীতকে নিম্নোক্ত ধারায় শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে—

ক. অপার্থিব পরিবেশে সৃষ্ট লোকসংগীত :

১. ভাবমূলক লোকসংগীত

২. জাগরণমূলক লোকসংগীত

খ. পার্থিব পরিবেশে সৃষ্ট লোকসংগীত :

১. বস্তুগত লোকসংগীত

২. স্থানগত লোকসংগীত

অপার্থিব পরিবেশের ভাবমূলক লোকসংগীতগুলোকে দেব-দেবী ও পির–পীরানিভিত্তিক, উৎসব, অনুষ্ঠানভিত্তিক, সাধনাভিত্তিক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এছাড়া জাগরণমূলক লোকসংগীতকে ইতিহাসনির্ভর এবং দেশপ্রেমমূলক ভাগে ভাগ করা যায়। একই ভাবে পার্থিব পরিবেশের বস্তুগত লোকসংগীতগুলোকে মানবসৃষ্ট উপাদানভিত্তিক যা আবার দেশীয় এবং বৈদেশিক বস্তুভিত্তিক ভাগে ভাগকরা যায়। আর স্থানগত পরিবেশের লোকসংগীতগুলো গ্রাম এবং নগরকেন্দ্রিক।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগলিক পরিবেশ* গ্রন্থে (১৯৮২) হাবিবুর রহমান পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নোত্তর জরিপ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ১০টি লোকসংগীতাঞ্চলে রূপায়িত করেছেন। তাঁর মতে, বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা এবং শরিয়তপুর ও মাদারীপুর অঞ্চল হল রয়ানি অঞ্চল। তাঁর মতে– বরিশাল অঞ্চলের জনজীবনে বিভিন্ন যুগপর্যায়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ধর্মের প্রভাবে লোকসংগীতে এসেছে বৈচিত্র। সময়ের বিবর্তনে রূপান্তর, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটেছে প্রচুর। যার ফলে আঞ্চলিক লোকসংগীতগুলো একটি জটিলাবর্তের সৃষ্টি করেছে।

দেখা যায়, ধর্ম এঅঞ্চলের লোকসংগীতকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংগীতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। সময় ও স্থানের বিভিন্নতায় লোকসংগীতের বিষয়বস্তুতে আসে পরিবর্তন। সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনেও গানের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। লোকসংগীত হয়ে ওঠে বৈচিত্রময়। বিচিত্র হয়ে ওঠে সুরে, কথায়, তালে ও পরিবেশনের পরিবেশে।

www.pathagar.com

১. রয়ানি

রয়ানি বা ভাসান গান মূলত চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার প্রচলিত লোককাহিনিভিত্তিক মনসাদেবীর মহাত্ম্যসূচক সংগীত। সর্পদেবী মনসার মহাত্ম্য প্রকাশক ভক্তিসংগীত বলে এই গানকে মনসার গান নামেও অভিহিত করা হয়। সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর ও শরিয়তপুর মহকুমা নিয়ে রয়ানি সংগীতাঞ্চল গড়ে উঠেছে। রয়ানির আভিধানিক অর্থ নেই। তবে বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায় স্মৃতিকথা বা মহাত্ম্যগাঁথা, বিশেষ করে সর্পদেবী মনসার জন্ম থেকে লক্ষ্মীন্দরের পুর্নজীবন প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তার দেবত্ব প্রচেষ্টার গীতি, কাহিনিই রয়ানি নামে পরিচিত। এদের রচয়িতাদেরকে রয়ানিকার বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রয়ন (অর্থাৎ স্মৃতিকথা) শব্দ হতে রয়ানির উদ্ভব ঘটেছে বলা যায়। অন্যদিকে সারারাত্রি এ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে বলে রজনী শব্দ হতে রয়ানি গানের উৎপত্তি হতে পারে। তবে অধিকাংশের অভিমত রয়ানি যাত্রা (যাত্রার অর্থ যখন একস্থান হতে অন্যস্থানে রওয়ানা হওয়া) শ্রেণির গান। ফলে যাত্রার পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষা প্রকাশক রওয়ানা শব্দ হতে রয়ানি শব্দটির উৎপত্তি। এ ছাড়া রয়ানি গান চাঁদ সওদাগরের ব্যবসা সংক্রান্ত ও বেহুলার স্বামী লক্ষ্মীন্দরের পুর্নজীবন প্রাপ্তির অভিযাত্রামূলক সংগীত বলে (অভিযাত্রা-যাত্রার ওয়ানা–রয়ানি) রয়ানি নামকরণ হয়েছে।

সর্প পুজার প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। সর্পকে সর্প হিসাবে পুজা না করে সর্পদেবতা বা সর্পাত্মারূপেই পুজা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সর্প পুজার প্রচলন আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সর্প টোটেম আছে; কিন্তু সর্প পুজার প্রথা নেই। আফ্রিকায় প্রায় সর্বত্রই সর্প দেবতা রয়েছে। ভারতবর্ষের সর্প পুজা মূলত সর্পদেবতারই পুজা। বাংলাদেশে মনসা সর্প দেবী হিসেবে পুজিতা হয়ে আসছে। দেবীর উদ্দেশ্যে মহাত্মকীর্তন ও স্তুতিবাক্য হতে পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়ে রয়ানি সংগীতের উৎপত্তি ঘটেছে এ কথা বলা যায়। লোকসমাজে প্রচলিত এই কাহিনিগুলোকে ভিত্তিকরে

www.pathagar.com

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পরিসর মনসা মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বরিশাল অঞ্চল খাল, বিলে পরিপূর্ণ। এখানকার আবহাওয়া আর্দ্র এবং মাটি খুবই স্যাঁতসেঁতে। এমনিতর পরিবেশ সাপ বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী। তাই এ অঞ্চলে সাপের প্রকোপও খুব বেশি। অধিকন্তু এই বিস্তৃত নিম্নাঞ্চল একসময় সুন্দরবনেরই অংশ ছিল। ফলে অত্যন্ত মারাত্মক বিষধর সর্পকুলের সমারোহ ঘটেছে এখানে। দক্ষিণ বাংলার এই ভৌগোলিক পরিবেশ যেখানে যেকোন অসতর্ক মুহূর্তে সর্পাঘাতের আশংকা বর্তমান। সেখানে এই বিশেষ নিসর্গ পুজাভিত্তিক সংগীতের প্রসার একান্তই স্বাভাবিক। দক্ষিণ বাংলার ঘরে ঘরে এ সংগীত পরিবেশিত হতো এক সময়ে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এ গানের স্রোতা। প্রতিবছর বিশেষত বর্ষার (আষাঢ় ও শ্রাবণ) আগমনে যখন সাপের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় তখন এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে, এমন কি প্রায় পরিবারে মনসা পুজা কিংবা মনসার মহাত্ম্য পরিবেশিত হতো। শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা, ভয় ও শুভকামনায় মনসায় গুণ ও কাহিনি কীর্তিত হয়। রয়ানিকাররা তখন দিবারাত্র সংগীতাকারে রয়ানি পরিবেশন করে।

বর্ষণমূখর দিনের অবিশ্রান্ত ধারার সাথে এ গানের সুর একই সূত্রে গাঁথা। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের তালে তালে মানুষের অশ্রুপাতের মতই এ গান করুণরসের সঞ্চার করে। এ গান একান্তভাবেই আঞ্চলিক এবং প্রকৃতিজাত। এ ছাড়াও স্থানীয় ভিন্নতাও রয়ানি সংগীতের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। রয়ানির বিষয়বস্তু, স্থান, ঘটনাপ্রবাহ ও বিশ্লেষণ এবং চরিত্র চিত্রণে একান্তভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, লোকমানস, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জনপদকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে যেন।

মনসা পুজায় ব্যবহৃত ঘট যা মনসারঘট নামে পরিচিত

www.pathagar.com

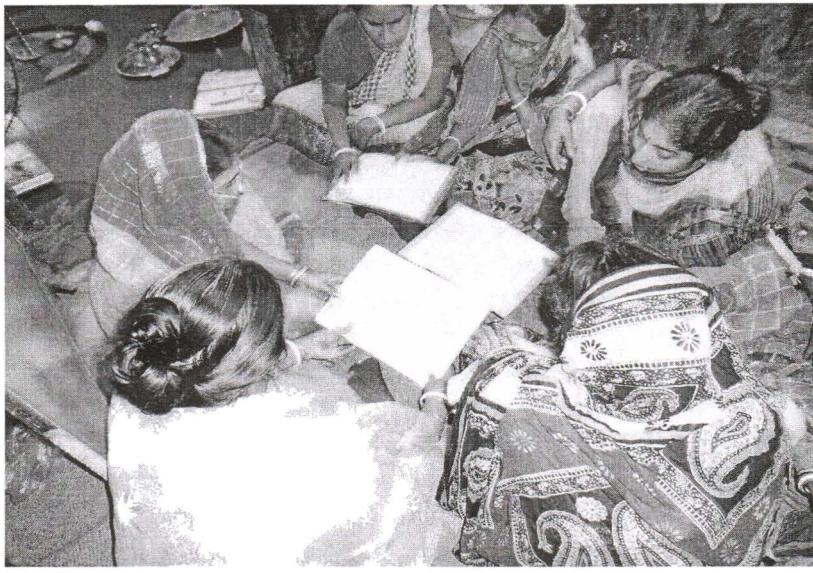

বরিশাল নগরীর বাজাররোডস্থ বাচ্চু সাহার বাড়িতে বংশপরম্পরায়
শ্রাবণ মাসব্যাপী মনসামঙ্গল সুর করে গাওয়ার আসর বসে

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী কবি বিজয়গুপ্ত রচিত মনসা মঙ্গলই বৃহত্তর বরিশাল এবং তার আশপাশ অঞ্চলে গাওয়া হয়ে থাকে। গীত রূপকেই রয়ানি বলা হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসব্যাপী এ গান গাওয়া হয়। এ গানের শিল্পী ঘরের গৃহিণীরা। প্রাত্যহিক গৃহকর্ম শেষে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মনসা মন্দিরের চত্বরে বা বারান্দায় হোগলা ও মাদুর পেতে বসে রয়ানির আসর। স্রোতা আশপাশের শিশু-কিশোর থেকে বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত। বরিশাল নগরীতে এসময়েও ৮/১০ স্থানে রয়ানির আসর বসতে দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে শ্রোতার সংখ্যা নেই বললেই চলে। বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনির মায়াজাল বা সুরের বৈচিত্র নয়, নয় শ্রোতাদের মনজয়ের আশায়, আজকে গাওয়া রয়ানি– সর্পদেবী মনসাকে তুষ্ট করার জন্যই গাওয়া হয়ে থাকে এমন ধারণা শিল্পীদের। তবে অনেক হিন্দু পরিবারে মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় এক দিন থেকে ২/৩ দিনের রয়ানির মানত করেন। আর মানতের রয়ানি পরিবেশিত হয়ে থাকে জাকজমকভাবে। আয়োজন অনুসারে বাড়ে প্রসাদের পরিমাণ। বরিশালের আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী উপজেলায় সব মিলিয়ে গোটা চারেক রযানির দল রয়েছে। এর মধ্যে নিমাই দেউরি ও সুমালার দলের নাম ও পরিবেশনা স্থানীয়দের কাছে পরিচিত। দলগুলো রয়ানিকে আধুনিক ফর্মে নিয়ে এসেছেন পরিবেশনার দিক থেকে। তাদের পরিবেশনায় সুরের বৈচিত্র প্রবল। উপস্থাপনেও রয়েছে নাটকিয়তা। শিল্পীদের সাজসজ্জায় ধর্মীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান গৈলার মনসা মন্দিরে বার্ষিক পুজা উপলক্ষে রয়ানির আসর বসে। এছাড়া শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রয়ানি দলের বায়নাও বেশি। কালের আবর্তে রয়ানি পরিবেশনার সময় আজ সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সাধারণ গৃহিণীদের গাওয়া মনসা মঙ্গল আর নিমাই দেউরি সুমালাদের গাওয়া রয়ানির পার্থক্য অনেক। এপার্থক্য সময় সুর পরিবেশনার ঢং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পোশাক ও পরিচ্ছদ-দর্শক শ্রোতার সংখ্যাতে সুস্পষ্ট। পার্থক্য যাই হোক না কেন, মধ্যযুগ থেকে রয়ানি টিকে আছে তার বৈচিত্রপূর্ণ ব্যঞ্জনায়, আগামীতেও টিকে থাকবে শেকড়সন্ধানী মানুষের প্রেরণা-উৎসাহ আর লোক মানসে প্রোথিত কাহিনির পরম্পরা-ট্রাজেডি ও মানুষের সফলতার জয়গানে। মনসা মঙ্গলের বাণী ও সুরে যে দেবতার প্রতি মানুষের চ্যালেঞ্জ এবং মানুষেরই জয় গাথাঁ, তাই মানুষই টিকিয়ে রাখছে রয়ানির সুরবাণীর ঝরণা ধারাকে।

রয়ানি উপস্থাপন এবং শিল্পভাব প্রকাশ

সাধারণত তিন আঙ্গিকে রয়ানি উপস্থাপিত হচ্ছে।

১. মন্দিরে বা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে গাওয়া।
২. কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের পর রয়ানির আসর বসানো।
৩. মঞ্চে উপস্থাপিত রয়ানি ।

মন্দিরে বা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে গাওয়া

এই রীতিই রয়ানির আদি রূপ। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক বাড়ির মনসা মন্দিরে শ্যাবণ মাসের এক মাস জুড়ে রয়ানি গাওয়া হয়। মন্দিরওয়ালা বাড়ির গৃহিণী এবং প্রতিবেশীরাই এর শিল্পী। দুপুরের রান্না-বান্না-খাওয়া-দাওয়া সেরে গৃহবধূরা ধোয়া কাপড়-চোপড় পড়ে মন্দিরে আসেন এবং দল বেধে রয়ানি গান। ওই দলেরও এক জন দলনেত্রী থাকে যিনি সুর তোলেন এবং বাকিরা তার সুর অনুযায়ী ধুয়া তোলেন। পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে মনসা মঙ্গল গাওয়ার এই রীতি এখনো বরিশাল অঞ্চলে দেখা যায়। বরিশাল নগরীর বাজার রোডের বাচ্চু সাহা ও প্রদীপ সাহার বাড়িতে প্রায় ৬০ বছর ধরে রয়ানি গাওয়া হচ্ছে। সাহা বাড়ির বড় বৌ অনিমা রাণী সাহা বলেন, মনসা মায়ের কাছে যা চাই তা পাই বলেই পুজা করি এবং প্রতিবছর এক মাস ধরে মনসা মঙ্গল গাই। ছোট বউ প্রতিমা সাহা বলেন, বিয়ের আগে গাইতে পারতাম না। এখন বড়দির কাছ থেকে শিখে নিয়েছি এবং গাইতে পারি। বাজার রোড সাহা বাড়ির মাসব্যাপী রয়ানি গাওয়ার আসরে ১০/১২ জন পড়শি উপস্থিত হন। যারা উপস্থিত হন তাদের সকলেই নারী। শিল্পীদের বয়স ২৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে।

কয়েক বছর আগেও নগরীর বাজার রোড, হাসপাতাল রোড, কাউনিয়া, দপ্তরখানার বেশ কয়েকটি বাড়িতে রয়ানির মাসব্যাপী আয়োজন হতো। এখনো বেশ কয়েকটি বাড়িতে আয়োজন হচ্ছে। অনেকে মাসব্যাপী না পড়ে সাত দিন বা তিন দিন আসর বসায়। ব্যস্ততা এবং শিল্পীর অভাবকে দায়ী করছেন শহুরে নারীরা। তবে বরিশাল অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস এমন প্রতিটি গ্রামেই রয়ানির আসর বসে শ্রাবণ মাস জুড়ে।

www.pathagar.com

বরিশাল নগরীর কাউনিয়া মনসাবাড়ি রোডের সার্বজনীন মনসা মন্দিরে বেশকয়েক বছর ধরে পুজার আগে রয়ানির আসর বসে মাস জুড়ে। মন্দিরের পুজা কমিটি রয়ানিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মনসা মঙ্গল সুর করে গাওয়ার জন্য সংগীত কমিটি নামে কমিটি গঠন করেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ওই কমিটির দলনেতা হলেন পূর্ণিমা রাণী শীল। বাকেরগঞ্জে উপজেলার ভরপাশা গ্রামের মেয়ে পূর্ণিমা অবিবাহিত অবস্থায় গ্রামের মুখার্জী বাড়ি থেকে রয়ানির সুর শিখেছেন। তার মতে, যাদের ঘরে মনসা মঙ্গল আছে তাদের শ্রাবণ মাসে ওই বই জাগাতে হবেই। নয়তো ওই পরিবারের অমঙ্গল হয়।

তিনি আরো জানান, লক্ষ্মীন্দরের ঢলান এবং জীয়ান পালার দিন মন্দিরে ৫০/৬০ জনের বেশি শ্রোতার আগমন ঘটে। তার মতে, লক্ষ্মীন্দরের ঢলান থেকে জীয়ান পর্যন্ত প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা একদিনে পড়তে হয়। এই দলের শিল্পীদের মতানুযায়ী রয়ানির মধ্যে করুণ লাছারি সুর খুই জনপ্রিয় এবং মনোগ্রাহী। এই সুর শ্রোতাদের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই টিমের অপরাপর শল্পিরা হলেন : দীপালি মহুরী, নীমা মালাকার, সুমী রাণী, রুনা কর্মকার, শিল্পী কর্মকার, সন্ধ্যা রাণী গুহ প্রমুখ।

টইে ধরেণের রয়ানির আসরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। তবে শুরু এবং শেষে উলুধ্বনি দেয়া হয়। পদ্মপূরাণ (মনসামঙ্গল) খুলে তার চারপাশে গোল হয়ে বসে নারীরা ছন্দবদ্ধভাবে সুর করে গ্রন্থের সামনের দিকে এগুতে থাকেন। গাওয়ার শুরু এবং শেষে গায়করা ভক্তিভরে মনসা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে থাকেন। শিল্পীরা সুর এবং তালের সাথে সাথে সামনের দিকে ঝুকে ঝুকে গান গেয়ে থাকেন। এসময় উপস্থিত সকল শিল্পীর মধ্যেই সমভাব ও সুর বিরাজ করে।

কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের পর রয়ানির আসর বসানো

রয়ানি স্বস্তিমূলক ধর্মীয় আচার। অর্থাৎ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ হলেই ভক্ত রয়ানি দিয়ে থাকেন। মানত বা মানসা পূরণ না হলে কেউই রয়ানি দেন না। বিশেষ করে পুত্র সন্তান লাভের ক্ষেত্রে রয়ানির মানত করেন অনেকে। তাছাড়া বিশেষে কোন কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মানত অনুযায়ী রয়ানি দিয়ে থাকেন ভক্ত মানতকারী। এক্ষেত্রে রয়ানি পরিবেশনকারী দলকে অর্থের বিনিময়ে এক দিন, দুই দিন বা তিন দিনের জন্য আনা হয়। সাধারণত রয়ানি দলের সদস্যরা পরস্ত বিকেলে সাজগোছ শুরু করেন। নারীরা চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি অথবা গেরুয়া শাড়ি পড়ে থাকেন। কাধে রাখেন লম্বা ওড়না যা অনেকটা উত্তরীয়ের মতো করে। পুরুষরা ধূতি এবং হাফ হাতার গেঞ্জি পড়েন।

নারীরা হালকা মেকআপ নেন এবং খোপায় ফুল বা ফুলের মালা ব্যবহার করেন এবং নারী-পুরুষ উভয়েই তিলক কাটেন। শিল্পীরা প্রথমে ধূপ-দীপ জ্বেলে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র, মনসা বন্দনা করে ঘটনাপ্রবাহে প্রবেশ করেন এবং সময় অনুযায়ী পরিবেশন করেন। অর্থাৎ এক দিনের রয়ানি হলে সকল ঘটনার সার অংশ উপস্থাপন করা হয়। তিন দিনের হলে একটু বেশি এমনিভাবে গাওয়া হয়। অর্থাৎ সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে উল্লেখযোগ্য অংশ গাওয়া হয়। সন্ধ্যার আগে বা পরপরই শুরু হওয়া

www.pathagar.com

রয়ানি রাত ১১টা ১২টা অবধি চলে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বাদ্য যন্ত্র। সুরের সাথে সাথে অঙ্গ-ভঙ্গি এবং নৃত্য রয়ানিকে নাটকীয় রূপ দেয়। বর্তমানে ৮/১০ জনের একটি রয়ানি দলকে এক দিনের রয়ানির জন্য তিন বেলা খাওয়া এবং ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। তিন দিনের ক্ষেত্রে ১৫/২০ হাজার টাকার চুক্তি হয়ে থাকে। তবে অর্থ কম হলে গায়ক এবং যন্ত্রীর সংখ্যা কমে। রয়ানি শেষে আসরে উপস্থিত ভক্ত বা শ্রোতাদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রয়ানির দর্শক সকল বয়সের হয়ে থাকে। কাহিনির পরম্পরা এবং সুর ও বাদ্যের ঝংকারের সাথে নৃত্য দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে আসছে। পেশাদার রয়ানি শিল্পীদের ক্ষেত্রে আসরে লোক না হওয়া অপমানজনক। এছাড়া শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রয়ানি দলের বায়না বেশি হয়।

মঞ্চে উপস্থাপিত রয়ানি

রয়ানি বরিশাল অঞ্চলের সৃষ্টি। এই মাটিতে দীর্ঘ কাল থেকে ধর্মীয় আবহে রয়ানি পরিবেশিত হয়ে আসছে। ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরেও এই অমর সৃষ্টি মঞ্চে পরিবেশিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল আগে থেকেই। যদিও কিছুকাল আগে রয়ানির শ্রোতাবৃন্দ কোন বিশেষ ধর্মীয় গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় ছিল এর দর্মক ও শ্রোতা। মনসামঙ্গলের কাহিনি এবং বিভিন্ন অংশে সুরের খেলার সাথে সাথে পরিবেশনকারী দলের নৃত্যভঙ্গী রয়ানিকে অপূর্ব গীতিনৃত্যালেখ্যে পরিচিত করে তুলেছে। এর সাথে কাহিনির পরম্পরা এবং উত্থান-পতন, পরিবেশনার ঢং, পরিবেশনকারীর অঙ্গসজ্জা, বাদ্যযন্ত্রের নিপুণ ব্যবহার, রয়ানিকে নাটকীয় মাত্রায় উন্নীত করেছে।

বরিশাল অশ্বিনী কুমার হল, বরিশাল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটিসহ বিভিন্ন স্থানে রয়ানি মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে। আঞ্চলিক লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালাতে রয়ানি কম করে হলেও পরিবেশিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পরিবেশনের ঢং এবং সময় নির্ধারিত থাকে। কাহিনি এবং সুরের উত্থান-পতন দ্রুত লক্ষ করা যায়। পরিবেশনকারীর দেহের ভাষার পরিবর্তন ঘটে দ্রুত। এরসাথে বাদ্যযন্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মোহিত করে।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

রয়ানি পরিবেশনে যে সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় তার মধ্যে হারমোনিয়াম, বাঁশি, খোল বা মৃদঙ্গ, জুড়ি, বেহালা, দোতরা অন্যতম। রয়ানি পরিবেশনের ক্ষেত্রে অন্যতম উপকরণ হল চামর।

পরিবেশনকারীদের মেক আপ

সাধারণত নারী শিল্পীরাই রয়ানির প্রাণ বা মূল গায়েন। মূল গায়েন কখনো চওরা লালপাড়ের সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, সোনালী পাড়ের সাদা উত্তরীয় পরিধান করেন। একই সাথে দলের সব নারী একই ধরনের পোশাক পরেন। গায়েনরা আলতা, কুমকুম, পাউডার, উপটান, কাজল, তিলক ব্যবহার করেন। প্রধান তিন গায়েন খোঁপায় ফুলের

www.pathagar.com

মালা ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষ শিল্পীরা সাদা ধূতির সাথে সাদা হাফহাতার গেঞ্জি বা ফতুয়া ব্যবহার করেন। পুরুষ শিল্পীরাও তিলক কেটে মঞ্চে ওঠেন। দেখা গেছে শিল্পীদের বেশিরভাগই চা এবং পান-এ আসক্ত। তবে যখন মঞ্চে থাকেন তখন একটানা রয়ানি পরিবেশন করেন। অনেক ক্ষেত্রে ৫/১০ মিনিট বিরতির ব্যবস্থাও করা হয়।

বরিশাল অঞ্চলের রয়ানি দলের বিবরণ

মনসা সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আগৈলঝাড়া উপজেলার কোদালধোয়া গ্রামের প্রয়াত বরদাকান্ত অধিকারী। পরবর্তীতে প্রয়াত সুরেন্দ্র নাথ কীর্ত্তনীয়া দলের হাল ধরেন। বর্তমানে মা মনসা সম্প্রদায়ের পরিচালক হলেন– কোদালধোয়া গ্রামের সুধীররঞ্জন সরকার। এই সম্প্রদায়ের কণ্ঠশিল্পীরা হলেন– বাসনা রাণী বালা, আলো রাণী কর, লিলি ওঝা, নিখিল কীর্ত্তনীয়া, মৃত্যুঞ্জয় ওঝা। দলে মৃদঙ্গ বাজান চিত্তরঞ্জন কীর্তনীয়া ও নির্মল কীর্ত্তনীয়া। হারমোনিয়াম ধরেন হরেন্দ্রনাথ বালা, বেহালা বাজান বাসুদেব বিশ্বাস, বাঁশি বাজান জ্যাকব বৈদ্য এবং দলের জুড়িদার হলেন সুশীল কীর্ত্তনীয়া।

মা মনসা সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উজিরপুর উপজেলার হারতার বাসিন্দা কড়িশ্বর সরকার। বর্তমানে দল পরিচালনা করছেন হারতার নিতাই সরকার। কণ্ঠশিল্পীরা হলেন– লক্ষ্মী রাণী মল্লিক, গোপাল রায়, শেফালী রানী মল্লিক, শেফালী রানী, সুমতী বড়াল। হারমোনিয়াম বাদক হলেন অনিল হালদার, মৃদঙ্গ বাজান জিতেন বিশ্বাস, জুড়িদার হলেন ঝন্টু রায়, বিশ্বনাথ মণ্ডল বাজান বাঁশি এবং সনাতন বিক্রম বাজান দোতারা।

মনসামঙ্গল সম্প্রদায় : এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উজিরপুর উপজেলার জল্লার প্রয়াত অনন্ত কুমার দেউরী। বর্তমানে পরিচালনা করছেন উজিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়নের বাহেরঘাট গ্রামের নিমাই সরকার (দেউরী)। দলের কণ্ঠশিল্পী সুভাসিনী বিক্রম, পারুল রানী হালদার, বকুল বাড়ৈ, সুমতী বৈরাগী, বীণা রাণী মণ্ডল, শৈলেন মিস্ত্রী। যন্ত্রীদের মধ্যে নিরঞ্জন মণ্ডল বাজান জুড়ি, সত্যরঞ্জন সরকার বাজান হারমোনিয়াম, নগেন হালদার ও অনন্ত পাড়ুয়া বাজান মৃদঙ্গ এবং ওয়াজেদ মিয়া বাঁশি বাজান।

এছাড়াও বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ছোট-বড় আট/দশটি রায়ানির দল রয়েছে। বরিশালের উজিরপুর আগৈলঝাড়া ছাড়াও ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলার দলগুলোও সুনামের সাথে রয়ানি পরিবেশন কর আসছে। প্রতিটি দলের গাওয়ার রীতি প্রায় একই রকম। দলে শিল্পীর সংখ্যা এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নির্ভর করে অর্থের উপর ভিত্তি করে।

কালের আবর্তে রয়ানি পরিবেশনার সময় আজ সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সাধারণ গৃহিণীদের গাওয়া মনসা মঙ্গল আর নিমাই দেউরি-সুমালা-সুধীররঞ্জনদের গাওয়া রয়ানির পার্থক্য অনেক। এপার্থক্য সময়-সুর-পরিবেশনার ঢং-বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার-পোষাক ও পরিচ্ছদ-দর্শক শ্রোতার সংখ্যাতে সুস্পষ্ট। পার্থক্য যাই হোক না কেন, মধ্যযুগ থেকে রয়ানি টিকে আছে তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যঞ্জনায়, আগামীতেও টিকে থাকবে শেকরসন্ধানী মানুষের প্রেরণা-উৎসাহ আর লোক মানসে প্রোথিত কাহিনির পরম্পরা-ট্রাজেডি ও মানুষের সফলতার জয়গানে। মনসা মঙ্গলের বাণী ও সুর– দেবতার প্রতি

www.pathagar.com

মানুষের চ্যালেঞ্জ এবং মানুষেরই জয়গাথা, তাই মানুষই টিকিয়ে রাখবে রয়ানির সুর-বাণীর ঝরণা ধারাকে।

২. বিয়ের গান : হয়লা

বরিশাল অঞ্চলে বিয়ের গানকে হয়লা বলা হয়ে থাকে। লোকসমাজে ব্যবহৃত শব্দমালায় সাজানো আঞ্চলিক ভাষা এবং প্রচলিত সুরে হয়লা পরিবেশিত হয়। হয়লা গাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট শিল্পীর প্রয়োজন হয় না। লোকসমাজের নারীরাই হয়লা পরিবেশন করে থাকেন। বিয়ে বাড়িতে বর অথবা কনে পক্ষের নারী সদস্যরাই হয়লা পরিবেশন করেন। আনন্দ-রসিকতায়পূর্ণ হয়লা দ্রুত পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন বা অন্তরিকতা সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে মনে করা হয়। রসিকতার ছলে রসাত্মক বা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা এবং সুরে একে অপরকে ঠকানো হয়লার অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, সুরের খেলা বা প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে ঠকিয়ে তাৎক্ষণিক আনন্দ উপভোগ হয়লাকে প্রতিযোগিতামূলক রূপ দিয়েছে।

হয়লায় পুরুষের অংশগ্রহণ বা উপস্থিততি নেই বললেই চলে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নির্দিষ্ট কোন কিছুই ব্যবহৃত হয় না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই ইচ্ছানুযায়ী বাজানো হয়। হয়লার সাথে সাথে নারীরা বেশিরভাগক্ষেত্রে নেচে ওঠেন। কখনো কখনো এই নাচ চরম রসিকতা ও অট্টহাসির মধ্য দিয়ে ধারাবাহকতার ছন্দপতন ঘটায়। তবে পাকা আসরে হয়লা জমে উঠতে খুব একটা সময় লাগে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মধ্যে শিল্পীদের বীরত্ব প্রকাশ পায়। কবে থেকে বরিশাল অঞ্চলে বিয়ে বাড়িতে হয়লা গীত হয়ে আসছে, তা স্পষ্ট করে বলা মুসকিল। এই গান লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারার মতো লিখিত রূপ পায়নি আজো। ১২৬১ সনের ২৮চৈত্র, *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় প্রকাশিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *বরিশালের বিবরণ* হতে জানা যায়,–

> ...এদেশের বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণরূপেই বিপরীত। অর্থাৎ বরকে প্রায় কন্যার বটিতে যাইতে হয় না, কন্যাই স্বয়ং সাজ–সজ্জা করিয়া সমারোহপূর্বক বরের আবাসে গমন করেন। এই রূপ নিয়ম ইহার দিগের পক্ষে অতিশয় সম্ভ্রমজনক, এতদ্রূপ শুভকর্মের কিঞ্চিত পূর্বে গৃহের অঙ্গনারা অঙ্গনের মধ্যে চক্রাকার হইয়া গানারাম্ভ করেন, এই গানের নাম "গাহিন লওন", তাহার বাদ্যের নাম "খাড়ানাগরা"। পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া অত্যুত্তম গায়িকাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতদ্রূপ গায়িকাগণ অন্য পল্লীতে কুটুম্বের ভবনে সংঙ্গীত করনার্থে নিমন্ত্রিতা হইয়া থাকেন।...

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী আজ আর বরের বাড়িতে বিয়ে হয় না। কন্যার পিত্রালয়েই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময়ে কন্যার বাড়িতেই হয়লার আসর জমে ওঠে। আগের মতো আর পেশাদার হয়লা শিল্পীদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম হয়লা লোক সমাজের নারীরা লালন পালন করে রেখেছেন। বরিশাল অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রামের নারীরা দু এক লাইন হয়লা গাইতে পারেন। হয়লার কথা বললে অনেকেই লাজুক হাসিতে বলে ওঠেন– *ওই দুই এ্যাক ছন্‌দো গাইতে পারি।* লোকসংস্কৃতি গবেষক দেবাশীষ চক্রবর্তী সম্প্রতি আ. জলিল বয়াতির মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চলের শিল্পীদের একত্রিত করে হয়লাকে মঞ্চে প্রদর্শনের জন্য একটি দল প্রস্তুত

www.pathagar.com

করেছেন। ওই দলটি গত তিন বছরে বরিশালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ ঢাকায় অনুষ্ঠিত লোকসংগীত অনুষ্ঠানে হয়লা পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছে।

প্রফেশনাল দলটি পোশাকের ব্যবহার, ঢোল, বাশি, করতাল, পাতিল (পাইল্লা) বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহাত করে। মঞ্চে উপস্থাপিত হয়লায় নাটকীয়তা আনায়নের জন্য বর-কনে সাজানো হয়। নৃত্যের বাহুল্যতা লক্ষণীয়। তাছাড়া কন্যাপক্ষের কন্যা সাজানো, কন্যাপক্ষের কন্যাবরণ, বরপক্ষের কন্যাবরণসহ উভয় পক্ষের চাপান এবং ঠেসের সাথে সাথে হেলে-দুলে নৃত্য হয়লাকে নতুনমাত্রা দিয়েছে। বরিশাল অঞ্চলে হয়লা শিল্পী হিসেবে বিশেষখ্যাতি অর্জন করেছেন– বরিশাল নগরীর রূপাতলী সোনারগাঁ টেক্সটাইল মিল সংলগ্ন এলাকার রেখা বয়াতি, নার্গিস পারভীন, মিনারা বেগম, নূরজাহান বেগম, বরিশালের উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের পূর্বধামসর গ্রামের শেফালী বেগম, একই উপজেলা ও ইউনিয়নের মুণ্ডপাশা গ্রামের রুনা পারভীন ও হেনারা বেগম, উজিরপুর উপজেলা সদরের প্রশিকা অফিস সংলগ্ন এলাকার মিনারা বেগম, উজিরপুর নিউমার্কেট এলাকার কোহিনুর বেগম প্রমুখ।

এক বিয়ে বাড়িতে হয়লা পরিবেশন করছেন কয়েকজন শিল্পী

এছাড়াও বরিশাল অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন গান গাওয়া হয়। ওই গানগুলোকে বিয়ের গান বলা যায়। কোন কোন হিন্দু বিয়েতে শিল্পীদের সংগীত দক্ষতায় হয়লার আদলে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে তা বর্তমানে খুব একটা দেখা যায় না। নিচে সংগৃহীত বিভিন্ন পর্বের হয়লা এবং বিয়ের গান তুলে ধরা হলো–

www.pathagar.com

কন্যা সাজানীর গান

[১]

হলদি গিলা সোন্দা মেথি আনো গো কুটিয়া;
হলদি কইরা মেন্দি আনো যতনে বাটিয়া;
লো পাড়ার লোক আইজকা ময়নামতির বিয়া ॥
পরথমেতে ময়নামতি হলুদ মাখে গায়,
হলুদ বরণ অঙ্গ তাতে আরও হলুদ হয়
তারপরেতে সোনার ময়না নদীর ঘাটে গিয়া,
সখিগণের সংগে আইলো সিনান করিয়া ॥
গোসল করিয়া ময়না আলতা দিল পায়,
রাঙা পায়ে আলতা কন্যার বড় শোভা পায়,
কালো চোখে দিল কাজল বাটুরা খুলিয়া
চন্দনেরি ফোঁটা দিল কপালে তুলিয়া ।
ময়নামতি সাজন করে ফিতায় বান্ধে বেনী;
পিঠের উপর পাইড়া ঘুমায় যেন কালো ফনী;
সাজন করে বিয়ার কন্যা হাঁসলী গলায় দিয়া
নাকে নোলক কানে দিল চম্পা ফুল আনিয়া ॥
সাজন করে ময়নামতি মেন্দি দিয়া হাতে
চান সুবুজের টিকলি ময়না তুইলা দিল সাথে,
সোনার হাতে বেলোয়ারী চুড়ী পিন্দিয়া,
কোমরেতে রূপার বিছা নিল যে ঘিরিয়া ॥
সবার শেষে পরল ময়না বিয়ার রাঙা শাড়ি
রূপ দেখিয়া লাগে যেমন ডানাকাটা পরী,
গায় সখীরা বিয়ার গান হেলিয়া দুলিয়া,
ময়নামতি বইলো এবার ঘোমটা মুড়ি দিয়া ॥

কন্যাবরণ

বরতে আইছে বরণীকইন্যা, বরতে আইছে বরণীকইন্যা বরতে নাহি জানে
হালকা মাইঞ্জা ঢুলাইয়া ঢালাইয়া কইন্যা বরণ করে কি নারে ॥
কাইল কোনে ছিলারে কুলা, কাইল কোনে ছিলারে কুলা পাটনিয়ার দোকানে
আইজ কেনে আইছরে কুলা রাম-সীতার বরণে রে ॥
কুলা করে ঝিলি না মিলি, কুলা করে ঝিলি না মিলি বকুল ফুলের মালা
ভাগ্যবতী বরণগো করে আবে ছোটে তারা কি না রে ॥
কাইল কোনে ছিলারে মেন্দি, কাইল কোনে ছিলারে মেন্দি বড়মিয়ার বাগানে
আইজ কেনে আইছোরে মেন্দি রাম-সীতার বরণে কি না রে ॥
মেন্দি করে ঝিলি না মিলি, মেন্দি করে ঝিলি না মিলি বকুল ফুলের মালা
ভাগ্যবতী বরণগো করে আবে ছোটে তারা কি না রে ॥

www.pathagar.com

কাইল কোনে ছিলারে হলদি, কাইল কোনে ছিলারে হলদি বানিয়ার দোকানে
আইজ কেনে আইছোরে হলদি রাম-সীতার বরণে কি না রে ॥
হলদি করে ঝিলি না মিলি, হলদি করে ঝিলি না মিলি বকুল ফুলের মালা
ভাগ্যবতী বরণগো করে আবে ছোটে তারা কি না রে ॥

বরিশাল জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাংস্কৃতিক মেলায়
হয়লা পরিবেশন করছেন শিল্পীবৃন্দ

কন্যাবরণঃ কন্যাপক্ষ
ঢাকাগোনে আনলাম রে বরণী ও তোগো বরতে কললাম বরলিনা
তয় বুঝি বরতে জান না, আমাগো দেশে নেয়ামু বাঙ্গালীর বরণ শিখামু ॥
চিটাগাংগোনে আনলামরে নাচুনী ও তোগো নাচতে কইলাম নাচলিনা
তয় বুঝি নাচতে জান না, আমাগো দেশে নেয়ামু বাঙ্গালীর নাচন শিখামু ॥
ফরিদপুরগোনে আনলামরে গাউনি, হয়লা গাইতে কইলাম গাইলি না
তয়বুঝি হয়লা জান না, আমাগো দেশে নেয়ামু হয়লা গাওয়া শিখামু ॥

কন্যাবরণঃ কন্যাপক্ষ
এমন সুন্দর হারমুনি কন্যাগো তুমি তোমার সিঁথি কেন খালিরে হুকুম দারোগা
আমার লগে গেলেরে হারমুনি কন্যা তোমার সিঁথিতে মিশামু ॥
তোমার সাথে গেলেরে দারোগা বাবু আমার দাদার যাইবেরে জাতি হুকুম দারোগা
পাঁচশ টাকা দিমুগো হারমুনি কন্যা তোমার দাদারে করমু রাজিরে ॥

www.pathagar.com

এমন সুন্দর হারমুনি কন্যা তুমি, তোমার মাইঞ্জা কেন খালিরে হুকুম দারোগা
আমার লগে গেলেগো হারমুনি কন্যা তোমার মাইঞ্জাতে মিশামু ॥
তোমার লগে গেলেরে দারোগা বাবু আমার বাবার যাইবে জাতি
পাঁচশ টাকা দিমুগো হারমুনি কন্যা তোমার বাবারে করমু রাজিরে ॥

কন্যার মাকে উদ্দেশ্য করে বরপক্ষের গান
আম পাতার চাতুর মুতুর কাডাল পাতার নাও
ওই ঘাটে বাতাস, মাঝি, এই ঘাটে ভিড়াও নাও
বিবির মায়ে রানছে সিন্নি একবার খাইয়া যাও ।
বিবির মায়ে লাগছে বিছান একবার যাইয়া যাও ।
বিবির মায়ে পরছে শাড়ি একবার দেইখ্যা যাও ।

বরপক্ষের গান
ঝাড়ের বাঁশ কাইটা হারে সাউদের কুমার করে, করে রঙ্গের বেতি কি না রে
রঙ্গের বেতি কইরা হারে সাউদের কুমার বুনায়, বুনায় রঙ্গের ডালা কি না রে
রঙ্গের ডালা বুনাইয়ারে সাউদের কুমার মিলায়, মিলায় রঙ্গের কামার কি না রে
রঙ্গের কামার মিলাইয়ারে সাউদের কুমার বেচে, বেচে রঙ্গের ডালা কি না রে
রঙ্গের ডালা বেইচা হারে সাউদের কুমার কেনে, কেনে সিঁথির সিঁদুর কি না রে
সিঁথির সিঁদুর কিনা হারে সাউদের কুমার চলে, চলে আপন দেশে কি না রে
তোমার দেশে যাইয়া হারে সাউদের কুমার মাদোন, মাদোন ডাকবো কারে কি না রে
আমার ঘরে আছে হারে মাদন, মাদন ডাকবা তারে কি না রে
তোমার মাদন ডাকলে পরে ফিইর‍্যা যাইবে, ফিইর‍্যা যাইবে ঘড়ে কি না রে
আমার মায়রে মাদন ডাকলে পরে তুইল্লা লইবে, তুইল্লা লইবে কোলেরে॥

বরপক্ষের চাপান
শিং চলে নালে মাগুর চলে খালে রাম কানাইয়ারে
কোন শিংয়ে আল দিয়াছে তোরে
নেলুয়া শিংয়ে আল দিয়াছে মাইয়ার মায়ের তলে রাম কানাইয়ারে
নেলুয়া শিংয়ে আল দিয়াছে মাইয়ার বুইনের তলে রাম কানাইয়ারে
নেলুয়া শিংয়ে আল দিয়াছে মাইয়ার ভাইর বউয়ের গালে রাম কানাইয়ারে

কন্যাপক্ষের চাপান
উন্দুরে মাডি ঠ্যালে ঝুড়া ঝুড়া
পোলার বাফে বইয়া রইছে যমের খুডা
শালার গুণ হইলোনা, শালার মিল হইলোনা
পোলার বাফে বুদ্ধিমান কথা ছিল না
একবিড়া পানের পয়সা জোটছিল না

www.pathagar.com

শালা খাউট্টা মুগইরের বারি খাইছো নি
শালা লম্বা মুগইরের বারি খাইছো নি
পোলার ভাই বুদ্ধিমান কথা ছিল না
একপাইল্লা মিষ্টির পয়সা জোটছিল না
শালা খাউট্টা মুগইরের বারি খাইছো নি
শালা লম্বা মুগইরের বারি খাইছো নি
পোলার বোনাই বুদ্ধিমান কথা ছিল না
একপাইল্লা মিষ্টির পয়সা জোটছিল না
শালা খাউট্টা মুগইরের বারি খাইছো নি
শালা লম্বা মুগইরের বারি খাইছো নি

কন্যাপক্ষের চাপান
পিরহারও লেইতে অতিতও আইছে, কোনখানে বসামু
মোর আল্লাদের অতিতগুন
কোনখানে বসামু মোর জৌলাসের অতিতগুন ॥
ঘড়েরও পাছে গরুর আতাল আছে
সেইখানে বসামু মোর আল্লাদের অতিতগুন
সেইখানে বসামু মোর জৌলাসের অতিতগুন ॥
পিরহারও লেইতে অতিতও আইছে, কি দিয়া খাওয়ামু
মোর আল্লাদের অতিতগুন
কি দিয়া খাওয়ামু মোর জৌলাসের অতিতগুন ॥
উত্তরকুলে কুত্তারছাও ধইরা আইন্না জবো দাও
হেইয়াদ্দা খাওয়ামু মোর
আল্লাদের অতিতগুন ॥
পিরহারও লেইতে অতিতও আইছে, কোনখানে শোয়ামু
মোর আল্লাদের অতিতগুন
গরুর ঘরের পাছে পায়খানা আছে
সেইখানে শোয়ামু মোর আল্লাদের অতিতগুন
সেইখানে শোয়ামু মোর জৌলাসের অতিতগুন ॥

কন্যাপক্ষের চাপান
নল বনে হাইটো না নলের আগা কাইটো না
নিশুদ করিলাম বন্ধু আর বাঁশি বাজাইও না ॥
পোলার মায়ের এত মান
খাতার তলে রাহে লাং
নিশুদ করিলাম বন্ধু আর বাঁশি বাজাইও না ॥
পোলার বুইনের এত মান

www.pathagar.com

ঠ্যাঙ্গের তলে রাহে লাং
নিশুদ করিলাম বন্ধু আর বাঁশি বাজাইও না ॥
পোলার ভাইর বউর এত মান
খোঁপার মধ্যে রাহে লাং
নিশুদ করিলাম বন্ধু আর বাঁশি বাজাইও না ॥

কন্যাপক্ষের গান

হারে ভাও নাই আমার গলাতে, হারে সুর নাই আমার গলাতে
পাইল বয়াতী থুইয়ানা আইছি আপনারই দেশেতে
হারে লগেনা কইরা আইনাছি পরের দেশের হুয়ারডি
দে দে হুয়ার নাংলা দে পোলার মায়েরও পাছাতে ॥ ঐ
হারে ভাও নাই আমার গলাতে, হারে সুর নাই আমার গলাতে
পাইল বয়াতী থুইয়ানা আইছি আপনারই দেশেতে
হারে লগেনা কইরা আইনাছি পরের দেশের কুত্তাডি
দে দে কুত্তা কামড়দে পোলার বুইনেরও গালেতে ॥ ঐ
হারে ভাও নাই আমার গলাতে, হারে সুর নাই আমার গলাতে
পাইল বয়াতী থুইয়ানা আইছি আপনারই দেশেতে
হারে লগেনা কইরা আইনাছি পরের দেশের রাওয়াডি
দে দে রাওয়া ঠোক্করদে, দে দে রাওয়া ঠোক্করদে পোলার ভাইর বউরও ঠোঁটেতে ॥ ঐ

বরপক্ষের চাপান

একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি। একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি
দুইহান জেলাপি রস ভরা
মাইয়ার মায়রে দেইখ্যানা আইছি রাস্তার ব্যাডাগো গলাধরা
সখী এক জোড়া নাকি দুই জোড়া ॥
একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি। একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি
দুইহান জেলাপি রস ভরা
মাইয়ার বুইনেরে দেইখ্যানা আইছি জাইল্লা ব্যাডাগো কোলজোড়া
সখী এক জোড়া নাকি দুই জোড়া ॥
একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি। একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি
দুইহান জেলাপি রস ভরা
মাইয়ার ভাইর বউরে দেইখ্যানা আইছি কোলার হাইল্লাগো গলাধরা
সখী এক জোড়া নাকি দুই জোড়া ॥
একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি। একখান জেলাপি ঘিচি না মিচি
দুইহান জেলাপি রস ভরা
মাইয়ার খালাগো দেইখ্যানা আইছি পুলিশ ব্যাডাগো কোলজোড়া
সখী এক জোড়া নাকি দুই জোড়া ॥

www.pathagar.com

বরপক্ষের গান

ছি বলেছি এমন বড়লোকের বাড়ি গান গেয়েছি
চাইলাম একটু পান দিল না একটু পান
মোগো বাড়ি যাইও
বটপাতা আইন্না দিমু পান বুইজ্জা খাইও ॥ ঐ
ছি বলেছি এমন চামারের বাড়ি গান গেয়েছি
চাইলাম একটু সুবারি দিলনা একটু সুবারি
মোগো বাড়ি যাইও
খারুরের আডি আইন্না দিমু সুবারি বুইজ্জা খাইও ॥ ঐ
ছি বলেছি এমন পিশাচের বাড়ি গান গেয়েছি
চাইলাম একটু হাদা দিলনা একটু হাদা
মোগো বাড়ি যাইও
পচাপাতা আইন্না দিমু হাদা বুইজ্জা খাইও ॥ ঐ
ছি বলেছি এমন ম্যাথরের বাড়ি গান গেয়েছি
চাইলাম একটু চুন দিল না একটু চুন
মোগো বাড়ি যাইও
বগের গু আইন্না দিমু চুন বুইজ্জা খাইও ॥ ঐ

কন্যা বিদায়ের গান

দুলা আইলো দুলা আইলোরে ময়না যাইবার কালে
কি ও কইয়া যাইমু পরের বাড়ি
তোমার বাবাজীর আছে ময়নালো মুল্লুক আর তাল্লুকলো যাইবার কালেরে
তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে। তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে।
তোমার চাচাজীর আছে ময়নালো থালা আর বাটিলো যাইবার কালেরে
তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে। তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে।
তোমার মায়েরও আছে ময়নালো খাতা আর বালিশলো যাইবার কালেরে
তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে। তাইও লইয়া যাইবা পরের দেশে।

কন্যা ও বরপক্ষের সম্মিলিত গান

আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায়
বেয়াই আইছে ছৈয়া নায়
আইজ বুঝি মোর যাইতে হয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥
আধা পোতে নিয়া বেয়াই, আধা পোতে নিয়া বেয়াই
মধুর কতা কয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥
উসিসতলা নিয়া বেয়াই, উসিসতলা নিয়া বেয়াই

www.pathagar.com

সুখের কতা কয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥
হাইতনা ঘরে নিয়া বেয়াই, হাইতনা ঘরে নিয়া বেয়াই
সরবোত গোলাইতে কয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥

ঘরের খাডালে নিয়া বেয়াই, ঘরের খাডালে নিয়া বেয়াই
বিছনা লাছতে কয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥
বেয়াই আইছে ছৈয়া নায়
আইজ বুঝি মোর যাইতে হয়
আমি যামুনা যামুনা পাগলা বেয়াইর নায় ॥

৩. গুণাই বিবি পালার গান

বরিশাল অঞ্চলের লোকসংগীতের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল গুনাই বিবি যাত্রাপালার গানগুলো যা আজ অবধি লোকবাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়। বরিশাল অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে গুণাই বিবি যাত্রাপালার মতো গুণাইর গানগুলোও পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, খুলনা এবং ময়মনসিংহের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। গুণাইবিবি যাত্রাপালায় সংলাপ অপেক্ষা নৃত্য ও গীতেরই প্রাধান্য। সংগীতই এই পালার প্রাণ। পালার গানগুলো পল্লী সুরে গীত হয়। কতগুলো গানের সাঙ্গে দোহারগণ সহযোগিতা করতেন। এ পালায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে দোতারা, বাঁশের বাঁশি, হারমোনিয়াম, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল ব্যবহৃত হতো। প্রবাদ আছে তোতামিয়া ও গুণাই বিবির কাহিনি কাল্পনিক নয়। বাস্তব ঘটনা। অনুসন্ধানে নিশ্চত হয় ঘটনাটি বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে ঘটেছিল। বরিশাল জেলার লৌকিক প্রেমসংগীত গুণাই যাত্রার গান বা গুণাই বিবির গান খুবই জনপ্রিয়। একে গুণাই বিবির পালাও বলা হয়। নায়িকা গুণাই আর নায়ক তোতা। তাদের বিচ্ছেদই হলো গানের বিষয়। বরিশালের বাইরেও মুসলমান সমাজে গানটি সুপ্রচলিত। গুণাই বিবির গানের কয়েকটি উল্লেখ হলো :

১
আমি ছালাম জানাই মাস্টারের চরণে গো॥
ছালাম ছালাম ছালাম জানাই মাস্টার গো
ও-না আপনার ও চরণে॥
শাহজানের কন্যা আমি মাস্টার গো
ও না জেলা বরিশাল॥

২
আমি আর যাব না হাই স্কুলে পড়তে গো॥
হাই স্কুলে পড়তে গেলে ভাইজান গো
ও আমার সম্মান রাখে না গো॥

www.pathagar.com

পড়াবার যদি ইচ্ছা থাকে ভাইজন গো
ও না মাস্টার রাখেন বাড়ি॥

৩
চরণ ধরে বলছি, চাচা, দেবেন পঁচিশ টাকা॥
দেবেন পাঁচশ টাকা, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা গো–
ও দেবেন পাঁচশ টাকা॥

এক অনুষ্ঠানে গুনাই বিবির গান পরিবেশন করছেন বিশিষ্ট শিল্পী ঝর্না

৪
ও আমার কলেজা ধরিল দারুণ বিষে গো॥
ভাইএ ভাইএ বিচ্ছেদ করে খালেক রে
ওনা বিষ খাওয়ালি শেষে॥
নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, খালেক রে
ওনা কেহ নাই সংসারে॥
আরে ও ভাইজান মরেছে, মরেছে
গুণোর কপাল ভেঙেছে।
অভাগিনী গুনাই রে ডাকে, ও ভাই সঙ্গে করে নে॥
খালেক রে, খালেক রে, ও বিষ আমার হস্তে দে,
নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, এবার আমিও যাই চলে॥

৫
আরে ও সখি, চল যাই চল যাই আমরা ফুল বাগানে যাই

www.pathagar.com

ফুল বাগানে গিয়া রে, সখি, পরাণ জুড়াই॥
আরে ও ফুল তুলিব, তুলিব আমরা ডালা সাজাব।
বিনা সুতের হার গাঁথিয়া আমরা গলায় পরিব॥

৬
আরে ও কে তোমরা কে আছ, কে আছ তোমরা, কে আছ বনে,
আর সরল মনে দাও পরিচয় তোমরা দুজনে॥
আরে ও তোমরা কথা কও, কথা কও – তোমরা একটি যা কও।
এখনি ছাড়িব গুলি রক্ষা নাই পাও॥

৭
ফলে ফুলে, সখি, বনে ফুলে নাচ
বনফুলে নাচ, লো সই!
বনফুলে না।
আমরা গাঁথিব মালা, আমরা সাজাব ডালা
পরাব তোমার গলে॥

৪. বাস্তু পুজোর গান

স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পুজা খোলা চাঁচ্যা দে।
স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে,
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পুজা ফুল তুল্যা দে।

অকান্দনে কান্দন কান্দেন মনসা,
প্রভু, মোর না যাও ছাড়িয়া।
আঁচলের নিধি, আহারে, দারুণ বিধি,
এখন আমি মরিব কান্দিয়া॥
গা তোল, ওগো, অভাগিনী কমলা।
কেন, প্রিয়ে, হেনবুদ্ধি করিলা।
কান্দে ধোনা মোনা দোঁহে বিষাদ ভাবিয়া।
ঘরেতে রহিব, গুরু, কার মুখ চাহিয়া॥
শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া।
চান্দর করুণার সীমা নাই।
বাকল খাইল চোরাগাই।

www.pathagar.com

৫. পার্বণ সংগীত

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
পেরথোমে বন্দিলাম, মাগো, দুগ্‌গার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।
তারপরে বন্দিলাম মোরা অসুরের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা বিজয়ার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।
তারপরে বন্দি যে দেব কার্তিকের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ॥
তারপর যদি বন্দি যে দেব গোণেশের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী নারায়ণ।

৬. পুরাণের গান

নারদ মুণি বীণা করেতে
বীণার হরিগুণ গান করিতে
উপনীত হয় গিরি পুরেতে,
বলে, ধন্য ধন্যা রাণী এক কন্যা ধরেছ গরভেতে;
জামাই এনেছি তোমার সাক্ষাতে।
সে যে দেবের দেব ভব মৃত্যুঞ্জয়,
ইচ্ছা হয় কি মনেতে।
শুনে গিরি রাণী মুখে দেয় বসন,
বলহে, ওহে তপোবন,
জামাই এনেছ অতি সুলক্ষণ,
ও তোর পাকাদাড়ী চুল নিশাতে আকুল,
ঢুলু ঢুলু করে দুই নয়ন।
চান বদনে লৈরা গিছে দশন।
হৈল সতীর ভাগ্যে জামাতা যুগ্য অতি নব্য পঞ্চানন।
তার সর্ব অঙ্গে ছাই মাখিছে
গলেতে দিচ্ছে ফণি-হার।
কটি ভরা ব্যাঘ্র চর্ম মাথায় জটা ভার।
ও তার বয়সে হয়েছে শতেকের উপরে,
ও হেঁটে যেতে ঢুলে পড়ে বৃষোপরে আরোহণ করে।
ও তার হস্তপদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ,
যেন গুলুম হয়েছে উদরে।

www.pathagar.com

জামাই দেখে প্রাণ কান্দে ডরে
যবন আলাম বলে ভাবলে কি হবে,
যার যার কপালে করে।

৭. গাজনের গান

১
পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিল ঢোলডগর কাঁড়া
শানাই শঙ্খ বাজে শত শত,
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত।
সঙ্গে চলে যত জানা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে।

২
আর, এভাবে যারা করে বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই কিছুই।
দেখ, শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রামনী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি।
একজনের থালে দুইজন বইসে,
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে।
আর অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয়॥

৮. ষাণ্মাসিক গান

ছয় মাসের সংবাদ
প্রথম বৈশাখ মাসে শ্বশুর মোর অইল।
মাসের ঊনত্রিশে বিবাহ মোর হইল॥
মুখচন্দ্রিকার কালে স্বামী চলিল পাটে।
আপযশ করে লোকে শুনি প্রাণ ফাটে॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে আমি ভাসিলাম সাগরে।
সমুদ্রের ঢেউ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
মহাসুখে বাস করে সবে পতি সঙ্গে।
আমি অভাগিনী ভাসি সাগর তরঙ্গে॥
আষাঢ় মাসেতে আমি পড়িলাম দায়।
ঘাটের খেয়ানি বেটা মোরে নিতে চায়॥

www.pathagar.com

শ্রাবণ মাসেতে পুনঃ ঠেকিলাম দায়।
বন হইতে ব্যাঘ্র আসি প্রভুরে খাইতে চায় ॥
অরণ্য দেখিয়া মোর ভয়ে প্রাণ ফাটে।
স্তুতি করি বাঘিনীরে এড়াইলাম সঙ্কটে ॥
ভাদ্র মাসেতে আমি ছিলাম একেশ্বর।
শরীর শুকাইয়া আমার হইল জরজর ॥
ছয় মাস ছিলাম মাগো স্বামী নিয়া কোলে।
তোমার প্রাসাদে আমি আসিলাম কূলে ॥

৯. চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান

১

তাল :–ঝুমুর

ভাইরে মানুষ নাই এ দেশে,
এ দেশের সকল মেকি সকল ফাঁকি,
যে যার মৌজে আপন রসে ॥
দেখছি কত মস্ত সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখখানা বড় মিষ্ট, অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলা বৃহস্পতি, কাজে কেউ না ঘেষে
বলতে গেলে এসব কথা, উঠে পাগল বলে হেসে ॥
স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না,
অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ, চিনবার যো নাই বেশে।
ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে ॥
যে-দেশ সকল দেশের সেরা, সে দেশের এমনি ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা হয় চলে যাই বিদেশে,
তবু কেবল বসে আছি ক্ষেপা মাগীর আশে,
এ মুকুন্দের ভরসা আছে দিবে বেটী সমাজ পিষে ॥

২

তাল : কাহারবা

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগৎবাসী সবে
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা ॥
গভীর হুঙ্কারে হুঙ্কারি দেরে ডাক
শিহরি উঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক!

www.pathagar.com

আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভূমি,
দেবগন আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা ॥
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার ।
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী-মা আমার ॥
জগত লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা ॥

৩
তাল : দাদ্‌রা
অতীত গিয়াছে অতীতের লাগি
সমুখে মহাভবিষ্যত
আলোকে পুলকে জ্ঞানে ও পূণ্যে
নিত্য যেন সে
শাসন যাহার অস্ত্র নহে এমনি কেবল মন্ত্র
জাগিয়া উঠিবে তাহার ছুয়ায় নূতন সূর্য্যচন্দ্র
তাহার শাসনে আত্মাদানে
দেখাইবে মহা মুক্তির পথ ॥
এক মন্ত্রে দিক্ষিত হয়ে লভিয়া নূতন প্রাণ
সবার সূত্রে হইবে মিলিত হিন্দু মুসলমান ॥
কামনা হইবে মুর্তিমতি আশা হবে ফলবতি
গিয়াছে সেদিন আসিবে সুদিন
কর সবে তাই দণ্ডবত ॥

৪
তাল : ঝুমুর
বান এসছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও ।
তোমরা এখনো ঘুমাও ।
গত যুগ গেছে কেটে দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর বলে ধর বৈঠা
জীবন মরণ পণ ॥
দমকা হাওয়ার কাল গিয়াছে
ফাগুন বইছে পাল খাটাও ॥

অবহেলে থাকলে বসে কাঁদিতে হবে সারা জীবন;
যুগ যুগান্তের তপস্যাতে, মিলছে এমন লগন ।
পারের মাঝি হাল ধরেছে
মিছে পরের মুখ তাকাও ॥

www.pathagar.com

৫

তাল : কাহারবা

এখনো খোলেনি আখি যার,
আমি কি দিয়ে বুঝাব তারে,
কোন্ কর্ম সাধিবারে,
জনম লভিনু কোলে 'ভারত মাতার' ॥
যদি কারো ভাগ্যগুণে, একটুখানি খোলে আঁখি
তখনি আমরা তারে চশমা দিয়ে ঢেকে রাখি।
আসমানেতে বেধে ঘর, ভাবি মোরা কতই বড়,
পরে মোরা পেটের দায়ে ধরা দেখি অন্ধকার ॥
বিএ.এম.এ পাশ করে নকরি যদি নাহি মিলে,
ভবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাও না চাষার দলে
খেটে পড়ে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর
দেখতে পাবি দুদিন পরে ঘুচে গেছে হাহাকার ॥
মুকুন্দ বলিছে কেন কাঁঙ্গাল সেজেছ আজ
তোমরাই পার নাকি পরিতে বীরের সাজ।
দেখাতে পার নাকি বোঝাতে পার নাকি
এ জগতে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার ॥

৬

তাল : ঝুমুর

সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের যোগার কর,
তোরা পেটের যোগার কর্ ॥
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ
কষে লাঙ্গল ধর॥
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলেদে তাঁতের মেলা, প্রতি ঘর ঘর ॥
কামার, কুমার, চামার, মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর্ ছড়িয়ে গলা তাদের
ভুল আপন পর ॥
এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোস করে–
তোদের কথা ভাবলে আসে
কম্প দিয়ে জ্বর ॥

www.pathagar.com

৭

তাল : ঝুমুর

ঘোর কলি কাল যা দেখি সব উল্টা তোর।
নইলে মা করবেন দাসী পনা,
গিন্নি উঠছেন, মাথার' পর ॥
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ
সবে খুঁজ পরের দোষ।
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর
যে জন সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যা যার পরম সম্পদ;
সে নয় দোষী, তার উচ্চপদ
যে না খায় সে মদখোর ॥
সদা অসৎ এর আদর,
সৎ এর হচ্ছে অনাদর।
বেদ কোরাণ ফক্কিকারি
(বাবুরা) নভেল পড়ে প্রেমে ভোর,
দেখে শুনে ভবের ভাব
মুকুন্দের পুরিল অভাব।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখিয়ে,
ভাঙ্গলো আমার ঘুমের ঘোর ॥

৮

তাল : কাহারবা

করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরা শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চলিব সবার পিছে
সহিব শত অপমান ॥
জেগেছে জগতে সবে, বসে নাই কেউ নীরবে
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেবোনা হীন, ধনী মানী দুঃখী দীন
রাজা প্রাজা সকলি সমান।
সে সুরে সুর মিলায়ে করম পতাকা লয়ে,
দলে দলে হওরে আগুয়ান।
দ্বেষ হিংসা পায়ে দলে, আয় ছুটে আয় চলে
চল্লিশ কোটি হিন্দু মুসলমান ॥
মরণ সাগর পার, যেতে হবে সবাকার

www.pathagar.com

' দিন গেল বেলা অবসান
তরী বুঝি ছেড়ে যায়, উঠে পড় খেয়া নায়
ভয় নাই মাঝি ভগবাগ ।

৯
তাল : ঝুমুর
বাবুদের পায়ে নমস্কার
দেখ ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভালো-মন্দের নাই বিচার ॥
কলিতে বউ হয়েছে রং এর বিবি স্বামী মানেনা
শাশুড়ি হন মরণা মাগী স্বামী খানসামা
বাপকে বলে "মাইডিয়ার"
ছোট খাটো চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী
যুবক বন্ধুর চোখে চশমা এই দুঃখে মরি ।
বাবুরা স্ফূর্তি করে বেড়ান ঘুরে
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাড় ॥

১০
তাল : কাহারবা
রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটি রাখজী ।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী ॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন করজী,
দুভায়েতে দুঘর বেধে,
করি একই দেশেতে বসতি ॥
টাকায় ছিল আট মন চাউল ভাই,
এখন বিকায় পোয়া পশারি,
এর পরেতে হতে হবে,
গাছের তলায় বসতি ।

১১
আত্মগৌরব হারালে;
এখনো সময় আছে,
বসে যারে গভীর ধ্যানে,
ডেকে ডেকে কেদে কেদে

www.pathagar.com

বাধ্য কর সে ভগবানে;
পূণঃ যদি তা পারিস হতে,
তবেই দেখবি এ ভরতে
বইবে আবার উল্ট স্রোত,
ভাসিবি সুখের হিল্লোলে ॥
যাওনা পূণঃ পুরু গৃহে,
ধরণা ব্রহ্মচারীর বেশ,
কর উচ্চ বেদধ্বনি,
শ্যাম গানে জাগাও না দেশ;
হওনা পূণঃ সর্ব্বত্যাগী,
রওনা জগত মঙ্গল ॥
পুন যদি সাধনাতে
একটা ব্রাহ্মণ হতে পার,
(তবে) কার্যক্ষেত্রে মায়ের নামে,
এ জগতে মাতাতে পারো,
তবেই যাবে এ দুর্গতি,
নৈলেরে ভাই অধোগতি;
এতেই ডুবে যাবেরে ভাই,
মোহ সিন্ধুর অতল জলে ॥

১২
বাউল সুর ।
এসেছে লেংঠা যাইবে লেংঠা,
মাঝ খানে কেন গণ্ডগোল ।
কেউ ডাকে কাকা, কেউ ডাকে বাবা,
কেউ বলে ভাই, আবল তাবল ॥
জননী জঠরে দশ মাস ছিলি,
ভূমিষ্ঠ হইয়ে মা ডাক শিখিলি,
করি স্তন পান, জীবন বাঁচিলি,
এখন ভুলে গেলি, সে মা মা বোল ॥
মণি মুক্তা আদি, ধন অগণিত
বোকা তুমি তাই, যতন কর এত;
মিছে ধন আশায় হয়ে বিচলিত,
টাকা টাকা টাকা করছে রোল ॥
ভাই বন্ধু আদি, পরিজন যত,
শেষের সাথি, এরা কেউ নয়রে তো;
কালী কালী কালী, বল অবিরত,

www.pathagar.com

যদি অন্তে পেতে চাস মায়েরি কোল ॥
স্বর্গীয় বলরাম ঠাকুর ।

১৩
বাউল–তাল ঝুলন ।
মনের মানুষ ধর লে হয়,
কেন ধামেতে রয় ।
চতুদ্দলে আর দ্বিদলে মন,
তাঁর সদাই গতাগতি হয় ॥
পেতেছে এক মজার কল,
কি কল কে জানে ।
সদাই চলে উল্টা কলে মন,
সহস্রারে স্থিতি হয় ॥
সে সাকার কিম্বা নিরাকার,
কে দেখেছে স্বরূপ তাঁর,
স্বরূপ কিমাকার ।
কর লে বিচার সব একাকার মন,
মূকুন্দ শ্রীগুরুই সর্ব্বমূলাশ্রয় ॥

১৪
ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে ॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সংগে ।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বংগে ॥
সাজরে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ ।
লইয়ে কৃপাণ হওরে আগুয়ান,
নিতে হয় মূকুন্দের নিওরে সংগে ॥

১৫
জাত গেছে সে জাতির–
যারা প্রাণ দেখেনা বিচার করে,
দেখে কেবল বাহির ॥
ধর্ম্ম যাদের লুকিয়েছে ভাতের হাঁড়ির মাঝে,
সাধুতা যার কপটতা, ভক্ত কেবল সাজে ।

www.pathagar.com

অর্থে মাপে মনুষত্ব, কর্ম্ম কেবল নাম জাহির ॥
মুখ বাজিতে বেজায় বড় ভক্তি চোখের জলে;
কাজের বেলায় দে পগার পার, থলিতে হাত পলে,
বন্ধু কেবল পাবার বেলায় দেবার বেলা নাই খাতির ॥

১৬
স্বরাজ সেদিন মিলিবে যে দিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান ॥
দেবতার আশীষ বষিবে সেদিন,
অজস্র ধায়ায় মাথার উপর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলীয়ান–
শক্তিতে হবি শক্তিমান ॥

কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে,
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান।
মা মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি,
ভারতের নর নারী–
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান;
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের,
তখনি হইবে মুর্তিমান ॥

১৭
বিএ.এমএ.পাশ করে নকরি যদি নাহি মিলে,
ভাবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাওনা চাষার দরে।
খেটে পড়ে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর–
দেখতে পাবি দুদিন পরে ঘুচে গেছে হাহাকার ॥
মুকুন্দ বলিছে কেন কাঙ্গাল সেজেছে আজ,
তোমারই পার নাকি পরিতে বীরের সাজ।
দেখাতে পার নাকি বোঝাতে পার নাকি,
এ জগতে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার ॥

www.pathagar.com

১৮

আয়রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী,
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে ॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।
এখন নীরবে নাই কিরে লাজ!
ধিকরে তোদের ক্ষাত্র তেজে ॥
কোটি কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া;
দাঁড়ারে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,
সাজাই বাংলা নূতন সাজে ॥
মাভৈঃ, ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর,
কতকাল রবি নত করি শির–
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,
অনাহত শব্দ ভেরীর মাঝে ॥

নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে মুকুন্দ দাসের গান
পরিবেশন করছেন প্রখ্যাত শিল্পী
অ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ দাশমুন্সী

www.pathagar.com

১০. আবদুল লতিফ-এর গান

১
অকুল গাঙে ভাটির তরী
কে যাও তুমি বাইয়া
আমার বাজানের আগে
খবর কইও যাইয়া ॥
পরের ঘরে দিয়া বাজান
খবর না কইরাছে
আদরের ময়না তাহার
আছে না মইরাছে,
আমার কেন্দে কেন্দে জনম গেল
পন্থের পানে চাইয়া ॥
সতীনের জ্বালায় জ্বলি
পতি হইছে পর,
এই দুনিয়ায় কেউ নাই আমার
দুক্কের দোসর ।
মায়ের আগে কইও আমার
দুক্কের খবর
ভাই আসিয়া দেখবে নইলে
অভাগীর কবর
জুড়াবো দুক্কের জ্বালা
বিষের বড়ি খাইয়া ॥

২
অচিন দেশের অচিন পাখী
চিরদিন না রয় খাঁচায়
হুকুমেতে আসে পাখী
তলবেতে চলে যায় ॥

একদমেতে আসে পাখী
আর এক দমে যায় সে পাখী
দম ফুরালে দিয়ে ফাঁকি
যার পাখী তার কাছে যায় ॥
ভাবে মানুষ পোষা পাখী,
আমার পোষা পাখী,
আসল কথা পাখী খাঁচা
আমার ভাবাই ফাঁকি ॥

www.pathagar.com

মনরে আমার বুদ্ধিনাশ,
করিস না ওই পাখীর আশা,
পাখী বড় নিঠুর পাখী
মায়ার বাঁধন কেটে যায় ॥

৩
আইলো দ্যাওয়া নিশালে,
মাঠে ঘাটে নামলো পানির ঢল ।
ঐ ঝিলে বিলে ঢেউ খেলেরে
ছলাৎ ছলাৎ ছল ॥
কালা কালা ম্যাঘে ম্যাঘে
আকাশ গ্যাশে ছাইয়া,
ব্যাঙ্গা নাচে বেঙ্গী নাচে
নতুন পানি পাইয়া,
ওই ম্যাঘের ফাঁকে বিজলী খেলে
চমকে বুকের তল ॥
আহারে এমন দিনে রাখাল বন্ধু নাইরে কাছাকাছি
ইচ্ছা করে ময়ূর হইয়া পেখম তুইলা নাচি ।
ধানের ক্ষেতে কোড়া ডাকে
ডহুক ক্ষণে ক্ষণে,
ঝিলে ফোটে শাপলা শালুক
কদম কেয়া বনে
একলা ঘরে কোন রমণীর
ঝরে চোখের জল ॥

৪
আমি যখন যাইতেছিলাম নৌকা খানা বাইয়া
জল ভরিতে দেখছিলাম এক
চাষীর কালো মাইয়া ॥
কালা মেঘের মতই কন্যার
দীঘল মাথার কেশ
সারা জনম কইলে কন্যার
রূপের না হয় শেষ
আমি ভুইলাছিলাম দুঃখ আমার
তারে ঘরে পাইয়া ॥
হায়রে আমার প্রাণের ময়না
খাঁচার তোতা পাখি,

www.pathagar.com

দুইদিনেরই জ্বরে আমায়
দিয়া গেল ফাঁকি ।
তারে যেদিন থুইয়া আইলাম
আমতলার ওই গোরে
সেদিন থেকেই ভাবছি বিধি
নেয় না কেন মোরে
আমার দুখের অশ্রু ঝইরা পড়ে
বুকের তলা বাইয়া ॥

৫
আমি মইজাছি মইজাছি রাঙা
মুখের হাসিতে
আগের মত সূর বাজেনা
তাইতো পোড়া বাঁশীতে ॥
তার হাসি মোরে গুণ কইরাছে
আর বাঁশিতে মোর ঘূণ ধইরাছে
তারে যতই দেখি চায় যে পরাণ
ততই ভালোবাসিতে ॥
আছো কি কেউ এমন গুণিন
জানো না কি গোনা,
আমারে কইরাছে কন্যা
কেমন যাদু টোনা ।
আমার বন্ধ হইছে নাওয়া-খাওয়া
এই রোগের কি আছে দাওয়া,
আমার সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটে
নয়নজলে ভাসিতে ॥

৭.
মোরা বরিশালইয়া পোলা
মোরাই ভরি বালাম চাউলে
বাংলাদেশের গোলা ।
কি কমু দশজনের কাছে
কওয়ার মতো কিইবা আছে,
দুধে ধোয়া বুক আমাগো
মন ডাও যে খোলা ॥
গাংগে মোগো কুমইর থাহে
বাঘ থাহে জংগলে,

www.pathagar.com

তাগো লগে লড়ই করাইয়া
থাহি সককলে ।
আইলে গোকী তুফান জড়ি
নেত্য তাগো সঙ্গে লড়ি
মোরা সাগর জলে তেমনি ভাসি
যেমন ভাসে হোলা ।

৮
ম্যাবাই, মাজাই, হাজাই বিয়া
করছে তেনোজন
আমার বিয়ার কতায় হ্যারা
কয়না কেউ কহন ॥
পিডা মিডা খাইতে হ্যারা হউর বাড়িতে যায়
মুই ঘরে এ্যালহাডা থাহি চৌহে না ঘুম আয়
হউর বাড়িতে যাইতেও যে আমারও চায় মন ॥

হ্যারা যে খায় আমে দুধে মোরে বাড়ু তে থুই
মুই অভাইগ্যা হুগ না হুগ না আমের আঁডি চুই
কাহাতাক আর সওন যায় কয়েন, এই যে জ্বালাতন ॥
বায়বার আইয়া কয় ম্যাভাইরে দেরি করেন কিয়া
ছোডো মেয়ে ডাঙ্গর হইছে দেওয়া লাগে বিয়া
ভাইরা হেই রায়বারের কতায় কান দেয়না কখন ॥
ভাইরা আমার দিগে না চায়রে ফিরিয়া
ধরিয়া একটা মাতারি রে করিয়া লমু বিয়া
মন্দ ছোন্দ কইয়েন না কেউ আপনারা দশজনা ॥

৯
মোগো বাড়ি না হোল মিডা
হুড়ুম চিড়া খই ॥
হুনাইয়া রাহো কতা খাঁডি,
বইতে দিমু হোগলা পাডি,
তালের পাহায় বাতাস দিমু
সত্য কথা কই ॥
ফুল সুপারী কাডিয়া দিমু
খিল হি করা পান,
ওই পানের রসে রাঙা করইয়া
লবা চান মুখখানা

www.pathagar.com

নানান রহম খাবা পিডা
দুধ বাতাস আউহি মিডা,
সঙ্গে দিমু হবরি ক্যালা
মইষা দুধের দই ॥

১০
ম্যা বাইজানের ছোডো হালী
বড়ই সুন্দরী ।
হ্যারেই আমি হরমু বিয়া
বিয়া যদি হরি ॥
বেয়ান মোরে আদর করাইয়া
পান দেয় আমার মুহে ভরইয়া
বেয়াইন আমার মানুষ না য্যান
পাহা কাডা পরী ॥
বেয়াইন মোর হাসে যহন
ঝকমক করে দাঁত,
খঞ্জন পককীর নাহান পাও তার
তুলার মত আত ।
মনের কতা কমু কারে,
না পাই বুঝি বেয়াইনডারে
হেইলে আমার মরতে অইবে,
গলায় দিয়া দরি ॥

১১
যখন আমার হইব রে শেষ বিয়া
মোরে গরম জলে গোসল দিও
বরই পাতা দিয়া ॥
সাদা বসন পিন্দাইও
আতর গোলাপ মাখাইও
মোরে লইয়া যাইও বন্ধুর বাড়ি
সবাই কান্দে নিয়া ॥

শোয়াইও মুখ থাকে য্যান
কেবলা মুখী মোর,
পয়লা চাওয়ায় বন্ধুর সনে
হয় য্যান শা-নজর ।
উত্তর শিয়রি করে

www.pathagar.com

শোয়াইও মোর বাসর ঘরে
মোর শেষ করিও সবাই
কলেমা পড়িয়া ॥

১২
যা রে যা চিঠি লেইখা দিলাম সোনা বন্ধের নামে রে
আমার অন্তরেরই প্রেম ভরিয়া ভালোবাসার খামে রে ॥
চিঠি রে তুই পঙ্খী হ পলকেতে উইড়া যা
বলিস আমার সোনা বন্ধের আগে রে
বন্ধু আমার প্রাণের প্রাণ বন্ধু আমার সোনার চাঁন।
সে বিনে মোর মন বসেনা একলা ঘরের কামে রে ॥
একলা শুইয়া থাকি স্বপনে তোমারে দেখি
ঘুম আসেনা একলা বিছানাতে রে
একে তো যৈবনের জ্বালা তাতে নাই প্রাণ চিকন কালা
চোখের জলে বালিশ ভেজা বিছান ভেজে ঘামে রে ॥
সবার পতি ঘরে রয় রঙ্গ রসে কথা কয়
কত সুখে কাটায় তারা রাতি রে
আমার সাধের যৈবন বইয়া যায় বন্ধু গো তোমার আশায়
ডাইনের কপাল ভেঙ্গে আমার গেলো বুঝি বামে রে ॥
এত নিঠুর কেমনে হও চিঠি পত্র নাহি দাও
লওনা খবর আছি না মইরাছি রে
ঘিরতো মধু দুধের সর তুইলা রাখছি সিঁকার পর
আইসো তুমি খাইবা বন্ধু বসিয়া বিরামে রে ॥
কুইটা চিড়া ভাইজা খই রাইখা দিছি পাইতা দই
বানাইয়া রাখছি মুড়ির মোয়া রে
আমার পাশে তোমার বসাইমু আশা মিটাইয়া খাওয়াইমু
নিজের হাতে মাইখা দিমু খাইবা দুধে আমে রে ॥
যখন তুমি আইবা বাড়ি আইনো একখানা ডাকাই শাড়ি
রেশমী চুড়ি আরও ফুকের দানা রে
নাকের নোলক কানের দুল রাঙ্গা ফিতা খোঁপার ফুল
আয়না কাঁকুই আলতা সাবান আইনো অল্প দামে রে ॥

১৩
বরিশালে জন্ম আমার
গর্ব্ব করি হেই জন্য কেউ না জানুক মুই তো জানি
আমি অতি নগন্য ॥
যেই নামেতে আমি নামী

www.pathagar.com

যার দামেতে আমি দামী
হেই নাম হইলো শেরে বাংলা
বিশ্বে যে নাম অনন্য ॥
বরিশালইয়া ইলশা মাছ আর
বরিশালইয়া বালাম চাউল,
প্যাডে পড়ছে বলইয়াই আমার
মনে কোনও নাইরে আউল ।
মোগে বরিশালের মাডি
হেজে সুহের শীতল পাডি
হেই মাডিতে জন্ম লইয়া
হইছি যে আমি ধন্য ॥

১৪
শেরে বাংলার দেশের মানুষ
মোগো বাড়ি বরিশাল
বাংলার মানুষ যারে লইয়া
গৌরব করবে চিরকাল ॥
বাংলাদেশের দক্ষিণ ধারে
থাহি মোরা সাগর পারে
সেই সাগর দর ইয়া দেই যে পাড়ি
শক্ত হাতে ধর ইয়া হাল ॥
বাঙ্গালী গো ঘুম ভাঙ্গাইতে
মরা গাঙে আনতে বান,
বরিশালইয়া চারণ কবি
মুকুন্দ দাস গাইছে গান ॥
হারা বাংলার মানসে যে কয়
হেই কথা তো নয় মিছা নয়
বাংলার অকসফোর্ড শষ্য ভাণ্ডার
মোগো দ্যাশ হেই বরিশাল ॥

১৫
হলদি গিলা সোন্দা মেথি আনো গো কুটিয়া;
জলদি কইরা মেন্দি আনো যতনে বাটয়া,
লোপাড়ার লোক আইজকা ময়নামতির বিয়া ॥
পরথমেতে ময়নামতি হলুদ মাখে গায়,
হলুদ বরণ অঙ্গ তাতে আরও হলুদ হয়
তারপরেতে সোনার ময়না নদীল ঘাটে গিয়া,

www.pathagar.com

সখীগণের সংগে আইলো সিনান করিয়া ॥
গোসল করিয়া ময়না আলতা দিল পায়,
রাঙা পায়ে আলতা কন্যার বড় শোভা পায়,
কালো চোখে দিল কাজল বাটুরা খুলিয়া
চন্দনেরি ফোঁটা দিল কপালে তুলিয়া ।
ময়নামতি সাজন করে ফিতায় বান্ধে বেণী;
পিঠের উপর পইড়া ঘুমায় যেন কালো ফণী;
সাজন করে বিয়ার কন্যা হাঁসলী গলায় দিয়
নাকের নোলক কানে দিল চম্পা ফুল আনিয়া ॥
সাজন করে ময়নামতি মেন্দি দিয়া হাতে
চান সুরুজের টিকলি ময়না তুইলা দিল মাথে,
সোনার হাতে বেলোয়ারী চুড়ি যে পিন্দিয়া,
কোমরেতে রূপার বিছা নিলো যে ঘিরিয়া ॥
সবার শেষে পরল ময়না বিয়ায় রাঙা শাড়ি,
রূপ দেখিয়া লাগে যেমন ডানাকাটা পরী,
গায় সখীরা বিয়ার গানা হেলিয়া দুলিয়া,
ময়নামতি বইলো এবার ঘোমটা মুড়ি দিয়া ॥

১৬
হাউসের সোয়ামী সোয়ামী
বাপের বাড়ি নাইওর যাব
যাইবার দিবনি ॥
বাপের মায়ে যাবার লাগি
দিছে মাথার কিরা
আজকা যাব প্রাণের বন্ধু
কাইল আসিব ফিরা
একটা রাতি একলা রইবা
ক্ষতি হইবো কি ॥
ঘুম যদি না আসে বন্ধু
একলা নিশি রাতে,
রাইখা গেলাম মায়ার কাজল
দিও নয়ন পাতে ।
দাদা, দাদী, নানা, নানী
আইজ আছে কাইল নাই
পন্থের পানে চাইয়া রইছে
প্রাণের সোদর ভাই
চোখের দেখা না দেখিলে
লোকে বলবে কি ॥

www.pathagar.com

১৭
রূপবতী কন্যা আমার বিয়ার সাজন সাজে ও কমলা রে,
আইছে দামান তাই তো সানাই বাজে ॥
নাকে নোলক কানে দুল, খোঁপায় গন্ধরাজের ফুল,
আহারে, গলায় দিছে গজমতির মালা,
সিঁথায় শোভে সিঁথী পাটি সাধের বেণী বাইন্ধাছে ॥
মেন্দী বাটা হাতে, বেলোয়ারী চুড়ি তাতে,
আহারে, ঠুনঠুনাঠন মিঠা মিঠা বাজে,
রূপ দেখিয়া চন্দ্র সুরুজ মেঘের আড়ে লুকইয়াছে ॥
রাঙা রাঙা আলতা পায়, ঝুমঝুমি মল শোভ তায়,
আহারে, কোমরতে রূপার বিছা দিছে,
পইরা নতুন পাটের শাড়ি বইসাছে সবার মাঝে ॥
এ্যাকে তো নয়ন বাঁকা, তাহতে সুরমা আঁকা,
আহারে, সোহাগী টিপ কপালে দিয়াছে,
সেই জনা মইজাছে, কন্যা যাহার পানে তাকাইছে ॥

১১. জারি গান

আবদুল জলিল বয়াতির আসমান সিংয়ের জারি গান
আমি প্রথমে বিছমিল্লাহ বলে জারি করলাম শুরু
অনাথের নাথ আল্লাহ দোয়া কর গুরু ।
এসব কথা বলতে সময় হবে অনেক ক্ষণ
আসমান সিং এর ফাঁসির জারি করতেছি বর্ণনা
বরিশালের ইতিহাস জানবে বাংলাবাস
কি কারণে হইয়্যাছিল আসমান সিং এর ফাঁসি
হিংগুলি সিং এর দুই পুত্র দলসিং আর আসমান
আসমান সিং এর শিক্ষার জন্য পাঠশালায় পাঠান
আসমান সিং এর পিতা হিংগুলি মারা গেল ।
শিশু আসমান ঘুমের ঘড়ে স্বপ্নেতে দেখিল
স্বপ্নে দেখে গুরুর কাছে আসমান বিদায় চায়
বিদায়ের বদলে গুরু তাকে এই অভিশাপ দেয়
ফাঁসিতে তোর মৃত্যু হউক দিলাম অভিশাপ
বাড়ি গিয়া দেখে আসমান মারা গেছে বাপ
পিতার মৃত্যুর পরে আসমান যখন বড় হয়
ঘটক এসে আসমানের বিয়ার কথা কথা কয়
দুর্গা নামে পাত্রী আছে সারদল সিং এর মেয়ে
দিন তারিখ দেখিয়া আসমান তারে করল বিয়ে

www.pathagar.com

সুভক্ষণে আসমান দুর্গার হইল মিলন
দশ মাস দশদিন পুরা হইল যখন
দুর্গার কোল জুরে একটি কন্যা সন্তান হয়
নীর মনি তার নাম রাখিল কন্যার বাবা মায়
পুলিশ বাহিনীতে আসমান চাকুরী পাইল
দুর্গার কাছে আসমান সিং বিদায়ও চাহিল ।
দুর্গা বলে বার মাসে চাকরিতে গেলে
অন্য নারী প্রেমে পরে আমায় যাবে ভুলে ।
আসমান বলে ছিঃ ছিঃ দুর্গা ও কথা বলনা ।
আমি তোমায় ভুলিবনা তুমিও ভুইলনা
দুর্গার কাছে বলে আসমান বিদায়ও পাইল
বিদায় নিয়া বরিশালে চাকরিতে গেল
হঠাৎ একরাত্রীতে আসমান চিল পাহারায়
লক্ষ্মী নামের এক পতিতা চিৎকার দিয়া কয়
বাঁচাও বলে লক্ষ্মী যখন চিৎকার দেয়
সরল মনে আসমান সিং লক্ষ্মীর কাছে যায়
আসমান সিং এর রুপে দুর্গা দেওয়ানা হইল ।

আবদুল জলিল বয়াতি

রংগে ঢংগে নানান কথা কহিতে লাগিল
ছলনায় ভুলিয়া আসমান লক্ষ্মীর বাসায়

www.pathagar.com

আসমান সিং না যেন লক্ষ্মী আসমানের চান পায়
আসমান সিংকে পাইয়া লক্ষ্মী হল আত্মহারা
লক্ষ্মীর প্রেমে আসমান সিংও হইল প্রেমের মরা
কার্তিক মাসে কুত্তা পাগল কিসের বেদ বিধান
তেমনিভাবে পাগল হইল লক্ষ্মী আর আসমান
দুর্গার কতা আসমান সিং ভুলিয়া রহিল
পতী পতী বলে দুর্গা কান্দিতে লাগিল
হায়রে পতী আমার ক্ষতি করল কোনবা নারী
কোন নারীর ছলনায় পইরা আসনা আর রাজী
আসমান সিং এর বন্ধু ছিল আফসার চৌকিদার
দুর্গা আর নীল মনির নিল দেখা শুনার ভার
দুর্গা ডাকতো আফসার ভাই, আফসার ডাকত কেন
আফসার বলে দুর্গা কেন শান্ত রাখ মন
খোদা নেওয়াজ খানামে আমিরা বাদ বাড়ি
খোদা নেওয়াজ করত কুকাজ খুঁজত পরের নারী
জল ভরিয়া দুর্গা এক দিন বাড়ির দিকে যায়
লম্পট খোদা নেওয়াজ দুর্গার সম্মুখে দাঁড়ায়
দুর্গাকে ধরিয়া নেওয়াজ টানাটানি করে
আফসার চৌকিদার নেওয়াজের মাথায় বাড়ি মারে
দুর্গা বোনকে আফসার তখন বাড়ি নিয়া যায়
আসমান সিং এর কথা এবার কিছু বলতে হয়
লক্ষ্মী নামের সেই পতিতা করল এমন ফন্দি
মদ মাতাল বানাইয়া করল আসমান সিংকে বন্দি
স্ত্রী কন্যার কথা ভুলে যায় আসমান
প্রতিশোধ নিতে আসিল খোদা নেওয়াজ খান
দুর্গার ঘরের দিকে দিল খোদা নেওয়াজ পাড়া
আফসার চৌকিদার আছিল ঐ রাত্রে পাহারা
আফসার চৌকিদার তারে দিল তাড়াইয়া
খোদা নেওয়াজ রেহাই পাইল খুব জোড়ে দৌড়াইয়া
স্বামীর শোকে দুর্গা যখন কান্দিয়া কাটায়
খোদা নেওয়াজ এদিকে এক কুটনীকে পাঠায়
কুটনিবুড়ি দুর্গাকে চুপে বলে
খোদা নেওয়াজ খায়ের ঘরে তুমি আস চলে
আফসার চৌকিদার কুটনিকে দিছে এমন মাইর
মাইর খাইয়া কুটনিক গেল দুর্গার ঘরের বাইর
আফসার ভাইকে বলে দুর্গা আসে বরিশালে
বরিশাল আসিয়া নৌকা ভিড়ায় ভাটার খালে

www.pathagar.com

লক্ষ্মীর ঘড়ে শুইয়া আসমান ফস্টিনস্টি করে
দুর্গা আইসা ঢুকল হঠাৎ লক্ষ্মী বেশ্যার ঘরে
মদে উন্মত্ত আসমান চিনেনা দুর্গাকে
গালাগালি করে আসমান তাড়াইয়া দেয় তাকে
কিল, ঘুঁসি, থাপ্পর, চোপর মারে দুর্গার গালে
মাইর খাইয়া নৌকায় চরে যাইয়া ভাটার খালে
বাড়ি আইসা আফসার ভাইকে বরিশাল পাঠায়
এই সুযোগে খোদা নেওয়াজ দুর্গার কাছে যায়
জোরপূর্বক দুর্গাকে ধরে নিয়া যায়
সতীত্ত কাড়িয়া নিল খোদা নেওয়াজ খায়
আসমান সিং এর কাছে আইল আফসার চৌকিদার
বাড়ি আসার জন্য তাকে বুঝাইল বারবার
আফসার আসিয়া যখন আমিরাবাদ যায়
খোদা নেওয়াজ খার কাণ্ড সবই শোনতে পায়
খোদা নেওয়াজের সাথে দুর্গার বিয়া হয়
খোদা নেওয়াজের ওরসে একটি কন্যা হয়
আফসার চৌকিদার আবার বরিশাল আসিল
আসমান সিং এর কাছে সবই বলিতে লাগিল
খোদা নেওয়াজের সাথে দুর্গার বিয়া হয়
সেই খানেও দুর্গার আর এক কন্যা সন্তান হয়
যাও যাও আসমান তুমি জলদি বাড়ি যাও
বাড়ি যাইয়া নতুন মাইয়ার মুখ দেখিয়া লও
তোমার নীল মনিকে নেওয়াজ কথায় মারে
আসমান সিং এর কাছে বলল আফসার চৌকিদারে
এই কথা শুনিয়া আসমান রয়না বরিশালে
প্রতিশোধ লইব আমি যা আছে কপালে
খোদা নেওয়াজ দুর্গা দিল এক ঘরে ঘুমাইয়া
তার পাশে নীলমনিও আছিল শুইয়া
গভীর রাতে আসমান সিং বাড়ি চলে যায়
দুর্গা দুর্গা বলে আসমান দুয়ার খোলতে কয়
আসমান সিং এর গলার আওয়াজ নেওয়াজ বুঝতে পায়
দুর্গা অমনি ঘরে বাতি নিভাইয়া দেয়
দর্জা খোল দুর্গা আসমান কহিল হাঁকিয়া
লাথি মেরে দরজা আসমান ফেলিল ভাংগিয়া
অন্ধকারে ছোরা হাতে ঘরেতে উঠিল
কোথায় কলংকিনি বইলা জোরে কোপ ছাড়িল
খোদা নেওয়াজ দুর্গা তাতে রেহাই পাইয়া যায়

www.pathagar.com

পিতার ছোড়ার কোপ লাগিল নীল মণির গলায়
পিতা হইয়া ছুরি মারলাম নিজের কন্যার বুকে
কত রকম কান্দে আসমান নীল মনিরও শোকে
কন্যার শোকে আসমান সিং বিলাপ করে কান্দে
থানা পুলিশ আইসা অমনি আসমান সিংকে বান্ধে
পুলিশে ধরিয়া কোর্টে চালান দেয়
নিজের কন্যার খুনের কথা সবই স্বীকার পায়
বিচারের দিন সব সাক্ষী প্রমাণ লইয়া
শিশু হত্যার দায় আসমান গেল দুসি হইয়া
নিজের স্বীকারোক্তি মতো হইল আসমান দোষী
বিচারকে রায় দিল আসমান সিং এর ফাঁসি
বিচারক জাস্টিস সিং ছিলেন আসমান সিং এর ভাই
স্বীকারোক্তি মতে দোসী করার কিছু নাই ।
ভাই হইয়া ভাইয়ের ফাঁসি দেখিব কেমনে
এই কথা যাষ্টিক সিং ভাবে মনে মনে
উচ্চ আদালতে ভাই করিল আপিল
নিম্নকোর্টের কাগজপত্র করিল দাখিল
উচ্চ আদালতে আসমান খালাস পাইয়া যায়
ফাঁসির হুকুম মওকুফ হইল বিচারপতির রায়
ফাঁসির হুকুম মওকুফের কাগজপত্র নিয়া
জাস্টিস সিং নিম্ন কোর্টে আসিল চলিয়া
নিম্নকোর্টের রায় জলদি কার্যকর করিতে
আসমান সিংকে ঝুলাইল ফাঁসিরও দঁড়িতে
দূর হইতে জাস্টিস সিং দেখিবারে পান
ফাঁসির রজ্জু গলে পরা জোরের বাই আছমান
থাম জল্লাদ ২ ডাক দেয় ফটিক সিং
ফাঁসির দড়ি টান দেওয়ায় বেজে উঠল রিং
যেই মুহূর্তে যাষ্টিক সিং দৌড়াইয়া আসিল
সেই মুহূর্তে আসমান সিং এর ফাঁসি হইয়া গেল
নিজের কলম দিয়া দিলাম জোরের ভাইকে ফাঁসি
জোরের ভাইকে হারাইয়া আখী জলে ভাসি
যেমন কর্ম তেমন ফল আসমানের কপালে
তাই বুঝিয়া কর্ম কর জলিল মিয়া বলে,

বরিশালের জারি

আমি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে জারি করলাম শুরু
অনাথের ও নাথা গো আল্লা দোয়া কর গুরু

www.pathagar.com

এ সব বলতে সময় হবে অনেক ক্ষণ
বরিশালের শিল্পী আমরা জারি কবি গাই
জারি দলের পক্ষ হতে সালামও জানাই ওরে
সকল শিল্পীর পক্ষ হতে সালামও জানাই
ছালাম নিবেন সকল কর্মকর্তা কর্মচারী
রেখা জলিল গাইবো এখন বরিশালের জারি

সুর

ও ভাই নদীর দেশের মানুষ মোরা নদীরই গান গাই-২
বরিশালের অপর নাম চন্দ্রদীপ আছিল
তারপরে বাকেরগঞ্জ নামে উদয় হল
অমর হয়ে আছ তুমি আগা বাকেরখান
তোমার বুকে দিচ্ছ তুমি এই জেলার স্থান
তারপরে বরিশাল নামে পরিচয়
কীর্তনখোলা নদীর তীরে আসন পেতে রয়-ঐ
এই বৃহত্তর বরিশাল একদিন বিভাগ হয়ে যায়
বরগুনা আর পটুয়াখালী বঙ্গপোসাগর পায়
মেঘনা নদীর কোল জুড়িয়া দ্বীপ চর ভোলোা জেলা
ইলিশানদীতে দেখবেন ইলিশ মাছের খেলা
পায়রা বিষখালী নদী কচা বলেশ্বর
বলেশ্বর নদীর তীরে রয় পিরোজপুর শহর
ধানশিরি নদীতে শোভা করছে ঝালকাঠী
শিল্পী কবি সাহিত্যিক আর ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি
গাবখান নদী ঝালকাঠীর পশ্চিম দিকে রয়
বর্তমান সরকার নদীতে ব্রীজ করে দেয়-ঐ
ফলে ফুলে নদী খালে এই বরিশাল ঘেরা
পাল উড়াইয়া নাও বেয়ে যায় যত নাবিকেরা
ছিল গোয়ালে গরু পুকুরে মাছ গোলা ভরা ধান
চাষী ভাইরা মই জুরিয়া গাইতো সারি গান
বরিশালের তাল নারিকেল সুপারির বাগান
সবুজ পাতায় সাজাইয়াছে বাড়ই বরের পান
ইক্ষুর রস খেজুরের রস তালবাটালীর গুড়
বরিশালের ঘরে ঘরে পল্লী গানে সুর
সাগর, সবরী, কলা আরো আছে অনেক কিছু
বাবুগঞ্জের সুবিখ্যাত চান পয়সার কচু
বরিশালের ইলিশ মাছে সাধ মিটায় সব দেশে
সাধ মিটাইয়া আমরা খাইয়া অন্যকে দেই শেষে
জাতীয় মাছ ইলিশ মাছের সুমান বহু রয়

www.pathagar.com

মাছ ধরিতে যাইয়া কত জেলে মারা যায়-ঐ
সুর শোনেন ভাইরে ভাই আমরা সকলকে জানাই
আমড়া তেঁতুল ঘইয়া খাইতে বরিশালে যাই ।
আম, জাম, আমড়া, লিচু, কাঁঠাল আর গইয়া
ঝালকাঠীর গামছা ভালো কিছু যাবেন লইয়া
নলছিটির তেতুল শিল্প যদিও হয় টক
অরুচি আসিলে মুখে খাইতে বড় টক
বানারীপাড়ায় সুবিখ্যাত আছে বালাম চাউল
চাষী যদি নাহি জন্মায় দেশে লাগে আউল
পিছনেট পাপস কাতার দড়ি পাকায় মেয়েছেলে
বিশ্বাস না হয় দেখতে পারবেন স্বরুপকাঠী গেলে-ঐ
বরিশালের বর্তমানে খুবই হয় উন্নতি
বরিশাল বিভাগ হইল ছয়টি জেলার পতী
বরিশালের এই উন্নতি হয় কিসের কারণ
স্বাধীনতার সুফল ইহা শোনেন বন্ধুগণ
উজিরপুরে বরা কোঠায় মুক্তি যোদ্ধার ঘাঁটি
পশ্চিমা হানাদার কত দিচ্ছে চাপা মাটি-ঐ
সৌর্য্য বীর্যের প্রতীক সিপাহি মোস্তাফা কামাল
বীর শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের রক্তের বরিশাল
অমর একুশের গানটি যিনি লিখে যায়
আলতাফ মাহামুদের বাড়ি বরিশাল জেলায়
শেরে-ই-বাংলার জন্ম মোদের বরিশাল জেলায়
চাখার যাদুঘরে যাহার স্মৃতিগুলি রয়
খান বাহাদুর উপাধী পান হাসেম আলী খান
বিডি হাবিবুল্লা বাড়ায় বরিশালের মান-ঐ
প্রখ্যাত সাংবাদিক যার নাম মানিক মিয়া হয়
শিল্পী কবি সাহিত্যিক এই বরিশাল জেলায়
অশ্বিনী কুমার বাংলার ছিল দানবীর
যাহার দানে খুমি হইত ফকির মুসাফির
ব্রজমোহন দত্তের দান বিএম কলেজ রয়
সেই বি, এম কলেজ হইছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়-ঐ
লক্ষণদাস সার্কাসের আছে লক্ষ লক্ষ গুণ
বরিশালের সুনাম সারা দেশবাসী শুনুন
অমৃত লাল দানবীরের দিচ্ছি পরিচয়
অমৃত লাল দে নামে মহাবিদ্যালয়-ঐ
দেবন্দ্র নাথ নাম রাজা ছিল মাধপপাশা
রাণীর নামে দিঘি কেটে পুরায় মনের আশা

www.pathagar.com

দুর্গা রানীর নামে দিঘি দূর্গাসাগর নাম
আজিতক বিদ্যমান দিঘি মাধপপাশা গ্রাম
দেখার মত গজনীর দিঘি আছে দুর্গাপুর
গরিয়ার দিঘি বরিশালে আছে কাশীপুর
লালর দিঘির মতো দিঘি অন্য জেলা নাই
রূপাতলীর রূপালী মাছ ঐ দিঘিতে পাই-ঐ
শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
পরী ওলীর স্থান মোদের জেলা বরিশাল
কালুশাহ একিন শাহ আবেদ শাহের মাজার
লেচুশাহের মাজারে লোক যায় হাজারে হাজারে
ইয়ার উদ্দিন খলিফার মীর্জাগঞ্জ মাজারে
দিবা রাত্রী ভক্ত যায় হাজারে হাজারে
সৈয়দ এছাহাক মাওলানা ছিলেন চরমোনাই এর পির
কত যে সৌভাগ্য মোদের বরিশালবাসীর
শর্ষনার পির সাব কেবলার নেক দোয়ার আসায়
লক্ষ লক্ষ ভক্তগণে যার মজলিসে যায়
বিচারণে গান গাওয়া ছিল যার অভ্যাস
সেই কবির নাম চারণ কবি মুকুন্দ দাস-ঐ
বরিশালে দাওয়াত দিয়া যাই
রসের শিন্নি রসের পিঠা সকলকে খাওয়াইতে চাই।
কবি বেগম সুফিয়া কামাল
বেলায় যিনি ধরেছে হাল
কবি আহসান নাম থাকবে চিরকাল
কবি মোজ্জামেল হক ভোলোা বরিশাল
কামিনীরায় ছিল কবি বরিশাল জেলায়
সামছুদ্দিন আবুল কালাম সাহিত্যের পাতায়
রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস
ছন্দ বিহনে কভু ছাড়তনা নিশ্বাস
জারি সারি ভাটিয়ালী যাত্রা পল্লীগীতি
সারা বাংলায় গাথা মোদের বরিশালের স্মৃতি
বরিশালের বড় গৌরব আলাম আকুব্বর
কথায় বলে তারা জারি গানের মাতুব্বর
জারীর জন্ম বরিশালে জেগে ছিল খনি
জারি সম্রাট উপাধী পায় কবি আবদুল গণী-ঐ
খোরশেদ মতলেব হিগুলদ্দি ছিল নাগর মোল্লা
কলম মোনাছেফ দিত জারি গানের পাল্লা
সফিউদ্দি ফয়জদ্দি গাইত পুথি গান

www.pathagar.com

যাদের গানে খুমি হইত হিন্দু মুসলমান
আমজাদ খলিফার ছিল লাঠি খেলার দল
যার লাঠি খেলায় মুগ্ধ হইত দেশবাসী সকল
শ্রাবণ ভদ্র মাসে চাষী লাগাইতো ধান
খেতে বইসা চাষী ভাইরা গাইত সারী গান-ঐ
কার্তিক অঘ্রায়ণ মাসে নবান্ন খাইত
পাড়া পরশী ইষ্টকুটুম সকল দাওয়াত দিত
পুরান দিনের স্মৃতি হৃদয় আছে গাথা
ভুলিতে পারিনা সেই নবান্ন খাওয়ার কথা
বরিশালের মানুষের কথায় ছিল মধু
পাংশি নৌকায় বর যাত্রীরা আনত নতুন বধূ-ঐ
আগের দিন নতুন বধূ পালকীতে আনিত
চার পাঁচ জন বেয়ারা মিলে পালকী কাধে নিত
বলরে মমিন আল্লা আল্লাহ খুব জরে বলিত
পাড়া পরশী সব মানুষে বই দেখতে আসিত
মেন্দিদিত হয়লা গাইত পাড়া পরশী নারী
কাদা খেলা আংটি খেলা হইতো বিয়া বাড়ি
মেয়ের বাড়ি বর যাত্রীরা যাইতো যখন
গেট পার হইয়া বাড়ি ঢুকতে লাগতো অনেক ক্ষণ-ঐ
শ্লোক ভাংগাইয়া তার পর পান খাইতে হইব
সেই সকল আনন্দ ফুর্তি বিলুপ্ত হইল
পালকীর কথা সবাই যেন একদম ভুলে গেল
বিয়ার পালকী একবার যদি দেখিতে পাইতাম
হারানো দিনের আনন্দে ডুবিয়া যাইতাম
বরশি দিয়া কৈ মাছ ধরত ডিঙ্গি নৌকা বাইয়া
সাতলার বিলের কৈ মাছ কত ধরত পল্ল দিয়া
অতিথীদের আপ্যায়নে শ্রেষ্ঠ বরিশাল
বেড়াইতে আসিলে মনে থাকবে চিরকাল-ঐ
বরিশালের শিং মাগুর আর কৈ মাছ খাওয়াইব
ইচ্ছা মোদের আপনাদেরকে সংগে নিয়া যাব
শীতের দিনে রসের শিন্নী রসের পিঠা খাই
বরিশালের যাবেন সবাই দাওয়াত দিয়া যাই
বরিশালের মানুষ ভালো মিষ্টি নদীল জল
খেপুপাড়ায় বাস করিলে বারে দেহের বল
বরিশালের মানুষদের আর কেউ করবেন না হেলা
বরিশালে দেখতে আসবেন নৌকা বাইচের খেলা
পটুয়াখালী বরগুনা আর ভোলোয় ছিল যারা

www.pathagar.com

গয়নায় চরে বরিশালে আসত যাইত তারা-ঐ
খেপুপাড়ার রাখাইন পাড়া দেখতে মনহর
রাখাইন জাতী বসত করে বেন্ধে মাচান ঘর
রাখাইন পাড়া ঘুইরা ঘুইরা দেখলাম বাড়ি বাড়ি
মাচান ঘড়ের নিচে বইসা বুনায় তাতের শাড়ি
সূর্য উঠা সূর্য ডুবা দেখতে চলেন যাই
কুয়াকাটায় বঙ্গপোসাগর দেখতে পাবেন ভাই
পর্যাটন কেন্দ্র আর দেখবেন বৌদ্ধ মূর্তি
বৌদ্ধ মূর্তি দেখলে সবার মনে লাগবে ফুর্তি
ধান নদীর খাল এই তিনে বরিশাল
শষ্যভাণ্ডার বরিশালে থাকবে চিরকাল
দিক নির্দেশনায় জনাব শীর শাহআলম ছিলেন
বরিশালের গান লিখিতে বহু তথ্য দিলেন
মাননীয় অতিথীদের সালাম ও জানাই
সালাম দিয়া রেখা জলিল বিদায় হইয়া যাই-ঐ
[আবদুল জলিল বয়াতি, রূপাতলী, বরিশাল]

১২. ত্রিনাথ মেলার গান

১
আমার আসরে এস ঠাকুর ত্রিনাথ
আমি মন দিলাম স্মরণে ।
প্রথমে বন্দিলাম আমি মা-বাপের চরণ
আমার আসরে
তারপরে বন্দিলাম আমি শিবের চরণ
তারপরে বন্দিলাম আমি বিষ্ণুরের চরণ
আমার আসরে
তারপরে বন্দিলাম আমি ত্রিনাথের চরণ
আমার আসরে
পূর্বেতে বন্দিলাম আমি পূর্বের দিবাকর
আমার আসরে
একই দিকে উদয় ভানু, চৌদিকে পশর
আমার আসরে
পশ্চিমে বন্দিলাম আমি ঠাকুর জগন্নাথ
আমার আসরে
আচার নাই বিচার নাই ভবে, বাজারে বিকার
আমার আসরে
উত্তরে বন্দিলাম আমি হিমালয় পর্বত

www.pathagar.com

আমার আসরে তাহার হিমাস্তে পাকে এ তিন ভুবন
আমার আসরে
দক্ষিণে বন্দিলাম আমি ক্ষির নদী সায়র
আমার আসরে
সেই নদীতে বাইছে ডিঙ্গা সাধু মহাজন
আমার আসরে
চতুর দিগ বন্দিলাম আমি যত দেবগণ
আমার আসরে
পাতালে বন্দিলাম আমি বাসুকীর চরণ
আমার আসরে
বসিতে আসন দিল রসনার উপর
আমার আসরে ॥

২
সারাদিন গেল ত্রিনাথের নাম লইও
সাধুরে ভাই সারাদিন গেল ত্রিনাথের নাম লইও
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ গোঁসাই যার বাড়ি যায়
এক পয়সার তৈল দিয়া তিন বাতি জ্বালায় ॥
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ গোঁসাই যার বাড়ি যায়
এক পয়সার পান-সুপারী তিনভাগে সাজায় ॥
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ গোঁসাই যেনা বাড়ি যায়
এক পয়সার সিদ্ধি দিয়া তিন কলকী সাজায় ॥
আম শরাত ঘট পত্র পুষ্প গোটা চার
সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ দিও বাড়ির সবার ॥
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ গোঁসাই যেবা বাড়ি যায়
মাঝে মাঝে করলে পুজা ধনে জনে বাড়ে ॥
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ গোঁসাইরে যে কারবে হেলা
গলায় হবে গলকুণ্ড চোখে বাইরায় ঢেলা ॥
ঢাকায় আছে ঢাকেশ্বরী কলিকাতায় মা কালী
ত্রিনাথ গোসাঁই উদয় হবে এই লক্ষ্মীর বাড়ি ॥
জোয়ারে ছাড়িলাম নৌকা উজান ঠেলে ধায়
না জানি কোন অপরাধ কইরাছি রাঙ্গা দুটি পায় ॥

৩
তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা ॥
এক পয়সার তৈল কিনে

www.pathagar.com

তিনবাতি জ্বালাইয়া বসে যার মেলা
জ্বলে তৈলের বাতি সারা রাতি
মেলা মিলায় গাছ তলায় ॥
এক পয়সার পান কিনে
তিন বাতি জ্বালাইয়ে বসে যার মেলা
ও খেয়ে পানের খিলি জাজো মিলি
বইসে বাজার গাছ তলায় ॥
এক পয়সার সিদ্ধি কিনে
তিন কলকী সাজায়ে
মেলা মিলায় গাছ তলায় ॥
ও দিয়ে গাঁজায় দম
বইছে ব্যোম বোবায় বলে হরিবোল ॥

৪
এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
আজ বর তার নেশা হল কলিতে
কলিতে হরি সর্বময় রূপেতে
পাগলের আশ্রয় ত্রিশূল হাতে
শম্ভুনাথ হইয়াছে উদয় ।
ট্যাংরা ফুলের সিদ্ধি স্মরি
দামরা বাহন রথেতে
ভোলোাগিরি ভোলোা মহেশ্বর
কাশিতে কাশি বিশ্বেশ্বর
গয়াতে উদয় হল আপনি গদাধর
আমার ত্রিনাথ ঠাকুর দিল দেখা
চন্দ্র কিশোর পর্বতে
কাশিতে কাশির বিশ্বেশ্বর
হুগলীতে নাম তারকেশ্বর
শ্মশান ময় শাসনে থাকে
ভোলোা মহেশ্বর
বৃন্দাবনে ঠাকুর কৃষ্ণ এসে
গৌর হইয়াছে নৈদেতে ॥

১৩. অন্যান্য লোকসংগীত

মাধব গোঁসাই-এর গান

বাংলার অন্যতম সাধক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উত্তর বরিশালের শ্রী মাধব চন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী

www.pathagar.com

উপজেলা মাহিলাড়া গ্রামে বাংলা ১৩১২ সালের ১২ চৈত্র রোজ রবিবার সকাল ৭:১১ মিনিটে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতার নাম শ্রীবিপেন গোস্বামী ও মাতার নাম বিমলা সুন্দরী দেবী। তার পুরো জীবনটাই ছিল তথ্যবহুল বহু আকর্ষণীয় ঘটনার ভরপুর। তিনি যে শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন তা নয়, তিনি দেশ বিদেশে বহু শিষ্য, সাগরেদ, সেবাশ্রম, ধর্মপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে তার কর্ম প্রতিভাকে শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি একাধারে ধর্ম প্রচারক, সাধক অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক ভাব সংগীতের লেখক ও গায়ক। ৯৫ বৎসর বয়সে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ১৯৮৮সালের মার্চ মাসে ১২চৈত্র তারিখ দেহ ত্যাগ করেন। অসংখ্য শিষ্য সাগরেদ এখনও তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার বাড়িতে মহাপ্রভুর মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তার একমাত্র ছেলে তুলসী চক্রবর্তী, মেয়ে বাসন্তি তার পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমটি দেখাশুনা করেন। বর্তমানে সেবাশ্রমটি আর্থিক সংকটের কারণে সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সেবাশ্রমে তাঁর রচিত গানের আসর বসে নিয়মিত। এছাড়াও মাধব গোঁসাইয়ের গান বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহুরে জীবনেও শিল্পীদের সুর ও ছন্দে গীত হয়।

১

কোন কারিগর গোড়েছেরে সাধর দেহঘর
আমি জীবন ভরে খুঁজে বেড়াই
জানলেম নারে তার খবর ॥
শুনি চৌদ্দ পোয়া দেহ ঘরখানা
কেবা কোথায় থাকে গুরু আমায় বলবানা
আমি ঘরে যাব মনে করি
সকল দেখি অন্ধকার ॥
সে ঘরের মালিক কোন জন
জীবন ভরে খুঁজে তারে পেলামনা কখন
সে কোনখানে লুকায়ে থাকে
জানি নারে তার খবর ॥
ঘরে খুটি দরজা ছাউনি যাছিল
কুবাতাসের ঝড় আসিয়া উড়ায়ে নিল
ঘূণে খেয়ে জড় করিল ॥

২

আমি ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি
জ্বালা সহেনা জীবনে
ও মোর গুরুধন চরণ তরী দাও হে আমারে
তোমার চরণে স্মরণ নিলাম গো
তুমি যা কর এই বারে ॥
মায়া কল্পতরুমূলে ছায়ার আশ্রয় করে
দিবানিশি ঢেলেছি জল মায়ার সংসারে

www.pathagar.com

আমার হল না সে প্রেমের উদয় গো
আমি ডুবলাম না প্রেমের নীরে ॥
আমি করব বলে তোমার সাধন আশা ছিল মনে
প্রেমরতি হলনা উদয় পাইনা তোমায় ধ্যানে
আমি কি দিয়ে মন বাধ্য করি গো
গুরু তাই বল আমারে ॥

জীবনে মরণে তুমি সুখে দুঃখে থাকি
দ্বিদলেতে ধ্যানে আমি তোমায় যেন দেখি
তোমার রূপ সাগরে ডুবে থাকিগো
এই বাসনা অন্তরে ॥
কেমনে কমলাকান্ত করছে আপন
গোসাঁই মাধবেরে কর দয়া দিয়ে শ্রীচরণ
তোমার পদে করলেম মন সমর্পন গো
তুমি যা কর আমারে ॥

৩
সারবি যদি ভবব্যাধি চল নদীয়ায়
আছে সরকারি এক ডাক্তারখানা
বিনামূল্যে ঔষধ দেয় ॥
ডাক্তার আছে শ্রী চৈতন্য
কম্পাউন্ডার নিত্যানন্দ
হরিদাস ঔষধ গুলে
রোগীক খাওয়াইয়া দেয় ॥
শ্রীঅদ্বৈত হয় কেরানি
হিসাব নিকাস করেন তিনি
কলির জীবের তরে নৈদা ঘুরে
এনেছে সে গৌর রায় ॥

রাধা নামের বোতল করে
কৃষ্ণ প্রেমের ঔষধ ভরে
বৈরাগ্য দাগ কাটিয়ে
ভক্তি রসের ঔষধ খায় ॥
নামামৃত পান করিলে
ভবব্যাধি যাবে দূরে
গোসাঁই মাধব বলে জীবের ভাগ্যে
শ্রীচৈতন্য হল উদয় ॥

www.pathagar.com

৪

ধূলা খেলা আজি সাঙ্গ করেছি
মহাযাত্রার কর আয়োজন
ছাড়িয়া এদেশ যাব পরদেশে
সাথি হইও শ্রী নন্দের নন্দন ॥
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত হবে লয়
দশ ইন্দ্রিয় সাথি হয়েছ আমার
পরআত্মা গুরুব্রহ্ম মিশে যায়
কেউ হল না আমার আপনজন ॥
কোথায় প্রাণ প্রিয়তমা পুত্র কন্যাদি
কোথায় অন্তরঙ্গ বন্ধু, কোথায় কুটুম্বাদি
কেউ হল না আমার ভবপাড়ের সাথি
কারো সনে নাই মোর দরশন ॥
তোমার রঙ্গভূমে কি বলে এসেছি
কি কর্ম সাধিতে কি নিয়ে চলেছি
অসৎসঙ্গে পড়ে সবি হারা হয়েছি
ভাবি নাই কখনো নারায়ণ ॥
গোসাঁই যোগেন্দ্রমোহন আর শ্রীরসরাজ
দয়া করি দাও হে পদ সরশীজ
যেন অন্তিমেতে হেরি যুগল মাধুরী
মাধবের শেষ আকিঞ্চন ॥

৫

সংসারের সং নিয়ে ভবের বলদ সেজেছি
সুখের আশায় ঘুরে ঘুরে
আমি দুঃখ সাগরে মরেছি ॥
প্রাণের ভাই বলি যারে
বুকে তুলে নিলেম তারে
সেতো যুগল সেজে চলে গেল
আমি একা ঘরে রয়েছি ॥
পুত্র কন্যা যাদের তরে
না খেয়ে খাওয়াইলাম তারে,
তারা এখন আমায় বোকা বলে
আমি ভবের বোকা সেজেছি ॥
অর্ধাঙ্গীনি পত্নী বলে
ভালোবাসলাম হৃদয় ভরে
সেতো আমায় দোষী করে

www.pathagar.com

আমি সকল দোষের দোষী হয়েছি ॥
সবাই আমায় পাগল বলে
আমি বেজায় পাগল এ সংসারে
গোসাঁই মাধব বলে ভবের পাগল
কইবা আমি হয়েছি ॥

বৈকুণ্ঠ গোসাঁইর গান

ভবের বাজার মন্দ না
যার কর্মে যা হয়
ভাইরে হাটে বেচা কেনা
কর্মগুণে হয় ॥
ভবের হাটে দোকানদারী
প্রধান ছয় জন কর্মচারী
তারা বিনাস্বার্থে করেছে চুরি
তবু তহবিল শূন্য নয় ॥
হিংসা নিন্দা প্রবঞ্চনা
নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করনা
ভাইরে শেষে কৃষ্ণ আরাধনা
কর্মগুণে হয় ॥
কেহ আছে বস্ত্র শূণ্য
ভিক্ষা করে পায় না অন্ন
কেহ ধনে মহামান্য
থাকেন দোতলায় ॥
বৈকুণ্ঠ কয় কেন্দে কেন্দে
আর কতদিন রাখবি বেন্দে
ভজলি না কেন
প্রাণ গোবিন্দে, কি হবে উপায় ॥

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (বাবু)-এর গান

১

কোথায় আমার প্রাণ গোবিন্দ নিত্যানন্দ
শিতল কর তাপিত প্রাণ ॥
কৃষ্ণকান্তে কৃষ্ণ কথা বলিওনা যথাতথা
প্রাণ গোবিন্দ পাবে ব্যথা গীতায় আছে সেই প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ ভক্তে পরশ পেলে সকল ব্যথা যাবে ভুলে
যেমন বাতের ট্যাবলেট খেলে বাত ব্যথার হবে আসান ॥
যদি দেখে কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ নামে হইও মত্ত

www.pathagar.com

ভাবের দেশে ভবের তত্ত্ব করিও আদান প্রদান ॥
কৃষ্ণ ভক্তের এমনই গুণ পান্তাভাতে লাগেনা নুন
আষাঢ় মাসে আসবে ফাগুন সে যে ভক্তের অধীন ভগবান ॥
পাগলা সুভাষ বলে শোন এইতো সেই বৃন্দাবন
যত আছো ভক্তগণ একটু পরশ দিও তোমার শ্রী চরণ ॥ ২৮-৯-২০১০

২
মোরা হেরে গেছি ব্রাহ্মণের চালে ২
সাধুভাই
ওরা মোদের মাথায় লবণ ফেলে কুলবড়ই খেলে ॥
বারমাসে তের পার্বণ সবাই করি ওদের শাস্ত্র মতন
আছে নানা দ্রব্যের প্রয়োজন পুজা করবেন মেষে দক্ষিণা দিলে ॥
বাবা মায়ের হলে মরণ ব্রাহ্মণকে কর স্মরণ
ওদের লোভ কর পূরণ বাবায় স্বর্গে যাবেন হেসে খেলে ॥

যত আছেন জ্ঞানী-গুণী পড়ে দেখুন গীতা খানি
ধরা পড়বে ওদের শয়তানী সচেতন হও সাধু সকলে ॥
পাগলা সুভাষ হেসে কয় ঘুষে যদি স্বর্গ পায়
বাবা লোকনাথ কেন ধ্যানে রয় আমায় বুঝাও ব্রাহ্মণের দলে ॥

বাউল অবনীর গান
একটা কারো বিড়াল পুষেছের মন
দেহে যত আছে ইঁদুর পোকা
সকলি করবে নিধন ॥
বৃন্দাবনে গোপীর ঘরে
ঐ বিড়ালের ছা
চুরি করে আনতে হবে চাইলে দিবে না
যা না গোপী সেজে ঐ ঘরেতে
দিয়ে পুরুষ আত্মা বিসর্জন ॥

নিত্যনতুন খেলছে বিড়াল যমুনার নীড়ে
ধরার মতো ধরতে পারলে
ছাড়বিনা তারে
রাখিস ভক্তি রসের বোস্তায় ভরে
বেড় হয় না যেন কখনো ॥
বাউল অবনী কয় বাড়ি এনে
খাওয়াবি দুধ ভাত

www.pathagar.com

মণিকোঠায় ছেড়ে দিবি
গভীর হলে রাত ॥

কৃষ্ণকান্ত গোসাঁইয়ের গান

চৈতন্যস্কুলে ভর্তি হওরে মন (ও মনা)
রইলি স্থূলের দেশে ঘুমের ঘোরে
কেন রইলি অচেতন ॥
প্রথম শ্রেণিতে পড়
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর
ত্রিসন্ধ্যাতে সন্ধ্যা কর
যা আছে বেদের বিধান ॥
হাতে নিয়ে জপের মালা
দূর কর মনের ময়লা
ত্রিতাপ জ্বালা থাকে দূরে
সমন ভয় হবেনা কারণ ॥
দ্বিতীয় শ্রেণিতে গিয়ে
সাধু জনার সঙ্গ নিয়ে
প্রেমরসের কাল কাটালিরে
মাঝে থেকে অনেকক্ষণ ॥
হরিনাম গায়েত্রি ধর
অজপাকে আশ্রয় কর
রূপ দিয়ে দুই নয়ন
কেন রইলি অচেতন ॥
তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া
ব্যাভিচারীর সাধন করা
বেধবিধির চরণ ছাড়া
গোষ্ঠ গানের অনুকরণ ॥
সখীর সঙ্গিনী হইয়ে
থাক সদায় সঙ্গ নিয়ে
সখীর কৃপা হলে পরে
মিলবে সে কালো বরণ ॥
চতুর্থ শ্রেণিতে যেয়ে
মঞ্জুরীর আখ্যান পেয়ে
যোগেতে যোগ মিশায়ে
যুগল কর দরশন ॥
গোসাঁই কৃষ্ণকান্ত বলে
স্বরূপ রইলি তুই মায়া ভুলে

www.pathagar.com

দিন গেল হেলায় হেলায়
ভালিনা গুরুর চরণ ॥

অনিল গোসাঁইয়ের গান
গুরুহে কি দিয়া পুজিব তোমারে
আমার ভক্তিশূন্য হৃদয়খানিরে
আমার নয়ন জল নাইরে ॥
এই আধারে ছিল মাত্র পুজার দুটি ফুল
লোভ অনলের তাপে শুকাইল মুকুল
আমার নিরস বাগান সরস কররে
তোমার প্রেম বারি দিয়া রে ॥
কি দিয়া পুজিব গুরু কি আছে আমার
মানবকূলে জন্ম নিয়ে হলেম পাষাণের আকার
ভবে আমার মতো ঘোর পাতকীরে
দয়াল এ বাজারে নাইরে ॥
গুরু আমার পুজার থালা শূন্য এ আধার
গুরুর সেবায় বাধিত হলেম ভবে এসম দশা কার
কাঙ্গাল অনিল বলে এ দরদীরে
তোমার যুগল চরণ দিওরে শিরে ॥

২
ভবে এসে ঘটল যন্ত্রণা
ভাবলাম কৃষ্ণ পদে দাসী হইব বলে
আমার ভাগ্যে হইল না ॥
সাধুর সঙ্গ করব বলে মনে ছিল
আসা হইল না মোর সাধুর সঙ্গ, ঘটল সর্বনাশ
হলেম কৃষ্ণ সেবার অপরাধীরে
ভবে এমন দশা কয় জনার ॥
আশার বাসা বেধেছিলাম মনের গহীনে
সেই বাসা পুড়ে গেল আমার হৃদয়ের আগুনে
এখন কান্দি বসে বৃক্ষ তলে
আমার মনের আগুন নেভে না ॥
মানুষ হয়ে জনম নিলাম এভব সংসারে
কর্ম দোষে পড়লেম ফ্যাড়ে সেই দোষ দিবা কারে
আমার আপান যারা কেউ নাই তারা
আমার মনের ব্যথা বুঝে না ॥
কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ নিয়ে যদি মরে যাই

www.pathagar.com

অন্তিমে যেন পাই ব্রজধান আমার আশা তাই
কাঙ্গাল অনিল বলে কেদে কেদে
গুরুর চরণছাড়া আমায় কইর না ॥

অসীম সরকারের গান

সাধের একখানা তরী লইয়ারে সুবল
আমি কংস নদীর খেওয়া বাই
দেখি ঘাটে আসে কিনারায় ॥
বিনামূলে পাড় করে দেই যেজন আসে ঘাটে
তারে আমি নিয়া যামু আমার প্রেমের হাটে
তারে পাড় করিব নিজ হাতে রে (সুবল)
গগনে বেলা নাই ॥
রাধা রাধা বলে ভাসি আঁখি নীরে
তারে কি রেখে যাব এই মায়ার সংসারে
তারে পাড় করিব নিজ হাতে রে (সুবল)
বেলা তো বেশি নাই ॥
কোনকূলে ঠাঁই নাইরে যাহার পাড় করিব তারে
জীবনে যদি সে একদিন ভক্ত সংঘ করে
ও যারে পার করিব খেয়া ঘাটেরে (সুবল)
ধনি মানির বিচার নাই ॥
অসীম বলে এই জীবনে ভক্ত সংঘ হয় মায়াময়
মরি চিতায় জীবন করলাম ক্ষয়
ও আমার কি হবেরে শেষের দিনেরে (সুবল)
বসে আমি ভাবি তাই ॥

রাধা বল্লভ গোসাঁইয়ের গান

১

ওসে সোনাই সওদাগর তোমার কোথায় বাড়ি ঘর
হাটে আসছো কত চালান লইয়ারে ॥
আনন্দের বাজারে সদায় করছোকি
যাহা কিনবার আসছোরে মন তাহা কিনছো নি
বাড়িতে ছেলে আর মেয়ে রইছে পথের দিকে চেয়ে
বাবায় আসবে কত চালান লইয়া রে ॥
মহাজনের চালান যদি বসে বসে খাও
পাড় হইতে তুমিরে মন খালি হাতে যাও
ঘাটে মহাজন যারা পাড় করবে তারা
একা কাদবে ঘাটেতে বসিয়ারে ॥

www.pathagar.com

সন্ধ্যা হবে বন্ধ হবে হাটের দোকান পাট
এক নিশিতে ভেঙ্গে যাবে আনন্দের বাজার
ও তুই সাথী হারাবি চোখে অন্ধকার দেখবি
বল্লভ কান্দে পাড়ঘাটায় বসিয়ারে ॥

২
তরী কোন দেশে তৈয়ারি
উসার কাষ্টে গড়ছে তরী থাকবেরে দুই একদিন চারি
হাইন বাইনে মিশ পড়ে নাই গাব কালি না থাকে তায়
বাইন দিয়া উঠছে এবার জলের ছিড় ছিড়ি।
তরীর গঠন দেখতে যেমন মানুষের মনোহরী
আছে পিতৃ রতন বোঝাই ভরা ঐ সে প্রেম সাগরে দিচ্ছে পাড়ি ॥
আট কুঠরী নয় দরজা আঠার মোকামে ঘেরা
রূপ-রসে গিল্টি করা গলুইতে ছয় দারি।
কুঠরীর মধ্যে ছয়টি তালা দেখনা তালাশ করি
আছে মূলাধারে গন্ধ কালী পাক করে অন্ন তরকারী ॥
দশ ইন্দ্রিয়ে দশ দেবতা তিনজন তারের কর্তা
ভদ্রা কালী যোগায় কথা মনকে চেতন করি
একুশ হাজার ছয়শ জমা দিবা বিভাবরি
ও তোর জন্য শূন্য খরচ ভারী নিলাম হবে তোর দেহ তরী ॥
গোসাঁই রাধা বল্লব ভেবে বলে তরী তোর অচল হবে
এই করার কয় দিন ভবে দেখনা চিন্তা করি
অনাথ বন্ধু কৃষ্ণকান্ত আর বেশি নাই দেরি
গুরু বল কর সম্বল দিবি যদি ভবপাড়ি ॥
ধর্ম ঘর সত্যপুরে যেখানে এক নৌকা গড়ে
রসরসিক কারিগরে বানায় প্রেমের তরী
কোন কারখানায় নৌকা তোমার ভালো নয় মিস্ত্রি
ও নাই জুইত বরাদ্দ পৈদ্য সদ্য তরীর মধ্যে গোলমাল ভারি ॥

গোসাঁই সত্যানন্দের গান

১.
দিন থাকিতে দেহের খবর জান মন মনুয়ারে
গুরুর কাছে জান সন্ধান তবে হবে ব্রহ্মজ্ঞান
ধন্য হবে মানব জনম ॥
আছে চতুর্দলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি চতুর্ভূজা মূল ডাকিনী
স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া
হিংসার ফণা বিস্তারিয়া ব্রহ্মণাড়ী আটকাইয়া হুংকারেতে করবে চেতন ॥

www.pathagar.com

সুসময়ের মধ্য দিয়া দমাম দলে দেখ গিয়া ব্রহ্মপুরীর সুন্দর গঠন
লাল বর্ণ ব্রহ্মরাজা অপূর্ব সে রূপের মজা
করিবে সে পথের নির্দেশন ॥
হৃদপদ্মে আছে নির্মিত কাঞ্চনে ঘর সুশোভিত
সেবায় রত আছে মনজরীগণ
সাথী সঙ্গে কিশোরী কিশোর অপূর্ব সে রূপ মনোহর
দ্বিছলে কর দরশন ॥
গোসাঁই সত্যানন্দ বলে দ্বিদলে ধ্যান করিলে
বংশীধারীর পাবি দরশন
যম রাজার নাই অধিকার সহস্র চক্র দেখ এবার
নীলকান্ত ঐ কর দরশন ॥

২.
বর ব্যথা নিয়া ঘুরি দুনিয়ায়
ব্যথা হরি দুঃখ দরদী রয়েছ কোথায় ।
আমার বিষানলে অঙ্গ জ্বলে গো
জ্বালা জুড়ানো হয়েছে দায় ॥
অন্তরে অনন্ত জ্বালা জ্বলে থেকে থেকে
কবে দেখা দিবে আমায় ব্যথা হরি পাখি
আমার ব্যথার জীবন কেমনে রাখি গো
জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে যায় ॥
অজানা অচেনা পথে চলি একা একা
বাতুল বলে তোমার রাতুল চরণ দিলে নাকো দেখা
আমি ভুলের পথে চলি একা একা গো
আমার আসল পথ গেল কোথায় ॥
যে কটা দিন আছে বাকি তোমায় যেন ডাকি
দেখা না পাই তবু যেন ঝরে দুটি আঁখি
বিনে সত্যানন্দের কমল আঁখি গো
কান্দে নীলকান্তের পোড়া হৃদয় ॥

ভবা পাগলের গান
আমি মানুষ হইয়া জনম লইয়া
মনুষের করিলাম কি
দয়াল রে...
শিশুকাল গেল হাসিতে খেলিতে
যৌবন গেল রসে
আমার বৃদ্ধকাল যাবে ভাবিতে চিন্তিতে

www.pathagar.com

যৌবনে লাগবে ভাটি ॥
আমার চুল পাকিবে দন্ত খসিবে
সম্বল হইবে লাঠি
পুত্র পরিজন সকলে বলিবে
এজ্বালা মরিলে বাঁচি
কেন্দে কেন্দে ভবা পাগল কয়
এবিশ্ব কার নয়
আসলে তোমার যেতেই হবে ॥

তারিনী দাসের গান

মানব দেহ রসে ভিজে হয়
আমি দিবা নিশি ভাবি বসি
গুরুর জন্ম কিসে হয় ॥
বল গুরু জন্ম কথা
তুমি আমি ছিলেম হেথা
এখন দুই জন আছি কোথায়
পরে যাব কে কোথা ॥

তুমি যে মন্ত্র আমায় দিলে
সে মন্ত্র কোথায় ছিলে
দেহ অন্ত্রে মন্ত্র কোথায় ছিলে
সে আমায় বল ॥
তুমি আমি আছি ভবে
কার আগে কেবা যাবে
তারিনী দাস যাবার কালে
কিসে প্রেম বাহির হয় ॥

বিবেক গোসাঁইয়ের (বিবেকানন্দ গোস্বামী) গান

একটি অচল পয়সা হলেম রে
গৌরাঙ্গের বাজারে
গুরু তুমি বিনে এই অধমের কে আছ
তাই বলরে ॥
হয়েছি এক অচল পয়সা
গুরুবিনে নাই ভরসা, গুরু যা করে
আমি যে দোকানে যাই, দোকানে যাই
ফেলে ফেলে দাও মোরে, গুরু যা করে ॥
গুরু তুমি পরশমণি লৌহ স্বর্ণ গড়াও তুমি

www.pathagar.com

পরমগুরু তুমি তেমনি করে
পরশ করে, সরস করে লও মোরে
গুরু যা করে ॥

বিবেক বলে এই বাসনা
ভবে যেন আর আসিনা পাপ দেহ নিয়ে
এবার দয়া করে দয়াল গুরু
যুগল চরণ দাও মোরে ॥
গৌরাঙ্গের বাজারে আমায় চরণ সেবার দাসী কর
আমায় চরণছাড়া কইরো না ॥

বিভূতি ভূষণ রায়ের (বিভূতি গোসাঁইয়ের) গান

১
তুমি জান না মন সেদিন হবে কবে
যেদিন শমন রাজা সময় বুঝে নিদান শমন দিবে ॥
সে হাকিমের হুকুম কড়া (২)
নিয়ে যাবে খাড়া খাড়া ভাইরে
আবার হস্তি ঘোড়া টাকার তোড়া সকল পরে রবে ॥
আর আসবেও একা যাবেও একা কেবলমাত্র চোখের দেখা
আবার অন্তিমকালে ওরে সখা দাস পিতাম্বর ভাবে ॥

২
কিসের রে তোর আভিজাত্য, কিসের বাহাদুরী
ফেলে তোমায় যেতেই হবে ধনো সম্পদ এ ঘর-বাড়ি ॥
খাট পালঙ্ক মুক্তা হিরে বসন ভূষণ রবে নারে
এসব ফেলে মাটির কোলে দেহ খাবে গড়া গড়ি ॥

স্বদম্ভে আর অহংকারে স্বসম্মানে আর উচ্চশিরে
সেই শির যে তোর হবে নত গোরস্তান আর শ্মশানপুরী ॥
অহং ছাড় দম্ভ ছাড় পরকালের চিন্তা কর
সরল চিত্তে সাধন কর পাবে তুমি স্বর্গপুরী ॥
গর্তেতে সাপ যাবার সময় সোজা তাকে যেতেই যে হয়
বিভূতি কয় থাকতে সময় দেখ একবার চিন্তা করি ॥

৩
অহং ভাব তো গেল না মন তোর অহং ভাবতো গেল না
পার হবে এসব বাড়ি পরপারে দিবি পাড়ি

www.pathagar.com

বৃথারে তোর এ ঘর-বাড়ি সংসারী ভজন পূজন হোলোনা ॥
কামিনী কাঞ্চন বালা হিরা-চুন্নি কণ্ঠমালা
সে শুধু বাড়ায় জ্বালা কিছুই সঙ্গে যাবে না ॥

আকাশচুম্বি অট্টালিকা দামি গাড়ি বিয়ে-নিকা
অর্থ কামের মোহ মায়ায় ত্যাগী হতে দিল না ॥
বিভূতি কয় আমিত্ব ছাড় আমার, আমার বিয়োগ কররে
পর পাড়ের পথ ধর নইলে সময় পাবে না ॥
দাসরূপে কর্ম কর ফলের আশা ত্যাগ কররে
ত্যাগের মাঝে ভোগ কর করে যাহা ভক্তজনা ॥

সুধীর তালুকদারের গান

রং মহলের রং লাগিয়ে কয়দিন বা রবি
ও তুই আসল কথা ভুলে গিয়ে নকলে ভরা ভরলি ॥
আসুলি ভবে কি বলিয়া তা মনে পড়ে কি
ও তোর ভবের ঘরে দিচ্ছে জ্বালা মায়ামোহিনী
ও তোর আসল ভাবের অভাব হলে কিভাবে পাড়ে যাবি ॥
এলে ভবে যেতে হয়রে তা ভেবে দেখছো কি
ও তুই রঙ্গরসে মত্ত হয়ে সব ভুলে গেলি
যেদিন শমন এসে ধরবে তোরে সেদিন জবাব কি দিবি ॥

উত্তম চাঁদ গোসাঁইয়ের গান

শুধু হরি বলে ডাকলে পরে হরি কি আর আসে
হরি আমার প্রেমের প্রেমিক প্রেম ভালোবাসে
হরির সঙ্গে কি সম্বন্ধ জানো না তা ভালো কি মন্দ
ও যার অন্তরে নাই প্রেমের গন্ধ হরি ভুলাবে কিসে ॥
মন্দা মন্দা জপলে পরে মন্দা কি পায় বসে ঘরে
পিপাসার কি শান্তি হয়রে জল জল বলে কাঁদলে বসে
গোসাঁই উত্তম চাঁদে বলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে
ওরে ও সার হয় না কোন কালে অপক্ক দোষে ॥

বনমালী গোসাঁইয়ের গান

রসিক যে জন প্রেম জোয়ারে রসের তরী বায় ।
তারা জোয়ার ভাটার খবর জেনে সাবধানে তরী চালায় ॥
স্থূল হতে হয় প্রবর্তের পাড়ি
শ্রীগুরু তার কাণ্ডারী যে যেখানে যায়
কেউ প্রবর্তে কেউ সাধকে কেউ সিদ্ধিগঞ্জে নাও লাগায় ॥

www.pathagar.com

প্রেমতলা হয় প্রেমের থানা, লোভী কামুক যেতে মানা
সাধু বেয়ে বেয়ে যায়
যার নিতাইগঞ্জের চালান ভরা , সহজ প্রেমে বোঝাই করা
সে কি ঠেকে দায়
সে হাসতে হাসতে প্রেমতলাতে পৌঁছে যায় ॥
গোসাঁই বণমালী বলে, মাঝির সঙ্গে প্রণয় হলে
তবে পাওয়া যায় ।
তখন মহাজনের ষোল আনা, এড়াবি নিকাশের দায় ॥

মুজিব মেহেদীর গান

মানুষ ভজলে খোদা মিলে সেই মানুষ ভাই কোথায় পাই
দলিলেতে বলছেন মালিক ॥ সাঁই ওরে ভাই...
কুলবিল মুমিনিন আল্লাহ আর্শে
গোপনে সে লুকাইয়া আছে ।
ঘোরে বান্দার পাছে পাছে জ্ঞান নয়নে দেখবি ভাই ॥
লাহুত মাহুত মালকুত যবরুৎ
আদম দেহে আছে অযুত
আঠারো মোকামের মাঝে সদায় বিরাজ করেন সাঁই ॥
মীম হরফে হয় মুহাম্মদ ওয়াইচ ক্রনী পাইয়াছেন স্বাদ
নবীর প্রেমে ভাঙিল দাঁত মায়ের সেবা মশগুল ভাই ॥
ভেবে কয় মুজিব মেহেদী
সংসার মায়ায় হইলাম বন্দী
মানুষেরই জন্য কান্দি সেই মানুষ ভাই কোথায় পাই ॥

অসীত দাসের গান

১
ও ভোলোমন
সুহৃদ কর মানুষ কাছে টেনে ।
মানুষ বড় এই সত্য
নাও গো তুমি মেনে ॥
মানব মনের গোলাপ গন্ধ নাও
মানুষেরে দাও গো তোমার ভালোবাসা দাও
শুধু হিংসা ভুলা
শান্তিসুধা এনে ॥
ভেদাভেদ সরাও দূরে মঙ্গল কর
জগৎ তোমার সুরে সুরে ।
প্রেমের কুসুম দুহাত দিয়ে ছড়াও

www.pathagar.com

নিঃস্ব প্রাণে আলো জ্বেলে গো
প্রভু প্রভু গাও
হেথা এলেম কেনো
নিজেই নাও জেনে ॥

২
জাত পাতের নাইরে বিচার বাউলে।
ও ভাই মানুষ সত্য আর সবই মিছে
উঁচু নিচু যাও ভুলে ॥
যেথা আল্লা, সেই ভগবান–
নেই ভেদাভেদ সমান সমান
জাত সে কি স্বণে লিখন
মুছে যায় মানুষ ছুলে ॥
যেই রাম সেই যে রহিম
দয়ার সাগর সবাই অসীম
ধর্ম সেকি দুই হয়রে
মানব প্রেম যার মূলে ॥

ডাক্তার রফিকুল ইসলাম সিরাজীর গান

১.
মন চল যাই মক্কার পথে
সেথায় খলিলুল্লার পায়ের চিহ্ন
স্ব-চোখে দেখতে ॥
খলিলুল্লা গড়াইছেন ঘর
সাথে নিয়ে সহচর
আল্লা তাঁরে হুকুম দিচ্ছে
কাবা গড়াইতে ॥
ঐ ঘরের চারিধার
ঘুরতে পারলে সাতবার
সিরাজী কয় সহজ হবে
পোল ছুরাৎ পাড়াইতে ॥

২.
ওরে বেশ ধরিয়া বাউল সাজিয়া
গান ধরিলে আজীবন।
হয় না তাতে বাউল যজ্ঞ
হয় না তাতে বাউল সাধন ॥

www.pathagar.com

একতারাতো যায় পাওয়া
আর সাথে বাউলা বেশ
বাউল সাজিতে কতক্ষণ
যখন বাউলের দেশ ।
গুরু দীক্ষা না নিলে হয়
ঐ বাউলের জিন্দা মরণ ॥
বাউলা রাজা ফকির লালন
করে যখন বাউল সাধন
কাম ক্রোধ লোভ মোহ
দ্যায় আগে বিসর্জন ॥
সিরাজ সাঁই দীক্ষা দিল
শিক্ষা নিল লালন
বাউল ধামে আজও তাই
করে লালন বিচরণ
সিরাজী কয় দীক্ষা ছাড়া
বাউল বৃক্ষে হয় না ফলন ॥

৩
এই ঘরের চাবি পরের হাতে
এক চাবিতে নয় দুয়ার
বন্ধ হয় একসাথে ॥
নয় দুয়ার খুইল্লা দিয়া
সে তামসা দেখে চাইয়া চাইয়া
মারবে চাবি ইচ্ছামতো
সময় হওয়ার সাথে সাথে ॥
কার যে কত সময় বাকি
তা কারো কওয়ার নাই শক্তি
সিরাজী কয় নাই যে সময়
রাখতে হবে স্মরণেতে ॥

৪
মোরা বাউলের ঘরে জন্ম নিয়া
চিনলামনারে বাউল
বাউলের ঘর আউল করিয়া
রাখি সেথায় ধান-চাউল ॥
বাউলগানে যেই প্রাণে
আনতো প্রাণ তানে তানে

www.pathagar.com

সেই প্রাণে ইংলিশ গানে
বাজাইছে ভীষণ আউল ॥
একতারা হাতে নিয়া
যাইতো বাউল যে পথ দিয়া
সেই পথে বেড়া দিয়া
ফলাই মোরা কুমড়া লাউ ॥
জন্ম নিয়া বাউল কূলে
বাউলেরা ভাই গ্যাছে চলে
সিরাজী কয় বাউল গানে
শ্রোতা ছাড়া নিঃস্ব বাউল ॥

৫
আকার নাই জানি তোমার
দয়াল তুমি নিরাকার
সাধন আর ভজনার মাঝে
নাই রূপের অন্ত তোমার ॥
যত সাধক সাধুজন
তাদের মাঝে তোমার বিচরণ
দমে আসো দমে যাও
তুমি দমে আসো দমে যাও
নিয়া আসো সমাচার ॥

দয়াল তোমার দেখিতে রূপ
ভজনায় দিয়েছি ডুব
খুঁজি তোমায় যুগ যুগ
আমি খুঁজি তোমায় যুগ যুগ
পুরাইও আশা আমার ॥

৬
ওরে সাধনার ফল যায় না পাওয়া
সময় না হইলে
সাধক ধর সাধন কর
ফল লাভ চাইলে ॥
ঐ ফলের চরম মূল্য
যাহার নাই কোন তুল্য
যার ঘোষণা দিয়াছেন সাঁই
সব বিধান বইতে ॥

www.pathagar.com

সিরাজী কয় এই যে বাজার
মানবকুলের জন্যরে ভাই
একটা টিকিট কাউন্টার।
এখান থেকে টিকিট নিয়া
যাইতে হইবে বিদায় নিয়া
সাধন ছাড়া কেউ পাবে না
আপার ক্লাস চাইলেও ॥

মরমী সাধক রশিদ ফকির এবং তাঁর গান

সুজন কাঠির সুজন মানুষ রশিদ ফকির আর আমাদের মাঝে নেই। ১৪০১ সনের পয়লা ফালগুন মোতাবেক ১৯৯৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রশিদ ফকির মারা যান। তিনি কবে জন্মে ছিলেন তার হিসেব কারো জানা নেই। সম্ভবত বিশ শতকের ত্রিশের দশকে তাঁর জন্ম। সেদিন হয়তো তার মায়ের কোল উজ্জ্বল করে দুঃদিনে মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েই তিনি জন্মে ছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিন মারা যান, সেদিন তার মহীয়সী মা বেঁচেছিলেন না। কিন্তু গৈলা-সুজনকাঠি, রথখোলা, আগৈলঝাড়াসহ আশেপাশের অসংখ্য গ্রাম যেখানের মানুষের কানে খবর পৌঁছেছিল যে রশিদ ফকির মারা গেছেন তারাই ছুটে এসেছেন হৃদয়ের টানে। রশিদ ফকিরের গানগুলো গেয়ে থাকেন–জলিল বয়াতী, সুধীর তালুকদার, প্রবীর বিশ্বাস ননী, নুরুল আমীন চৌধুরী, সুধীর তালুকদার, অধ্যাপক নাসের জামাল প্রমুখ।

১
তুমি আমার কেবলা কাবা, মাবুদ মাওলা সাই।
তুমি আমার কেবলা কাবা, মাবুদ মাওলা সাঁই।
তুমি আমার কেবলা কাবা, দেহের ভিতর আছে কাবা। (২)
তুমি আমার কেবলা কারা মাবুদ মাওলা সাঁই। (২)
জাহের কাবা মক্কায় আছে, দেহের ভিতর কাবা আছে। (২)
তুমি আমার কেবলা কাবা মাবুদ মাওলা সাঁই। (২)
আয়নার দোকান কানার কাছে, খুলিতে নিষেদ আছে। (২)
তুমি আমার কেবলা কাবা, মসাবুদ মাওলা সাঁই। (২)
ধন-রত্ন চাইনা খাঞ্জা, তোমায় যেন পাই। (২)
তুমি আমার কেবলা কাবা, মসাবুদ মাওলা সাঁই। (২)

২
মুর্শিদ বাবাজান, কাঙ্গালের চরণ কর দান। (২)
চরণে ভিখারী আমি (২) ত্বরাইয়া লও নিদান।
কাঙ্গালের চরণ কর দান। ঐ
চাইর কুতুবের ঘর খানি, ষোল জনতায় নেগাবান।
কুদরতে বসত করে, পাক মাওলা সোবাহান। (২)

www.pathagar.com

খাঞ্জাহানের মুর্শিদবন্দী (২) আরাফাতেরই ময়দান।
কাঙ্গালের চরণ কর দান। ঐ
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ পৃথিবীরই শেষ সীমানা।
হুজুরী নামাজ পড়িলে আজাব নাই তার গোরস্থান।
হাশরে ত্বরাইয়া নিবে (২) খাঞ্জাহানের মুরিদান।
কাঙ্গালের চরণ কর দান। ঐ

৩
খাঞ্জা তোমার নূরীপদে এই নিবেদন কইরে যাই।
বাবা তোমার নূরীপদে এই নিবেদন কইরে যাই॥
পদতলে থাইকা যেন দোজাহানের মুক্তি পাই। (২)
খাঞ্জা তোমার নূরীপদে এই নিবেদন কইরে যাই॥

মউয়ত ও নিদান কালে, আজরাইল আইসা দেখা দিলে (২)
আমি আল্লা আল্লা রইলা যেন ফানাফিল্লা হয়ে যাই। (২)
খাঞ্জা তোমার নূরীপদে এই নিবেদন কইরে যাই।
দীন হীন কাঙ্গালে বলে, খোদার আরশ তলে। (২)
কুদরতী ছায়াতে যেন, হাশর আজাব ভুইলা যাই॥ (২)
খাঞ্জা তোমার নুরীপদে এই নিবেদন কইরে যাই।

৪
বাবা ধইরাছি তোমারি রাঙ্গা পায়।
খাঞ্জা ধইরাছি তোমারি রাঙ্গা পায়।
তুমি বিনে কেবা আছে বলো আর যাবো কোথায়। (ঐ)
দেখিয়া তরঙ্গ নদী, প্রাণ কাইন্দাছে নিরবধি, কি করি উপায়।
আমার নাইকো পয়সা, না জানি সাঁতার, যাবো কার নায়। (ঐ)

তুমি তো পতিত পাবন, তুমি জীব কর ত্বরণ নিজ করুনায়।
আমি জন্মবধি অপরাধী, দাও চরণ আমার মাথায়। (ঐ)
আমার দিনে দিনে দিনফুরাইল, জন্ম-মরণ যায় বিফল, হেলায় হেলায়।
আমার সময় ত্বরণ কর ধরণ, নইলে বাঁচা ভীষণ দায়॥ (ঐ)
আমি দীন হীন আশা কইরে ঝম্প দিলাম প্রেম সাগরে, তোমারি আশায়।

৫
সাধন ভজন গুরুর চরণ হইলোনা নিদান কালে। (২)
তিন দিনের এই দুনিয়াতে, জুইলা মরি দিনে রাতে। (২)
আমার গুরুর চরণ পাবো বইলে (২)

www.pathagar.com

দেখা হইলো না নিদান কালে। (ঐ)
সাধন বিনে কাঙাল কি আর, পাবো দেখা গুরুর আমার (২)
আমার গুরুর সনে লেনা-দেনা হইলো না নিদান কালে। (ঐ)

৬
দয়াল বইলা তোমার ডাকি সকলে।
গুরু আমার নিদয়া হইলে।
দয়াল বইলা তোমার ডাকি সকলে
আমার তাপিত পরাণ শীতল কররে গুরু (২)
তোমার প্রেম বরিষণে। (২) ঐ
সাথের সাথী যারোগা ছিল
একে একে তারা পার হইয়া গেল
আমার ভাগ্যে এইকি ছিল রে দয়াল (২)
তরী ডুবল অকূলে। (২) ঐ
আমি তোমার পাতকী হইলে
দ্যাখ্যা দিয়ো গুরু এই বিপদকালে
তোমার প্রেম সিন্ধু শুকাবেনা গুরু (২)
আমায় এক বিন্দু দিলে (২) ঐ
অদিনের আর কয়দিন বা বাকি
যুগল চরণ গুরু দেখাও না দেখি
তোমার যুগল চরণ দিয় মাথায় রে গুরু (২)
আমার প্রাণ যাবার কালে, আমার জান যাবার কালে। ঐ

৭
আমি হই নাই তোমার মনের মতো
দিলে অকূলে ভাসাইয়া, কাঙ্গাল বলিয়া। ঐ
বোবার যেমন স্বপ্নে দেখে, মনের স্বপ্ন মনে থাকে রে
ওসে কিছু নাহি বলতে পারে (২) হৃদয় যায় যে ফাঁটিয়া
কাঙ্গাল বলিয়া- ঐ

বন পুইড়া যায় সবাই দ্যাখে, ওরে মনের আগুন
কেউ না দেখে রে (২)
ও তার মনের আগুন মনে থাকে (২) সদাই
জ্বলে রইয়া রইয়া
কাঙ্গাল বলিয়া- ঐ
তোমার দেখা পাবো বলে, বইসা রইলাম নদীর
কুলেরে
হায়রে অধম কাঙ্গাল কেঁদে বলে, (২) মুর্শিদ

www.pathagar.com

যাইও না ছাড়িয়া
কাঙ্গাল বলিয়া। ঐ

পরেশ বাইনের গান

১

কি গান শুনাব বন্ধু, আমি যে অজ্ঞান।
আমি নহি কবি, নহি শিল্পী, না জানি পুরান।
আশা করে দাঁড়াইল যখন, গানের মঞ্চেতে।
পঞ্চমেতে বাজে যে সুর, আমার বীণাতে।
ভয় পেয়ে যাই হই হুল্লাতে, ছন্দ কাটা হয় যে গান।
দোতারাতে যখন আমি, বাজাই গানের সুর।
ব্যোমের তারে ঢিল পড়িয়া, বাজিল বেসুর।
বেসুরেতে বাজাইয়া সুর, আমি হলেম অপমান।
স্বরলিপি না শিখিয়া, গান গাইতে যাই।
ভুল করিয়া মূল সাধনে, কেঁদে দিন ফুরাই।
আমি বাউল গীতি কেমনে গাই-করি নাই যে সুরের ধ্যান॥
পরেশ বলে কাল বৈশাখীর, এলোমেলো হাওয়া।
পারলেম নারে গান গাইতে মিছে চাওয়া পাওয়া।
বারণ করো আসা যাওয়া ওগো সু-মহান।

২

হারে ও নিষ্ঠুর বন্ধুরে,
আর কতদিন থাকব তোমার আশার পথ চাইয়া
আমি হৃদয় ভরা ব্যথা নিয়া, কান্দি যে দাঁড়াইয়া॥
তোমার আসার আশা করে, চাহি পন্থ পানে।
কেমন আছি ওগো বন্ধু, দেখে যাও নয়নে।
আমার কথা কি নাইরে মনে, গেছকি বন্ধু ভুলিয়া।
কোন দেশেতে থাক বন্ধু, সেদেশ কত দূর।
সে দেশে কি পৌঁছে না মোর, করুণ কান্নার সুর।
তুমি ভালোবেসে সাজলে নিঠুর। কোথায় আছো লুকাইয়া॥

বেদন মাখা হিয়াসম, জলভরা দুই আঁখি।
আর কতদিন আছে আমার চাওয়া পাওয়ার বাকি।
আমার দুঃখের জীবন কর সুখী, একবার ভাঙ্গা বুকে আসিয়া॥
কত আশা নিয়ে আছি, এ পোড়া বুকেতে।
এ জীবনে পাব কি আর তোমায় দেখিতে।
কাঙ্গাল পরেশ কান্দে পথে পথে, শুধু ব্যথার গান গাহিয়া।

www.pathagar.com

৩
ওরে দীনের দয়াল রে, দিনের শেষে একবার এসে
এ দীনের খবর লইও।
আমার সেদিনের দিন যেদিন হবে, তুমি একবার দেখা দিও।
বন্ধু-বান্ধব ছাড়া হইয়ে, যেদিন যাব যাত্রা পথে।
ভালোবাসার প্রিয়জন, কেউ থাকবেনা সাথে।
সেদিন মিলাইও হাত হাতে হাতে, একবার সম্মুখে দাঁড়াইও॥
দিবাগত রবি যখন অস্তাচলে যাবে।
থেমে যাবে চলার পথ দৃষ্টি না থাকিবে।
আমার আঁধারের পথ নেমে আসবে, তুমি পথ দেখাইয়া নিও॥
অসীমের এক যাত্রী হবে, অচিন দেশের পরে।
সেদিন তুমি হইও সাথী, অকূল পাথারে।
তুমি কাঙ্গালে বকলে অভাগারে, ফেলে নাহি যাইও॥
পরেশ বলে দীন বন্ধু, তোমাকে জানাই।
পরের ঘাটে যাইয়া যেন তোমায় দেখতে পাই।
সেদিন কাণ্ডারী সাজিয়ে গোঁসাই, আমায় পার করিয়া নিও॥

মো. আতাউর রহমানের গান

১
আমি পাগোল বলে
আমাকে কেউ ঢিল মারোনা
তুচ্ছ বলে যখন তখন
চড় দিওনা।
তোমাদেরই মত ছিল
আমার এ জীবন
আশা করে বেধেছিলাম
সুখেরই বাসর।

সুখের বাসর ছেড়ে হলাম
জঙ্গলের দোসর
আজ আমি জ্ঞান হারা
অসাড় এ জীবন।
অন্ন, বস্ত্রের নাই ভাবনা
আমি চলি পথে
ভালোবাসে কেউ আমাকে
কাপর পড়ায় কষে
কেউবা আবার চড়াও হয়ে

www.pathagar.com

লাঠির আঘাত করে
জ্ঞানহারা মানুষ আমি
ঘুরি দ্বারে দ্বারে।

২
মাঝি সাজাও তরী
উড়াও পাল
জোৎস্না চাঁদনি রাতে
ভাসব মোরা খাইব দোল
জয়ন্তিরই স্রোতে।
চৈত্র মাসের মৃদু হাওয়া
চাঁদের রাতের আলো
ঢেউয়েরই সাথে মিশে আছে
দেখতে লাগে ভালো।
জলদি করে ও মাঝি ভাই
সাজাও তোমার তরী
রঙ্গিন পাল উড়াইয়া দাও
আর করনা দেরি।
চলছে তরী ধীরে ধীরে
বইছে মৃদু হাওয়া
কুল কুল সুর ভেসে যায়
জলে ঢেউয়ের খেলা।
আসমানেতে পূর্ণিমার চাঁদ
হাজার তারার মেলা
জলছে কুপি জয়ন্দিতে
ভাসছে কত ভেলা।
নোঙ্গার করা রঙ্গিন নাও
ভাসছে জলে ভেলা
অবাক দৃষ্টে চেয়ে দেখি
জলের উপর মেলা।

৩
আমি কি বলিব দুঃখের কথা
হৃদয় বড় বান
ভালোবাসা জীবনের
গুড়ে খান খান।
ভালোবাসা অনুরাগ

www.pathagar.com

মায়ার বাঁধনে
হৃদয় রেখেছে তারে
কতনা যতনে।
স্বপ্ন ছিল যারে নিয়ে
বাঁধব সুখের ঘর
সে জন গেল বহুদূর
আমায় করে পর।
আমি যেদিক তাকাই
সে দিক দেখি মরু বালুচর
ভালোবাসার অনলে
পুরে ছারখার।
ভালোবাসার প্রতিদান
দুঃখ অপমান
ব্যথার নদীতে আজ
বইছে তুফান।
[গ্রাম : গলইভাঙ্গা, ডাকঘর : গাছুয়া, উপজেলা : মুলাদী, জেলা : বরিশাল]

রবি সরকারের গান

১
বজ্র কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন করেন দেশ
যাঁর নাইরে গুণের শেষ।
ভোগে রাওয়াল পিণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে যাতনা অশেষ॥
যাঁর নাইরে গুণের শেষ।
সারাদেহ বরফে ঢাঁকে
তবু মুক্ত করতে চায় মাকে
করুণ কণ্ঠে মা বলে ডাকে।
গোলাবারুদ ভরে বন্দুকে
ভীষণ ভয় দেখায় বঙ্গবন্ধুকে
অসীম সাহস বুকে
নাই মাত্র ভীতির লেশ॥
যাঁর নাইরে গুণের শেষ।
সাংগঠনিক সংগ্রামী আন্দোলন
ঘটালো যে মহা মিলন
অপূর্ব প্রেমানুশীলন।
অবদানের প্রতিদান দিতে
কি আছে বাংলার মাটিতে
দুষ্কৃতের হাতে শেষ নিশ্বাস নিঃশেষ

www.pathagar.com

যাঁর নাইরে গুণের শেষ।
না চিনে জাতির জনকে
ভেঙ্গে দেয় সুখের স্বপনকে
চির পর করল আপনকে।
কি করব রে, কোথায় যাব
এমন মহান নেতা আর কি পাব?
সুসময়ে বিষময় পরিবেশ॥
যাঁর নাইরে গুণের শেষ।
মানলে শোসকের তালিকা
পেত স্বর্ণ অট্টালিকা
মনিময় রত্নের মালিকা।
মুজিব কীর্তি বিবরণী
বইবে জীবনভর সবুজ বরণী
রবি কয় নিয়ত শুনি মুজিব সুর রেশ॥
যাঁর নাইরে গুণের শেষ।

২

জয়বাংলা, জয়বাংলা, জন্মভূমির জয়
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।
ঐ যে বর্জ কণ্ঠে জাতির পিতা দিতেছে অভয়॥
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।
যাঁর যা আছে নিয়ে দাঁড়াও, দেশ হতে বিদেশী তাড়াও
ডোবা খানায় নিয়ে ডুবাও শত্রু হবে ক্ষয়।
হবে মুক্তি যুদ্ধের, এদেশ মুক্ত অন্যভাবে নয়॥
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।
বীর ভোগ্যা, বসুন্ধরা বীর বাঙ্গালি এই আমরা
খসাব শোসকের চামড়া, নাহিকো সংশয়
মুক্তিযুদ্ধে দেখাইবো শক্তির পরিচয়॥
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।
বাঙ্গালি এক মায়ের সন্তান মুসলিম-হিন্দু-বোদ্ধ-খ্রিস্টান
গড়ব স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, অভিন্ন হৃদয়।
হবে মোগল পাঠান খানের বংশ ধ্বংস সুনিশ্চয়॥
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।
শোন হে দালাল রাজাকার
দেশ সেবায় দেল কর পরিষ্কার
জয় বাংলা বলে হুংকার
মার এসময়।

www.pathagar.com

কার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল
করি রবি কয়॥
বঙ্গবন্ধু পিছে আছে নেই কোন ভয়।

৩
মুক্তিযুদ্ধের দামামা ঐ বাজে অবিরল
চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।
জাতির জনকের দেয়া নাম জয় বাংলা বল
চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।
আমরা হবো জয়যুক্ত
স্বদেশকে করব মুক্ত
যুদ্ধ করার উপযুক্ত বীর বাঙ্গালীর দল।
বইবে মোঘল পাঠান খানের রক্তে
শ্রাবণের বাদল
চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।
ইয়াহিয়া আর আয়ুব খাঁ
এই পাপিষ্ঠ যায় কি রাখা
ভেঙ্গে ঐ শোষকের আঁখা
করব বেদখল
স্থপতির বাংলাদেশ স্বপ্ন করবরে সফল
চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।
দালাল রাজাকার পদলেহি হুঁশিয়ার গোত্যন্তর নেহি
দেহে রাখলে হলে দেহি
সোজা পথে চল্।
ছেড়ে দে ভাই ধাতু শূন্য ছাতু খোরের ছল॥
চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।
মনকে কর বঙ্গ কেন্দ্রীক
জাতির পিতার বিধান সঠিক
এখনও হও দেশপ্রেমিক
যাবে অমঙ্গল
রবি কয় যুদ্ধে কাটবে
পরাধীন শৃঙ্খল

www.pathagar.com

চল্ চল্ চল্ ভাইরে
মুক্তিযুদ্ধে চল।

৪
সুজলা সুফলা শ্যামলা সোনার বাংলা নাম,
সকল দেশের চাইতে ভাইরে বাংলার বেশি দাম,
নদী মাতৃক সুখ শান্তির দেশ মিলে সব আরাম॥
বাংলাদেশ হয় অগ্রগণ্য,
কবিদের কবিত্বের জন্য,
বিশ্বকবি বিশ্ব বরেণ্য,
বিশ্বময় সুনাম,
বিদ্রোহ কবিতায় শ্রেষ্ঠ নজরুল ইসলাম॥

চারণ কবির কাব্য দৃশ্যে,
চমক লাগায় সারা বিশ্বে,
বিতণ্ডা হয় গুরু শিষ্যে,
কল্পনার কাঠাম,
ছন্দ দিয়ে ছবি তোলেরে দেখতে সুঠাম॥

সুর শিল্পী পাগল বিজয়
পাণ্ডিত্যে নিশিকান্তের জয়,
রসভরা রসিক রসময়,
স্বচক্ষে দেখলাম।
ভাবে ডুবে পাগল রাজেন্দ্র হয়েছে নিষ্কাম॥
কবি গুরু হরি আচার্য, চারণ কবির হয় আচার্য,
অলৌকিক তারকের কার্য
পরিচয় পেলাম,
যার নামে ভয় পায় কাম কামনা ব্যারাম॥
রাজেন কালা আর অনাদি,
কবি বিনোদ যুক্তিবাদী
হরিবর মনোহরাদি,
তাঁদেরও এই ধাম,
রবি কয় কবির জননী লহ মোর প্রণাম॥

৫
মায়ার এই সংসারে এসে সুখের সীমা নাই,
মায়ার সেবাতে রাত্র দিবাতে কি যে আনন্দ পাই,

www.pathagar.com

তোলা জলে স্নান অবগাহন মাখানো অন্ন খাই॥

প্রাতঃ কৃত্য মূল মাহাত্ম করতে সমাধান,
চাওয়ার আগে যা যা লাগে কি সুন্দর যোগান,
আমি মার পরাণের পরাণ বাস্তবে দেখি তাই॥

সেবায় পরিপাটি মাটি নাই কোন ভুল ত্রুটি,
নিরিবিলি যত্নে রত নাইকো ছুটাছুটি,
ধ্যানে মগ্ন আখি দুটি, অশ্রুজল বোঝাই।

বহু জন্মের সাধনের ফল আমার এই পাওয়া,
আবহমান রবে বহমান বাৎসলের হাওয়া,
আমার জীবনের শেষ পাওয়া চাওয়া
বলি হারি যাই॥

ওগো মাগো মায়া, দেবী, আমার দাবী লবি
বাজে দেখা বন্ধ করে দেখিস গুরুর ছবি।
রবি বলে পাবি সবই, নিষ্ঠা রতির গতি চাই।

নুরুল আমিন চৌধুরীর গান

১

ও গেছে তুই গেল্‌হি কোম্মে
তাড়াতাড়ি আয়
আছমির পোয়ায় গড়া দেছে
মাছ ধরতে বোলায়॥
আছমির পোয়ার গড়া দেছে
মোল্লাবাড়ির খালে
ফাউল্ল্যা পাইত্তা তিনডা বোয়াল
পাইছে বেইন্না হালে (হ্যারা)
হেইয়ার লইগ্যা খামু মোরা
তরাতরি আয়।
একটা দউড়ে খালিক কারে
এ্যাহন কইয়া আয়
বাবো যাইবে মাছ ধরতে
ছ্যাত কইর‍্যা বোলায় (তোমারে)
হ্যারে লইয়া যামু মোরা
তিন তক্তার ডোংগায়॥

www.pathagar.com

২
ছোট্ট কালে বাপে মরছে চাচার হাতে থুইয়া
হেইলা চাচায় কয়না কতা নিজের পোয়া পাইয়ারে
অকুলে ভাসাইলি মোর আল্লারে
হারে নিদানে ভাসাইলি মোর আল্লারে॥
চাচার পোয়ায় ল্যাহে পড়ে
হাই স্কুলে যাইয়া
মুই হেকালে গরু রাহি
চডানেতে বইয়া রে॥
চাচার পোয়ায় ফুটবল খেলায়
বন্দু বান্দব লইয়া
মুই হেকালে গরু আনি
ছাড়াবাড়ি যাইয়া রে॥
চাচার পোয়ায় ভাত খায়
মুরহার কইলজ্যা দিয়া
মোরে চাচী ভাত দেয়
মরিচ পোড়া দিয়ারে॥

৩
মোর পরানডায় শান্তি পাইলাম বাংলায় জন্ম লইয়া
ভাইট্যাহালে নাও বাইয়া যাই ভাডির গান গাইয়া॥
হাউজ্জাহালে আত পাও ধুইয়া উডানেতে বইয়া
এসমাইল পল্লান জারি গাইতো সারিন্দা বাজাইয়া
বাংলা ভাষার নাহান ভাষা পামু না বিছরাইয়া॥
মায়ের ভাষা কাইর‍্যা নেতে চাইছিল যে ওরা
বোহের রক্ত দিয়া ভাষা কাইর‍্যা আনছি মোরা
পরাণ গ্যালেও এই ভাষাতে যামুরে গান গাইয়া॥
হারা দুন্নইর মানে কয় মোগো দেলডা জম্মের শক্ত,
যহন তহন ভাষার লাইগ্যা দেতে পারি রক্ত
সালাম, রফিক, শফিক গ্যাচে হেই পোতটা দ্যাহাইয়া।

৪
মোগো দ্যাশের নাহান দ্যাশ কুম্মে আছে
হারা বচ্ছর ফুলে ফলে ভইর‍্যা থাহে গাছে॥
দইওন পক্কির গান হুইন্যা ঘুমে গোনে উডি
পান্তা ভাত খাইয়া কোলায় পাহা ধান কাডি
হউর‍্যা খ্যাতের ফুল দেইখ্যা পরানডা মোর নাচে॥

www.pathagar.com

দুহইর‍্যা হালে গুরা গারায় ডুবায় খালে যাইয়া
কোন দ্যাশে এই রকম খাল পামু না বিছরাইয়া
ঘুঘু পক্কির দুহইর‍্যা হালে বোলে গাছে গাছে॥
ঝি বউরা যায় পানি আনতে ঠিলা লইয়া ক্যাতে
গাজী কালুর পুতি হুইন্যা, ঘুমাই বেইন্যা রাইতে
এইরহম সুন্দর দ্যাশ দুইন্নইর কুম্মে আছে॥

৫

মোগো দ্যাশের সুনাম দুন্নইর হগন মানের মোহে
হেইয়ার লইগ্যা ব্যাবাকেক আয় দ্যাখতে নিজের চোহে॥
হুগলডির মাতা ঘুইর‍্যাযায় সুন্দইর বোন দেইখ্যা
চরে যাইয়া ছবি উডায় গায়ে কাদা মাইখ্যা
রয়েল ব্যাঙ্গল দেইখ্যা হ্যাগো ধান্দা লাগে চোহে॥
মোগো দ্যাশে আজার আজার আছে নদী খাল
জাইল্লারা মাছ ধরে দ্যাহো পাইত্যা ভ্যাশাল জাল
ইলশা মাছ আর পাংগাস খাইয়া ত্যাল লাইগাছে মোহে॥
মোগো দ্যাশে আইয়া খায় হ্যারা ডাব নাহইল আর ক্যালা
যে দিক আইয়া চাইয়া দ্যাহে চত্তির মাইশ্যা ম্যালা
দ্যাশে যাইয়া এই দ্যাশ লইয়া মনের সুহে ল্যাহে॥

৬

১. ল্যাহা পড়া হিক্যা ভাইরে হরছি একটা বড় ভুল
চারিদিকে আন্ধার ভাইরে চোহে দেহি হউর‍্যা ফুল॥
বাবার ধারে টাহা চাইলে চউক উল্ডাইয়া মোরে
কয় সব খুয়াইছি ল্যাহা পড়া হরাইতে খাইয়া তোরে
কি করমু কুম্মে যামু বইয়া হিরি মাতার চুল।
চাকরির লইগ্যা হারা দ্যাশে ঘুরলাম কত ভাই
কয় টাহা ছাড়া কোন হানে চাকরির আশা নাই
গলায় দড়ি দিয়া মরমু কিনা ভাইব্যা পাইনা কোন কুল।
২. যুব উন্নয়নে যাইয়া ক তোর দুক্ষের কতা
হ্যারা বোঝে যুবগ ভাইগো হগল দুঃখ ব্যথা
কারিগরি শিক্ষা নিয়া প্রয়োজনে ঋণ নিয়া
গইর‍্যা তোল নিজের কুল॥

৭

কীর্তন খোলার মাঝি ভাই মোর কাওয়ার চরে বাড়ি
মোর বাপের নামডা কাউল্লা মাঝি

www.pathagar.com

মায়ের নাম আল্‌হে পরি॥
এই নদীতে খেওয়া বাইছে মোর বাপ চাচায়
দশ বৎসর বয়সে খেওয়ায় উডাইছে মোর বাবায়
ঝড় বইন্যা মাতায় লইয়া আইজো
নদীডা দেই পাড়ি॥
মোর বাপ চাচারে খাটছে গিল্লা
কীর্তন খোলার পানি
মোরেও একদিন খাইবে গিল্লা
হেইডাও মুই জানি
মোর মাইয়া পোয়া এতিম অইবে
বউডা অইবে রাড়ী॥
এই নদীডায় বানছে মোর ভালোবাসা দিয়া
হেইয়ার লইগ্যা থাকতে পারিনা ঘরের মধ্যে হুইয়া
আমনেরাই কয়েন বাপ দাদার ফল
মুইকি ছাড়তে পারি॥

৮
ক্যাম্মে থাকমু এ্যালহা মুই
আনধাইর‍্যা কয়বোরে
মরণের কতা মনে অইলে
বুকটা ধরপর হরে॥
ময় মুরুব্বিরা কত কইছে রোজা নামা হরতে
খ্যালা ধুলার লগে কইছে সুরা কেরাত পরতে
হ্যাগো কতার ধার ধারি নাই
গায়ের ত্যালের জোরে॥
পাগলামি ছাগলামি থুইয়া
ধরছি নামাজ রোজা
জেম্মে অউক মারফ করামু
মোর গুনাহের বোঝা
গুনাহ মাফ কইর‍্যা আল্লা
ভেস্ত দিও মোরে॥

৯
আমায় প্রেম শিখাইয়া চইলা গেল
দিলনা ঠিকানা
আমি ভালো ছিলাম নিজকে নিয়ে
এখন গলায় কলংকের মালা॥

www.pathagar.com

কোনবা দেশে থাকে সখি
কোনবা দেশে ঘর
বলে দিতে পারো কি কেউ
বন্দুয়ার খবর
নিজের দুঃখে নিজে মরি
যায় না কোথাও বলা॥
বন্দু যদি নাহি আসে
এ জীবন থাকিতে
নিজের জীবন দান করিব
বন্দুয়ার পিরিতে
বিষের বড়ি খাইয়া সখি
জুড়াইব জ্বালা॥

আ. সাত্তার চৌধুরীর গান

১

কওছেন দেহি এ্যাহন মুই এ্যালহা এ্যালহা কি হরি
হাতদিন ধইর‍্যা ন্যাভাই মোর উইঠ্যা রইছে হউর বাড়ি॥

বাবায় হরে রাগারাগি ন্যাভাইরে কয় আস্তে
ন্যাভাই মোরে কইয়া গ্যাছে গরু বাছুর বাস্তে
আর কোলায় কামে নাসতে
মাজই বড় আনাডা হরতে চায়না কোনডা
হুদা হুদি গেল কাজে ন্যাভাই লগে দেয় আড়ি॥

অল্প সল্প জাগা জমি চারি বাদা কেওর নাই
আল আলুডি ছাড়া মোগো নাইরে কোন
বেইন্না রাইতে কোলায় জাই হাউজ্যা হালে বারতে আই
আত পাও বুইয়া খাইয়া লইয়া অলগন্তে হুইয়া পরি॥
ভাইট্যা হালে খাল হুগাইলে কান্দে লইয়া পোলো জাল
খালে বিলে মাছ ধরি মুই ইলশা ফাটলশ্য হউল বোয়াল
ডেহির হাক আর কলইর ডাইল দায় ঠেইক্যা খাচ্ছি কাইল
আইজগো কোন জাইলদা চিংগইর ধরমু
কোমের পক্ষে এক আড়ি॥

২

দুই সতীনে ঝগড়া কইরা স্বামীর কাছে বিচার চায়
এই বার স্বামী বাকছে বিষম দায়॥

www.pathagar.com

বুক ভাসাইয়া নয়ন জলে ছোট্ট বিবি কাইন্দা বলে
নিত্য নিত্য আমার থালে ভাত বাড়িয়া যায়
আমার জোতা দিয়া পায় এ বাড়ি ও বাড়ি যায়
আমি কোন কাম জানিনা পাড়ায় পাড়ায় কুনাম গায়।

পচিশ বৎসর এই বাড়িতে খাইটা পাইটা দিনে রাইতে
ঘর বান্দিলাম নিজের হাতে বড় বিবি কয়
ঘরে পাইয়া মাগনা সালিশ আগে আগে কর নালিশ
উচিত বিচার কইরো এবার ধরি তোমায় দুটি পায়॥
স্বামী তখন কি আর করে কাছে ডাইকা দুই বিবিরে
আস্তে আস্তে বুঝাইয়া কয়
দ্যাখা শুনা করতে এসব একার পক্ষে হয় না সম্ভব
উচিত বিচার করতে হলে আর এক বিবি আনতে হয়
ধন্য স্বামী ধন্য তোমার রায়।

স্বরূপেন্দু সরকারের গান

১

ভাটির নাইয়া যাওরে বাইয়া আমার পরান বন্ধুর কাছে।
তারে যাইও কহি, সে বিরহী আজো বেঁচে আছে (রে)॥
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি সাত সাগর দিতে হয় পাড়ি
কি করি সংসার টানিছে পাছে।

স্বরূপেন্দু সরকারের গান গাইছেন সংগীত বিষয়ক গবেষক
অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বয়ম্ভূ সরকার

www.pathagar.com

আমি সংসারের আবর্তে পড়ি তবু তারে মনে করি
বুঝি সে আমারে ভুলিয়া গিয়াছে।
যদি পাখির মতো পাখা পাইতাম এক নিমিষে উড়ে যাইতাম গো
শেষে মনের কথা খুলে কইতাম এক নিমিষে উড়ে যাইতাম গো
শেষে মনের কথা খুলে কইতাম পরান বন্ধুর কাছে (রে) ॥
কি করিত পাহাড়, নদী, বিধি না হলে বিবাদী
অবলা না করত যদি পাছে।
আমি হতাম যদি বিলের টগর, পাড়ি দিয়া নদী সাগর
ভেসে ভেসে যেতাম বন্ধুর কাছে।
যদি আমি কবি হইতাম মনের কথা লিখে জানাইতাম গো
তারে নারী হয়ে দেখতে কইতাম কেমনে সে বাঁচে (রে) ॥
স্বরূপ কয় তার রূপের ছটা লাগিলে দুরন্ত লেঠা
ঘনঘটা মেঘে ঘিরে পাছে।
ও রূপ চোখে লেগেছে যার দিবারাত্রি জ্ঞান নাহি তার
তার হৃদয় বীণার তার ছিন্ন হইয়াছে।
কেন তবু তায় না পারি ভুলতে কেন পারি না তার বাঁধন খুলতে গো
নাইয়া ভুলো না তাহারে বলতে এই কামনা যাচে (রে) ॥
[২ ভাদ্র বুধবার ১৩৭৭ ॥ শ্রীরামকাঠি থেকে বরিশাল চলার পথে]

২
রব কি সুখে আর ঘরেতে সইরে প্রাণপাখি যদি গেল চাড়িয়া।
জ্বলে মনের আগুন সহস্রগুণ জীবন ভরিয়া ॥ সইরে–
হৃদমাঝারে পুষেছিলাম সোনার পরান পাখি
আগে যদি জানিতাম সে দিবে মোরে ফাঁকি, তবে দোর কি খোলা রাখি।
হলো জীবনে মোর জ্বালা যে কি পাখি উড়িয়া ॥ সইরে–
তারি তরে কি যে জ্বালা জানিল না কেউ
কী বেদনায় নদীর বুকে ওঠে পড়ে ঢেউ, তাকি খুঁজে দেখে কেউ।
সাধে কি কাঁদে কুলের বউ পতি ছাড়িয়া ॥ সইরে–
স্বরূপ কহে স্বরূপেতে চাও যদি তারে
হৃদয় করো ব্রজভূমি নামের ঝঙ্কারে, বসে ত্রিবেণীর পারে।
পাবে দিনের শেষে পাখিটিরে নীড়ে ফিরিয়া ॥ সইরে–
[২২ শে চৈত্র শুক্রবার (পথে) ১৩৬৯ ॥ বলইকাঠি বরিশাল]

৩
তোমার জীবন তরণী মাঝি বাইয়ো, বাইয়ো রে সাবধানে।
যেন কাম নদীর গোলাতে তরী নেয় না ভাটির টানে ॥

www.pathagar.com

এ নদীতে যদি কেহ বাইতে চাহে নাও
পারে নকো বিনে গুরুকৃপা পুবাল বাও।
হোক না তার ময়ূরপঙ্খী নাও বাঁধা ভক্তিজ্ঞানে–
শুধু বাঁকা চোখের ইশারাতে মারা যাবে প্রাণে ॥

ইশারাতে সারা হতে নাহি যাহার মন
মাতৃনামের বেড়া দিয়ে দাঁড়াবে সে জন।
কুজন হইবে সুজন পঞ্চরস সাধনে–
ও তার কামনা সব ধুয়ে যাবে প্রেমের তুফানে ॥
কাম কামনা না রলে নায় ভয় থাকে না তারি।
সহজে উঠে পাড়ি লাগে না জলের বাড়ি।
সহজ নহে সহজ যাহা সাধি গোপীগণে–
তাঁরা ব্রজের ঘাটে নাও ভিড়াল লভি কালাচানে ॥

তাঁর হয় কাল আছান রয় কালাচান তরণীতে যাঁর
শত বাধা ঠেলে তরী ভিড়ে তাঁর কিনার।
তারা আগে করি আমিত্ব নাশ ছাড়ে তরী গোনে
কেবল স্বরূপ রূপের নেশায় সারা জীবন উজান টানে ॥
[৭ ফাল্গুন শনিবার ১৩৭২ ॥ সাগরিকা হোটেল বরিশাল]

৪

সব হারায়ে নদীর কূলে ভিখারির মতন মনরে ভোলো এখন কেন কাঁদিস অকারণ।
আপন কর্মদোষে সর্বহারা বুঝে দেখ এখন ॥
সকাল বেলা ভাবলি রে তুই এমনি যাবে দিন
ব্যয় করিলি আয় না করে তাই তো এতো ঋণ।
এখন একা নদীর কূলে, কাঁদিস বসে ফুলে ফুলে
ঐ দেখ সাথিরা তোর বাদাম তুলে জোয়ারে দেয় গোন ॥
হাতের পাঁচ যাহা ছিল হারালি হেলায় এখন মিছে কাঁদলে কি লাভ অপর বেলায়।
জীবন ভাবলি ছেলে খেলা, তাই ত্বরা ফুরায় আয়ু বেলা
এখন যেদিক চাহিস দেখিস ঘোলা, হয়ে গোলাতে পতন ॥
আকুল হয়ে ফুলের নেশায় করলি যেবা ভুল তাঁহার পরিণামে এখন হারালি দুকূল।
ভাবলি যারে আপন বলি, সেই তো তোরে দিল বলি
এখন কার কাছে জানাবি বলি, মনেরি বেদন ॥
স্বরূপ কহে অপরূপ যা সংসারে দেখিস
ঝুপ করে ডুব দেবার আগে অদূরে থাকিস।
গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে, ভালো করে নে চিনিয়ে

www.pathagar.com

হিসাব কর আলি কি নিয়ে, কি আছে এখন ॥
[১৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার ১৩৭৩ ॥ সাগরিকা হোটেল, বরশিল]

৫
হারে ও নিঠুর কালারে আগে জানলে,
আগে জানলে, পিরিতি আমি করতেম না।
পিরিতি করিতেম নারে, জ্যান্তে মরা মরতেম না–
তবে অবেলায় কালিন্দীর কূলে জল ভরিতে যাইতেম না ॥
শুনেছি পিরিতির মাঝে শুধু সুধা ভরা
সেই ভরসায় ডুব দিয়ে প্রেম পাথারে কূলহারা।
এতো নিঠুর প্রেমের ধারা জানলে এ পথ ধরতেম না–
ডাল ভেঙে পড়তে হয় জানলে, প্রেম গাছেতে চড়তেম না ॥
অবলা রমণী আগে জানতেম না এর কিছু
কাল হলো ঐ কালার বাঁশি যখন নিল পিছু।
এখন মর্মে দংশে হাজার বিছু ঘরে রইতে পারলেম না–
ঘরে পেলে মনের মতন রতন পরকে যতন করতেম না ॥
ঘর ছাড়িয়া পরকে এখন আপন মনে করি
গুরুজন নিন্দা সহি দিবস শর্বরী।
কি জ্বালা সব কাল হেরি, জানলে ওরূপ হেরতেম না–
শুয়ে পিরিতি পালঙ্কের পরে তবে কলঙ্কের হার পরতেম না ॥
স্বরূপ কহে কালো ছেড়ে পালাবি কোথায়
জনম কালো মরণ কালো কালো ভুবনময়।
যদি আলোর পাছে কালো না যায়, আলোর দাম বাড়িতে না–
আলা কালা দুই না রলে মধুর হয় না জোছনা ॥
[৫ আষাঢ় রবিবার ১৩৭২ ॥ চরবানিয়ারি বাগেরহাট]

গণেশ পাগলের গান

গোপাল গঞ্জ জেলায় গণেশ পাগলের আশ্রম রয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য শিষ্য এবং ভক্তের মধ্যে আগৈলঝাড়া, গৌরনদী এবং বরিশাল সদর উপজেলার এই গান গেয়ে থাকেন। শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী সুধীর তালুকদার, প্রবীর বিশ্বাস ননী, রতন শীল অন্যতম।

১
সাধনাতে ছিল সঠিক
দুলী ফুলী বিন্দুতে ঠিক
নিরানন্দ যাবে সঠিক প্রেমানন্দে ভাসিয়া।
জ্ঞানের খড়্গ নিয়ে হাতে

www.pathagar.com

দেখা দাও আজ আঁধার রাতে কাটো অজ্ঞান তিমির অন্ধকার
স্বরূপ প্রকাশিকা।
পদ্মার জলে নাও ডুবিলে
ঘাটে বসে জল সেচিলে
কত যে লীলা দেখালে কত জায়গায় বসিয়া।
এদিন বরি বলে খেলা চালাও প্রেমের মেলা সদা মিলাও
নিত্য লীলা নিত্য দেখাও মর্তধামে আসিয়া।

২
প্রণমি চরণে গণেশ
স্থান পাই যেন তোমার রাঙ্গা পায়,
তুমি ঠেলিও না পায় এই অসময়,
নইলে দাঁড়াই আমি কার ছায়ায়
বাস করি তোমার বাঁধা বাড়ি
ও গণেশ তোমায় মনে নাহি করি
তোমার নামে ঝরে না বারি
পাড়ি কি আমার উঠবে হায়
আমি অতি অত্যাচারী
কত পাপ করেছি এই দেহধরি
তুমি নিজ গুণে ক্ষমা করি
পৌঁছাইয়া নেও তরী কিনারায়
কানাই কাঁদে গোলায় পড়ি
পাগল তুমি বিনে চলেনা তরী
তুমি নিজে এসে হও কাণ্ডারী
গণেশ নইলে তরী আমোর ডুবে যায়।

৩
থাকতে সময় পাগল বলরে ওরে আমার মন
এ দুর্দিনে পাল বিনে কি আছে তোর আপন জান।

গণেশ নামের দোহাই দিলে ডোবা তরী ভাসে
দুগাপুর মনোহর সরকার তাহার প্রমাণ আছে,
ও তার নৌকা ডোবে পদ্মার মাঝে গণেশ করে নৌকার জল সেচন
ঐ ...
মনোহরের নৌকা যখন পদ্মায় ডুবে যায়
উচ্চস্বরে ডেকে বলে পাগল রহিলে কোথায়

www.pathagar.com

বুঝি এই অসময় প্রাণ যে যায়
গণেশ আমি অতি অভাজন
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু রাখতে ভক্তের মান
নিজ হাতে ধামা ধরে পাগল করে জল সেচন,
অধম কানাইয়ের নাই সাধন ভজন গণেশ নিজ গুনে দাণ চরণ। ..... ঐ

৪
পাগল তোমার লীলার কথা কি বলিব আর
তোমার লীলা বোঝার মতো সাধ্য আছে কার।
আমমবস্যার পূর্ণিমার চাঁদ মাকে দেখালে
কত নিঃসন্তান সন্তান পেল তোমার কৃপার বলে
আবার পদ্মার মাঝে নৌকা ডোবে বাড়ি বসে করে।
আদিত্য নামে এক ছোট ছেলে একবার পড়ে গেল জলে কৃপা করে।
কৃপা করে তারে তুমি লইলে তোমার কোলে
তারেও তুমি জীবন দিলে সত্য সমাচার।
সর্পে দংশে জমিদার পুত্র কুমিল্লা জেলায়,
৬ দিন পরে পাগল তথায় গুরুচাঁদ সহ যায়
দুলী ফুলীর দোহাই দিয়ে পাগল জীবন বাঁচায় তার।
অধম ব্রজেন বলে পাগল আমার মিনতি নিও
জীবন সন্ধায় তুমি এসে পার করিয়ে দিও,
তোমার চরণ বিনে পাগল আর বাসনা নাই...ঐ

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

১. শিঙ্গা

প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শিঙ্গা বহুল পরিচিত। সংগীত জগতের সংগে শিঙ্গার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও শঙ্খের মতো প্রাচীন লোকসমাজে শিঙ্গার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে যুদ্ধকালীন শিঙ্গার সংকেত দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সৈন্যদলকে নির্দেশ দেয়া হতো। গঠন রীতির দিক থেকেও শঙ্খের সাথে শিঙ্গার যথেষ্ট মিল রয়েছে। মহিষের শিং- এর সরু প্রান্তে ছিদ্র করে জোরে ফুঁ দিয়ে শিঙ্গা বাজানো হয়। বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও এই লোকবাদ্যটি প্রাচীন লোকসমাজে প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল। লোক বাদ্য শিঙ্গার ব্যবহার লোকধর্মমত মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনা পরিলক্ষিত হয়। মতুয়ারা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে শিঙ্গা বাজিয়ে থাকেন। বিশেষ করে মতুয়াদের আরাধ্য গুরু হরিচাঁদ গোসাঁইয়ের জন্ম বা মৃত্যু তিথিতে অনুষ্ঠিত উৎসব, নবান্ন, ওরাকান্দির উদ্দেশে ধর্মযাত্রাকালীন তারা শিঙ্গা বাজিয়ে থাকেন।

ঢোল, শিঙ্গা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র

www.pathagar.com

২. ঢাক/ঢোল

অন্যান্য লোকবাদ্যর তুলনায় ঢাকের আকৃতি বৃহৎ। পিপা আকৃতির কাঠের খোলের দুই মুখে চামড়ার আচ্ছাদন থাকে। বাজানোর সময়ে এক মুখে দুই ধরনের কাঠি দিয়ে ঢাক বাজানো হয়। এই অঞ্চলে আকৃতি অনুসারে ঢাক বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন জয়ঢাক, বীরঢাক ইত্যাদি। জয়ঢাক আকৃতিতে বৃহৎ। এবং এর শব্দও অনেক বেশি। বীরঢাক আকৃতিতে ছোট। কাঁধে নিয়ে এই ঢাক বাজানো হয়।

শব্দের প্রচণ্ডতার কারণে সংগীত বা নৃত্যের ক্ষেত্রে ঢাকের তেমন ব্যবহার নেই। তবে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃহত্তর বরিশালে বিভিন্ন পূজার সময়ে ঢাকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। খোলের ন্যায় এই আনন্দ বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহারও অতি প্রাচীন। পাহাড়পুর এবং ময়নামতির প্রস্তরগাত্র এবং ফলকেও ঢাক চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া ধর্মমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলে যুদ্ধের বর্ণনায় ঢাকের উল্লেখ রয়েছে। জয়ঢাক বরিশাল অঞ্চলের সৃষ্টি বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। জেলার পূজানুষ্ঠান ঢাক ছাড়া ফিকে মনে হয়। বরিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন পূজা, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে, অন্নপ্রসন্ন অনুষ্ঠানে বাজনা আনা হয়।

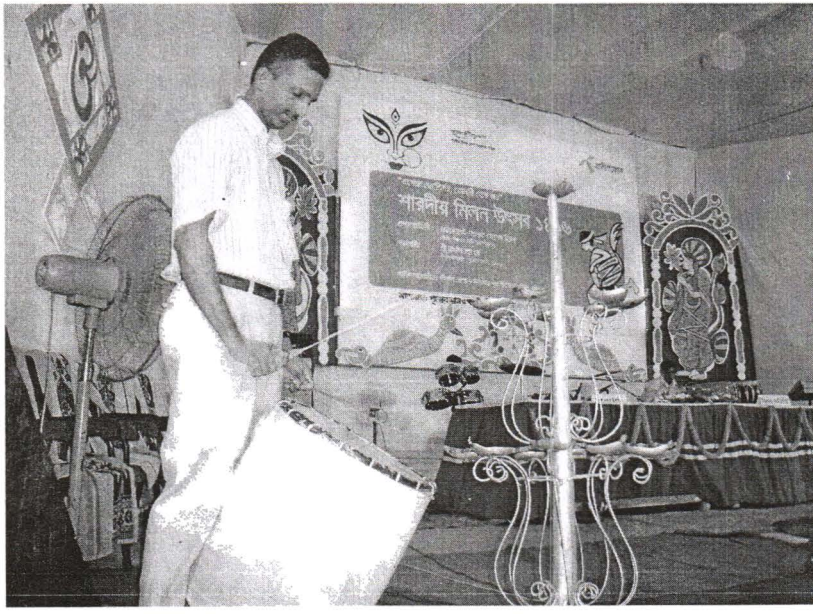

ঢাক

www.pathagar.com

স্থানীয়দের মতানুসারে জয় ঢাকের উৎপত্তি বরিশাল অঞ্চলের শিকারপুরে। পূজা-পার্বণে ঢাক বাজানো হয়। এছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে, অনন্নপ্রাসন, বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানেও ঢাক বাজানো হয়।

ঢাকের সংগে কিছুটা সাদৃশ্য থাকা এই লোকবাদ্য যন্ত্রটিও আনদ্ধ শ্রেণির। এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে ঢোল নামের এই বাদ্যযন্ত্রটির ভূমিকা ব্যাপক। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে মুসলমানগণ এই অঞ্চলে ঢোল নামের বাদ্যযন্ত্রটি আমদানি করে। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু সেতার, রবার এবং তবলার মতো ঢোল উদ্ভাবন করেন। ঢোল বাদকদের এক সময়ে এতোটা চাহিদা ছিল যে, এখানকার লোক সমাজের একটি সম্প্রদায় পেশা হিসেবে ঢোল বাজানোকে গ্রহণ করেছিল। ঢুলী নামের এই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী ঢোল বাজানোর পেশায় নিয়োজিত ছিল। ঢাকের মতো ঢোলও কাঠনির্মিত পিপাসদৃম দুই মুখ চামড়া আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্র বাঁ হাতের তালু এবং অঙ্গুলি আর ডান হাতে একটি কাঠি সহযোগে বাজানো হয়ে থাকে। জারি, সারি ইত্যাদি লোকসংগীত এবং বিভিন্ন লোকজ নৃত্যে ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়।

৩. শঙ্খ/শাঁখ

বাংলা তথা বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে লোকবাদ্য হিসেবে শঙ্খ বহুল পরিচিত। শুষির শ্রেণির এই লোকবাদ্যটির উল্লেখ প্রাচীন বহু গ্রন্থাদিতে রয়েছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধ ঘোষণার এবং সমাপ্তিতে শঙ্খের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সামুদ্রিক এক প্রকার শঙ্খ থেকে এই বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহারিক রূপ দেয়া হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে অতি সহজ কৌশলে শঙ্খ নির্মিত হয়ে থাকে। বন্ধ দিকে সঠিকভাবে ছিদ্র করে নিলেই শঙ্খ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়।

শঙ্খ

www.pathagar.com

বাদকের তীব্র ফুঁ শঙ্খের ভেতরকার পথ দিয়ে বের হওয়ার সময়ে গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে থাকে। আকৃতি এবং প্রকৃতি অনুসারে শঙ্খকে গোমুখ শঙ্খ, ধবল শঙ্খ, পানি শঙ্খ, পঞ্চমুখী শঙ্খ ইত্যাদি ভাগে বিন্যাসিত করা হয়।

সংগীতের ক্ষেত্রে শঙ্খের তেমন ভূমিকা না থাকলেও অদ্যাবধি এই বাদ্যযন্ত্র নি:সৃত শব্দকে মাঙ্গলিক ধ্বনি হিসেবে চিহ্নি করা হয়। বিদেশী সংগীতজ্ঞদের নিকট শঙ্খ ইন্ডিয়ান ট্রাম্পেট নামে পরিচিত।

৪. একতারা

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত এক তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মতো বরিশালেও একতারা নামের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। আকৃতি নির্মাণ উপকরণ ও এলাকাভেদে একতারার বিভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয়।

একতারা নির্মাণে পাকা লাউয়ের শুকনো খোলা ব্যবহার করা হয়। সেই সংগে নির্ধারিত মাপের এক টুকরো বাঁশের খানিকটা অক্ষত রেখে বাকি অংশ, চার সমান ভাগে চিরে বিপরীত দুই টুকরো বাদ দিয়ে লাউয়ের দুই দিক আটকে দেয়া হয়। তারপর এক টুকরো তার খোলের নিচ থেকে বাঁশের অক্ষত অংশে প্রবেশ করানো একটি কীলকের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়। তারটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কীলকটি ব্যবহৃত হয়।

তারের উপর তর্জনীর আঘাতে একতারা বাজানো হয়ে থাকে। সুর তোলা না গেলেও লোকসঙ্গীতে তাল ঠিক রাখতে একতারার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

বাউল সম্প্রদায়ের অতিপ্রিয় এই বাদ্যযন্ত্রটি এখানকার লোকসঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছেও জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিচিত।

৫. কাঁসি/কাঁসর

লোকবাদ্যের এক সুপ্রাচীন নিদর্শন কাঁসর। কাঁসর আকৃতিতে ছোট হয়ে লৌকিক গান বা এই ধরনের ছোট পরিসরে ব্যবহৃত হলে কাঁসি নামে পরিচিত হয়।

কাঁসার তৈরিচ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট থালাকৃতির এই বাদ্যযন্ত্রটির একপ্রান্তে ছিদ্র করে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে কাঠের কোনো দণ্ড দিয়ে আঘাত করে বাজানো হয়। তাল বাদ্য হিসেবে মাঙ্গলিক এই বাদ্যযন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৬. বাঁশি

দেশের অন্যান্য এলাকার মতো বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলেও বাঁশের বাঁশি সব থেকে জনপ্রিয় লোকবাদ্য হিসেবে চিহ্নিত। লোকসমাজে সকল ধর্ম এবং বর্ণের মধ্যে বাঁশের বাঁশির প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

অতি সামান্য উপকরণে অতি সরল প্রক্রিয়ায় বাঁশি তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণত এক টুকরা 'তল্লা' বাঁশ থেকে বাঁশি তৈরি হয়। দেড় থেকে দুই ফুট দৈর্ঘ্যের বাঁশের টুকরায়, নির্দিষ্ট দূরত্বের কয়েকটি ছিদ্র তৈরি করা হলেই বাঁশের বাঁশি তৈরি হয়ে যায়। শুষির শ্রেণিভুক্ত বাঁশির বেশ কয়েকটি প্রকরণ এই অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। আড়বাঁশি, কদবাঁশি, টিপরাবাঁশি, হরিণাবাঁশি, পাতাবাঁশি, নরবাঁশি, তুবড়ি ইত্যাদি তার অন্যতম। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের লোক সমাজে এবং লোকসংস্কৃতিতে বিভিন্ন প্রকার বাঁশি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাঁশি

৭. খোল

মৃদঙ্গ অর্থাৎ যার অঙ্গ মাটির, সেই আনন্দ বাদ্যযন্ত্রটি এই অঞ্চলে খোল নামে পরিচিত। প্রাচীন এই আনন্দ বাদ্যযন্ত্রটি চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের প্রভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে শ্রীখোল নামেও পরিচিত হতে থাকে। যদিও এক বিশাল সংখ্যক লোকবাদ্য বিশেষজ্ঞ বহু জটিল ও বিরল বোল বাজানো হয় বলে খোলকে লোকবাদ্য হিসেবে চিহ্নিত না করার পক্ষে। তা সত্ত্বেও বহুকাল ধরে লোকবাদ্যের বৈশিষ্ট্য বহন করা এবং লোকসমাজে বাদিত ও আদৃত হওয়ার কারণে খোল নামের বাদ্যযন্ত্রটিকে লোকবাদ্য হিসেবে চিহ্নিত করাই সমীচীন।

বিশেষ একধরনের মাটি দিয়ে সাধারণত খোলের চোঙ্গাকৃতির সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি হয়। এই কাঠামোর ডানদিকের ছোট মুখ 'ডাইনামুখ' এবং বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত

www.pathagar.com

বড় মুখটি 'বাঁয়ামুখ' নামে অভিহিত। উভয় মুখে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের জন্য তার উপর এক ধরনের তাপ্পি লাগানো হয়। ফিতার সাহায্যে গলায় ঝুলিয়ে বাদক দুই হাত দিয়ে খোল বাজিয়ে থাকে। সাধারণত কীর্তন এবং অন্যান্য লোকসংগীতে খোলের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

৭. হাঁড়ি

তবলার অনুরূপ এই লোকবাদ্যটির কমবেশি প্রচলন বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলেও দেখা যায়। তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও শ্রেণি বিন্যাসের দিক থেকে এই বাদ্যযন্ত্রটিকে লোকবাদ্যের কোনো শ্রেণি ভুক্ত করা যায় না। গঠনের দিক থেকে লোকবাদ্যে ব্যবহৃত হাঁড়ি মাটির পাতিলের মতোই। হাঁড়ির মুখের অংশ বায়া আর নিচের অংশ তবলার মতো ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র দক্ষ বাদক হাঁড়িতে বোল তুলতে সক্ষম। ব্যবহারিক দিক বিচারে হাঁড়িকে তবলার আদি সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৮. কত্তাল

বাংলার লোকসংগীতের সংগে উত্তালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। আকৃতি কিছুটা বৃহৎ হলেও কত্তালের প্রকৃতি এবং বাজানোর রীতি মন্দিরার মতোই। সাধারণত বৈষ্ণব কীর্তনে খোলের সংগে কত্তাল বাজানো হয়ে থাকে সে কারণে এই অঞ্চলে কত্তালের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

৯. মন্দিরা

সংগীতের তাল ও লয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য এই লোকবাদ্যটিকে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সংগে ব্যবহার করা হয়। কাঁসার তৈরি দুইটি উত্তল আকৃতির চাকতি বিশেষকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়ে মন্দিরা নামে পরিচিত হয়। ঘনবাদ্য শ্রেণির এই বাদ্যযন্ত্রটির মধ্যস্থলে রশি প্রবেশ করিয়ে চাকতি দুটিকে পরস্পরের সংগে আঘাত করে মন্দিরা বাজানো হয়। বৃহত্তর বরিশালের প্রায় সর্বত্রই ভক্তিগীতিসহ বিভিন্ন প্রকার লোক সংগীতে মন্দিরার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১০. দোতারা

একতারার মতো দোতারাও এই অঞ্চলের লোকসংগীতে ব্যবহৃত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রসমূহের অন্যতম। তাল দেয়া এবং সুর তোলার জন্য শ্রেণিভুক্ত দোতারার ব্যবহার করা হয়। দণ্ড এবং খোল এই দুটি অংশে চারটি তার লাগিয়ে দোতারা নির্মিত হয়। সাধারণত কাঠাল কিংবা নিম কাঠ দিয়ে দণ্ড এবং খোল নির্মাণ করা হয়। দোতারার খোল অংশ চামড়া আচ্ছাদিত থাকে। খোলের নিচের দিক থেকে চারটি তার

www.pathagar.com

চামড়ার আচ্ছাদনের উপরে বসানো এক টুকরো হাড় বা এ ধরনের একটা ধাতব টুকরোর উপর দিয়ে দণ্ডের মধ্যে টেনে নেয়া হয়। তারপর দণ্ডের মধ্যে লাগানো এক একটি কীলকের সাথে এক একটি তার শক্ত ভাবে প্যাঁচানো হয়। এই কীলকের সাহায্যে দোতারায় সুর বাঁধা হয়। সর্বক্ষেত্রেই কারুকার্যময় দণ্ড দোতারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দোতরা নাম হলেও এই বাদ্যযন্ত্রটি নির্মাণে সাধারণত চারটি তার ব্যবহার করা হয়। সুরসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যতার কারণে লোকসংগীতের জগতে দোতারার অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

দোতারা

১১. খঞ্জরি

আনন্দ এবং ঘনবাদ্যর এক অপূর্ব মিশেল হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই খঞ্জরি বা খঞ্জনীর ব্যবহার লোক সমাজে প্রচলিত। লোকসংগীত কিংবা লোকনৃত্যে এই তালবাদ্যটির ব্যবহার ব্যাপক। কাঁসি এবং কাঁসরের মতো ছোট আকারের একই প্রকৃতির বাদ্যযন্ত্রটি ডস্ফ বা ডফ নামে পরিচিত।

খঞ্জরি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে নির্মিত হয়ে থাকে। সাধারণত নিম বা কাঁঠাল গাছের গোলাকৃতির ফ্রেমের একদিকে চামড়ায় ঢাকা এবং অন্যদিক খোলা রাখা হয়। এই ফ্রেমে সমান দূরত্বে চারটি ধাতব শলাকার প্রত্যেকটির সংগে করতালের মতো দুটি করে ধাতব চাকতি বসানো হয়। হাতের তালু এবং অঙ্গুলি সহযোগে খঞ্জরি বাজিয়ে,

www.pathagar.com

লোকনৃত্য বা অন্যকোন লোকসংগীতে তাল দেয়া হয়। অনুষ্ঠানমঞ্চে অতি সহজে বহনযোগ্য খঞ্জরি, বাদকের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে ঘুরেফিরে বাজনায় ভিন্ন মাত্রা প্রদর্শিত হয়।

১২. সারিন্দা

প্রাচীনকালের যে সকল বাদ্যযন্ত্র অদ্যাবধি বাংলা তথা বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে সারিন্দা তার অন্যতম। শ্রেণিভুক্ত এই লোকবাদ্যটিতে তাল ও ছন্দসহ যে কোনো সংগীতকে সুরে বাজানো যায় বলে সংগীতপ্রেমীদের কাছে সারিন্দার বিশেষ কদর রয়েছে। গঠনের দিক থেকে দোতারার সংগে সারিন্দার বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কাঠের তৈরি সারিন্দায় তারের সংখ্যা তিনটিতে সীমাবদ্ধ। এছাড়া বাজানোর পদ্ধতিতেও ভিন্নতা রয়েছে। বেহালার মতো ঘোড়ার লেজের তৈরি ছড়ের ঘর্ষণে সারিন্দা বাজানো হয়। এই অঞ্চলের লোকসংগীতে সারিন্দার ব্যাপক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি। বাংলাদেশ উৎসবের দেশ। উৎসবের নামে বাঙালি ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ছিন্ন করে বৃহতে হয় সমবেত। এতেই বাঙালির আনন্দ। এ কারণেই হয়তো বাঙালির উৎসব এতো বর্ণিল, এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত, এতো আবেগঘন। উৎসবের ঐতিহ্য সার্বজনীন বলেই বাঙালির উৎসব নিঃসন্দেহে হয়ে ওঠে মানবিক ও কল্যাণধর্মী, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভিন্নতার উর্ধ্বে মানুষকে এক স্থানে জড়ো করতে সহায়তা করে। আমাদের উৎসব সামাজিক মেলামেশার মেলবন্ধন ঘটায়, পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে এবং একটি সুস্থ সামাজিক আবহ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লোকঐতিহ্যের কল্যাণধর্মী মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ এমন উৎসব আমাদের পরম সম্পদ। তাই অনন্তকাল ধরে উৎসব টিকে আছে বৈচিত্র, বিশিষ্টতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনার নান্দনিক মাধুর্যে।

উৎসব চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যে লালিত তার প্রবাহমান সাংস্কৃতিক ধারার বিকাশ। পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য-সহমর্মিতা-শ্রদ্ধা-সামাজিক মূল্যবোধে মানুষ এবং মানবতাকে নিরবধি খুঁজে ফেরার উৎসব বাঙালিত্বের আলোর আভাসটাকেই সত্য বলে চিহ্নিত করে।

ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল- আজহা, শব-ই-বরাত, শব-ই-মেরাজ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, আশুরা, খাৎনা বা মুসলমানি, ওরস, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কীর্তনসহ বিভিন্ন পুজা-ব্রত, শ্মশান দীপালী, ভার ফোঁটা, অষ্টমীর স্নান, চৈত্রসংক্রান্তি, নবান্ন অন্যতম। পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আকিকা-অন্নপ্রাশন, সাধ ভক্ষণ, বিয়ে, বৌভাত, হাতেখড়ি, শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খের ধ্বনি দেয়া, ইলিশ ঘরে তোলা বরিশালবাসীর অন্যতম উৎসব হিসেবে বিবেচিত।

মানুষের সামাজিক মূলধনের অস্তিত্ব নির্ভর করে সমাজবদ্ধ মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর। সংস্কৃতিই সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। আর এসবের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ পৌঁছতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। ব্যক্তিকে গণ্ডিবদ্ধ রেখে খণ্ডিত পরিচয়ে বিভক্ত করা মানবসত্তাকে সামাজিকসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার নামান্তর। সমাজ বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মানুষ কেবলই হয়ে ওঠে একলা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধহীন। এমন সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে–সার্বজনীন উৎসব। তাই আজ উচ্চারিত হচ্ছে– ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

www.pathagar.com

১. বৈশাখি উৎসব

বাংলা নববর্ষ বাঙালির আদিমতম, অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন উৎসব। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের যে গণভিত্তি, তার শেকড় সুদূর অতীতে প্রোথিত। এই উৎসবের সংযোগ-অস্তিত্ব বাঙালির অনুভূতির সাথে জড়িত। পহেলা বৈশাখ আমাদের সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্রও বটে। এককথায় জাতির প্রাণের উৎসব, জাতীয় ঐক্যের অমোঘ শক্তি। নববর্ষ উৎসব ও বৈশাখি মেলা বাঙালি সংস্কৃতির একটি বৃহৎ এবং মৌল উপাদান। পহেলা বৈশাখ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক গণ্ডির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, এর রয়েছে অর্থনৈতিক তাৎপর্য। উৎপাদন শক্তির সাথেও রয়েছে পহেলা বৈশাখের গভীর সম্পৃক্ততা। জাতি গঠন এবং সংস্কৃতির প্রবহমানতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এ উৎসবের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে চলছে নিজেদের শেকড় সন্ধানের প্রচেষ্টা। মানুষ পিছিয়ে পড়া সময়কে অতিক্রম করতে চাইছে নিজের অস্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে।

নববর্ষের নতুন খাতা

পহেলা বৈশাখের প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় নববর্ষ উৎসবের। সার্বজনীনতাই বছরের প্রথম এই উৎসবের মূখ্য বিষয়। উৎসব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ। একারণেই এই উৎসব পরিণত হয়ে উঠে আনন্দঘন সম্প্রীতির মিলন মেলা হিসেবে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালি তার হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছে সুদূর অতীত থেকে। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে উৎসব পালনে আমরা বজায়ে রেখেছি স্বকীয়তা। নিজস্ব সাংস্কৃতিকধারায় উৎসব আনন্দ উপভোগে আপোষহীন বলেই আমরা উৎসব পাগল জাতি হিসেবে বিশেষ পরিচিত। বাংলা নববর্ষ কেন্দ্রীক বৈশাখি উৎসবে সময় ও স্থানভেদে পরিবর্তন আসলেও মাটির টানে ফিরে চলার চেতনায় ভাটা পরেনি এখনো। তাইতো প্রথম সূর্য সাংস্কৃতিক চেতনাজাত বাঙালিয়ানার বার্তা নিয়ে আসে প্রতিদিন-প্রতিবছর। নববর্ষ উৎসবের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হচ্ছে নতুনতর মাত্রা।

www.pathagar.com

বিদায়ী বছরের সব ব্যর্থতা, সব নেতিবাচকতা কাটিয়ে নতুন বছর আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, বাঙালি মাত্রই এ প্রত্যাশা। বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিকে নতুন করে আত্মপরিচয়ে আগ্রহী করে তোলে। বাঙালির বড় শক্তি তার ভাষা, তার সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি শুধু গান-বাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যা ছড়িয়ে আছে সবার প্রতিদিনের জীবনাচরণে। এ শক্তি তাকে সাহস দিয়েছে ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিভিন্ন সময়ে রাজপথের আন্দোলনে। শেষ পর্যন্ত তারা সক্ষম হয়েছে বিজয়ী হতে। পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। পহেলা বৈশাখের উৎসবটি আর দশটা উৎসব থেকে আলাদা। এ উৎসবের রূপটি ধর্মীয় নয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ উৎসবটি সবার প্রাণের উৎসব। ধর্ম ও গোত্রনির্ভর উৎসবের ভিড়ে নববর্ষ আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায় আমাদের সংস্কৃতি মানুষে মানুষে মিলন প্রতিষ্ঠা করে– এ সংস্কৃতি বিভাজন ও বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করে। নববর্ষের প্রাণের উৎসবে ধনী, নির্ধন সব এক হয়ে যায়।

বৈশাখি উৎসবের শোভাযাত্রা

নববর্ষ উৎসবে সবার অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত। গ্রামীণ সমাজে এ দিনটি উদযাপিত হয় বেশ ঘটা করেই। যার প্রভাব এখন শহুরে জীবনে দেখা যায়। গ্রামের কৃষক-রাখাল থেকে শুরু করে সবাই দিনটিকে স্মরণ রাখে, আয়োজন করে বাড়তি উন্নত খাবারের। সে নতুন বছরের জন্য আশান্বিত হয়। পুরাতনকে ভুলতে চায়। আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলার। সে আয়োজন সরল এবং ক্ষুদ্র হলেও তার ব্যাপকতা অনেক বেশি। উৎসবের সঙ্গে অর্থনীতির একটি সম্পর্ক আছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই অর্থনীতি সীমিত পরিসরে সক্রিয় থাকে নববর্ষের উৎসব আয়োজনে। হালখাতা অনুষ্ঠান অর্থনীতির

www.pathagar.com

একটি মানবিক রূপ। দোকানিরা হালখাতা খুলে মানুষকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করে। দেনা-পাওনা সব শোধ করে নতুন করে হিসাব খোলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেয় সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজা।

বৈশাখি উৎসবের শোভাযাত্রা

বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে বরিশাল পরিণত হয় মেলার নগরীতে। কমপক্ষে ৪টি স্থানে বৈশাখি মেলা এবং কমপক্ষে ১০টি স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে বরিশাল নগরীতে সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ। চৈত্র সংক্রান্তিতে খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটারের আয়োজনে সাংস্কৃতিক আড্ডা এবং একই দিনে অশ্বিনী কুমার হল প্রাঙ্গনে গণশিল্পী সংস্থার আয়োজনে লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পহেলা বৈশাখের প্রত্যুষেই ঐতিহ্যপ্রিয় মানুষের গন্তব্যস্থান ব্রজমোহন বিদ্যালয় (বিএম স্কুল) মাঠে উদীচীর আয়োজনে প্রভাতী অনুষ্ঠান। প্রতি বছর উদীচী ও বরিশাল নাটকের যৌথ আয়োজনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তমাল তলায় প্রভাতী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতী অনুষ্ঠানের পর একই স্থানে চারুকলা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব। পরে বের করা হয় সার্বজনীন মঙ্গল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় চারুশিল্পীদের হাতে বানানো আবহমান বাংলার বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখির প্রতিকৃতি, মুখোশ, মুকুট, হাতপাখা, রাজকীয় পাখাসহ ৩০টি ঢাক, ব্যান্ডদল অংশ নেয়। অপর দিকে নগরীর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সাকাল সাড়ে সাতটায় খেলাঘর বরিশাল জেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিকালে বৈশাখ উৎসব ছড়িয়ে পড়ে মেলার মাঠে। উদীচী বরিশাল জেলা শাখা এবং বরিশাল নাটক-এর উদ্যোগে বিএম স্কুল মাঠে, শিশু সংগঠন চাঁদের হাটের উদ্যোগে নগরীর আমানতগঞ্জ টিবি হাসপাতাল মাঠে, শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটারর

www.pathagar.com

আয়োজনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে, বরিশাল থিয়েটারের আয়োজনে অশ্বিনী কুমার হল চত্বর, প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশু পার্ক, সাগরদি এ. ওয়াহেদ স্কুল মাঠ, গোঁড়াচাঁদ দাস রোড হালিমা খাতুন স্কুল মাঠে আয়োজন করা হয়েছে তিন দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া নগরীর আশপাশে স্থানীয় উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে বৈশাখি মেলার। প্রতিটি মেলা থাকে লোকে লোকারণ্য। মেলায় আসেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। বরিশাল নগরীর মেলার শুদ্ধতাও প্রশংসনীয়।

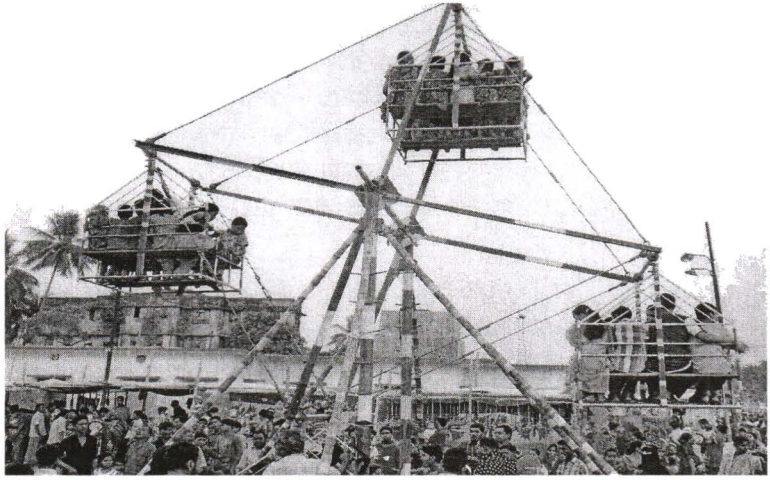

যে-কোনো লোকউৎসবের অন্যতম আকর্ষণ রাধাচক্কর

সময়ের পরিক্রমায় দিনভর চারু-কারু শিল্পীদের তৈরি পসরার পাশাপাশি মেলার সাথে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ণিল আয়োজন। হাল আমলের স্থানীয় প্রথিতযশা শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় অংশগহণ করলেও মূল আকর্ষণ কিন্তু লোকগান-বাউলগানের আসরের প্রতি। এককথায় তিন দিনের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে। এছাড়াও বরিশাল জেলার উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, বাকেরগঞ্জ,বানারীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমান সময়ে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায়। এই আয়োজন সাম্প্রতিক কালের। বাবুগঞ্জে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্ষবরণের নানা বর্ণিল কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে সপ্তবর্ণ পাঠাগার ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে দুদিনব্যাপী ওই বর্ষবরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন আয়োজন করে পান্তা-ইলিশ, পিঠা উৎসব, পালাগান, নাটক এবং লাঠিখেলা। বাবুগঞ্জ উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামে বর্ষবণ উপলক্ষে কয়েক বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও মেলার। স্থানীয়দের আয়োজনে চণ্ডিপুরের ঢালি বাড়ি মাঠে

www.pathagar.com

এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় মানুষের ঢল নামে। ১৪২১ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বাকেরগঞ্জের ঘোড়ার ম্যালিক মোঃ সাইফুল, দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন মোঃ জুয়েল। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল আলম ফকির, মেলার আয়োজক মোঃ আবুল বাশার, শাহে আলম হাওলাদার, আজিজ শিকদার প্রমুখ।

বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা ইউনিয়নে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে ইউনিয়নের সন্তোষপুর শেরে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলায় নানা রকমের পসরা সাজিয়ে দোকানিরা আগতদের নজর কাড়ে। বেচা-বিক্রির পাশাপাশি মেলায় লাঠি খেলা, পুতুলনাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে প্রতিদিন। মেলাকে ঘিরে আশপাশের কয়েকটি গ্রামে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

২. নবান্ন

হেমন্তের নতুন ধানে নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে দক্ষিণাঞ্চল। নবান্ন ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে হয়ে ওঠে সার্বজনীন। ঐতিহ্য ভুলতে বসা শহুরে মানুষকে মনে করিয়ে দেয় ফিরে চল মাটির টানে। অগ্রহায়ণের পঞ্চম দিনে আবার পঞ্জিকা (তিথি-নক্ষত্র) অনুযায়ী এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে গ্রাম বাংলায়। মূলত পারিবারিকভাবেই নবান্ন পালিত হয়ে আসলেও এই উৎসব এখন সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। আধুনিক নাগরিক জীবনে নবান্ন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়ে থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভোরের আলো ফোটার আগেই গুরুপুজা, প্রার্থনা বা ভক্তিগীতি শেষে দেবতা, ব্রাহ্মণ, কাক ও প্রয়াত স্বজনদের উদ্দেশে নবান্ন নিবেদনের পালা শেষ করে। এর পর তৈরি করা নবান্ন বিতরণ করা হয় পরিবারের সদস্য এবং অতিথিদের।

এই দিনে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঞ্জন রান্না করা হয়। সন্ধ্যায় বানানো হয় পিঠা-পুলি। বরছাড়া নবান্ন উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় মূল ঘরের দরজার উপর নতুন ধানের ছড়া পাঁচ প্রকারের পাতাসহ কলারখোলে পেচিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। লক্ষ্মীর আগমন এবং শস্য বৃদ্ধির কামনায় এই প্রথা লোক সমাজে চলে আসছে।

হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার
প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার ॥
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।
কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই
বেদ-বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই ॥

www.pathagar.com

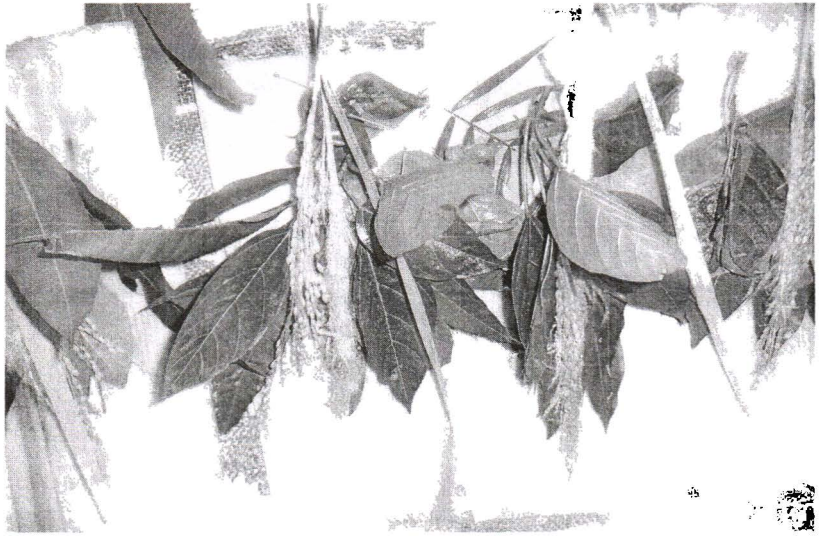

নবান্নের মাঙ্গলিক উপকরণ

নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বরিশাল নগরীতে মতুয়া সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা

মূলনীতিকে ধারণসহ দ্বাদশ আজ্ঞা পালনকারী মতুয়া সম্প্রদায় নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে নগরীতে ২০০৮ সাল থেকে আয়োজন করে আসছে নবান্নের মিলন-মেলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও উচু-নিচু, নারী-পুরুষ ভেদহীন মতুয়ারা সন্তান-অধিক শস্য-বৃষ্টি-পশুসম্পদ কামনা এবং মানবজাতির মঙ্গল কামনায় কৃষিভিত্তিক সভ্যতার উৎসব

www.pathagar.com

নবান্নের আয়োজন করে। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মতুয়া সম্প্রদায় গোপালগঞ্জ জেলার ওরাকান্দি নিবাসী পরমারাধ্য হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রেম-ভক্তিরূপের সাধনধারাকে মানব সমাজের পাথেয় হিসেবে মনে করে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্য ও আড়ম্বরের সাথে বরিশালে এ উৎসবের আয়োজন করে আসছে। নবান্ন উপলক্ষে বরিশাল নগরীর নতুনবাজার আদিশ্মশানস্থ অমৃতাঙ্গনে মতুয়া মন্দিরে বসে এই মিলনমেলা। দিনব্যাপী উৎসবের আগের রাত থেকেই চলে মতুয়া নারীদের নবান্ন তৈরির পালা। খুব ভোরে মতুয়াচার্য মঙ্গলঘট স্থাপন করে উৎসবের সূচনা করেন। আয়োজন করা হয় আলোচনাসভা এবং ভক্তিগীতির। এর পর পরই মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ভক্ত জয়ডঙ্কা-কাসঁর-শঙ্খ-শিঙ্গাসহ নানা বাদ্যযন্ত্র সহকারে নগরীজুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে।

৩. ঈদ উৎসব

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশে সমবেত হওয়াই নয়। ঈদ মানুষের আত্মিক বন্ধনের বিভেদহীন মিলনমেলা। ঈদ আজ মানুষে মানুষে সম্প্রীতি-সৌহার্দ সৃষ্টির প্রণোদনা। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ ও সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে। যুগ যুগ ধরে চলমান ঈদ উৎসব নবসংস্কৃতিক চেতনার সৃষ্টি করেছে।

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর ওঠে ঈদের চাঁদ। আনন্দ-উৎসবে জেগে ওঠে বিস্তৃর্ণ জনপদ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঈদ সামাজিক বন্ধনেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঈদ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও সাজিয়েছে সামাজিক মাত্রায়। এককথায় ঈদোৎসব সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়ে উঠেছে। বরিশাল নগরীর ঈদ-উল-ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় হেমায়েত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে সকাল সাড়ে ৮টায়। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন। বিনিময় করেন কুশলাদি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে।

কয়েক বছর ধরে ঈদের প্রধান জামাতের ইমামতি করছেন স্টিমারঘাট জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওঃ শরফ উদ্দিন বেগ। এছাড়া দুটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় জামে কশাই মসজিদের উদ্যোগে সকাল ৯টা ও ১০টায়। চকবাজার জামে এবায়দুল্লাহ মসজিদে সকাল ৯টায় প্রথম ও সাড়ে ১০টায় দ্বিতীয়, সদর রোডের জামে বায়তুল মোকাররম মসজিদে সকাল ৯টায় ও সাড়ে ১০টায়, পুলিশ লাইনস জামে মসজিদে সকাল ৮টায় ও সাড়ে ৮টায় এবং নুরিয়া হাই স্কুল ইদগাহ ময়দানে সাড়ে ৮টায় এবং সোয়া ৯টায় দ্বিতীয়, সাগরদী মাদ্রাসা মসজিদে প্রথম জামাত সকাল ৮টায় এবং সকাল ৯টা দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। এদিকে ঈদের প্রথম জামাত সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে নগরীর জেলগেট মসজিদ, ওয়াপদা জামে মসজিদ, কালুশাহ সড়ক জামে মসজিদ, বিএম কলেজ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও রূপাতলী

www.pathagar.com

গাউছিয়া সড়কস্থ মৌলভীবাড়ি জামে মসজিদে। সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় নগরীর বেলতলা মাহমুদিয়া মাদরাসা ময়দান, হোসাইনিয়া মাদ্রাসা মসজিদ, গোরস্থান ইদগাহ ময়দান, বাজার রোড খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আলিয়া মাদ্রাসা মসজিদ, পাওয়ার হাউস মসজিদ, মেডিকেল জামে মসজিদ, কালিজিরা কেন্দ্রীয় ইদগাহ মাঠ, হরিণাফুলিয়া মাদ্রাসা ময়দান এবং বালুর মাঠ জামে মসজিদে। সকাল ৯টায় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে পোর্ট রোড জামে মসজিদ, বরিশাল কলেজ জামে মসজিদ, ব্রাউন কম্পাউন্ড জামে মসজিদ করিম কুটির জামে মসজিদ, 'ল' কলেজ জামে মসজিদ, হাটখোলা জামে মসজিদ, সিএন্ডবি রোড তেমাথা জামে মসজিদে এবং সর্বশেষ একক জামাত সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় উত্তর আমানতগঞ্জ সিকদারপাড়া ঈদগাহ মাঠে। এছাড়াও নগরীর ৩০টি ওয়ার্ড এবং জেলার ১০ উপজেলায় ছোট-বড় অন্তত ৩শতাধিক ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিভাগের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই দরবার শরীফ মাঠে সকাল ৯টায়। চরমোনাইর পীর মাওলানা মুফতি সৈয়দ মো. রেজাউল করিমের ইমামতিতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মুসুল্লি এ জামাতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দৃষ্টিনন্দন গুঠিয়া জামে মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯ টায়।

বাবুগঞ্জের ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কের পাশে রামপট্টি বালুর মাঠে ঈদ জামাতের আয়োজন করে জাকের পার্টি। ২০১৩ সালের সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত ওই জামাতের দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন জাকের পার্টির চেয়ারম্যান পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী ফরিদপুরী।

বরিশাল নগরীর হেমায়েত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এক কাতারে ঈদের নামাজ আদায় করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ

www.pathagar.com

বরিশালের ১০উপজেলার অর্ধলক্ষাধিক জাকেরানদের অংশগ্রহণে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক ও উপজেলা সম্পাদক মোস্তফা কামাল মন্টু সিকদার।

বরিশালের গৌরনদী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সকাল ৯টায় প্রধান ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী কমপ্লেক্স সুন্দরদীতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নারীসহ হাজার হাজার মুসল্লী ঈদের নামাজ আদায় করেন। টরকী বন্দর আদর্শ জামে মসজিদ, গৌরনদী থানা জামে মসজিদ, তাঁরাকুপি, কটকস্থল ঈদগাহ মাঠেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মুসলমানদের সর্ববৃহত্তর ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামায়াতের জন্য বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সুন্দরদীর গ্রামের দুবাই প্রবাসী বাদশা মুন্সীর নিজস্ব উদ্যোগে বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী কমপ্লেক্স সুন্দরদী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য জামায়াতের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া আগত হাজার হাজার নারী পুরষকে সেমাই, ভাত ও মাংস খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সুন্দরদী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গৌরনদী পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী কয়েক গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী-পুরুষ একত্রে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করার জন্য আয়োজক বাদশা মুন্সীর নিজস্ব উদ্যোগে ঈদের আগে রাতে ও ঈদের দিন সকালে মাইকিং করে দাওয়াত দেয়া হয়। ঈদের দিন সকাল সাড়ে ৮টায় জামাত শেষে ধনী-গরীব কয়েক হাজার নারী-পুরষকে সেমাই, ভাত ও মাংসসহ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

ঈদের দিন ও পরদিন নগরীর বিনোদন কেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধা পার্ক, প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশু পার্ক, কীর্তনখোলা নদীর ওপর শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, ত্রিশ গোডাউন, দুর্গাসাগর দীঘি এবং গুঠিয়া মসজিদ কমপেক্স এলাকায় তরুণ-তরুণীদের ঢল নামে। গভীর রাত পর্যন্ত এসব দর্শনীয় স্পটে থাকে ভ্রমণ পিপাসুদের উপচে পড়া ভিড়। অনেকে আবার নগরীর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দুরে বরিশাল-ভোলা সড়কের লাহারহাট কালাবদল নদীর তীরে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঈদ আনন্দ উপভোগ করেন। ঈদের দিন দুপুরে জেলখানা, এতিমখানা ও হাসপাতালগুলোতে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়। নগরীর সড়কগুলোতে স্থানীয় তরুণদের উদ্যেগে আলোকসজ্জা এবং সরকারি ও বেসরকারি ভবনগুলোতে আলোকসজ্জা করায় সন্ধ্যার পরে নগরী পরিণত হয়ে ওঠে আনন্দের নগরীতে। ঈদের চাঁদ দেখার পর পরই নগরীতে আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দ উল্লাস করা হয়।

ঈদকে কেন্দ্র করে দর্জিপাড়ায় নতুন পোশাক তৈরির ধুম পড়ে যায়। টুপি-পাঞ্জাবি-পাজামা, জুতা-স্যান্ডেল থেকে সাজ-সজ্জার রকমারি প্রসাধনী, অঙ্গসজ্জার জন্য মেহেদী-কুমকুম, কেশবিন্যাসের জন্য সুগন্ধিতেল-ফিতা-ফুল, আলতা, অলংকার, এবং সেমাই-ফিরনি-জর্দ্দা-মিষ্টি থেকে মাংস-পোলাও, ঘর সাজাবার নানা জিনিস সবই আজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। রমজানের রোজার শেষে খুশীর ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় নদীর উপর ঈদের মেলা জমে উঠে কয়েক বছর ধরে। উপজেলা শহরের ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে সন্ধ্যা নদীর শাখা পয়সারহাট

www.pathagar.com

নদীর উপর নবনির্মিত সেতুর উপর ঈদের দিন সকাল থেকেই শত শত মানুষ বেছে নিয়েছে সেতুটিকে। ঈদের এই উৎসবে দোকানীরাও বসে থাকে না। ঝাল, টক আচার, চটপটি থেকে শুরু করে বাহারি পসরা সাজিয়ে বসে তারা।

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার ২০গ্রামের মুসলমান ঈদ উৎসব পালন করেন এক দিন আগে। উপজেলার খানপুরা, মাধবপাশা, আগরপুর, কেদারপুর, ওলানকাঠির ১০হাজার মুসুল্লির ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে খানপুরা জাহাঙ্গির সিকদার বাড়ি, মাধবপাশা আমীর দুয়ারীর বাড়ি এবং কেদারপুর মান্নান হাওলাদারের বাড়ি ঈদগাহ ময়দানে। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ শাহসুফি দরবার শরিফের অনুসারীরা বিশ্বের যে কোন জায়গায় প্রথম চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ঈদ পালন করেন। চন্দনাইসের শাহসুফি দরবার শরিফ ও সাতকানিয়া মির্জাখালী দরবার শরীফের অনুসারী জাহাঙ্গির সিকদার বলেন, প্রায় শত বছর পূর্বে থেকে দরবার শরীফের মুরিদগণ হানাফী মাহযাবের অনুযায়ী সঙ্গতি রেখে রোজা ও ঈদ একদিন আগে পালন করে থাকেন।

এছাড়া পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ১৫টি গ্রামের বিশ সহস্রাধিক চাঁন-টুপি তরিকার মানুষ সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করে আসছে। এতে করে সাধারণত তারা ঈদের আগের দিন ঈদ উদযাপন করেন। কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পাঁচজুনিয়া ও চালিতাবুনিয়া, লালুয়া ইউনিয়নের উত্তরলালুয়া, চম্পাপুর ইউনিয়নের মরিচবুনিয়া, নিশানবাড়িয়া, মাঝিবাড়ি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের তেগাছিয়া, আরামগঞ্জ, সাফাখালী, টিয়াখালী ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া, নাচনাপাড়া এবং পৌর শহরের নাইয়াপট্টি, সুইসঘাট ও বাদুরতলী এলাকার এভাবে ঈদ উদযাপন করে আসছে। তারা রোজাও রাখেন এক দিন আগে। ওই তরিকার অনুসারীদের ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায় উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের উত্তর নিশানবাড়িয়া গ্রামের মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা শফিজউদ্দিন বিশ্বাসের মাজার জাহাগিরিয়া শাহসুফী মমতাজিয়া দরবার প্রাঙ্গনে। এছাড়া লালুয়া ইউনিয়নের উত্তরলালুয়া গ্রামের মাঝিবাড়ি খানকা, কলাপাড়া পৌর শহরের নাইয়াপট্টি জামে মসজিদ ও ধানখালী ইউনিয়নের চালিতাবুনিয়া গ্রামে এ তরিকা অনুসারীদের পৃথক পৃথক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। পৌর শহরের নাইয়াপট্টি এলাকার বাসিন্দা মো. রুস্তম আলী বলেন, আমরা কাদেরিয়া তরিকার অনুসারী। সৌদী আরবের সঙ্গে মিল রেখে আমরা রোজা ও ঈদ করি। আমরা একদিন আগে রোজা রেখেছি। সে হিসেবে একদিন আগে ঈদ উদযাপন করছি। জাহাগিরিয়া শাহ সুফী মমতাজিয়া দরবার শরীফের প্রধান খাদেম মো. নিজামউদ্দিন বিশ্বাস জানান, প্রতিবছর এখানের ঈদের জামাতে কলাপাড়া ছাড়াও পাশের গলাচিপা ও রাঙ্গাবালী উপজেলার কাদেরিয়া তরিকার সহাস্রাধিক অনুসারী অংশগ্রহণ করেন।

৪. শারদোৎসব

দুর্গোৎসব সম্প্রীতি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতারই বার্তাবহ। তাইতো শরৎ সাংস্কৃতিক চেতনাজাত বাঙালিয়ানার বার্তা নিয়ে আসে প্রতিদিন-প্রতিবছর। শারদোৎসবের মাধ্যমে

www.pathagar.com

বিজয়া দশমীতে হিন্দু রমণীরা এভাবে মেতে ওঠে সিঁদুর খেলায়

বাঙালি সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হচ্ছে নতুনতর মাত্রা। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৃষ্টির অসাধারণ সমন্বিত প্রয়াস শারদোৎসব। এ উৎসব চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যে লালিত তার প্রবাহমান সাংস্কৃতিক ধারার বিকাশ। প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জীবিত আনন্দোৎসব কেবলমাত্র সমবেত হওয়া নয়। শারদোৎসব অসংখ্য মানুষের আত্মিক বন্ধনের বিভেদহীন মিলনমেলা। পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ-সহমর্মিতা-শ্রদ্ধা-সামাজিক মূল্যবোধে মানুষ এবং মানবতাকে নিরবধি খুঁজে ফেরার প্রণোদনা।

একারণেই হয়তো শরৎ এবং এ সময়ের উৎসব এতো বর্ণিল, এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত, এতো আবেগঘন। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভিন্নতার উর্ধ্বে মানুষকে এক স্থানে জড়ো করতে সহায়তা করে। সামাজিক মেলামেশার মেলবন্ধন ঘটায়, পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে। ঐতিহ্যের কল্যাণধর্মী মানবিক চেতনা সমৃদ্ধে শারদোৎসব হোক বাঙালি লোকসমাজের পরম সম্পদ।

বরিশাল মহানগরীতে ৩৩টি, সদর উপজেলার ২০টিসহ জেলার ৫শ ৫০টি পুজামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজা। উৎসব উপলক্ষে প্রতিটি মণ্ডপ মনোমুগ্ধকর সাজে সাজানো হয়। পুজা উদযাপন পরিষদ বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি রাখাল চন্দ্র দে-এর দেয়া তথ্যমতে মহাষষ্ঠীতে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পুজা প্রশস্তা। স্বয়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর

www.pathagar.com

বোধন, আমন্ত্রণ অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা প্রবেশ স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পুজা, অষ্টমীতে অঞ্জলি প্রদান, নবমীতে যথাবিহিত পুজা এবং দশমীতে পুজা শেষে দেবীকে বিসর্জন দেয়া হয়। এর আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীরা কাঁশার থালা সাজিয়ে দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে আনেন। একে যাত্রার থালা বলা হয়। এসময় রমনীরা সিঁদূর খেলায় মেতে ওঠেন। সধবা নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পড়িয়ে দেন সিঁথিতে। অবশেষে ৫দিনব্যাপী উৎসব বিজয়া দশমীর মাধ্যমে শেষ হয়। তিনি আরো জানান ২০১৩ সালে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় সর্বাধিক ১শ ৪১টি মণ্ডপে পুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া উজিরপুর উপজেলায় ১০৫টি, গৌরনদীতে ৭৪টি, বাকেরগঞ্জে ৬৫টি, বানারীপাড়ায় ৪৯টি, মেহেন্দিগঞ্জে ২১টি, বাবুগঞ্জে ১৯টি, মুলাদীতে ১২টি এবং হিজলা উপজেলায় ১১টি মণ্ডপে পুজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মাননা, অর্থ, বস্ত্র প্রদানসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের মৃৎশিল্পী সম্মাননা ২০০৯ সাল থেকে শিল্পী-সাংবাদিক সুশান্ত ঘোষ-এর প্রচেষ্টায় বরিশাল নগরীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিবছর দুর্গা প্রতিমা তৈরি শেষে, প্রতিমাশিল্পী, যাদের স্থানীয়ভাবে গুণরাজ নামে অভিহিত করা হয়, তাদেরকে একত্র করে এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১১৬ জন মৃৎশিল্পীকে সম্মাননা স্মারক, অর্থ, বস্ত্র প্রদান করা হয়।

আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুরে দেবী বিসর্জন দেবার স্থানে বসে লোক মেলা। মেলায় আখ-পান-কাচাহলুদ-মিষ্টি এবং লোকসমাজে উৎপন্ন সামগ্রী স্থান পায়। উজিরপুরে সন্ধ্যা নদীর পাড়ে দেবী বিসর্জন স্থানে মেলার সাথে বসে হর পর্বতীর নৃত্যাভিনয়। স্থানীয়রা বিভিন্ন দেব-দেবী সেজে এখানে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। উজিরপুর-আগৈলঝাড়ায় দশহরা উপলক্ষে স্থানীয় নদীতে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়।

এছাড়া দশহরার পর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে মোয়া-নারু তৈরির ধুম পড়ে। দশমী তিথির চারদিনের মাথায় কোজাগরী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীদেবীর পুজা। এর একপক্ষ পর অর্থাৎ অমাবশ্যায় অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীশ্যামা পুজা। একারণেই দুর্গোৎসবের আগ থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।

৫. আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগৈলঝাড়ায় নারীদের নৌকাবাইচ

পাঁচ বছর ধরে বরিশাল-গোপালগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী আগৈলঝাড়া উপজেলার কদমবাড়ি এলাকার পয়সারহাট নদীতে নারীদের নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এখানে নৌকাবাইচের আয়োজন করে আসছে কদমবাড়ি গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তরঙ্গ। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কহিনুর ইয়াসমিন বলেন, আজ নারীরা পিছিয়ে নেই। নারীরা আর পিছিয়ে থাকতে চায়না, চায় সমঅধিকার।

www.pathagar.com

আগৈলঝাড়া : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে পয়সারহাট নদীতে নারীদের নৌকা বাইচ

এ অধিকার আদায়ের অংশ হিসেবেই আমরা নারীদের নৌকাবাইচের আয়োজন করেছি। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার পয়সারহাট নদীতে ২০১০সালের ৮মার্চ বেলা ১১টায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় নারীদের নৌকা বাইচ। তরঙ্গ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত ১৭৬ জন নারীর ১৬টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে ফুলমালা রায়ের নেতৃত্বে বেলী দল প্রথম, সুমিত্রা অধিকারীর বকুল দল দ্বিতীয় এবং ছায়া অধিকারীর নেতৃত্বে চাঁপা দল তৃতীয় স্থান অর্জন করে। সকাল ৯টায় বাইচ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস। কোহিনূর ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন আগৈলঝাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মর্তুজা খান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপংকর বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দাতা সংস্থার প্রতিনিধি সিনা দে এবং নিকোলা মিন্ডে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। ২০১৩ সালের বরিশাল, গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়ার ১৪টি দল বাইচে অংশগ্রহণ করে। বাইচে অংশগ্রহণ করে প্রথমস্থান অধিকার করে ঊষা অধিকারীর গোলাপ দল, ফুলমালা রায়ের বেলী দল দ্বিতীয় এবং সরস্বতী জয়ধরের জুই দল তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

গোলাপ দলের সভানেত্রী ঊষা অধিকারী বলেন, বিশ্বের যাহা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছেন নারী, অর্ধেক তার নর, এ বাক্যকে স্বীকার করবার জন্যই

www.pathagar.com

আমরা বাইচে অংশগ্রহণ করেছি। ৮মার্চ বেলা সাড়ে ১০টায় নারী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে পয়সারহাট নদীর পাড়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কহিনুর ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল কালাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাকাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিপুল দাস, বাগধা ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বাবুল ভাট্টি, কানাডিয়ান এম্ব্যাসির প্রধান রুদজুম্বন, আমেরিকা এ্যাম্বাসির প্রতিনিধি লুচিয়া, স্থানীয় সমাজসেবক অনন্ত কুমার অধিকারী, আবুল বাশার হাওলাদার, মোঃ জয়নাল মিয়া, জগদীশ অধিকারী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কর্মকর্তা সুভাষ সমদ্দার। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিনটি দলকে পুরস্কার হিসেবে রঙ্গিন টেলিভিশন প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের জন্য ছিল বিশেষ পুরস্কার। পাঁচ বছর ধরে নৌকাবাইচ হয়ে আসছে। প্রথমবার প্রতিযোগী নারীরা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পড়ে বাইচে অংশগ্রহণ করে। এর পর কয়েক বছর ধরে লাল পাড়ের হলুদ শাড়ি পড়ে বৈঠা হাতে বাইচে অংশগ্রহণ করে আসছেন। বাইচ দেখতে নদীর দুপাড় হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়।

৬. হারতায় লক্ষ্মী পুজার নৌকা বাইচ

বিলবেষ্টিত উজিরপুরের হারতায় প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় নৌকা বাইচ। ১৫২ বছর আগে লক্ষ্মী পুজার দিনে সন্ধ্যা নদীতে সর্বপ্রথম বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনে বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যৌথভাবে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন হারতা বাজার কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ।

নৌকা বাইচ

www.pathagar.com

হারতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হরেন রায় বলেন, নৌকা বাইচ উপলক্ষে হারতায় দিনব্যাপী মেলা বসে। মেলায় নানা প্রকার পসরা সাজিয়ে দর্শনার্থীদের মাঝে যোগ হয় ভিন্ন মাত্রা। সোমবার সকাল থেকে হারতা হয়ে ওঠে উৎসবের জনপদ। বাইচ প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে বিভিন্ন স্থান থেকে নৌ পথে শত শত ট্রলার, লঞ্চ ও সড়ক পথে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভিড় জমায় হারতা বাজারে। দর্শনার্থী পদচরনায় মুখরিত হয়ে উঠে সন্ধ্যা নদীর দুই তীর। প্রতিযোগিতায় মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইচের নৌকা অংশগ্রহণ করে। সব ধর্মের মানুষ এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে উৎসবমুখর করে তোলে।

৭. বড়দিন

বরিশাল নগরীসহ জেলার আগৈলঝাড়া এবং বাকেরগঞ্জ উপজেলার পাদ্রিশিবপুরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা পালন করে আসছেন ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। নগরীর ক্যাথলিক চার্চ, ব্যাপ্টিস্ট চার্চসহ চাদমারি লাকায় বসবাসরত খ্রিস্টান সম্প্রদায়, আগৈলঝাড়া উপজেলার জোবারপাড়, কাঠিরা, ছবিখারপাড়, রাজিহার, গৈলা এবং বাকেগঞ্জ উপজেলার পাদ্রিশিবপুর গ্রামের বিভিন্ন খ্রিস্টান পল্লীতে থাকা পরিবারগুলো পালন করে আসছেন এ উৎসব। সকালে শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে গীর্জায় প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বড় দিনের শুভ সূচনা করেন। দুপুরে বিভিন্ন রকমের খাবার পরিবেশন এবং বিকেলে আনন্দ মেলা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে বড় দিন।

বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রার্থনা

www.pathagar.com

৮. শশ্মান দীপালী

বরিশাল অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় কালি পুজার আগের দিন মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে পারিবারিক শ্মশানে দীপ জ্বালিয়ে থাকেন। এই উৎসব শ্মশান দিপালী উৎসব নামে পরিচিত। বরিশালের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্মশান দিপালী জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়ে আসছে অর্ধশতাব্দী আগে থেকে। বরিশাল আদিশ্মশান এবং পরবর্তীতে বরিশাল মহাশ্মশানে দাহ বা সমাধিস্থ স্বজনদের উদ্দেশে তৈরি করা মঠ বা স্মৃতিস্তম্ভে আলোয় আলোয় আলোকিত করে তোলেন জীবিত স্বজনরা। একই সাথে স্বজনের পছন্দের খাবার প্রসাদ হিসেবে আনা হয় তর্পন শ্মশানে। ধূপ-দীপ জালিয়ে করা হয় প্রয়াত স্বজনদের। প্রসাদ উৎসর্গ করে তার আত্মার সদগতি কামনা করা হয়। বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও হিন্দু সমাজে এই রীতির প্রচলন নেই। বরিশাল কাউনিয়া এলাকায় বরিশাল মহাশ্মশানে শ্মশান দীপালী উপলক্ষে মেলা বসে। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রয়াত স্বজনদের স্মরণ করার জন্য জীবিত স্বজনরা আসেন বরিশালে। দিবসটি উপলক্ষে বরিশাল মহাশ্মশানে বসে লোকমেলা। বর্তমানে বরিশাল জেলার আশপাশ এলাকাসহ ঝালকাঠি, পটুয়াখালী জেলার বেশকিছু এলাকায় শ্মশান দীপালী পান করছেন ওইসব এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়।

জমিদারি প্রথা প্রচলনের সময়ে স্থানীয় জমিদার কালীনারায়ণ-এর দান করা সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বরিশাল নগরীর নতুন বাজারে শ্মশান স্থাপন করা হয় যা আদি শ্মশান নামে পরিচিত। ক্রমে আদি শ্মশানে স্থান স্বল্পতার কারণে আর একটি শ্মশান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হওয়ায় বারশাল নগরীর কাউনিয়া খালের উত্তর দিকে নির্ধারণ করা হয় মহাশ্মশান। বৃটিশ শাসনামলে বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান প্যারীলাল রায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান দীনবন্ধু সেন বরিশাল মহাশ্মশানের সুবিধা-অসুবিধা তদারক করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এ শ্মশানের পশ্চিম দিকে ঘেষে লাকুটিয়ার দিকে চলে গেছে খাল। সেসময়ে কেবলমাত্র শবদেহ সৎকার করার সময় শ্মশানবন্ধুরাই যেত সেখানে। দিন-দুপুরে সাহসী লোকেরাও মহাশ্মশানে একাকী যেতে সাহস করত না ভূত-প্রেতের ভয়ে। মহাশ্মশানে শ্মশানকালী পুজা এবং দিপাবলী উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য মহাশ্মশান রক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠন তখন ছিল এবং এখনও আছে। দীপাবলী উৎসবে বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য লোক এখানে এসে আপনজনদের সমাধিতে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে, ব্যথাভরা বুকে অশ্রু বিসর্জন করেন স্বজনদের স্মরণে। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি দ্রব্য শ্মশান বেদীতে সাজিয়ে রাখেন। মনে মনে ভাবে বিদেহী আত্মা সকলের অলক্ষে তা গ্রহণ করে। বর্তমানে বরিশাল মহাশ্মশান এলাকা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়ে উঠেছে। কল্পিত ভূত-প্রেত তুলেছে পটল।

পঞ্জিকামতে ভূত চতুর্দ্দশীতে দিপাবলী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় মহাশ্মশান কালী পুজা। বরিশাল মহাশ্মশানের দিপাবলী উৎসব অন্য কোথাও পালিত হয় না। বরিশালে দিপাবলী উৎসব পালন প্রসঙ্গে অগ্নিযুদ্ধের বিপ্লবী পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছিলেন—তখন ব্রিটিশ আমল। খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী আত্মার পুনরুত্থান হয়। পুনরুত্থান দিবস উপলক্ষে বছরের নির্দিষ্ট দিনে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা

www.pathagar.com

মৃতের সমাধিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তৎকালীন বরিশাল জেলার জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে নতুন শ্মশান প্রতিষ্ঠাকালে খ্রিস্টান নিয়মানুযায়ী শ্মশানে দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব করেন এবং তিনিই নাকি এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন। সে বছর থেকেই প্রতি বছর বরিশাল মহাশ্মশানে দিপাবলী উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

মহাশ্মশানের সম্পত্তির পরিমাণ ৫একর ৯৬ শতাংশ। এখানে দীর্ঘদিন মৃতদেহ সৎকার এবং দিপাবলী উৎসব ছাড়া আর কিছুই করা হত না। তবে ১৯৯৪ সালে মহাশ্মশান রক্ষা সমিতি নামে পুনরায় গঠন করা সংগঠন শ্মশান ও দিপাবলী উৎসবসহ শ্মশানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মহাশ্মশানের প্রধান গেটটি অগ্নিযুগের বিপ্লবী পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের নামে নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় গেটটি নারায়ণ চন্দ্র দে (নারুর) পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশে নিজ অর্থে নির্মাণ করেন। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদাভাবে নির্ধারিত স্থান চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

পিতৃপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভূতচতুর্দশী তিথিতে বরিশাল মহাশ্মশানে প্রার্থনারত

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের দুর্গাসাগর দিঘিতে সংকীর্ণতা-পঙ্কিলতার আবর্তে ঘেরা মানব জীবন থেকে পাপমুক্তির বাসনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অষ্টমীর স্নান ও মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথীতে এই স্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর স্নান এবং মেলায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে দুর্গাসাগর। অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে ওই এলাকার কয়েক কিলোমিটার স্থান জুড়ে বসে লোকমেলা। বিভিন্ন স্থান

www.pathagar.com

থেকে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রির আশায়। স্থানীয় প্রবীণদের মতে প্রায় চারশ বছর আগে দুর্গাসাগর দিঘিকে ঘিরে পূণ্যস্নান এবং মেলার সৃষ্টি হয়েছিল।

অষ্টমীর স্নানে পূণ্যার্থীরা

বরিশাল জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে কেউ পুণ্য লাভের আশায়, কেউ কেউ প্রত্যাশা পূরণের আশায় আবার কেউ কেউ প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার পর দুর্গাসাগর দিঘিতে স্নানে আসেন। এসময় স্নানার্থীরা নৈবেদ্য সাজানো কলাপাতা গঙ্গার উদ্দেশে দিঘির জলে নিবেদন করেন। ফুল, তুলসী, দুর্বা, সিঁদুর, আতপচাল, কলা, ফল, মিষ্টি, ধূপ-দীপ দিয়ে নৈবেদ্যে সাজানো হয়। বরিশাল অঞ্চলে স্নানানুষ্ঠানে গঙ্গায় (দিঘির জলে) কাচা আম নিবেদন করা হয়। এরপর উলুধ্বনি বা ঘণ্টাধ্বনির মধ্য দিয়ে ডুবস্নান করে জোর হাতে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। মন্ত্র পড়াবার জন্য দিঘির দুটি বিশাল ঘাটে ব্রাহ্মণরা উপস্থিত থাকেন। সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা পুণ্যার্থীদের মন্ত্র পড়ান। পুণ্যস্নানের যে কটি পর্ব রয়েছে তা হল– আচমন, জলশুদ্ধি ও স্বস্তি, সূর্য্যার্ঘ্য, সূর্যপ্রণাম, সংকল্প, তিলক, প্রণাম এবং তর্পন। অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে মাধবপাশা স্কুলমাঠসহ আশপাশের এলাকা জুড়ে এক দিনের মেলা বসে। মেলায় তরমুজ-ফুটি, বিভিন্ন প্রকারের হস্ত ও কুটিরশিল্পসামগ্রী, লোকসমাজে ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকারের খাবার, খাট-পালঙ্কসহ কাঠের তৈরি নানা আসবাবপত্র, হাতপাখা, লেহার তৈরি জিনিসপত্র, মাটির তৈরি খেলনা এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র, প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন প্রকারের খেলনা পাওয়া যায়। দুর্গাসাগরের দিঘির পাড়ে গাছের নিচে আড়ালে আবডালে বা মেলা প্রাঙ্গণের অনতিদূরে বউট্টা, চরকা, তিনতাস, রিং

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করে পাওয়াসহ বিভিন্ন প্রকারের জুয়ার আসরও বসে। এই মেলা অর্থনৈতিক লেনদেনের অন্যতম স্থান এবং স্থানীয়সহ ব্যবসায়ীদের আয়ের উৎসও বটে।

প্রতিবছর বরিশাল নগরীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়

নগরীতে রথযাত্রার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

www.pathagar.com

লোকমেলা

বাংলার মেলা মানুষের জীবনের এক ভিন্নতর চালচিত্র। ধর্ম এখানে উপলক্ষ হলেও, মানুষ মিলিত হয় মানুষের জন্য। নানা রকম পসরা সাজিয়ে বসেন বিক্রেতারা যাতে করে আকৃষ্ট হয় ক্রেতারা। একসময় সংসারের জিনিসপত্র, চাষবাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন রকম গৃহস্থালীদ্রব্য সংগৃহীত হত মেলা থেকে। মেলা ছিল গ্রামবাংলার এক ভিন্নতর সামাজিক বন্ধন। যেখানে ধর্মীয় সংকীর্ণতার কোন প্রশ্রয় ছিল না। বাংলার জনজীবনে মেলার অসাধারণ ছবি বরিশালে অনুপস্থিত ছিল না। দেশভাগ সব পরিস্থিতি বদলে দিলেও বরিশালে তার ছবি একেবারে অনুজ্জ্বল হয়ে যায়নি। কতরকম বিনোদনই না এইসব জেলাকে জীবন্ত করে রেখেছিল একদিন। বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৮৪) বেন্টলির (১৯২১) উল্লিখিত মেলার একটি তালিকায় উদ্ধৃত আছে–

মেলার নাম	মেলার স্থান	তারিখ ও সময়	গড় উপস্থিতি
১. দশহরা	বানারিপাড়া	জ্যেষ্ঠ ১ দিন	১০,০০০
২. সূর্যমণি মেলা	বানারিপাড়া	মাঘ ১ দিন	১৫,০০০
৩. শিবরাত্রি	শিববাড়ি, পোনাবালিয়া	ফাল্গুন ১ দিন	১০,০০০
৪. চৈত্র সংক্রান্তি	হাটখোলা, বরিশাল	চৈত্র ১ দিন	৫,০০০
৫. নীলতলা মেলা,	নাজিরপুর	বৈশাখ ১ দিন	৬,০০০
৬. গোপাল ঘোষের মেলা	বগুড়া মৌজা,	বৈশাখ ৭ দিন	২,০০০
৭. চৈত্র সংক্রান্তি	ঝালকাঠি	চৈত্র ১ দিন	৫,০০০
৮. ঝালকাঠি	কালীপূজার মেলা	কার্তিক ৭ দিন	৫,০০০
৯. মাঘী সপ্তমী	পানাবালিয়া	মাঘ ১ দিন	১,০০০
১০. বাবুগঞ্জ মেলা	বাবুগঞ্জ	ডিসেম্বর /জানুয়ারি ১ মাস	১,০০০
১১. কালবৈশাখি	জরিয়াবাড়ি	বৈশাখ ১ দিন	১,২০০
১২. পৌষ সংক্রান্তি বাটাজোর	গৌরনদী	নভেম্বর- ডিসেম্বর ১৮ দিন	১,০০০
১৩. চৈত্র সংক্রান্তি	ভাণ্ডার	চৈত্র ১ দিন	৮০০
১৪. চৈত্র সংক্রান্তি	মোরাকাঠি	বৈশাখ ১ দিন	৭০০
১৫. চৈত্র সংক্রান্তি	ধামুরা	চৈত্র ১ দিন	৬০০
১৬. পৌষ সংক্রান্তি	ধামসার	পৌষ-ফাল্গুন ৭ দিন	৫০০
১৭. শিবরাত্রি	কীর্তিপাশা	ফাল্গুন ৭ দিন	৫০০
১৮. শিবরাত্রি	কলসকাঠি	ফাল্গুন ৭ দিন	৫০০
১৯. শিবরাত্রি	লাখুটিয়া	ফাল্গুন ১৫ দিন	৫০০
২০. গলাইয়া	উজিরপুর	বৈশাখ ৩ দিন	৫০০
২১. পৌষ সংক্রান্তি	চাঁদসি	জুলাই ৩ দিন	৫০০
২২. চৈত্র সংক্রান্তি	মাধবপাশা	চৈত্র ১ দিন	১,০০০

www.pathagar.com

দেশভাগের পর এসব মেলার বেশিরভাগই এখন নেই। তবুও বাকরগঞ্জে যে ৩৪টি মেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম হল গৌরনদী উপজেলার কুতুবশাহের দরগাহের মেলা। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে আয়োজিত এই মেলা মুসলমানদের ধর্মীয় মেলা হলেও নানা সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়।

এছাড়াও বরিশাল নগরীর শ্রীশ্রীমংকর মঠ প্রাঙ্গনে প্রতিবছর শিবচতুর্দ্দশীতে মেলার আয়োজন করা হয়। বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠিতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে ৫ দিনব্যাপী লোক মেলার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১. মাধবপাশার মেলা

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের দুর্গাসাগর দিঘিতে মানব জীবন থেকে পাপমুক্তির বাসনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অষ্টমীর স্নান ও মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথীতে এই স্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর স্নান এবং মেলায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে দুর্গাসাগর। স্নান উপলক্ষে ওই এলাকার কয়েক কিলোমিটার স্থান জুড়ে বসে লোকমেলা। বিভিন্ন স্থান থেকে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রির আশায়। স্থানীয় প্রবীণদের মতে প্রায় চারশ বছর আগে দুর্গাসাগর দিঘিকে ঘিরে পূণ্যস্নান এবং মেলার সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে মাধবপাশা স্কুলমাঠসহ আশপাশের এলাকা জুড়ে এক দিনের মেলা বসে।

লোকমেলায় হরেকরকম দোকান

www.pathagar.com

মেলায় তরমুজ-ফুটি, বিভিন্ন প্রকারের হস্ত ও কুটিরশিল্পসামগ্রী, লোকসমাজে ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকারের খাবার, খাট-পালঙ্কসহ কাঠের তৈরি নানা আসবাবপত্র, হাতপাখা, লেহার তৈরি জিনিসপত্র, মাটির তৈরি খেলনা এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র, প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন প্রকারের খেলনা পাওয়া যায়।

২. বাটাজোরের অশ্বিনী মেলা

এক সময়ে প্রবাদ ছিল—আজকে ভারতবর্ষ যা ভাবে তা গতকাল ভেবেছে বাংলা এবং তাই গতপরশু ভেবেছিল অশ্বিনী দত্তের বরিশাল। বাংলার জাগরণের অগ্রদূত, ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক গুরু, শিক্ষাব্রতী, আলোকিত বরিশালের স্রষ্টা মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের (১৮৫৬-১৯২৩) অলোকসামান্য কর্মসৃজন স্মারক অশ্বিনী মেলা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় গৌরনদী উপজেলার বাটাজোরে।

লোকমেলায় বাঁশ-বেতের সামগ্রী

এ উপলক্ষে জীবনের উল্লাসে চল-অমৃত সদনে স্লোগানকে ধারণ করে বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্কুল কর্তৃপক্ষের আয়োজনে বর্তমানে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুগস্রষ্টা অশ্বিনী কুমার দত্তের প্রতি দায়বোধ থেকে ১৯৯৭ সাল থেকে ব্রজমোহন কলেজের (বিএম কলেজ) ব্রজমোহন থিয়েটার বেশ কয়েক বছর এই মেলার আয়োজন করে। মাঝখানে তিন বছর রাজনৈতিক সংক্রমণে মেলা বন্ধ থাকার পর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে মেলা পুনরায় চালু হয়। দিনভর লোকমেলার পাশাপাশি প্রতিদিন আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান,

www.pathagar.com

নাটক, যাত্রাপালা, মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া আবদুর বর সেরনিয়াবাদ বৃত্তি এবং অশ্বিনী পদক প্রদান মেলার অন্যতম অনুসঙ্গ। বর্তমানে বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেলা চালু রেখেছেন। এযাবৎ যাঁরা অশ্বিনী পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম, শিল্পী আ. লতিফ, কবি আসাদ চৌধুরী, শিক্ষাবিদ প্রফেসর মো. হানিফ, সাংস্কৃতিক জন নিখিল সেন, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক প্রাণ কুমার সেনগুপ্ত (পিকে সেন), বরিশালের সাদা মনের মানুষ বিজয় কৃষ্ণ দে অন্যতম। এই মেলার অন্যতম সংগঠক ছিলেন ব্রজমোহন থিয়েটারের শ্যামল সেন, শান্তনু ভট্টাচার্য, ফুয়াদ হায়দার বিশ্বাস, আবুয়াল মাসুদ মামুন, রবীন আহমেদ সেলিম, দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, উত্তম সাহা, সুব্রত পাল চৌধুরী বাপ্পি, বায়েজিদ-বিন-গুলজার লেলিহান, সুব্রত চক্রবর্তী, মারিফ আহমেদ বাপ্পি প্রমুখ। আদর্শিক মেলা হিসেব যা বেঝায় তা হল– অশ্বিনী মেলা। নিষ্কলুষ এই মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। অশ্বিনী মেলা আজ বাটাজোরবাসীর বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবছর মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের জন্মদিন (২৫ জানুয়ারি) উপলক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় আশপাশ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে সঙ্গীত-আবৃত্তি এবং নাটক অন্যতম। তাছাড়া এই মেলাক কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষ অস্থায়ী যাত্রাদল তৈরি করে মেলার শেষ দিন যাত্রাপালার আয়োজন করে থাকে। মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদভুক্ত অধিকাংশ সংগঠন অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানভুক্ত নার্ট সংগঠনসমূহ নাটক পরিবেশন করে। তাছাড়া আয়োজক কমিটি প্রতিবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অশ্বিনী পদকে ভূষিত করেন। প্রতিদিনের লোকমেলায় প্রায় ৪শ টি স্টল স্থান পায়। মেলায় বাঁশ-বেত-কাঠ-স্টিলের আসবাবপত্র থেকে শিশুদের খেলনা পর্যন্ত স্থান পায়। রাধাচক্কর, ঘোড়ার দোলনা মেরার অন্যতম আকর্ষণ। মেলাকে কেন্দ্র করে বরিশাল জেলা প্রশাসন বাটাজোর অম্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে স্থায়ী মঞ্চ 'অশ্বিনী মঞ্চ' নির্মাণ করে দিয়ছে।

২০১৩ সালের ১৮ মার্চ বিকেল ৩টায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. মসিউর রহমান, শিক্ষাবিদ প্রফেসর মো. হানিফ, গৌরনদী পৌর মেয়র মো. নুরুল ইসলাম হাওলাদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. শহীদুল ইসলাম। আলোচক ছিলেন বরিশাল আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইসমাইল হোসেন নেগাবান মন্টু, শিক্ষক নেতা দাশগুপ্ত আশীষ কুমার, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সহসভাপতি নজরুল ইসলাম চুন্নু, খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি জীবন কৃষ্ণ দে, অধ্যাপক ইমানুল হাকিম, এবং মেলার উদ্যোক্তা শ্যামল সেন, মেলা উদযাপন পর্ষদের সদস্য সচিব প্রধান শিক্ষক

www.pathagar.com

সদানন্দ চক্রবর্তী। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানমালায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক যজ্ঞেশ্বর দে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান, গীতিনৃত্যনাট্যালেখ্য লড়াই চাই লড়াই, নাট্যালেখ্য বঙ্গ আমার জননী আমার এবং নাটক কুকুরেরা ও আদাব মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ১৯ মার্চের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শওকত হোসেন হিরন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শাহ আলম খান, সরকারি গৌরনদী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম। পরিমল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বরিশাল প্রেসক্লবের সভাপতি এস.এম. ইকবাল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজল ঘোষ, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মিরন, অশ্বিনী মোলার উদ্যোক্তা সদস্য অধ্যাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় ভাবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান, গীতিনৃত্যালেখ্য সোনাই মাধব এবং প্রজন্ম নাট্যকেন্দ্রের নাটক ইংগিত, বরিশাল নাটকের যুদ্ধ স্বাধীনতা , বাটাজোর লায়ন ক্লবের স্কুল তৈরি করা এবং হরহর অশ্বিনী নাট্য সংঘের দিক দর্শন মঞ্চস্থ হয়।

সমাপনী দিনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংকের পরিচালক এ্যাড. বলরাম পোদ্দার, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ননী গোপাল দাস, বরিশাল জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা পারভীন আক্তার। বাটাজার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এইচ এম সামসুল হক এর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি সৈয়দ দুলাল, মুক্তিযোদ্ধা ও নাট্য সংগঠক মিন্টু বসু, সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সহসভাপতি শানিত দাস, অধ্যাপক শচীন রায় প্রমুখ। অতিথিবৃন্দ বরিশালের আদর্শ শিক্ষক খ্যাত বিশিষ্টজন প্রাণ কৃষ্ণ সেন গুপ্তের হাতে অশ্বিনী পদক তুলে দেন। আবদুর রব সেরনিয়াবাদ বৃত্তি প্রদান শেষে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান শেষে শব্দাবলী গ্রুপথিয়েটারের দুটি নাটক জন্তু ও বধ্যভূমিতে শেষ দৃশ্য, পঞ্চসিঁড়ি গ্রুপ থিয়েটারের রেফারী এবং বাহাদুরপুর কৃষি ক্লাব এন্ড লাইব্রেরির পরিবেশনায় ডাক্তার কশাই পরিবেশিত হয়।

৩. আগৈলঝাড়ার মার্বেল মেলা

লোকবাংলার গ্রামীণ মেলা মানুষের জীবনের এক বর্ণিল চালচিত্র। ধর্ম এখানে উপলক্ষ হলেও মানুষ মিলিত হয় প্রাণের টানে। নানা রকম পসরা এবং চেনা-অচেনা মানুষের মুখ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। আর যদি মেলায় থাকে লোকক্রীড়া তবে মেলার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে হাজারগুণে। নিষ্কলুষ ক্রীড়ার বিনোদনই জীবন্ত রাখে মেলাকে। আর এরসঙ্গে যুক্ত রকমারি পসরা বাড়ায় আকর্ষণ। আগৈলঝাড়ার মার্বেল মেলা তেমনি একটি মেলা যেখানে লোকক্রীড়া এবং লোকজীবনের প্রয়োজনীয় রকমারি পসরার সাথে মানুষের

www.pathagar.com

এক মহামিলন মেলা। এবার এই মেলা লোকজীবনের প্রণোদনা সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক সম্পীতির মেলায় পরিণত হয়েছে।

আগৈলঝাড়ার মার্বেল মেলার প্রেক্ষাপট অন্যান্য মেলার তুলনায় অনেকটা ভিন্ন। ২০১৪ সালের মেলা ছিল গ্রামবাংলার অভিন্নতর সামাজিক বন্ধন– যেখানে ধর্মীয় সংকীর্ণতার কোন প্রশ্রয় ছিল না। বাংলার জনজীবনে মেলার অসাধারণ ছবি ছিল না অনুপস্থিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী গোষ্ঠী হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুট-পাট, ভাংচুর এবং নারকীয় হামালায় লিপ্ত। তখন বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে দু'শ বছরের ঐতিহ্যবাহী মার্বেল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্বেল মেলা উপলক্ষ্যে চৈত্রসংক্রান্তির দিন ভোর থেকে উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের রামানন্দেরআঁক গ্রামে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী জেলা-উপজেলা থেকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজার-হাজার নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও শিশু জমায়েত হয়।

স্থানীয় প্রবীণদের দেয়া তথ্যানুযায়ী ১৭৪৮ সালে রামানন্দেরআঁক গ্রামে মা সোনাই চাঁদ আউলিয়া নামে এক গৃহবধূর বিয়ের ৭ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ওই বড়িতেই একটি নিম গাছের নিচে মহাদেবের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে বিভিন্ন সময় অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ রাখেন।

মার্বেল মেলায় মার্বেল খেলা

মার্বেল মেলায় নানারকম পসরা

তিনি ওই সময় নবান্ন উৎসব ও মার্বেল খেলার প্রচলন করেন। সেই থেকে ওই স্থানে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে মার্বেল খেলা ও মেলা বসে। লোক মেলায় প্রতিবছর হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। স্থানীয়দের উদ্যোগে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

মার্বেল খেলা উপলক্ষে প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষ সকাল থেকে মার্বেল খেলায় মেতে উঠে। মেলাস্থলে শিশুদের খেলনা, বাঁশ ও বেতের শিল্পসামগ্রী, প্রসাধনী, বাহারী মিষ্টির পসরা নিয়ে বসে দোকানীরা। মেলা উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় প্রতিটি বাড়ি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ২০১৪ সালের মেলা কমিটির সভাপতি জ্যোতিশ চন্দ্র বাড়ৈ, সাধারণ সম্পাদক মনতোষ বিশ্বাস, স্থানীয় ইউপি সদস্য মিহির হালদার বলেন, পরিস্থিতি বদলে গেলেও বরিশালের আলৈঝাড়ার মার্বেল মেলা লোকমেলা তার ঔজ্জ্বল্য হারায়নি আজো। এই মেলাকে তাই দুশ বছরের ঐতিহ্য আর সম্প্রদায় এবং শিশু-নারী-পুরুষের সমন্বয়ে মানুষের মেলবন্ধন বলা চলে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে আয়োজিত মার্বেল মেলায় মেলায় মানুষ যোগ দেয় মাটির টানে– মনের আবেগে। মার্বেল মেলা ছাড়াও আগৈলঝাড়ায় লক্ষ্মীর দশহরার মেলা মহাসমারোহে বহমান এখনো।

৪. কচ্ছপ মেলা

প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে আগৈলঝাড়া উপজেলার ত্রিমুখী কদম বাড়িতে কচ্ছপ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ওই এলাকা ও পার্শবর্তী এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে ওই দিন মেলা থেকে কচ্ছপ কিনে নেন। কচ্ছপের মাংসে ভুড়িভোজ হয় পহেলা বৈশাখে অথবা তার পর দিন। নিরীহ এই প্রাণীটি প্রায় বিলুপ্তির কারণে সরকার এই কচ্ছপ শিকার ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষেধ করায় কয়েক বছর যাবত এই মেলায়ও তার প্রভাব পড়ে। গত বছর বন বিভাগের কর্মকর্তারা এই মেলায় বিক্রির সময় হাতেনাতে ধরে বিপুল সংখ্যক কচ্ছপ পয়সার হাট নদীতে মুক্ত করেন। গত কয়েক বছর ধরে কচ্ছপ মেলায় প্রকাশ্যে কচ্ছপ বিক্রি বন্ধ থাকলেও মেলাস্থলের অনতিদূরে গোপনে চড়ামূল্যে বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সাংবাদিক প্রবীর বিশ্বাস ননী।

৫. লক্ষ্মী দশহরার মেলা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় আশ্বিন অথবা কার্তিক মাসে কোজাগরী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে লক্ষ্মী দশহরার মেলা প্রতিবছর উপজেলা সদরে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আগৈলঝাড়া উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী কোটালীপাড়া ও উজিরপুর উপজেলা থেকে আসা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বাদ্যের তালে তালে নেচে-গেয়ে লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিমা নিয়ে মেলায় উপস্থিতির পাশাপাশি লোকমেলা এই মেলার অন্যতম অনুষঙ্গ। মেলা উপলক্ষে নানপ্রকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় হিন্দুধর্মালম্বী ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। মেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬. শিকারপুরের মেলা

হিন্দু পুরান ও কিংবদন্তি অনুযায়ী ধর্মীয় পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর তাঁরাবাড়িতে কয়েকশ বছর আগে থেকে মেলার

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাচীন এই লোকমেলা বর্তমানে ছোট পরিসরে বসলেও মেলাটি তার লোক ঐতিহ্য হারায়নি। শ্রীশ্রী উগ্রতাঁরা মায়ের (কালিকা) পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

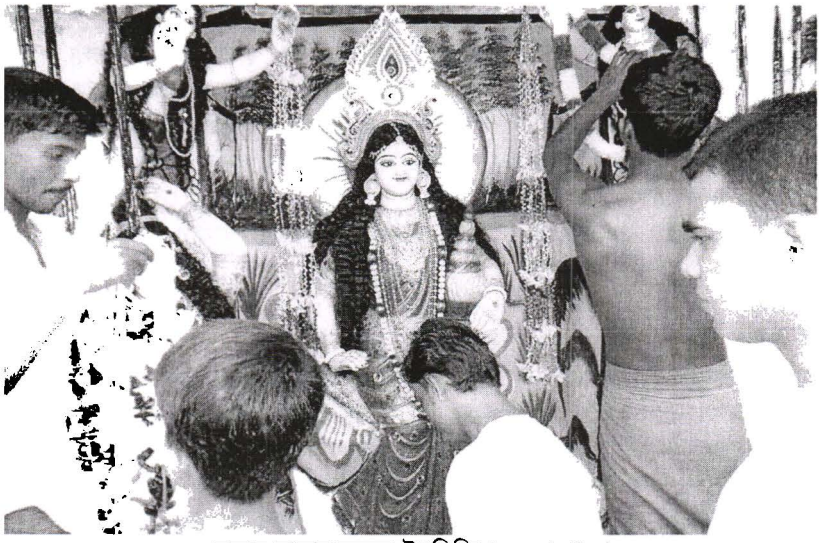

হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গণ

৭. মাহিলাড়ার বইমেলা

জাতীয় শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিন বছর ধরে গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে বইমেলাসহ লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে একুশের অনুষ্ঠানমালা– আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলা প্রথমে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হত। ২০১৫ সালে মেলা পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি বরিশাল অঞ্চলের সর্ববৃহৎ বইমেলায় পরিণত হয়েছে।

৮. সূর্যমণির মেলা

বরিশালের প্রাচীনতম মেলা হল সূর্যমণির মেলা। জেলার বানারিপাড়া উপজেলার বেতাল নামক গ্রামে রাজা কন্দর্প নারায়ণ দেবী সূর্যমণির মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে এই মেলার প্রচলন করেন বলে স্থানীয়দের ধারণা। বর্তমানে সূর্যমণির কষ্টি পাথরের মূর্তিটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু মেলা প্রতিবছর ন্যূনতম তিন দিন মেলার আয়োজন করে আসছে স্থানীয়রা। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহেই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি লোক ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মেলার আশপাশ এলাকার হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। মেলায় বিভিন্ন সামগ্রী কেনাবেচার পাশাপাশি

www.pathagar.com

প্রশাসনের অগোচরে চরকা, বউট্টা, তিনতাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার জুয়ার প্রচলন রয়েছে বলে জানা গেছে।

সূর্যমণি মেলায় মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র

৯. আরজ মেলা

চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের ১১৩ এবং ১১৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামছড়ি গ্রামে বই মেলা, শিশুচিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মেলায় 'আরজ দুয়ার' উদ্বোধন হয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী মেলা এবং আলোচনা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল আলম।

চরবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম সাবুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল রউফ মিয়া, এডিসি কাজী হোসনেয়ারা, এনডিসি সাদেকুর রহমান, আরজ লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক শামিম মাতুব্বর। তিন দিনের অনুষ্ঠানমালায় আলোচনাসভা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এর পাশাপাশি দিনভর চলে বইমেলা। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মেলায় আটটি বইয়ের স্টল বসে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে স্থানীয়রা নানা ধরনের খাবার এবং নিত্যপ্রয়োনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনা হয়।

www.pathagar.com

১০. ছবি খাঁর বই মেলা

বরিশাল অঞ্চলের বহু কিংবদন্তির স্রষ্টা ছবি খাঁ-এর স্মরণে উত্তরণ সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে গৌরনদী উপজেলার সাকোকাঠীতে তিন দিনব্যাপী বই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে চার বছর ধরে। বইমেলার পাশাপাশি প্রতিদিন সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মেলায় উত্তরণ সাংস্কৃতিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে সাহিত্য আসরে প্রধান অতিথি ছিলেন মাহিলাড়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মো. ফিরোজ ফোরকান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উজিরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এইচএম মিজানুর রহমান (হারিস মিজান), গৌরনদী চন্দ্রদ্বীপ সাহিত্য সমাজের উপদেষ্টা ও সাংবাদিক জহুরুল ইসলাম জহির, চন্দ্রদ্বীপ সাহিত্য সমাজের সাধারণ সম্পাদক কবি শিকদার রেজাউল করিম। সাহিত্য আসরে কবিতা আবৃতি, গল্পবলা, প্রবন্ধ পাঠসহ সাহিত্য আলোচনায় অংশ নেন কবি অবিচল আ. মান্নান, সাঈদ বিন ভূইয়া পান্নু, মো. সোহরাব শরীফ, লেখক মো. আমীর আলী। অনুষ্ঠানে গৌরনদী, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ ও আগৈলঝাড়ার কবি-সাহিত্যিক লেখকগণ উপস্থিত হন। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১১. কলসকাঠির জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠিতে জগদ্ধাত্রী পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দক্ষিণাঞ্চলে একমাত্র বাকেরগঞ্জেই প্রতি বছর এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।এক সময়কার জমিদারদের বাসস্থান কলসকাঠির মোট ৯টি মন্দিরে এই পূজা হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৩টি মন্দির সার্বজনীন এবং বাকি ৬টি মন্দিরে পারিবারিকভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে মন্দিরের আশপাশ এলাকায় মেলা বসছে পূজা শুরু থেকেই। ষষ্ঠী তিথী থেকে দশহরা পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী পূজা এবং মেলায় লাখ লাখ লোকের সমাগম ঘটে। কলসকাঠি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য এবং জগদ্ধাত্রী পূজা উদযাপন কমিটির উপদেষ্টা আশীষ কুমার গাঙ্গুলী সাধন জানান, ২০১৪ সালে ৯টি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কলসকাঠি বন্দরে ৬টি এবং বন্দর সংলগ্ন খালের ওপাড়ের ৩টি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কলসকাঠি কালীবাড়ি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি চন্দ্রনাথ মুখার্জী জানান, প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পূজা-মেলা এবং উৎসব উপভোগ করার জন্য ভারতসহ বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মানুষ কলসকাঠি আসেন।

উল্লিখিত মেলা ছাড়াও প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ বরিশাল নগরীসহ জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই একাধক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়াও ঈদ-উল-ফিতর, দুর্গাপূজা, কালিপূজা, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসছে আবহমান কাল ধরে।

১২. জীবনানন্দ মেলা

বরিশালের সন্তান, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণে বেশ কয়েক বছর ধরে জীবনানন্দ মেলার আয়োজন করছে জাতীয় কবিতা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখা

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ। ২০১২ সালে ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র শওকত হোসেন হিরণ জীবনানন্দ মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ওই বছর মেলার উদ্বোধন করেন বরিশালের সন্তান পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক মিহির সেনগুপ্ত। তিন দিনব্যাপী মেলায় আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতাপাঠের আসর, কবিআড্ডা, কবিসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানমালার অন্যতম সংযোজন ছিল দিনভর বইমেলা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কবিতা পরিষদ বরিশাল শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ তপংকর চক্রবর্তী।

২০১৪ সালের ২৮ থেকে ৩০ মার্চ তিন দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করে জাতীয় কবিতা পরিষদ। ওই বছরও মেলায় আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কবির আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালের ১৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অশ্বিনীকুমার হলে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জীবনানন্দ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় জেলার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দিনভর বই মেলা এবং আলোচনাসভা মেলাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

জীবনানন্দ মেলা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা

১৩. শিবচতুর্দশীর মেলা

বরিশাল জেলার বিভিন্নস্থানে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে মেলা বসে। এর মধ্যে বরিশাল নগরীর শ্রীশ্রীশংকর মঠ প্রাঙ্গণ, উজিরপুরের তাঁরাবাড়ি প্রাঙ্গণ, বার্থী তাঁরা মায়ের মন্দির

www.pathagar.com

প্রাঙ্গণ অন্যতম। তবে শিবচতুর্দশীর সর্ববৃহত মেলা হয় বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠি জেলার পোনাবালিয়ায়। পোনাবালিয়া শিবমন্দিরের কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মেলা বসে। শিবচতুর্দশী তিথীকে অনেকে আবার মিবরাত্রি বলে অভিহিত করেন। ওই দিন সধবা নারী এবং অবিবাহিতরা উপোস করেন। ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে ডাবের জল, দুধ ঢেলে পূজা করে উপোস ভাঙ্গে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে কেউ কেউ ব্রত পালন করেন। বরিশাল নগরীরর শ্রীশ্রীশংকর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর স্মৃতির উদ্দেশে গঠিত ট্রাস্ট এই মেলার আয়োজন করেন। প্রতিবছর দুই দিন করে মেলার আয়োজন চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। মঠ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মেলার আয়োজ চলে আসছে।

মেলায় আগত এক দোকানি

www.pathagar.com

লোকাচার

১. চৈত্র সংক্রান্তিতে তিতা খাওয়া

বঙ্গাব্দের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে বিভিন্ন রকমের তিতা খেতে হয় বলে প্রচলিত রয়েছে। বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বছরের শেষ দিনে প্রতি হিন্দু পরিবারে বিভিন্ন প্রকারের তিতা শাক-সবজি খাওয়া হয়। এই দিনে মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। অধিকাংশ হিন্দু পরিবার আজো এই নিয়ম মেনে চলে। সকালে দই-চিড়া-মুড়ি-মুড়কি মেখে খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। দুপুরের খাবারে তিতা শাক এবং সবজি হিসেবে– হেলেঞ্চা শাক, বেতের আগা, গিমা শাক, বনভাড়ালি (ঘেচু), থানকুনি, নিম পাতা, থোর (কলা গাছের ভেতরের অংশ), বুহইর (ডুমুর) প্রভৃতি রান্না করা হয়। মটর বা মুগ ডালে করলা দেয়া হয়। সবজি হিসেবে কাচাকলা, পেঁপের ব্যবহার চলে। তাছাড়া এই দিনে কাচা কাঁঠাল রান্না করে (ইচর) খাওয়ার বিধান রয়েছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে বিভিন্ন রকমের তিতা সবজি নিয়ে আসা বিক্রেতার কাছ থেকে সেগুলা কিনছেন ক্রেতারা

www.pathagar.com

অনেকে পঞ্চ তিতা, কেউ কেউ সপ্ত তিতায় রান্না করা নিরামিষ সবজি খেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বরিশাল সদর উপজেলার চাঁদপুরা ইউনিয়নের রায়াপুরা গ্রামের স্বত্তোর্ধ কাকি ঘোষ জানান– বছরের শেষ দিন তিতা খেয়ে দেহের বিষ নামানো হয়। তিতা দিয়ে বছর শেষ করে পরের দিন মিষ্টি দিয়ে শুরু করে টক দিয়ে খাবার শেষ করতে হয়। টক তৈরির প্রধান উপাদান কাচা আম। তার মতে, শরীরকে সতেজ রাখতে চৈত্র সংক্রান্তিতে তিতা খেয়ে শরীর পরিশুদ্ধ করি এবং গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে প্রশান্তি পেতে আমের টক খওয়ার রীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বংশপরম্পরায় চলে আসা এই রীতিকে তিনি প্রাচীন বলে দাবি করেন। তার বিশ্বাস– খাবারের এই নিয়ম মেনে চললে যমও ঘরের দরজা থেকে ফিরে যায়। গ্রাম অঞ্চলের গৃহিণীরা সাধারণত বাড়ির আশপাশ থেকে তিতা উপাদান সংগ্রহ করে রান্না করে থাকেন। কিন্তু শহর অঞ্চলে সবজি বিক্রেতা বা গ্রামের মৌসুমি সবজি বিক্রেতারা তিতা সবজিগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন বিক্রি করার জন্য বরিশাল নগরীর বাজার রোড, নতুনবাজার এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তিতে এগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অল্প অল্প করে সাত/আট রকমের তিতা সবজি ৩০ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

২. ভাইফোঁটা

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকাচারসমূহের মধ্যে ভাইফোঁটা অন্যতম। এই লোকচারের উদ্ভবের সময়কাল জানা যায়নি। তবে লোকাচারটি প্রাচীন বলে জানিয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের বয়স্করা। ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান বংশ পরম্পরায় চলমান।

ভাইফোঁটা

www.pathagar.com

হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক পরিবারে ভাইফোঁটার রীতি নেই। যাদের রীতি নেই সেসব পরিবার এ নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করেন না। পারিবারিক অনুষ্ঠান বিধায় পালন করার ক্ষেত্রে পারিবারিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় পালনকারীদের। কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ভাইয়ের আয়ুস্কামনা ও মৃত্যুদুতকে প্রতিহত করার জন্য বোনেরা ভাইফোঁটা নামের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নির্দিষ্ট দিনে বোনেরা ভাইদের কপালে বাঁ হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দই এবং চন্দনের টিপ তিনবার পরিয়ে দেয়। আর সেই সাথে বোনেরা বলে থাকে–

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যম দুয়ারে দিলাম কাটা,
ভাই আমার নিম তিতা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবন নিরাপদ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন ঘরে ভালোভালো রান্না-বান্না হয়। অনেকে পিঠা-পায়েসের আয়োজন করেন। মিষ্টি বিতরণ করা হয়ে থাকে। ভাই যদি ছোট হয় তবে বড় বোন ছোটভাইকে আশির্বাদস্বরূপ কিছু উপহার দিয়ে থাকেন। আর বোন যদি ছোট হয় তবে বড়ভাই ছোটবোনকে উপহারস্বরূপ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। দেয়ার ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বা নতুন জামা-কাপড় প্রাধান্য পায়।

৩. হরিজন সম্প্রদায়ের সূর্যপূজা

বরিশাল নগরীতে প্রায় ৫ হাজার হরিজন সম্প্রদায়ের বসবাস। একটি বড়ো প্রতিবছর সূর্যপূজা করে থাকেন। সকালে স্নান সেরে সূর্যবন্দনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হয়। এইপূজা উপলক্ষে ২০১৪ সালের ২৮ অক্টোবর বিকেলে কীর্তনখোলা নদীর তীরে জমায়েত হয় ফজারী ও ভক্তবৃন্দ। অস্তগামী সূর্যের স্তব প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের পূজা। তৃতীয় দিন সূর্যদোয়ের সাথে সাথে যজ্ঞ, সূর্যের স্তব, প্রার্থনার মাধ্যমে সাঙ্গ হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা। পূজা উপলক্ষে নগরীর কীর্তনখোলা নদীর তীরে ২টি তোরণ তৈরি করা হয়। সূর্য পূজা উপলক্ষে হরিজন সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোররা উৎসবে মেতে ওঠে। হরিজন ঐক্য পরিষদের সম্পাদক জয়ন্ত রবিদাস জানান, প্রতিবছর হরিজনদের বাড়িতে ষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে সূর্য পূজা শুরু হয়।

মহাসপ্তমীতে কীর্তনখোলা নদীতে সূর্যের পূজার (সুরুজ নারায়ণ) মাধ্যমে এই পূজার মূল আয়োজন। অষ্টমীর সকালে সূর্য বন্দনার মাধ্যমে এই পূজার শেষ হয়। নদী তীরে প্রার্থনা ছাড়াও যজ্ঞানুষ্ঠান ও সূর্যের সন্তোষ লাভের উদ্দেশে বিভিন্ন ফল-উপাচার প্রদান করা হয়েছে। নগরীর কীর্তনখোলা ফেরি ঘাটে মূল পূজা হলেও কাউনিয়া ডোমবাড়ির হরিজনরা স্থানীয় খালপাড়েই পূজার আয়োজন করেন। পূজা উপলক্ষে নগরীর কাউনিয়া, আমিরকুটির, কাটপট্টি, ফলপট্টিসহ হরিজন কলোনী এলাকায়

www.pathagar.com

বসবাসরত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসবের আমেজ লক্ষ করা যায়। সূর্য পূজাকে বিভিন্ন এলাকায় ছটপূজা নামেও অভিহিত করা হয় বলে পূজার সাথে সংশিষ্টরা জানান।

৪. আউগলাই-নিআউগলাইয়ের ব্রত

ব্রতের কথক : বকুল রাণী শীল, বয়স: ৫৫, বর্তমান ঠিকানা : সগরদী বাজার, বরিশাল সদর, বরিশাল। গৃহিণী, দুই ছেলের জননী, স্বামী পরলোকগত। বাবার বাড়ি : দপদপিয়া, উপজেলা : নলছিটি, জেলা : ঝালকাঠি। শ্বশুরবাড়ি : পাদ্রিশিবপুর, উপজেলা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল। কথক বাবার বাড়িতে এবং বিয়ের পর শ্বশুবাড়িতে এই ব্রত পালন করেছেন। এখনো কারো ছেলের বিয়ে হলে বিয়ের কয়েক দিন পর ব্রত পালনের জন্য পরিচিত জন তাকে ডেকে নেন। গত বছর ডিসেম্বরে সর্বশেষ ব্রত করেছেন। এবছরও শীতকালে ২/৩ বাড়িতে ব্রতকথার জন্য ডাক পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ব্রত পালনের সময় : সন্ধ্যার পর। মাসের যেকোন দিন, যেকোন তিথিতে পালন করা যায়। তবে ছেলের বিয়ে অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পর ছেলের মা নববধূকে নিয়ে এ ব্রত পালন করে থাকেন।

ব্রতের উপাচার : ফুল, দূর্বা, তুলসী পাতা, পাত (কলার পাতার অগ্রভাগ), ঘট, আমশরাত (এক বোঁটায় যুক্ত পাঁচটি আম পাতা) এনে আরাধ্য আউগলাই-এর উদ্দেশে সাজিয়ে পূজার আয়োজন করতে হবে। এছাড়াও এই ব্রতে উপাচার হিসেবে সিঁদুর, পান-সুপারী, হাদা, (শুকানো তামাক পাতা), সরিষার তেল এবং প্রসাদ হিসেবে ফল-বাতাসা প্রয়োজন হয়। শুরু ও শেষে উলুধ্বনি দিতে হয়। ব্রতপালনকারীরা ভক্তিভরে ফুল-দূর্বা হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনে আউগলাই-নিআউগলাইকে প্রণাম জানাবে এবং প্রসাদ গ্রহণ করবে।

ব্রত পালনের উদ্দেশ্য : এই ব্রত পালন করলে ব্রত পালনকারী এবং তার পরিবার বিপদ-আপদে রক্ষা পায়, মনষ্কাম পূরণ হয়, নির্ধনের ধন হয়, কুমারীর বিয়ে হয়, স্বামীর আয়ু বাড়ে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যিনি না মানবেন বা অবজ্ঞা করবেন তার সবকিছু রসাতলে যায়। তিনি যা করেন তার ফল উল্টো হয়। যিনি ব্রত পলন করেও অবজ্ঞা ভরে তা বন্ধ করে দেন তিনি ভালো চাইলেও কিছুতে ভালো হবে না। আর তিনি যদি একবার মুখ দিয়ে মন্দ কিছু চায় তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়।

ব্রত পালনের আগে এবং পরে করণীয় : আগেই গোবর-মাটি দিয়ে লিপে রাখা উঠানে পূজার নির্দিষ্ট স্থানে প্রথমে ঘটে সিঁদুর দিয়ে সস্তিকা চিহ্ন এঁকে জল ভরে তার উপরে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া আমশরাত সাজিয়ে রাখতে হবে। আমশরাতের উপরে একটি আস্ত সুপারী অথবা পাকা কাঁঠালীকলা অথবা হরিতকিতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে রাখতে হয়। একে গাছফল বলা হয়। এরপর কলার পাতে সিঁদুর দিয়ে আউগলাই-

www.pathagar.com

নিআউগলাইয়ের চিহ্ন সিঁদুর দিয়ে এঁকে ঘটের সামনে রেখে ধূপ-দীপ-প্রসাদ সাজিয়ে সামনে রেখে ব্রতকথা শুরু করতে হবে। ব্রতের শুরুতে তিন জোড়া উলুধ্বনি (জোকার) দেয়ার নিয়ম রয়েছে। শেষে ব্রতে ব্যবহৃত সরষের তেল উপস্থিত সবার মাথায় মেখে দেয়া হয়। প্রসাদ গ্রহণ করার পর পান-সুপারী-তামাক দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। কলার মেজপাতায় সিঁদুর দিয়ে আঁকা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের প্রতিকৃতি আগামী ব্রত পর্যন্ত পালনকারী পরিবারে সংরক্ষণ করা হয়। আগামী ব্রতের দিন তা জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। ব্রত পালনকালে উপস্থিত সকলে ধোয়া কাপড়-চোপর পড়ে উপস্থিত হয়ে ভক্তিভরে ব্রতকথা শোনেন–

॥ সমবেত গান ॥

চল গোলাপি ফুল তুলিতে বাবুর বাগানে
চাপে-চুপে আনবো ফুল বাবু না জানে
সেই ফুল আনিয়া দেব আউগলাইরে ॥
চল গোলাপি দুব্বা তুলতে বাবুর বাগানে
চাপে-চুপে আনবো দুব্বা বাবু না জানে
সেই দুব্বা আনিয়া দেব আউগলাইরে ॥
চল গোলাপি তুলসী আনতে বাবুর বাগানে
চাপে-চুপে আনব তুলসী বাবু না জানে
সেই তুলসী আনিয়া দেব আউগলাইরে ॥
চল গোলাপি পাত আনতে বাবুর বাগানে
চাপে-চুপে আনব পাত বাবু না জানে
সেই পাত আনিয়া শয্যা দেব আউগলাইরে ॥
চল গোলাপি কুমরিয়ার বাজারে ঘট আনিতে
কুমারেরো বাড়ি দিয়া আনিব মাটির ঘটরে
সেই ঘট আনিয়া দেব আউগলাইরে ॥
চল গোলাপি আমশরাত আনতে বাবুর বাগানে
চাপে-চুপে আনব শরাত বাবু না জানে
সেই শরাত আনিয়া দেব ঘটে উপরে ॥

ব্রতচারিণী গল্পের ছলে বলবেন : এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার সংসারে ছিল সুখ আর সুখ। তার হাতিশালে ছিল হাতি, ঘোড়াশালে ছিল ঘোড়া। অপরূপ সুন্দরী রাণীর কোল জুইড়া আইছে ফুটফুইড্ডা দুইডা পোলা। পোলা দুইডাই ল্যাদা। কিন্তু রাজা ভাগ্য দোষে সবকিছু খুয়াইয়া হালাইছে। ভিকারী হওনের যোগার। একদিন রাজা মনের কষ্টে গ্রামের রাস্তা দিয়ে নীচুমাতায় হাইট্টা যাইতেছে। যাইতে যাইতে দ্যাহে কয়েকজন ঠাইরণ এক বাড়ির উডানে বইয়া সুর কইরা কি যেন গাইতাছে। রাজায় সামনে আউগাইয়া যাইয়া কয়, তোমরা কি করতেছো?

www.pathagar.com

ঠাইরণরা কয়– আমরা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের ব্রত করতেছি।

রাজা কয়– আউগলাই-নিআউগলাই আবার কেডা?

ঠাইরণরা কয়–আউগলাই-নিআউগলাই হইলো যুগল। ধরেন স্বামী-স্ত্রী।

রাজা জিগায়–এই ব্রত কইরা কি হইবে? মানুষ কি পাইবে?

ঠাইরণরা কয়–বিপদ-আপদে রক্ষা পায়, মনষ্কাম পূরণ হয়, নির্ধনের ধন হয়, কুমারীর বিয়ে হয়, স্বামীর আয়ু বাড়ে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

রাজায় কয়–আর আউগলাই-নিআউগলাইরে না মানলে?

ঠাইরণরা কয়–যে না মানবে হের হগল কিছু রসাতলে যায়। হের কোন কামই হয় না। করে এক হয় আর এক। যে না মানবে হে ভালো চাইলে কিছুতেই ভালো হইবে না। আর যদি একবার মুখ দিয়ে খারাপ চায় হেইয়া লগে লগে হইয়া যাইবে।

রাজা ব্রতের কথা হুইন্যা বাড়ি যাইয়া রাণীরে সব ভাঙ্গাইয়া কয়। রাণী শুইন্যা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের ব্রত করার পণ করে। রাজাও প্রতিজ্ঞা করে ব্রত কইরা যদি আমার রাজত্ব ফিইরা পাই, হেইলে প্রতি মাসে একবার কইরা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের ব্রত রাণীরে করতে দিমু। পরের দিন রাজার পকোডে মাত্র দশ টাহা আছে। হের মধ্য দিয়া রাজা একটাহার পান-সুপারী-হাদা পাতা আর ফল-বাতাসা কিইনা আনে। হে বাড়ির এক ঠাইরণরে আইনা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের আসন পাতে রাজবাড়ির উডানে। রাণী কোলের পোলা দুইডারে হোয়াইয়া রাইখা ভক্তিভইরা ব্রত কথা হোনে। হঠাৎ রাজার মনে সন্দেহ জাগে– আউগলাই-নিআউগলাই আছে, নাকি সব মিথ্যা? অমনি রাজা দ্যাহে পূজার আসন লইড়া ওডছে। প্রথমে দ্যাহার পর ভাবে এইডা বুঝি চউক্ষের ভুল। হের পর আবারো দ্যাহে। পরপর তিনবার দ্যাহার পর রাজা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে।

॥ সমবেত গান ॥

বাও নাই বাতাস নাই, আসন কেন লরে রে
ওইনা আসনের আড়ালে
আউগলাই-নিআউগলাই মায় আইছে রে

পূজার আসন নড়তে দেইখ্যা রাজা ও রাণীর মনের মধ্যে ভক্তি জাইগ্গা ওঠে। রাজা-রাণী দুজনেই প্রতিমাসে ব্রত করার প্রতিজ্ঞা করে। ব্রত শ্যাষে রাজা-রাণী ভক্তি ভইরা আউগলাই-নিআউগলাই দেবীরে প্রণাম করে। নিজে প্রসাদ লয় আর যারা জোকার হুইনা আইছে হেগো দেয়। কিছু দিনের মধ্যে রাজার গোলা ভইরা ওঠে। রাজ্য ফিইরা পায়। পাইক-প্যাদা জোগার হয়। আবারো পরিবারে সুখ ফিইরা আয়। এমনি কইরা দিন যায়, মাস যায়। প্রতিমাসেই রাণী ভক্তি কইরা, মানুষজন খাওয়াইয়া একবার কইরা আউগলাই-নিআউগলাইয়ের পূজা দেতে থাহে।

এমন কইরা ছয় মাসের প্রত্যেক মাসেই রাজা ব্রতের সদায় কইরা আনে আর রাণী ব্রত করতে থাহে। এর পর একদিন রাণীর কিসের লইগ্গা যেন মন খারাপ। রাণী ভাবে

www.pathagar.com

এক মাসে ব্রত না করলে আর তেমন কি হইবে। তাছাড়া আমাগোতো এহন আর অভাব নাই। সামনের মাসে একলগে দুইবার করমু হানে। এমনি কইরা দুই মাস, তিন মাস পূজা আর হয় না। রাজায় আনে রাণীর ধরে আলস্য। রাজায় গেছে বাণিজ্যে এদিকে রাণীরে ধরছে আলিস্যায়। আউগলাই-নিআউগলাইয়ের পূজা আর হয় না। এদিকে রাজায় তো আর আয় না। বিদেশে কি যেন সমস্যায় পড়ছে। রাণীরতো মাথা খারাপ। দিন-রাইত দুই পোলারে বুকে লইয়া কান্দে আর কান্দে। রাজার গোলা শূন্য হইয়া যায়। বাড়ি ঘর সবকিছু হারায় রাণী। দুই পোলা লইয়া রাণীর অবস্থা– নাড়ার বান্ধন তারার ছাউনির মতো। দুই মুঠ ভাতের লইগ্গা একসময়কার রাজরাণী ধূলায় নাইমা আয়। স্বামীর কোন খুঁজ নাই। এক পোলারে হাডায় আর এক পোলারে কোলে লইয়া রাণী এই দুয়ারে ওই দুয়ারে ঘুইরা বেড়ায় এক ফোঁটা দুধের লইগ্গা। রাণী পোলাগো লইয়া এক যায়গা দিয়া অন্য যায়গায় ঘোরতে থাহে। একসময় হে অন্য যায়গায় যাইয়া ওডে। একদিন রাণী নাদীর ধারে পোলাগো লইয়া বইয়া আছে। যদি স্বামীর দেহা পায় এই আশায়। নদী দিয়া এক সওদাগর বাণিজ্য কইরা যাইতে ছিল বাড়ির দিকে। নদীর পাড়ে ছোট দুইডা পোলা লইয়া অপরূপ সুন্দরী এক মাইয়া মানুষরে বইয়া থাকতে দেইখ্যা নৌকা থামায়। সামনে আইয়া রাণীর রূপ দেইখা সওদাগর রাণীরে জোড় কইরা নৌকায় ওডায়। পোলা দুইডা চিক্কইর দিয়া কান্দে। সওদাগরের মন ভোলে না। রাণীও কানতে থায়ে চিক্কইর দিয়া। এর মধ্যে নৌকা দিছে ছাইড়া। রাণী কানতে থাহে আর বিলাপ করে–

নিওনা নিওনা গো সওদাগর
সওদাগর নিওনা মোরে
দুইডা শিশু পইরা রইছে
বটবৃক্ষের তলে।
হায়রে বটবৃক্ষ থাইকো তোমরা সাক্ষি।
হায়রে চন্দ্র-সূর্য থাইকো তোমরা সাক্ষি।
হায়রে বনের লতা-পাতা থাইকো তোমরা সাক্ষি।

রাণী পোলাগো দিকে হাত বাড়াইয়া কানতে থায়ে। বিলাপ কইরা কইতে থাহে আমার রূপই আমারে এমন করছে। বিপদে পইরা এবার আউগলাইরে ডাহে আর কয়– আমারে আমার পোলাগো ধারে নিয়া যাও। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না। নিরূপায় হইয়া রাণী এবার কাইন্দা কাইন্দা নিআউগলাইরে কয়– যে রূপের লইগা আমার এমন দশা, আমার হেই রূপ তুমি প্যাতনা বুড়ির মতো কইরা দ্যাও। নৌকা মাঝ নদীতে যাইতে না যাইতেই রাণীমার রূপ প্যাতনা বুড়ির মতো হইয়া যায়। গাও দিয়া বাইরাইতে থাহে পচা মাছের গোন্দ।

সওদাগরের লোকজন তো অবাক। ভাবে এ দেখলাম কি, আর হইলো কি। সওদাগর কয়– মাতারিরে নদীর মইধ্যে ফালাইয়া দে। সওদাগরের লোকজন কয়–

www.pathagar.com

লইলেন তো ভালোর লইগ্গা, আর এহন কি হইলো। তয় আপনে হের লগে থাকতে পারেন বা না পারেন আপনার তো কামের মানুষেরও দরকার আছে। নৌকায় যহন উডাইছেন তহন নদীতে নাই বা ফালাইলেন। সওদাগর প্যানা বুড়ি লউয়া যায় নিজের দেশে। থাকতে দেয় বাড়ির দরজার সামনে খালের পাড়ে খ্যাড়ের ঘরে। আর বাইরের কাম করায়। বাড়ির মদ্যে ঢুকতে দেয় না। মানুষ জনে ঘেন্না করে।

এদিকে হারাদিন কাইন্দা-কাইট্টা দুধের বাচ্চা দুইডা সন্দার সময়ে একটা ঝোঁপের পাশে যাইয়া আশ্রয় লয়। কানতে কানতে ঘুমাইয়া পড়ে। ওই রাজ্যে ছিল এক আটকুরা গোয়ালা। হেগো আছিল একশ একটা দুধের গরু। হেয়ার মধ্যে আছিল একটা সুরভী গাই। গোয়ালা দুধ ব্যাচে আর হে টাহা দিয়া সংসার চালায়। হেগো ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না। কিন্তু ছিল না কোন পোলাপাইন। গোয়ালিনীর মনে এর লইগ্গা ছিল দুঃখ।

গোয়লিনী দ্যাহে হ্যাগো সুরভী গাই দুফুর হওয়ার আগেই কোতায় য্যানো যায়। আবার কিছুক্ষণ পর ফিইরা আয়। এর মধ্যে আটকুরা গোয়ালার মনে প্রশ্ন জাগে যে– সুরভী গাইয়ের এক বোডায় এক বালতি, দুই বোডায় দুই বালতি দুধ হয়। হেই হিসাবে চারই বোডায় চাইর বালতি দুধ হওয়া কতা। এই দুই দিন ধইরা গোয়ালিনী আর দুধ কি করে? বাকি দুধের কতা গোয়ালা গোয়ালিনীরে জিগায়। গোয়ালিনী কয়– সুরভী গাইয়ের দুই বোডা দোয়ানোর পর আর বানের হাত দেওয়া যায় না। দুপুস কইরা লাফ দিয়া ওডে আর দড়ি ছিইড়া দৌড় দিয়া কোতায় যেন যায়। গোয়ালিনী কয়– কাইলকা আমি দেখমু সুরভী গাই কোতায় যায়? কেয়া বানে হাত দিতে দ্যায় না।

অন্যদিকে রাজার নাবালক দুই পোলা জঙ্গলে গাছের নিচে চুপ চাপ বইয়া থাহে। ছোট ভাইয়ের কান্দন দেইখ্যা বড় ভাই কয়–

মায় গেছে আনে
বাপে গেছে বানে
আমরা দুটি ভাই
পইড়া রইছি বট বৃক্ষের তলে ॥

এদিকে গোয়ালিনী আইজ সকাল হইতেই রেডি। হে দ্যাখবেই সুরভী গাই কোতায় যায়। যথারীতি দুধ দোয়াতো যাইয়া যেই দুই বান দোয়ানোর পর তৃতীয় বানে হাত পরছে ওমনি সুরভী গাই লাফ দিয়া উইড্ডা দেয় দৌড়। গোয়ালিনীও সুরভী গাইয়ের লেঙ্গুর ধইরা ঝুইল্লা থাহে। গোয়ালিনী আইজ দেখবেই সুরভী গাই কোতায় যায়। বেতবন-কাটাবন পাড় হয় সুরভী গাই। গোয়ালিনীর সারা শরীর যায় ছাইল্লা-বাইল্লা। হঠাৎ এক বট গাছের তলে যাইয়া সুরভী গাই থামছে। গোয়ালিনী একটু আড়ে সইরা কলাগাছের ফ্যাতরার পাশে যাইয়া পলায়। দ্যাহে সুরভী গাই দুই বোডার দুধ দুই

www.pathagar.com

ভাইরে খাওয়ায়। আর বাকি দুধ কচুপাতায় ঢাইল্লা রাহে। এই দৃশ্য দেইখ্যা দুধ খাওয়া-দাওয়ার পর গোয়ালিনী আস্তে আস্তে দুই পোলার সামনে যাইয়া কয়– ও মনু তোমরা কারা?

বড় পোলাউগ্গায় কয়–

মায় গেছে আনে
বাপে গেছে বানে
আমরা দুটি ভাই
পইড়া রইছি বট বৃক্ষের তলে ॥

গোয়ালিনী আবার কয়– তোমরা কি আমার লগে যাবা। তোমাগো খাওয়ামু-পড়ামু। পোলাদুইডা গোয়ালিনীর লগে যাইতে রাজি হয়। সন্ধ্যার দিকে গোয়লিনী রাজার পোলাগো নিয়া ঘরে উডায়। আটকুরা পরিবার সন্তান পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। কিন্তু কি কইয়া পোলাগো রাখবে। পাড়ার মাইনষে কি কইবে। হেরাতো গোয়ালা-গোয়ালিনীরে চোর কইয়া অপবাদ দিবে। গোয়ালিনী কিছুতেই পোলাগো হাতছাড়া করতে চায় না। গভীর রাতে গোয়ালা বলে– গোয়ালিনী পোলাগো পাওয়ার একটা বিহিত আছে। গোয়ালিনী চমকাইয়া ওঠে। বলে কি বিহিত? তাড়াতাড়ি কও।

গোয়ালা কয়–তুমি কাইল রান্নাবান্না কইরা সাইজ্জা-গুইজ্জা প্যাডে ধামা বাইন্ধা পাড়া বেড়াইতে নামবা। মাইনষে যেন বোঝে যে, গোয়ালিনীর পোলাপাইন হইবে। যেই কথা সেই কাজ। পরদিন গোয়ালিনী রান্দাবারা কইরা খাইয়া-দাইয়া সাইজ্জা-গুইজ্জা প্যাডে ধামা বাইন্ধা পাড়া বেড়াইতে নামে। পড়শীরা বলে– ও গোয়ালিনী তোমার প্যাড ওতো উচা ক্যা? খবর-টবর কি? গোয়ালিনী মিডুমিডু হাইস্যা হাইস্যা কয়–

যা হয় নাই জুয়ান কালে তা হইলো বুড়াকালে
আমি যে বাইচ্চা আছি তাই আমার কত ভাইগ্যো ॥

পড়শীরা অবাক হয়। কয়েক জনে কয়– সন্ধ্যা হইছে এহন তুই বাড়ি যা। পোয়াতিগো সন্ধ্যার পর বাইর থাকতে নাই। গোয়ালিনী আবারো অভিনয় কইরা কয়–

যা হয় নাই জুয়ান কালে তা হইলো বুড়াকালে
আমি যে বাইচ্চা আছি তাই আমার কত ভাইগ্যো ॥

পড়শীগো কেউ কেউ গোয়ালিনীর কপালে সিঁদুর পড়াইয়া দেয় আবার কেউ কেউ মাথায় সরিষার তেল দেয়। আবার কেউ ফল দিয়া সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিইরা যাইতে কয়। এদিকে গোয়ালা ঘরের পেছনে কালাকুত্তা বাইন্ধা রাখছে। গভীর রাত্তিরে কুত্তা কাইড্ডা রক্তে ভাসাইয়া দেছে সাইনছের ঘর। এরপর গোয়ালিনী সাত+সাত অর্থাৎ চৌদ্দ জাগ জোকার দিছে। পাড়া-পড়শীর কান খাড়া হইয়া গেছে চৌদ্দ জাগ জোকার হুইন্যা। রাইত পোহাইতে না পোহাইতে পাড়াপড়শীরা আটকুরা গোয়ালার বাড়িতে আইতে থাহে। জোমক পোলা দেহনের লইগা। কিন্তু গোয়ালা কিছুতেই পোলাপানরে দেখতে দেয় নাই। ঘরের মধ্যে উঁকিঝুকি মাইরা দ্যাহে রক্ত আর রক্ত। কেউ কেউ

www.pathagar.com

দ্যাহে ওই রক্তের মধ্যে হুইয়া রইছে দুগ্গা পোলা। পোলাগো দেইখ্যা প্রতিবেশীরা কইয়া ওডে– আরে ভগবান এ দেহি এক বছইরা পোলাপানের মত পোলা হইছে গোয়ালিনীর।

গোয়ালা ছয় দিনে ষষ্ঠী, মাস দিনে মাসকি করছে। গোয়ালা মাইনষেরে বেশি একটা ঘেষতে দেয় না পোলাপানগো ধারে। গোয়ালিনীরেও দেয় না পাড়া বেড়াইতে বা নদীর ঘাটে যাইতে। রাজার পোলারা গোয়ালার ঘরে ঘি-ননী খাইয়া হাতে-বিঘাতে ডাঙ্গর হইয়া গেছে। ৫বছর হইতে না হইতেই স্কুলে ভর্তি কইরা দিছে গোয়ালা। গোয়ালিনী পোলাগো নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া স্কুলে পাডায়।

একদিন গোয়ালা দুধ নিয়া বাজারে যায়। দুধ বেইচ্যা বাড়ি ফিইরা কয়– দ্যাহ হাডের কয়েকজনে কয়, যে আটকুরা গোয়ইল্লার পোলারা বড় হইছে। হেয়ার পরও দুধ লইয়া রোজ রোজ হাডে আয়। পোলারা একটুও সাহায্য করে না। এই কতা বড় পোলায়ও হুইন্না ফালায়। পরদিন বড় পোলা কয়–বাবা আইজ তোমারে আমি হাডে যাইতে দিমু না। আমি দুধ লইয়া হাডে যামু। বেচা-বিক্রি কইরা হিসাব-নিকাশ করইরা টাহা-পয়সা বুইঝা আনমু। যেমন কতা তেম কাজ। বড় পোলা কলসি মাথায় লইয়া হাডের দিকে রওনা দেয়। এইয়া দেইখ্যা ছোড পোলাও বায়না ধরে ভাইয়ের সাথে হাডে যাওয়ার। বড় পোলায় কয়, ভাই তোর যাওনের দরকার নাই, আমিই পারুম। তুই থাক। নাছোরবান্দা ছোডপোলা ভাইয়ের পিছ পিছ রওনা দেয়। তহন বড়ভাই হাঁটতে হাঁটতে কইতে থাহে–

মায় গেছে আনে
বাপে গেছে বানে
আমরা দুটি ভাই
পইড়া রইছি
আটকুরা গোয়াইল্লার আতালে ॥

এই কতা হোনতে পায় প্যাতনা বুড়ি। হুইনা হের মনের মধ্যে উথাল পাথাল করতে থাহে। চউক্ষের সামনে ভাইসা উঠতে থাহে পোলা দুইডার মুখ। প্যাতনা বুড়ি হেগো পিছপিছ হাডে আবারো হোনতেপায়–

মায় গেছে আনে
বাপে গেছে বানে
আমরা দুটি ভাই
আটকুরা গোয়াইল্লার আতালে ॥

আগেকার রাণী আর এহনকার প্যাতনা বুড়ি খুঁজতে খুঁজতে পোলাগো স্কুলে যাইয়া হাজির হয়। ভালো কইরা দ্যাখতে দ্যাখতে হঠাৎ কইয়া ওডে–ওপোলা তোমরা সত্যি কইরা কওতো তোমরা কারা? পোলা দুগ্গা নাক ছিটকাইয়া কয়, কেডা তুমি? তুমি আমাগো সামনে দিয়া সইরা যাও। বিচ্ছিরি গোন্দ আইতেছে তোমার গাও দিয়া। হঠাৎ প্যাতনা বুড়ি ছোড পোলার কপালে একটা কাডা দাগ দেইখ্যা মনে করে– বড়পোলায় এক দিন ছোড পোলারে কঞ্চি দিয়া বাড়ি মাইরা এমন দাগ ফালাইয়া দিছিল। এই

www.pathagar.com

পোলা দুগ্গাই কি তাইলে তার। প্যাতনা বুড়ি পোলা দুগ্গারে নিজের বইল্যা দাবি করে। নিজের পোলাগো পাইয়া হে কিছুতেই আর হাতছাড়া করতে চায় না।

এরমধ্যে বেশ কিছুদিন আগে স্ত্রী-সন্তানহারা রাজা ঘোরতে ঘোরতে ওই সওদাগরের বাড়িতে আইসা আশ্রয় নেয়। একদিন রাজারে আউগলাই-নিআউগলাই স্বপ্ন দ্যাহায় যে—তোর স্ত্রী-পুত্র দুই যায়গায় ঘুইরা বেড়ায়, আর তুই নিশ্চিন্তে ঘুমাও। রাজার ঘুম ভাইঙ্গা যায়। গাও ঝাড়া মাইরা কিছুক্ষণ চুপ কইরা বইয়া থাইক্যা স্বপ্নের কতা ভাইবা আবারো ঘুমায়। আবারো একই স্বপ্ন দ্যাহে রাজায়। এমনি কইরা তিন তিন বার স্বপ্ন দেহার পর রাজা চকবগাইয়া হজাগ হইয়া যায়। আর তো ঘুমায় না। পরদিন ভোরে স্বপ্নে কতা সওদাগররে জানায়।

ওদিকে প্যাতনা বুড়িরূপী রাণী পোলা পাওয়ার লইগা সওদাগরের কাছে গোয়ালা-গোয়ালিনীর বিরুদ্ধে বিচার দেয়। যাইয়া দ্যাহে রাজারে। কিন্তু নিজের পাপ আর এই চেহারার লইগা কিছুই কইতে পারে না। খালি কান্দে আর ভাবে– কেউই হ্যার কতা বিশ্বাস করবে না। এহন স্বামীর দাবি কইরা পোলাগো হারানো যাইবে না। সওদাগর বিষয়ডার সুরাহা করার লইগা পোলাগো স্কুল দিয়ে ধইরা আনাইয়া বিচার বসায়। গোয়ালা গোয়ালিনীরে ডাইকা আনতে লোক পাডায় হ্যাগো বাড়ি। প্রথমে যাইতে রাজি হয় না। পরে পোলাগো কতা চিন্তা কইরা গোয়ালা-গোয়ালিনী সওদাগর বাড়িতে যাইয়া কয়–

আমার রান্দা ভাত গান্দা হইছে
স্বামী-স্ত্রী কেউই খাই নাই
আমার পোলাগো দ্যাও।

ফয়সালা না হওয়ায় সওদাগর পোলাগো নিজের জিম্মায় রাইখ্যা সবাইরে যাইতে কয়। পোলা দুগ্গা বাড়ি যাওয়ার লইগা কান্দাকাডি করে। কিন্তু সওদাগর হ্যাগো যাইতে দ্যায় না। পোলারাও প্যাতনা বুড়ির ধারে থাকবে না। পরের দিন বিচার হইবে। সওদাগর প্যাদা পাডাইছে গোয়ালা-গোয়ালিনীর বাড়িতে। গোয়ালা কয়, আমার কম্প দিয়া জ্বর ওডছে। আমি যাইতে পারুম না। কিন্তু পোলাগো লইগা গোয়ালিনীর কান্দনে আর প্যাদার ভয়ে সওদাগর বাড়ির বিচারে যাইতে বাধ্য হয়।

বিচার আসরে সওদাগর জিগায় গোয়ালিনী তুমি কও পোলা দুগ্গা কার? যেই কইতে গেছে যে, পোলারা আমার, হেই নিআউগলাই গোয়ালিনীর গলা চাইপা ধরে।

বিচার আসরে বওয়া রাজা এবার কয়, গোয়ালিনী, সত্য ধর্মের কাল; সত্য কতা কও।

গোয়ালা-গোয়ালিনী আবারো যহন কইতে গ্যাছে পোলারা আমাগো হেই সময়েই নিআউগলাই আবারো দুজনের গলা চাইপ্পা ধরে। কোন কতা মুখ দিয়ো বাইর হয় না।

যহন বিচার কিছুতেই আর কিছু হয় না তহন প্রজারা কয়, বিচারের বিধান করমু আমরা।

প্রজাগো কতা হুইনা সওদাগর কয়, ঠিক আছে। তোমাগো কতাই ঠিক। আগামী পরশু বিচারের দিন ধার্য করে প্রজারা।

www.pathagar.com

বিচারের দিন সকালে হাজার হাজার গ্রামবাসী বিচারের জায়গায় উপস্থিত হইছে। প্রজাগো মধ্য দিয়া বুড়া এক প্রজা কয়, সওদাগর মশায় আমরা চাই ঠিক বিচার। প্রজাগো পক্ষ দিয়া বিধান হইলো–

দশ হাত আড়ে দশ হাত ব্যাড়ে কাট একটা পুষ্কুনি।
কড়ি দিয়া বান্ধাও একটা জাঙ্গাল পুষ্কুনির ।
তার এক পাড়েতে গোয়ালিনী
অন্য পাড়ে প্যাতনা বুড়ি
এক পাড়েতে ছেলেরা
অন্য পাড়ে থাকবে প্রজারা ॥

পুষ্কুনি কাডার লইগা এবং কড়ি দিয়া একটা জাঙ্গাল বান্ধানোর লইগা দরকার দুই দিন সময়। দুই দিন পর হইবে আসল বিচার।

প্যাতনা বুড়ি ঘরে যাইয়া কাইন্দা কাইন্দা কয়, আউগলাই-নিআউগলাই আমি অনেক পাপ করছি। আমি তোমারে অবজ্ঞা করছি তুমি এবার আমারে ক্ষমা করো। তুমি আমার পোলাগো আমার কোলে ফিরাইয়া দাও। দুই দিন দুই রাইত ধইরা প্যাতনা বুড়ি খালি কাইন্দা কাইন্দা আউগলাই-নিআউগলাইরে ডাকছে।

অন্যদিকে গোয়ালা বাড়ি যাইয়া গোয়ালিনীরে রুই মাছ, লেউয়া, শিং মাছের ঝোল খাওয়ায়। লাউপাতার ঝোল খাওয়ায় যাতে গোয়ালিনীর বুকে দুধ হয়। দুই দিনেই গোয়ালিনী খাইতে খাইতে মোডা হইয়া গেছে। বিচারের দিন সকালেই সবাই উপস্থিত হইছে। প্রজাগো কতা মতো পুষ্কুনি কাডা হইছে। কড়ি দিয়া জাঙ্গাল বান্ধাইনা হইছে। সবকিছু করা হইছে। পুষ্কুনির একপাড়ে দুই পোলা, অন্যপাড়ে প্যাতনাবুড়ি। একপাড়ে গোয়ালিনী আর অন্যপাড়ে প্রজারা।

সওদাগরের অনুমতি লইয়া বুড়া প্রজা কয়, এইবার গোয়ালিনী কোলে ছোড পোলারে নিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে। গোয়ালিনী ছোড পোলারে কোলে নিয়া দুধ খাওয়াইতে থাহে। কিন্তু দুধ আর বাইরায় না। পোলায় চুইতে চুইতে রক্ত বাইর হইয়া গেছে কিন্তু দুধ বাইর হয় নাই। এইবার প্যাতনা বুড়ির কোলে ছোড পোলারে দিয়া একইভাবে দুধ খাইতে কয় প্রজারা। যেই পোলাডায় দুধে মুখ দিয়া চোষন দিছে অমনি পোলার মুখ ভইরা গেছে। দশ হাত াড়ে আর দশ হাত ব্যাড়ের পুষ্কুনি দুধে ভইরা গেছে। সবাই জাগইর দিয়া উঠছে। এমন কইরা বড় পোলারেও দুধ খাওয়াইতে গেলে একই অবস্থা হয়। গোয়ালা চিক্কইর দিয়া কয়, গোয়ালিনীর বুকে দুধ আছে। কিন্তু কেউই আর হে কতা হোনতে চায় না। গোয়ালা গোয়ালিনীর দুধে টান দিয়া দুধ বার করতে গেলে দুধের বোটাই ছিইরা গেছে কিন্তু দুধ আর বাইর হয় নাই।

গোয়ালিনী তহন আসল কতা কয় যে, পোলা দুগ্গারে আমি জঙ্গ দিয়া টোকাইয়া আইন্না কোলে পিডে কইরা মানুষ করছি। তাই পোলারা আমার। প্যাতনা বুড়ি কয়–

www.pathagar.com

পোলাগো আমি দশ মাস দশ দিন প্যাডে ধইরা জন্ম দিছি তাই পোলারা আমার। আসল মা চেনার পরও প্রজারা আবার বেকায়দায় পড়ে।
প্রজারা বিধান দেয়–

পোলা দুগ্গা গোয়ালা বাড়ি খাইবে
প্যাতনা বুড়ির বাড়ি আচাইবে।
প্যাতনা বুড়ির বাড়ি খাইবে
গোয়লার বাড়ি আচাইবে।

সমান অধিকার দুই পক্ষের। কিন্তু এতে কেউই রাজি হয় না। দুই পক্ষই পোলাগো নিজের কইরা চায়। এই অবস্থা দেইখ্যা প্যাতনা বুড়ি আউগলাই-নিআউগলাইরে স্মরণ কইরা পুষ্কুনিতে ঝাপাইয়া পড়ে আর প্রতি মাসে ব্রত পালন করার প্রতিজ্ঞা করে। ঠিক এমন সময় আউগলাই রাণীরে কইয়া ওডে,

দিলাম দিলাম পত্র বর
পরমায়ু বর দিয়া দিলাম রাজারে
লইয়া যাও তোমার ঘর।

আউগলাই পোলাগো কয়,

দিলাম দিলাম বিদ্যার বর
পরমায়ু বর দিয়া দিলাম তোমাগোরে
মায়রে লইয়া যাও তোমার ঘর।

আউগলাই রাজারে কয়–

দিলাম দিলাম শান্তির বর
রূপের বর দিয়া দিলাম রাণীরে
স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাও তোমার ঘর।

রাজা-রাণী-পোলারা আবার একত্র হইয়া সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

৫. ঘাটকালীর ব্রত

ব্রতের কথক : বকুল রাণী শীল, বয়স: ৫৫, বর্তমান ঠিকানা : সগরদী বাজার, বরিশাল সদর, বরিশাল। গৃহিণী, দুই ছেলের জননী, স্বামী পরলোকগত। বাবার বাড়ি : দপদপিয়া, উপজেলা : নলছিটি, জেলা : ঝালকাঠি। শ্বশুরবাড়ি : পাদ্রিশিবপুর, উপজেলা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল। কথক বাবার বাড়িতে এবং বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এই ব্রত পালন করেছেন। এখনো কারো ছেলের বিয়ে হলে বিয়ের কয়েক দিন পর ব্রত পালনের জন্য পরিচিত জন তাকে ডেকে নেন। গত বছর ডিসেম্বরে সর্বশেষ ব্রত করেছেন। এবছরও শীতকালে ২/৩ বাড়িতে ব্রতকথার জন্য ডাক পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

ব্রত পালনের সময় : সন্ধ্যার আগে ঘাটে বসে এই ব্রত পালন করতে হয় ॥ কোন নিদৃষ্ট তিথি বা বারের প্রয়োজন নেই । অর্থাৎ যেকোন তিথিতে এবং যে কোন দিন ব্রতপালন করা যায় । ব্রতস্থলে যিনি গুরুজন থাকবেন তাকে সবাই প্রনাম করবেন ।

ব্রতের উপাচার : দূর্বা, সিঁদুর এবং প্রসাদ হিসেবে ফল-বাতাসা প্রয়োজন হয় । শুরু ও শেষে উলুধ্বনি দিতে হয় । ব্রতপালনকারীরা ভক্তিভরে দূর্বা হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনে ঘাটকালীকে প্রনাম জানাবে এবং প্রসাদ গ্রহণ করবে ।

ব্রত পালনের উদ্দেশ্য : এই ব্রত পালন করলে ব্রত পালনকারী এবং তার পরিবার বিপদ-আপদে রক্ষা পায়, মনষ্কাম পূরণ হয় । যিনি না মানবেন বা অবজ্ঞা করবেন তার সবকিছু ছাড়খার হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে ব্রত কথার মধ্যেই পাওয়া যায়– ঘাটকালী বলে যেবা শুভ যাত্রা করে, শূণ্য হাতে সদাশিব সদা রক্ষে তারে । ব্রত শুনে যেবা করে তুচ্ছ উপহাস, শেল বিদ্ধ হয়ে তার নরকেতে বাস । ব্রতকথা শুনে যেবা মনে মনে হাসে, দুর্গতির একশেষ ধরে যক্ষ্মা কাশে । ব্রতকথা শুনে যেবা করে অহংকার, বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় রক্ষা নাই আর । পরিণামে কিযে দশা সেই যে পশুর, মৃত্যু তার দণ্ডাঘাতে দন্ড করে চুর । ব্রতকথা শুনে যেবা দূরে যায় সরে, অপঘাতে মৃত্যু তার রক্ষা কেবা করে ।

ব্রত পালনের আগে এবং পরে করণীয় : ব্রতকারীগন বাড়ী ও পড়শীদের একবার মাত্র ডাকবেন । দুইবার ডাকবেন না । ওই একডাকেই যারা নদী-খাল বা পুকুরঘাটে আসবে ব্রতপালনের উদ্দেশ্যে তাদের নিয়েই ব্রতকথা বা পাচালী মুখস্থ বলতে হবে । ব্রতের শুরুতে তিন জোড়া উলুধ্বনি (জোকার) দেয়ার নিয়ম রয়েছে । শেষেও একইভাবে উলুধ্বনি দিতে হবে । শুধুমাত্র করজোড়ে দূর্বা নিয়ে এই ব্রত শুরু করা যায় । তবে প্রসাদ হিসেবে ফল-মূল এবং পান-সুপারীর ব্যবহার প্রচলন আছে । প্রসাদ গ্রহণ করার পর বয়োজ্যেষ্ঠকে সবাই প্রনাম করবে । পালনকারীরা কলসী ভরে ঘরে ফিরবেন । পালনকারীরা ধোয়া কাপড়-চোপর পড়ে উপস্থিত হয়ে ভক্তিভরে ব্রতকথা শোনেন–

ব্রতের বন্দনা

নমঃ নমঃ সিদ্ধেশ্বরী পার্ব্বতী কুমার ।
দেবতার অগ্রে পূজি চরণ তোমার ॥
পুত্ররূপে গজানন সর্ব্বসিদ্ধি দাতা ।
তোমার জননী দেব সবাকার মাতা ॥
তব নাম স্মরণেতে বিঘ্নের বিনাশ ।
বিঘ্নবিনাশ মা তাই করে সুপ্রকাশ ॥
হৃদয়েতে এস মোর হৃদয় রঞ্জন ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর লক্ষ্মীনারায়ণ ।
বন্দে শৈল সুতা দেবী শিবসিমন্তিনী ।
দশমবিদ্যারূপে দশভূজাঙ্গিনী ॥

www.pathagar.com

সরস্বতী রূপে তব পদে নমস্কার ।
রচনাদি হয় যেন ভাষায় প্রচার ॥
এস মাতা বাক্‌দেবী স্কন্ধে করি ভর ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মা আমার ॥
বহুদিন হতে মম এই আকিঞ্চন ।
ঘাটকালীর ব্রতকথা করিব বর্ণন ॥
কিন্তু দেবী কি করিব আতি ভক্তিহীনা ।
পরাধীনা দাসী আমি আশ্রয়বিহীনা ॥
সংস্কৃত ব্যাকরণে নাহি অধিকার ।
কি করিয়া ব্রতকথা করিব প্রচার ॥
কারকাদি সন্ধি সূত্রে নাহি অধিকার ।
কি দিয়ে যে কি করিব চিন্তা করা ভার ॥
তবে যদি দয়া মোরে করেন অভয়া ।
শীতঅন্তে কুমারীকে দিয়ে পদছায়া ॥
দোষাদোষ না লইবেন যত জ্ঞানীগণ ।
তাদের পদেতে মোর এই নিবেদন ॥
কূলপণ্ডিতের কাছে এইমাত্র চাই ।
অবলা বলিয়া যেন ক্ষমা ভিক্ষা পাই ॥
স্বত্ত্বঃ রজঃ তমঃ ইতি দ্বিগুণ আঁধার ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর ॥
একে একে বন্দি আমি যত দেবগণ ।
পূর্ণকর মনোবাঞ্ছা এই নিবেদন ॥
শিব দুর্গা পদে মোর এই নিবেদন ।
অবলার বল মাত্র শ্রীকালী চরণ ॥
তারপর বন্দি আমি কালীঘাটের কালী ।
যেইখানে হয়েছিল লোহার পাঠবলি ॥
এই ও মাহাত্ম্য ভবে করুণা যাহার ।
ভক্তিভরে পূজি আমি চরণ তোমার ॥
এস মাতা ঘটেশ্বরী হৃদয়ের পটে ।
পূজির চরণ দুটি মন্ত্রহীন ঘটে ॥
এস মাতা ঘটেশ্বরী পূজিব চরণ ।
ভক্তিভরে অকাতরে ডাকে বামাগণ ॥
অচলা হইয়া দেবী কর অধিষ্ঠান ।
যাবৎ না ব্রতকথা হয় সমাপন ॥

www.pathagar.com

অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাগো মিনতী আমার।
অন্যস্থানে যাও যদি দোহাই তোমার ॥

ব্রতের প্রণামমন্ত্র

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥
সর্ব্বসা বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপ বর্গদে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবেসর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্ব্যকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে ॥

ব্রতকথা বা পাঁচালি

ঘাটকালী ব্রতকথা শুন দিয়া মন।
ঘাটে বসে এই কথা করিবে শ্রবণ ॥
তিথিবার না লাগিবে কিছুই ইহাতে।
শ্রবণ করিবে কথা দুর্ব্বা লইয়া হাতে ॥
ব্রতের নিয়ম আছে শুন সর্ব্বজন।
আদি অন্তে উলু দিবে যত ত্রয়োগণ ॥
গুরুজন কেহ যদি থাকে বিদ্যমান।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাকে করিবে প্রণাম ॥
দ্বিধা না করিবে কভু মান-অভিমান।
বলিলাম সব এবে ব্রতের বিধান ॥
আর যাহা বলি শুন সব বামাগণ।
পান-সুপারী-চুন আদি করিবে আয়োজন ॥
খরের মশল্লা যত প্রিয় মিষ্ট ফল।
বাধা নাই দিতে পার যার যা সম্বল ॥
একমাত্র চিন্তা সেই চরণ কমল।
ভক্তিভাবে শুনিলে পাবে হৃষ্ট ফল ॥
ঘাটকালী বলে যেবা শুভ যাত্রা করে।
শূণ্য হাতে সদাশিব সদা রক্ষে তারে ॥
ব্রত শুনে যেবা করে তুচ্ছ উপহাস।
শেল বিদ্ধ হয়ে তার নরকেতে বাস ॥
ব্রতকথা শুনে যেবা মনে মনে হাসে।
দুর্গতির একশেষ ধরে যক্ষ্মা কাশে ॥

www.pathagar.com

ব্রতকথা শুনে যেবা করে অহংকার।
বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় রক্ষা নাই আর ॥
পরিণামে কিযে দশা সেই যে পশুর।
মৃত্যু তার দণ্ডাঘাতে দম্ভ করে চুর ॥
ব্রতকথা শুনে যেবা দূরে যায় সরে।
অপঘাতে মৃত্যু তার রক্ষা কেবা করে ॥
এসব পাপীর শাস্তি মুখে না ফুরায়।
অধিক লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায় ॥

সওদাগরের বিবরণ

কোন এক দেশে ছিল এক সওদাগর।
পুত্র রাখি পত্নিসহ গেল লোকান্তর ॥
ছোট বেলা বিয়ে দিয়ে বৌ আনিয়ে ঘরে।
কিছুদিন সুখে ছিল শুন তার পরে ॥
কাল পূর্ণ হলে আর কে রাখিতে পারে।
পতি-পত্নিসহ তারা গেল স্বর্গপুরে ॥
টাকাকড়ি যাহা ছিল ফুরাইয়া যায়।
স্থাপ্য ধনে বসে কদিন কুলায় ॥
হলেও রাজার গোলা ভাল দেখি চিতে।
ফুরাইয়া যায় সব ঝিনুক মাপিতে ॥
ব্যবসা আদি কোনরূপ আয় নাহি করে।
সওদাগর পুত্র তার ভাবিছে অন্তরে ॥
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী সবে বলে তাই।
সপ্ততরী নিয়ে তবে বাণিজ্যেতে যাই ॥
বাণিজ্য কারণ আমি দূরগামী হব।
গুণবতী ভার্য্যা ঘরে তার কি করিব ॥
এই চিন্তা মনো মধ্যে বলবতী তার।
লইব স্মরণ গিয়ে এইখানে আমার ॥
এতক ভাবিয়া শেষে সাধুর তনয়।
উত্তরিয় গিয়া সেই মাতুল আলয় ॥
ছয় মাসের খোরাক পোষাক সঙ্গে নিয়ে।
মামীকে সকল কথা বলিছে ডাকিয়ে ॥
এই ক্ষণেতে শুন মামী মম বিবরণ।
বাণিজ্যে যাবার জন্য করিয়াছি মন ॥
বৌকে যদি তব কাছে রাখহ এখন।

www.pathagar.com

তব আশীর্ব্বার্দে করি বাণিজ্যে গমন ॥
বামা সতী কি প্রকারে সঙ্গে নিয়ে যাব ।
তব কাছে রাখ সতী ত্বরায় আসিব ॥
কিছুদিন পরে আমি আসিয়া হেথায় ।
বৌকে তবে নিয়া যা আপন আলয় ॥
এ বিপদে মামী যদি তুমি কর পার ।
চিরদিন বাধা রব চরণে তোমার ॥
লক্ষ্মীর বরে মামার কোন অভাব নাই ।
গোলাভরা ধান আর গোয়ালেতে গাই ॥
হাতীশালে হাতী আর ঘোড়া দাস-দাসী কত ।
কলরবে পূর্ণ সদা বাড়ি-ঘর যত ॥
অহংকারে করে আমি তুচ্ছ চরাচর ।
কোথা হতে এ আপাদ জুটিল আবার ॥
স্বীকার পাইল শেষে পড়িয়া লজ্জায় ।
সে অবধি ভাগ্নে বৌ রহিল তথায় ॥
এদিকেতে ছয় মাস গেল উত্তরিয়ে ।
ওদিকেতে বধূসতী ভাবিছে বসিয়ে ॥
ছয় মাস উত্তরিয়া বৎসর আসিল ।
তবু সওদাগর পুত্র দেশে না আসিল ॥
হিংসাতে মামী শাশুড়ি কহিতে লাগিল ।
দিবা-রাত্র গাল-মন্দ করিছে বধূরে ॥
খেতে পড়তে দেয় বলে খোটা দেয় কত ।
দিনান্তে খেতে দেয় পোড়া ভাত যত ॥
শতগ্রন্থি ছিন্নবস্ত্র দিয়া সর্ব্বগায় ।
এত কষ্ট দিয়া মামী রাখিল তায় ॥
তারপর মুখ জ্বালা সহন না যায় ।
সওদাগর পত্নী ভাবে কী হবে উপায় ॥
মনে মনে ভাবে তিনি কি করি এখন ।
পোড়া প্রাণ না রাখিয়া দিব বিসর্জন ॥
এতেক ভাবিয়া সতী করিল গমন ।
নিবির অরণ্য মাঝে দিল দরশন ॥
ভীষণ কান্তারে বসি কাঁদিতে লাগিল ।
হেণকালে উপরেতে দৈববাণী হল ॥
কে যেন বলিছে তুই কেন কাঁদ বালা ।

www.pathagar.com

ব্রত কর ঘাটকালীর দূরে যাবে জ্বালা ॥
এই ব্রত যদি তুই পার করিবারে ।
শীঘ্রই আসিবে তোর স্বামী ফিরে ঘরে ॥
পাড়া পড়শীকে ঘাটে নিয়া যাবি ।
এক ডাকের বেশি ডাক কভু নাহি দিবি ॥
তাহাতে যে আসে বা না আসে ঘাটে ।
ঘাটে বসে শুনিবে কথা মনের হরষে ॥
এক বিরা পান চুন সুপারি সঙ্গে ।
সিঁন্দুর সিঁথিতে দিবে মনের আনন্দে ॥
খয়েরাদি প্রিয় খাদ্য যত দিতে পার ।
ভক্তিভরে একমনে এই ব্রত কর ॥
ব্রতঅন্তে সকলেকে সিঁন্দুর পরিয়ে ।
প্রসাদ দিবেক সবে বাটোয়ারা করে ॥
অবশিষ্ট কিছুমাত্র ভক্তি সহকারে ।
যতনে তুলিয়া দিবে আপনার শিরে ॥
তারপর মনে মনে করিবে ধেয়ান ।
সবজ্বালা জুড়াইবে পাবে পরিত্রাণ ॥
দৈববাণী শুনি ধ্বনি মন উচাটন ।
করিব এ ব্রত কিন্তু শাশুড়ি ভীষণ ॥
এইসব কথা যদি তার কাছে বলি ।
বার কথা শুনাইবে আর দিবে গালি ॥
এই সকল শুনাইয়া কার্য কিছু নাই ।
তার চেয়ে ভিক্ষা করে যাহা কিছু পাই ॥
তাই দিয়ে ব্রত কথা করিব পালন ।
ইহা ভেবে বধূ সতী করিল গমন ॥
পাড়া মধ্যে যেয়ে এক বাড়ি উপনীত ।
করজোড় করিয়া বলিছে যথোচিত ॥
সেই বাড়ির কটি বৌ পান খেতেছিল ।
পান দেখে দুটি পান ভিক্ষা সে মাগিল ॥
ক্রোধভরে তারা সব গর্জিয়া উঠিল ।
সবে মিলে দূরদূর করিতে লাগিল ॥
কেহ বলে দেখ মাগীর পেটে নাই ভাত ।
পান খাওয়ার সাধ কত দুরহ বজ্জাত ॥
বার বৎসর ধরে স্বামীর খোঁজ নাই ।

www.pathagar.com

এতকাল গত হল আছে কিবা নাই ॥
পরনেতে ছেড়াবাস রঙ্গ দেখ কত।
বুড়ি বলে বাছারা আর বল কত ॥
খেতে বলে দুটি পান দেলো হাতে ধরে।
দুটি পান দিল শেষে বুড়ি দয়া করে ॥
পান দুটি পেয়ে সতী করিল গমন।
মনে ভাবে হেথা আর নাহি প্রয়োজন ॥
এত বুলি শুনিলাম এক পান চেয়ে।
আর যদি কিছু চাই আসবে ঝাটা নিয়ে ॥
কার্য নাই অন্য বাড়ি করিব গমন।
সব বাড়ি দূর দূর আগের মতন ॥
দূর দূর করে পরে দয়া প্রকাশিয়া।
কিছু কিছু দিয়া দিল বিদায় করিয়া ॥
যাহামাত্র পেয়েছিল তাই সব নিয়ে।
পাড়া পড়শীদের সতী বলিছে ডাকিয়া ॥
এস সবে ঘাটে বসি শুনি ব্রতকথা।
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ দূরে যাবে ব্যথা ॥
শাশুড়ি বলে মাতা করি নিবেদন।
ঘাটে এসে ব্রতকথা করগো শ্রবণ ॥
শাশুড়ি বলেন মোর সময় যে নাই।
হাতীশালে হাতি বাধা গোয়ালেতে গাই ॥
দাস-দাসী ঘুমে আছে যার যেবা ঘরে।
স্বামী-পুত্র শুয়ে আছে দোতলার উপরে ॥
আর যতসব শুয়ে আছে আঙ্গীনার মাঝে।
মন দিতে নাহি পারি বৃথা বাজে কাজে ॥
এতেক বলিয়া তিনি করিল গমন।
তারপর যা ঘটিল শন সর্ব্বজন ॥
যারা মাত্র এসেছিল তাহাদের নিয়ে।
শুনিলেক ব্রতকথা ঘাটেতে বসিয়ে ॥
ব্রতঅন্তে সকলেকে সিঁন্দুর পরিয়ে।
প্রসাদ দিলেক সবে বাটোয়ারা করে ॥
কিন্তু স্বামী বাড়ি এলে করিবেক ব্রত।
ইহা না বুঝিল রমা প্রর্থনার মত ॥
ব্রত শেষে বাড়ি এসে দেখে চমৎকার।

www.pathagar.com

উঠানে পড়িয়া মামী করিছে চিৎকার ॥
ধূলাতে পরিয়া তিনি গড়াগড়ি যায়।
শোকেতে কাতর হয়ে করে হায় হায় ॥
বৌকে ডাকিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিল।
তোরে স্থান দিয়া মোর এ দশা হইল ॥
কোথাকার ডাইনী এনে এ দশা আমার।
একেবারে স্বর্গপুরী হইল ছারখার ॥
হাতীশালে হাতী মরে গোয়ালেতে গাই।
স্বামী-পুত্র দাস-দাসী কিছু বেঁচে নাই ॥
তোরে স্থান দিয়া মোর এ দশা হইল।
স্বামী-পুত্র দাস-দাসী সকলি মরিল ॥
ঘাটে বসে কি করিলি তাই না শুনিয়া।
স্বামী-পুত্র মরা সব দেখিনু আসিয়া ॥
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া না পাই।
ইচ্ছা হয় বিষপানে এজ্বালা জুড়াই ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মামী হইল আকুল।
ভাগ্নেবৌ বলে শুন যাতে পাবে কূল ॥
ঘাটকালী তুচ্ছ করে অন্যায় হয়েছে।
সেই জন্য মামী তব কপাল পুড়েছে ॥
এতক্ষণে উঠে বসে শুন মোর কথা।
হারাধন পাবে ফিরে মান ব্রতকথা ॥
উঠিয়া অমনই ব্রত মানস করিল।
ব্রতকথা শুনিবারে ঘাটেতে চলিল ॥
ব্রতঅন্তে প্রণমিয়া করিল প্রার্থনা।
পুরাও মা ঘাটকালী দাসীর বাসনা ॥
এ বিপদ হতে মোরে কর মা উদ্ধার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে ব্রত করিব আবার ॥
বাড়ি এসে দেখে সব দাস দাসী যারা।
স্বামী-পুত্র বাঁচিয়াছে যত হাতী-ঘোড়া ॥
ওদিকেতে সওদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়া।
ঘাটকালীর বরে ঘাটে পৌঁছিল আসিয়া ॥
পাড়া-পড়শী দৌড়ে বলিছে তখন।
স্বামী তব আসিয়াসে শুন বিবরণ ॥
শুনিয়া স্বামীর কথা তাড়াতাড়ি এল।

www.pathagar.com

কিন্তু একি অকস্মাৎ দুর্ঘটনা হল ॥
ঘাটকালী মাতা তিনি করিলেন ছল।
ধন-রত্ন স্বামীসহ নৌকা হল তল ॥
ঘাটে আসি ভরা নৌকা জলে নিমগণ।
কোথায় গিয়াছে চলি নাহি নিরূপণ ॥
বিনামেঘে বজ্রাঘাত হেন মনে গনি।
অচেতন হয়ে ধরায় পড়িল যে ধ্বনি ॥
চেতন পাইয়া ধ্বনি বলিতে লাগিল।
কি দোষেতে বিধি সর্ব্বস্ব হারিল ॥
কি দোষেতে দোষী আমি ও রাঙা পায়।
দুঃখানলে পড়ে মোর এযে প্রাণ যায় ॥
ঘাটকালী ঠাকুরাণী দয়াময়ী মাতা।
এ বিপদে রক্ষা কর অধম দুহিতা ॥
যদি ঘাট হয়ে থাকে ঘাটকালী পদে।
অকূলে পড়িয়া ডাকি রক্ষ এ বিপদে ॥
স্তব স্তুতি নাহি জানি জ্ঞানহীন নারী।
পদাশ্রিতা দাসী তব বসন্ত কুমারী ॥
আশ্রয় বিহীনা এই সংসার মাঝারে।
দীনহীনা কাঙ্গালিনী ডাকি মা তোমারে ॥
কাতরেতে ভিক্ষা মাগি স্বামী কর দান।
নতুবা ও পদে দেবী ত্যাজিব পরাণ ॥
ছিন্ন পরাধীনা নারী অতি নিরাশ্রয়।
কৃপা করে রাখ মাতা দিয়ে পদাশ্রয় ॥
সর্ব্বশক্তিময়ী মাগো মিনতি আমার।
পতিদানে রক্ষা কর প্রাণ অবলার ॥
কেঁদে কেঁদে সাধু পত্নী হইল আকুল।
পর্ণচন্দ্র পতি যেন রাহু প্রতিকূল ॥

ত্রিপদী ছন্দে

ব্যাকরণে সন্ধিসূত্রে কিছু নাহি জানি মাত্র
তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র নাহিক আমার।
ধরিয়া যে কোন সূত্র ভাবিতেছি দিবা-রাত্র
ঘাটকালীর মহাব্রত করিব প্রচার ॥
বলিছে অমিয় বালা দূরে যাবে সব জ্বালা

www.pathagar.com

ভবজ্বালা হবে নিবারণ।
যে বনেতে দৈববাণী হয়েছিল শুন ধ্বনী
সে বনেতে পুনঃ তুমি করহ গমন ॥
পুনর্ব্বার গিয়া সেথা হত্যা করি মনোব্যথা
চরণে করিবে নিবেদন।
তিনি অতি দয়াবতী অগতি জানার গতি
অচিরেই পাইবে পতিধন।
শুন বলি হিবাণী ত্বরা করে বিনোদিনী
থাকিতে ঐ দিনমণি হও আগুয়ান ॥
দূরাদৃষ্ট যাবে দূরে স্বামী রত্ন পাবে ফিরে
ঘচে যাবে হৃদয়ের ভার ॥

উপদেশ পেয়ে ধ্বনি গমন করিল।
পুনরপি যে বনেতে উপনীত হইল ॥
অম্ভা দিয়া বলে গিয়া রক্ষ ঠাকুরাণী।
তোমাবিনা কেউ নাই বুঝিনে আপনি ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বালা হইল আকুল।
এ সংসার সমুদ্র মাঝে দিয় তারে কূল ॥
মৃতপ্রায় পড়িলেক ভূমির উপর।
ভূমিতে পড়িয়া ধ্বনি কাঁদিল প্রচুর ॥
পুর্ব্বার দৈববাণী হইল গগনে।
ডাকিয়া বলিছে বাছা শুন এক মনে ॥
হরকৎ শব্দ অর্থে কষ্ট বোঝা যায়।
বরকৎ শব্দ অর্থে সুখ যে নিশ্চয় ॥
সুখ-দুঃখ ভবে আমি যে কারণ।
সদাসুখে থাকে যদি মর্ত্তবাসীগণ ॥
সুখমত্ত জীবগণ আমায় ভুলিয়া।
ভীষণ নরক পথে যাইবে চলিয়া ॥
দেব দেবীর পূজা আর ধরাতে না রবে।
সেই জন্য যত দুঃখ উদিত হইবে ॥
দুঃখ কষ্ট যত কিছু আমি যে কারণ।
সংক্ষেপেতে কহিলাম যত বিবরণ ॥
স্বামী বাড়ি এলে ব্রত করিব আবার।
ব্রতঅন্তে বল নাই তুমি পুনর্বার ॥

www.pathagar.com

ঘাটকালী না সারিয়া স্বামী দরশন।
যে কারণে স্বামী তব জলে নিমগণ ॥
উঠিবে ভাসিয়া নৌকা স্বামী রত্ন ধন।
পুনরপি ব্রতকথা ভাব মনে মন ॥
শুনিবে দৈববাণী প্রফুল্লিত মন।
ভক্তিভাবে মনে মনে করিল মানন ॥
করজোড়ে বলিতেছে সওদাগর জায়া।
অকুলে পড়েছি বড় দে মা পদছায়া ॥
শ্রীচরণ তরী দিয়ে রাখ এইবার।
পাঁচ বিড়া পানে ব্রত করিব আবার ॥
ভাসিয়া উঠুক নৌকা যত রত্ন ধন।
ব্রতের বিধান মতো পূজিব চরণ ॥
ঘাটকালী ঠাকুরাণী দয়া প্রকাশিল।
কামনার সঙ্গে নৌকা ভাসিয়া উঠিল ॥
উঠিল ভাসিয়া নৌকা স্বামী রত্ন ধন।
বামাদের উলুধ্বনি হাইল গগণ ॥
পর পার হতে সব দেববালাগণ।
যেন তারা উলু দেয় সাধুর আলয় ॥
বাণিজ্যের যত দ্রব্য সঙ্গী নিয়া।
সতী সাধু পত্নিলয়ে এল বরণ করিয়া ॥
পাড়া-পড়শীকে তিনি বলিছে তখন।
এক্ষণেতে ব্রতকথা করিব শ্রবণ ॥
ব্রতের নিয়ম আছে এক ডাক দিবে।
তাই এক ডাক দিয়ে চলিলেক সবে ॥
ঘাটে এসে ব্রতকথা করি সমাপন।
ব্রতঅন্তে কামনা করিল সর্ব্বজন ॥
মনস্কাম পূর্ণ হলে এই ব্রত যার।
করিব বলিয়া সবে করে অঙ্গীকার ॥
ঘাটকালী ঠাকুরাণীর মহিমা অপার।
সকল সুখেতে সুখী সেই সওদাগর ॥
কোন দুঃখ নাহি তার সংসার মাঝারে।
অভাব নাহিক কি ঘাটকালীর বরে ॥
ইহা শুনে ব্রত করে দেশবাসী যত।
ব্রতকথা ক্রমে ক্রমে হইল প্রচারিত ॥

www.pathagar.com

ভক্তি করি এই ব্রত করিবেক সবে।
রহিবে না কোন কষ্ট দুঃখ আর ভবে ॥
এক মন হয়ে যেবা এই ব্রত শোনে।
অভাব রহে না তার পূর্ণ ধনে জনে ॥
ঘাটকালীর ব্রতকথা লেখা যার ঘরে।
তার ঘরে জড়া-ব্যধি প্রবেশিতে নারে ॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী তথা করে বাস।
হিংসা দ্বেষ শত্রুভয় রিপুর বিনাশ ॥
অমিয় বলিছে ব্রত অমিয় সমান।
সেবিকা বলিয়া তারে পদে দিও স্থান ॥
চিরশান্তি দানে রাখ পদপ্রান্তে।
হৃদিপদ্ম পাদপদ্ম দেখি যেন অন্তে ॥
ঘাটকালী প্রতি হরি হরি বল মুখে।
বিপদ হরিয়ে তিনি রাখিবেন সুখে ॥
অপর বাসনা কভু কিছুই না করি।
কালভয় নিবারিয়ে দিও পদতরী ॥
বদন ভরিয়া কালী বল সর্ব্বজন।
এতদিনে ব্রতকথা হল সমাপন ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রসহ একাধিক মন্ত্র পাঠ শেষে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে ব্রতকথা শেষ করতে হবে।

ওঁ যদাক্ষরং পরিদ্রষ্টং মাত্রাঞ্চি।
যৎ ভবেৎ পূর্ণ ভবতু ওৎর্ব্বং ॥
তৎ প্রসাদে দেহিশ্বরী।...
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবেসর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে ॥...
কালী কাত্যায়নী কালভয় নিবারণী।
অন্তিমেতে দিয় শিরে চরণ দুখানি ॥

৬. শ্রীশ্রীসুবচনীর পাঁচালি ও ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম- গৃহ প্রাঙ্গনে একটি চারকোণা পুকুর কেটে আলপনা দিয়ে সারি সারি জোড়া হাঁস ও একটি খোঁড়া হাঁস অঙ্কন করিবে, তারপর আমের পল্লব, ডাব বা কাঁটালী কলা ও সিন্দুর দিয়ে ঘট বসাবে। চারকোণা পুকুরে দুধ ও জল দিয়ে ভর্তি করবে, তারপর ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সাধ্যমত ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও নৈবেদ্য দিয়ে দেবী সূবচনীর

www.pathagar.com

পূজা করবে। পূজা শেষে শাঁখ বাজাবে, তারপর ব্রতকথা শুনে, এয়োদের খই, নাড়ু, পান, কলা, তেল ও সিন্দুর প্রভৃতি সাধ্যমত দিবে। প্রসাদের জিনিস কিছু কিছু সবাইকে বিতরণ করবে, তারপর পুরেহিতকে দক্ষিণা দিবে। বিবাহ উপলক্ষে পূজা করলে, পুত্রবধূর কাঁখে জলপূর্ণ কলসি দিয়ে ঘরে তুলবে।

ব্রতের উপকরণ : পিটুলি গোলা, ঘট, আম্রপল্লব, ডাব বা কলা, সিন্দুর, খই, নাড়ু, পান, সুপারী, তেল, ধূপ-দীপ, পুষ্পাদি, সাধ্যমত ফলমূল-মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা।

ব্রতের ফল : হিন্দু রমণীগণ বিবাহের পর দেবী সুবচনীর ব্রত করেন। এই ব্রত করিলে কোন বিপদ-আপদের ভয় থাকে না, দেবীর কৃপায় নব-দম্পতি সুখে থাকে।

গণেশ বন্দনা

বন্দিলাম গণপতি পার্বতী নন্দন।
বন্দিলাম ব্রহ্মা শিব আর নারায়ণ॥
বন্দিলাম দেবী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী।
গুরুর চরণপদ্মে অসংখ্য প্রণতি॥
দশ দিকপাল আর নবগ্রহগণে।
বন্দিলাম করজোড়ে দশবিদ্যাগণে॥
ভক্তিভরে বন্দিলাম জনক জননী।
অবশেষে বন্দিলাম দেবী সবচনী॥

ব্রতকথা
ব্রহ্মণীর পুত্রের বিবরণ

বন্দি মাত সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিত-পাবনী পুরাতনী।
বলি মাগো করপুটে, অধিষ্ঠান কর ঘটে,
শুনহ আপন ব্রতবাণী।
শুন শুন ব্রতীগণ, সুবচনী পূজার্চন
ব্রতকথা যে করে শ্রবণ।
মহামারে মহাঘোরে, দেবী তারে রক্ষা করে,
ভক্তাধীনা সুবচীন হন॥
সুখে রাজ্য করে রাজা কলিঙ্গ ঈশ্বর।
সেই রাজ্যে অনাথা ব্রাহ্মণী করে ঘর॥
একমাত্র পুত্র তার পড়ে পাঠশালে।
ছাত্রগণ সবে মিলি নানা দ্রব্য খায়।
ব্রাহ্মণীর পুত্র সবাকার পানে চায়॥

www.pathagar.com

একদিন দ্বিজপুত্র ভাবে মনে মন ।
আজ গৃহে ফিরে মাংস করিব ভক্ষণ ॥
ঘরে ফিরে পুত্র তাহা জননীরে বলে ।
নানা দ্রব্য খায় মাগো বালক সকলে ॥
মাছ-মাংস কভু মাগো দেখিতে পাইনা ।
আজ মাংস খেতে বড় হয়েছে বাসনা ॥
দুঃখেতে ব্রাহ্মণী বলে মাংস কোথা পাবে ।
পুত্র বলে আমি মাংস যোগাড় করিব ॥

ব্রাহ্মণপুত্রের খোঁড়া হাঁস চুরি ও কারাবাস

প্রাতঃকালে উঠি সেই ব্রাহ্মণী তনয় ।
মাংস সংগ্রহের লাগি ঘুরে পাড়াময় ॥
নৃপতির যত হাঁস ছিল হংসশালে ।
সর্বদা পাহারা দিত প্রহরী সকলে ॥
সারাদিন হাঁসগুলি জলাশয়ে চরে ।
সন্ধ্যাকালে পুনরায় ফিরে যায় ঘরে ॥
খোঁড়া হাঁস ছিল এক পালের মধ্যেতে ।
সেই হাঁস দ্বিজপুত্র ধরে আচম্বিতে ॥
আছাড়িয়া সেই হাঁস মারিয়া ফেলিল ।
গৃহে আসি জননীর হাতে হংস দিল ॥
রন্ধন করিয়া মাংস অতীব গোপনে ।
দ্বিজপুত্র মাংস খায় আনন্দিত মনে ॥
প্রহরীরা দেখে পালে খোঁড়া হাঁস নাই ।
রাজারে সংবাদ তারা দিল ধাওয়াধাই ॥
শুনি ক্রোধে রাজা বলে হাঁস খুঁজে আন ।
না পাইলে খোঁড়া হাঁস বধির পরাণ ॥
রাজার আদেশ পেয়ে হংসচরগণ ।
খোঁড়া হাঁস খুঁজিবারে করিল গমন ॥
হংস লাগি চরগণ খুঁজিতে লাগিল ।
ব্রাহ্মণীর কুটিরের নিকটেতে এল ॥
হংস লাগি চরগণ ইতি উতি চায় ।
হংস পাখা দেখে তারা ছাইয়ের গাদায় ॥
দূতগণ ব্রাহ্মণীর পুত্রেরে ধরিল ।
ব্রাহ্মণীরে কটু বলিতে লাগিল ॥

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণীর পুত্রে তারা বাঁধি অবশেষে।
সভামধ্যে আনি দিল রাজার সকাশে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের অধিপতি।
গর্জন করিয়া বলে অতি ক্রোধমতি॥
কলিঙ্গ নৃপতি বলে এত অহঙ্কার।
খোঁড়া হাঁস মারিয়াছ পাবে ফল তার॥
দূতগণে আজ্ঞা দিল রাখ কারাগারে।
বক্ষেতে পাথর দিয়া রাখ বালকেরে॥
দূতগণে দ্বিজপুত্রে রাখে কারাগারে।
এ সংবাদ সবে গিয়া দিল ব্রাহ্মণীরে॥
সংবাদ শুনিয়া সেই দুঃখিনী ব্রাহ্মণী।
হাহাকার করি কান্দে শিরে কর হানি॥
আছাড় খাইয়া কাঁদে, কেশ-পাশ নাহি বাঁধে,
জ্ঞানহারা পড়ে ভূমিতলে।
শুনিয়া ক্রন্দন রব, প্রতিবেশী এল সব,
উঠ উঠ বলি সবে তোলে॥
এ নহে ব্রাহ্মণ ধর্ম, করেছে ঘৃণিত কর্ম,
ব্রাহ্মণের ছেলে হতে নারে।
শান্ত হোক রাজক্রোধ, সবে গিয়া অনুরোধ,
করিব রাজারে করপুটে॥
কেহ উপদেশ দেয়, শুন যাতে ভাল হয়,
কেঁদে কিছু হবে নাকো আর।
কিবা হতে কি যে হয়, শাস্ত্রেতে এ কথা কয়,
সকলি তো কর্ম দেবতার॥
আর কেহ নাহি যার, সুবচনী মাতা তার,
একমনে পদ ভাব তাঁর।
যদি তাঁর কৃপা হয়, হারা মরা ফিরে পায়,
পুত্রে তব করিবে উদ্ধার॥
সেইদিন এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে,
মিলি যত এলো নারীগণ।
শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণীও যায় সেথা,
ভক্তিভরে করিল মানন॥
পুত্র মোর কারাগারে, ছাড়া পেয়ে এলে ঘরে,
মা তোমার অর্চনা করিব।

www.pathagar.com

সবে কর আশীর্বাদ, পুরে যেন মনোসাধ,
মিথ্যা হলে পরাণ ত্যাজিব॥
ব্রাহ্মণীর কাতরতা, দেখি সবে পায় ব্যথা,
সবে মিলি করিল গমন।
রক্ষ মাগো নিজগুণে, মুক্ত করি ব্রাহ্মণে,
নিজ, পূজা করহ গ্রহণ॥
ব্রতকথা শেষে সবে দিল উলুধ্বনি।
প্রাণমিল দেবী পদে যতেক রমণী॥
করজোড়ে সব নারী বলে তারপর।
সুবচনী মাতাপাশে মাগিলেক বর॥
দয়া কর দয়াময়ী তুমি নিজগুণে।
ব্রাহ্মণীর পুত্রটির চাহ মুখপানে॥
রাজ কারাগার হতে করহ উদ্ধার।
মহিমায় তোমার মাগো ভরুক সংসার॥
ভক্তি করি যথাসাধ্য আনি উপচার।
তব ব্রত করি মাগো কি বলিব আর॥
প্রণাম করিল সবে ভূমিতে লোটাইয়া।
প্রসাদ লইল সবে আনন্দিত হইয়া॥
তারপর এয়োগণ দাঁড়ায়ে সকলে।
ভক্তি করি দিল সব সিন্দুর কপালে॥
তারপর জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দিয়া।
নিজ নিজ গৃহে সবে চলিল ধাইয়া॥

কলিঙ্গ রাজাকে স্বপ্নাদেশ

দেবী শুনিলেন কানে, রাজা শুয়ে যেই স্থানে,
নিশিরাতে লয়ে পাটরাণী।
দ্বিজপুত্রে উদ্ধারিতে, দেবী গিয়া সে স্থানেতে,
স্বপ্নাদেশ করেন সুবচনী॥
শুন্ রাজা তোরে কই, মন্দকারী আমি নই,
এন হিত কথা বলিবারে।
যে মেরেছে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস,
বন্দী করি রেখেছে তাহারে॥
দেখিয়া তাহার দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
তাই তোরে বলি আমি সার।

www.pathagar.com

রজনী প্রভাত হলে, নিজে গিয়ে বন্দীশালে,
দ্বিজপুত্রে করিবি উদ্ধার॥
ধরি তার দুটি করে, বিনয়েতে তুষ্ট কর,
অপরাধ তার নাহি লবে।
তারপর শুভক্ষণে, শকুন্তলা কন্যাসনে,
ধন রত্নসহ বিভা দিবে॥
নহিলে সমূলে ধ্বংস, করিব রে তোর বংশ,
রহিবে না শেষে কেহ আর।
হবে রক্ত অগ্নি বৃষ্টি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি,
পুরী সব হবে ছার খার॥
যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ করেছে নাশ,
সে কেবল লোকের লাগান।
কল্য প্রাতঃকাল হলে, গিয়া তুমি হংসশালে,
সে হাঁস দেখিবে বিদ্যমান॥
বলিলাম যাহা আমি, পালন করহ তুমি,
কহিলাম তোমা হিতবাণী।
এত বলি সুবচনী, ভক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী,
অন্তর্ধান হলেন তখনি॥

খোঁড়া হাঁসের পুনর্জীবন প্রাপ্তি

স্বপ্ন দেখি নরপতি, ভয় পেয়ে দ্রুতগতি,
শয্যা হতে উঠিয়া তখন।
বলে উঠ উঠ রাণী শয্যাত্যাগ কর ধনী,
শুন বলি স্বপ্ন বিবরণ॥
স্বপনে দেখিনু যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল।
নিদ্রাঘোরে যা দেখিনু, সব বুঝি হারাইনু
রাজ্যধন পুত্রাদি সকল॥

বন্দীশালে দ্বিজসুতে, কষ্ট দিনু বিধিমতে,
সে দেবীর বরপুত্র হয়।
শুনিয়া স্বপ্নের কথা, রাণী হয় অতি ভীতা,
অতিশয় চিন্তিতা হইল।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণেক রাজার পাশে,

www.pathagar.com

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল॥
পরে করজোড় করি, দেবীকে প্রণাম করি,
রাজা রাণী কাঁদিয়া আকুল।
ক্ষমা কর মহামায়া, নিজগুণে কর দয়া,
একবার হও অনুকূল॥
বলিতে বলিতে নিশা, পোহাইয়া হইল উষা,
দ্রুত রাজা হংসশালে যান।
নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়া হাঁস নাচে,
দেবী বরে পেয়ে প্রাণদান॥

দ্বিজপুত্রের কারামুক্তি রাজার ক্ষমা প্রার্থনা

দেখিয়া বিস্মিত হইল, নৃপতির ক্রোধ গেল,
আসি বসে বাহির দালানে।
অস্তিার হইয়া মনে, পাত্র-মিত্র-বন্ধুগণে,
ত্বরা করি ডাকাইয়া আনে॥
বন্দীশালে আছে বিপ্র, মুক্ত করি আন শীঘ্র,
দিব তারে কন্যা অর্ধ রাজ্য।
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে, পাত্র-মিত্র সবে গিয়ে,
দ্বিজপুত্রে মুক্ত করি আনে।
দিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া,
আপনারে ধন্য বলি মানে॥
রাজা দ্বিজ নিকটেতে, দাঁড়াইয়া করপুটে,
স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে।
হয়ে মোর অবতংশ, রক্ষা কর মম বংশ,
সবান্ধব শরণাগতেরে॥
চিনিতে পারিনি তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা,
যত কষ্ট তোমারে দিলাম।
দিয়া কন্যা রাজ্যদান, রাখিব তোমার মান,
পরে রত্ন সিংহাসনে, আশ্রয় নিলাম॥
পরে রত্ন সিংহাসনে, বসায়ে দ্বিজ নন্দনে,
নিজ হস্তে চরণ ধৌয়ায়।
দূত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে,
ত্বরা করি আনিল সভায়॥

www.pathagar.com

দ্বিজপুত্রের বিবাহ

জ্যোতিষ-শাস্ত্রসম্মত, দিন করি আনন্দিত,
শুভলগ্ন করিলেন স্থিতার।
তবে কলিঙ্গ ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে করি ঘর,
নির্মাইল সুন্দর মন্দির॥
অতঃপর শুভক্ষণে, স্ত্রীগণে ডাকি আনে,
তৈল হরিদ্রা দিতে গায়।
বিবিধ বসন পরি, নানাবর্ণে বেশ ধরি,
নারীগণ সারি সারি যায়॥
শুনি বিবাহের রব, বাদ্যকর যত সব,
রাজার রাজ্যেতে বাস ছিল।
নানাবাদ্য সঙ্গে করি, সবে বেশভুষা করি,
রাজার পুরীতে প্রবেশিল॥
বাজিতেছে জগঝম্প, শব্দে হয়ে ভূমিকম্প,
রাণী শুনি হইল আনন্দিত॥
এয়োগণ হলো জড়ো, অন্তরে আনন্দ বড়,
এয়োতীরা হরিদ্রা মাখায়।
শঙ্খরব হুলাহুলি, সব বামাগণ মিলি,
সরোবরে স্নান লাগি যায়॥
ঘটেতে পুরিয়া বারি, লইল মস্তকোপপি,
রাজরাণী অঞ্চল লোটায়॥
প্রবেশিয়া রাজপুরে, ঘটেরে প্রণাম করে,
রত্নদীপ বাসবে জ্বালায়॥
জিজ্ঞাসিল রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী,
হাই আমলা বাটিবেক কে।
স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন ব্যথা,
পতির প্রেয়সী হবে যে॥
ছিল কাছে বিপ্রসুতা, বড় রূপগুণযুতা,
পতির প্রেয়সী সেই ধনী।
তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে লয়ে সহচরী,
হাই আমলা বাটাইল রাণী॥
ব্রাহ্মণীর পুত্রে ধরে, মঙ্গল আচার তরে,
করাইল স্নান অধিবাস।
সন্ধ্যায় লইয়া বরে, সবে স্ত্রী-আচার করে,

www.pathagar.com

নানারূপে করে পরিহাস॥
ছাদনায় দোঁহে লয়ে, পুরোহিত ডাকাইয়ে,
শুভকার্য করে আরম্ভন।
দুইজনের হস্তে লয়ে, বাঁধে পুষ্পমাল্য দিয়ে,
রাজা-রাণী আনন্দে গমন॥
সবে জলধারা দিয়ে, বর-কন্যা গৃহে লয়ে,
বাসরেতে করে জাগরণ।
সব বামাগণ সঙ্গে, নিশি কাটে নানারঙ্গে,
প্রাতঃকালে উঠে দুইজন॥
এবে দ্বিজপুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়,
বিদায় করহ ত্বরা করি।
মঙ্গল আসনোপরে, বসাইয়া দু'জনারে,
রূপ দেখে যত নর-নারী॥
কন্যার বিদায় কালে, রাণী ভাসে অশ্রুজলে,
আজি হতে বাছা হইলে পর।
শুনিয়া ক্রন্দন ধ্বনি, দুঃখিত সে নৃপমণি,
কাঁদে বসি সভার ভিতর॥

রাজকন্যাসহ দ্বিজপুত্রের স্বগৃহে আগমন

নানাবাদ্য শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক ছুটে,
রথ গজ নাহি গায় পথ।
দেখিয়া আশ্চর্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র এলো,
ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ॥
ব্রাহ্মণীরে কহে লোক, ঠাকুরাণী ত্যাজ শোক,
দেখে এসে তব ভাগ্য ভাল।
পুত্র ছিল কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে,
রাজকন্যা সঙ্গে লয়ে এলো॥
শুনি এই শুভবাণী, আনন্দিত সে ব্রাহ্মণী,
ভাবে মনে এমন কি হয়।
সুবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলি দিল নিধি,
হারাধন ঘরে বসে পায়॥
পুত্র এসে সন্নিকটে, দাঁড়াইয়া করপুটে,
জননীরে করিল প্রণাম।
ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগীর কোলে বস,
দেবী পুরাইল মনস্কাম॥

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণীর সুবচনী পূজা

তবে জলধারা দিয়ে, পুত্র-পুত্রবধূ লয়ে,
আঙিনায় পূজে সুবচনী।
চারিকোণা করি ঘর, কাটিল আঙিনা পর,
আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী॥
চিত্র-বিচিত্র করি, খোঁড়া হাঁস সারি সারি,
লিখি ঘট আরোপিলা তাতে।
আম্রশাখা পূর্ণ বারি, দুগ্ধেতে গহর পুরি,
দিব্য শোভা পদ্মিনী পাতাতে॥
সুবচনী পূজা সব, সাঙ্গ হলে শঙ্খরব,
শুনে সব দণ্ডবৎ হয়ে।
এয়োগণে করে দান, নাড়ু রম্ভা গুয়াপান,
তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে॥
এয়োগণ সারি সারি, দাঁড়াইল শোভা করি,
ব্রাহ্মণী চরণে দিল জল।
আঁচল লোটায় তাতে, দিল পুত্র-বধূ মাথে,
মনোবাঞ্ছা হইল সফল॥
প্রসাদের দ্রব্য যাহা, কিছু কিছু লয়ে তাহা,
ব্রাহ্মণী আপনি বাঁটি দিল।
একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি অঞ্চলে,
ভক্তিভাবে সকলে লইল॥
দক্ষিণান্ত সমাপিয়া, ঘটে বিসর্জন দিয়া,
পুরোহিত করিল গমন।
তবে পুত্রবধূ লয়ে, পূর্ণঘট কক্ষে দিয়ে,
গৃহমাঝে প্রবেশে তখন॥

দেশে দেশে এই কথা প্রচার হইল।
সুবচনী পূজা সবে করিতে লাগিল॥
সুবচনী ব্রতকথা বড় মধুময়।
শ্রবণে সকল বিপদ দূরে সরে যায়॥
এই গ্রন্থ পাঠ যেবা করে ভক্তি ভরে।
সকলি কুশল তার হয় দেবী বরে॥

www.pathagar.com

অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
পতি সোহাগিনী হয় সব বামাগণ॥
দ্বিজ শঙ্কর মাগো কিছুই না জানে।
বিপদে পড়িলে রক্ষা করো এ সন্তানে॥
সুবচনী ব্রতকথা হইল সমাপন।
পরে হরি হরি বল যত ভক্তগণ॥
[ইতি সুচনী পূজা ও ব্রতকথা সমাপ্ত।]

৭. শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালি

বিষ্ণু বন্দনা
(ত্রিপদী)
ত্রিনাথ কেশব নমঃ তুমি হে পুরুষোত্তম,
চতুর্ভুজ গরুর বাহন।
জলদ বরণ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা,
বনমালা নানা আভরণ॥
করেতে মোহন বাঁশি, মুখে মৃদু মন্দ দাসি,
কৃপা কর কমললোচন।
জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ॥
রামকৃষ্ণ জনার্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন,
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর জগন্নাথ যজ্ঞেশ্বর,
বাসুদেব শ্রীবৎ লাঞ্ছনা॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভন চতুর্ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ, নিরুপদ কোকনদ
রতন নুপূর বাজে তায়॥
পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলী বর
মুখে সুমধুর মৃদু হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥
ইন্দ্র আদি সুরসব, চারিদিকে করে স্তব,
নারদাদি ঋষি যত জন।
মুনির বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে

www.pathagar.com

পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥
কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহরে আনন্দ মনে
শীতল সুগন্ধি মন্দ বার
ষড়ঋতু সহচর বসন্ত লইয়া শয়ত।
নিরবধি সেবে তব পায়॥
ভৃঙ্গের গুণ গুণ রব কুহরে কোকিল সব,
পূর্ণচন্দ্র শারদ যামিনী।
বীণা বাঁশি আদি যন্ত্রে গান করে তাল তন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী।
উর প্রভু শ্রীনিবাস দাসের পুরাও আশ
এই মোর সদা আকিঞ্চন।
করি এই নিবেদন দিবে চরণ স্মরণ
ত্রিনাথ অধীন এই জন॥

দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপাখ্যান ও ত্রিনাথের পূজা প্রচার
(পয়ার)
কলির আরম্ভ কালে দেব নারায়ণ।
নবদ্বীপে গৌয়াঙ্গ রূপ করেন ধারণ॥
দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে হরি সংকীর্তন।
হরিবোল বই তার নাহিক বচন॥
তবু নাহি কলির নরের পাপ যায়।
দেখিয়া কি করি হরি ভাবনে উপায়॥
নবদ্বীপে ত্রিনাথ রূপ করেন ধারণ।
কেমনেতে পাপীগণ করিবে পূজন॥
কেমনেতে করি এই পূজার প্রচার।
ত্রিনাথ পূজিলে হবে সকলে উদ্ধার॥
সেই দেশে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অতি দরিদ্র দ্বিজ না মিলে ওদন॥
গাভী চড়াইয়া ফিরে ময়দান উপর।
দৈবাৎ হইল হারা সে গাভী তৎপর॥
অন্বেষণ দ্বিজ করি ভ্রমে স্থানে স্থান।
কোথাও না পায় দ্বিজ গাভী অন্বেষণ॥
আকুল হইয়া দ্বিজ করিছে রোদন।
মনে মনে ভাবিতেছে দেব নারায়ণ॥

www.pathagar.com

হেন কালে দেখিল সে এক সরোবর।
মরিব ইহাতে মনে ভাবে দ্বিজবর।
আচম্বিতে দৈববাণী দিয়া নারায়ণ।
ত্রিনাথে করহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ॥
গাভীর কারণে কেন জীবন ত্যাজিবে।
পুনর্বার ধনরত্ন গাভী আদি পাবে॥
তটিনীর তটে গিয়া করহ খনন।
তিন পাই প্রাপ্ত হবে শুনহ ব্রাহ্মণ॥
এক পাই গাঁজা আর এক পাই পান।
তৈল লবে এক পাই শুন মতিমান॥
বিলম্ব না কর দ্বিজ শুনহ বচন।
ত্বরা গিয়া তিন দ্রব্য কর আনয়ন॥
এত বলি দ্বিজবর গমন করিল।
নদীর তীরেতে আসি মৃত্তিকা খুঁড়িল॥
সেইখানে তিন পাই দেখিতে পাইল।
আনন্দে আটখানা দ্বিজ তখন হইল॥
ভাবে কোন দেব ইনি না জানি কারণ।
কখন তাহার সঙ্গে নাহি দরশন॥
যে হউক সে হউক তায় করি নমস্কার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেন হয় সে আমার॥
এত ভাবি দোকানেতে গমন করিল।
মৃদু স্বরে দোকানীরে কহিতে লাগিল॥
শুন শুন দোকানদার লই তিন পাই।
তিন পাইর ভিতরে আমি তিন দ্রব্য চাই॥
তৈল গাঁজা দেহ আর এক পাই পান।
বিলম্ব সহিতে নারি করিব প্রস্থান॥
দোকানী বলেন শুন অবোধ ব্রাহ্মণ।
কিসেতে লইবে তৈল বলহ বচন॥
তৈল পাত্র কিছু নাহি আনিলে সঙ্গেতে।
কিসে লইবে তৈল বলহ ত্বরিতে॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন দোকানদার ভাই।
কিসেতে লইব তৈল ঠাকুরে সুধাই।
এত বলি দ্রুতগতি করিল গমন।
দেখেন সেখানে আর নাহি কোন জন॥

www.pathagar.com

না দেখিয়া দ্বিজবর করেন রোদন।
বলে প্রভু কোথা কারে করিলে গমন॥
কান্দিতে লাগিল দ্বিজ ভাবিয়া না পায়।
হেন কালে দৈববাণী হইল তথায়॥
তৈল আন বস্ত্র মধ্যে করিয়া বন্ধন।
আমার বচন কভু না হবে লঙ্ঘন॥
এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল।
দোকানদারে গিয়া তবে ব্রাহ্মণ কহিল॥
কোঁচার কাপড়ে তৈল বান্ধি দেহ মোরে।
কি কার্যে পাত্রেতে যোগ্য কহিনু তোমারে॥
এত শুনি দোকানদার ভাবে মনে মন।
নিশ্চয় উম্মাদ এই ব্রাহ্মণ নন্দন॥
ঠকাইয়া দেয় তৈল বিপ্রের কুমারে।
দেখিয়া কুপিত হইলেন গদাধরে॥
তৈলের কলসি লইল করিয়া হরণ।
দেখিয়া বিস্ময় মুদি হইল তখন।
দোকানদার ভাবে মনে ব্রাহ্মণ এ নয়।
বুঝিনু দেবতা ইনি হইবেন নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের পদ মুদি করিয়া ধারণ।
বলে প্রভু ক্ষম মোরে আমি অভাজন॥
ঠকায়ে দিয়াছি তৈল তোমারে আপনি।
সে দোষ ক্ষম মোর শুন দ্বিজমনি॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কিছু নাহি জানি নাই।
ইহার তদন্ত জানেন ত্রিনাথ গোসাঞি॥
মানই তাঁহার পূজা পুনঃ তৈল পাবে।
তোমার মনের ব্যথা তিনিই পুরাইবে।
মুদি বলে কোথা তিনি বল গো আমায়।
তোমার চরণে ধরি করি গো বিনয়॥
আদি অন্ত কথা শুনি ব্রাহ্মণ কহিল।
শ্রবণ করিয়া মুদি অবাক হইল॥
মনে মনে মানস করিয়া ততক্ষণ।
মুদি দূরাচার পূজা করিল মান॥
পুনর্ব্বার তৈল কুম্ভ মুদি যে পাইল।
হরষিত হয়ে মনে নিজ গৃহে আইল॥

www.pathagar.com

কবিবর কহে শুন শুন ভক্তগণ।
ত্রিনাথ প্রকাশ করেন আপন পূজন॥

গুরু কর্তৃক ত্রিনাথের অপমান ও শাস্তি লাভ
(ত্রিপদী)

ঘরে আসি ব্রাহ্মণ আনন্দিত হয়ে মন।
ত্রিনাথের করেন পূজন।
আনি নানা উপহার তবে ব্রাহ্মণ কুমার।
পূজা করে দেব নারায়ণ॥
ঘটের স্থাপন করি, ত্রিনাথের নাম স্মরি
বলে প্রভু দেহ পদছায়া
আমি অতি মূঢ়মতি কি জানি তোমার স্তুতি
আমারে করহ প্রভু দয়া
ওহে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর
তিন দেব একত্তরে পূজা করিছে ব্রাহ্মণ।
গুরু তার আইল হেনকালে
শিষ্যে ডাকি ততক্ষণে বলে কি কর এক্ষণে
বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥
ধ্যানেতে শিষ্য আছিল তখন না কথা কহিল
শ্রবণে কুপিত গুরু তার।
লাথি মারি ঘটো পরে ফেলিল ধরণী পরে
তবু শিষ্যের বাক্য নাহি আর॥
তপ্পিদারে ক্রোধে কন অন্যান্য করিল যদি
এই ক্ষণে গৃহে চলে যাব।
যদি গুরু ক্রোধানলে আপনার গৃহে চলে
হেনকালে শুন বিবরণ
অমান্য করি ত্রিনাথে ফেলে ঘট পদাঘাতে
স্ত্রী পুত্রাদি হয়েছে মরণ
রোদনের ধ্বনি শুনে তপ্পিদার কহে ব্রাহ্মণে
শুন প্রভু করি নিবেদন
বুঝি কে রোদন করে শুনি তোমার মন্দিরে
শুনি গুরু করে আগমন
গৃহে আসি ততক্ষণ দেখিল শুন্য ভবন

www.pathagar.com

স্ত্রী পুত্র মরেছে তিন জন।
শুনি গুরু এই কথা হৃদয়ে পাইল ব্যথা
ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন
বলে পুত্র গেলি কোথা খাইয়া আমার মাথা
একবার দেখা দেও মোরে
তোমার লাগিয়া বাপ হৃদয়ে পাইনু তাপ
কেমনে রহিম একা ঘরে
আর নাহি গৃহে যাব জলে ডুবিয়া মরিব
এত বলি আইসে জলাশয়।
জলেতে নামি যেমন দেহ করিবে পতন
অমনি আকাশবাণী হয়।
নাহি মর দ্বিজবর নাহি ত্যাজ কলেবর
নারী আর পাইবে তনয়।
তব শিষ্য দ্বিজবর গিয়াছিল তার ঘর
বসিয়া সে ত্রিনাথ পূজায়
তব সই সম্ভাষণ না করিল সেইজন
দেখি ক্রোধ কৈলে তুমি তায়
ঘট পদেতে ফেলিলে তেই এত দুঃখ পাইলে
স্ত্রী পূজ মরিল যে তার
এবে এক কার্য কর ত্বরা যাহ তার ঘর
আদ্য অন্ত কহ গিয়া তায়
তব নারী পুত্রগণ পাবে প্রাণ এইক্ষণ
কবিবর রচিল ভাষায়।

ত্রিনাথের পূজা প্রচার ও মাহাত্ম
শুনিয়া আকাশবাণী ব্রাহ্মণ তখন।
হরষিত শিষ্য করেন গমন॥
আদ্য অন্ত কথা যত শিষ্যের কহিল।
শ্রবণে ব্রাহ্মণ তবে বিস্মিত হইল॥
শ্রীগুরু বলেন ভক্ত তুমি বাছাধন।
না জানিয়া তোমা প্রতি কহি কুবচন॥
কখন করহ তুমি মম প্রতিকার।
তোমার কল্যাণে পাই পুত্র পরিবার॥
ব্রাহ্মণ বলেন গুরু শুনহ বচন।
বিধি মতো কর তুমি ত্রিনাথ পূজন॥

www.pathagar.com

শুনি ত্রিনাথের পূজা মানস করিল।
কল্কে পোড়া ভয় শিষ্য হস্তে দিল॥
এই ভস্ম লয়ে যাও ত্বরায় করিয়া।
তাদের অঙ্গে তুমি দিবে মাখাইয়া॥
এত বলি কল্কে পোড়া ভস্ম করে দিল।
হরষিত মনে গুরু গৃহেত আইল॥
স্ত্রী পুরুষের অঙ্গে মাখায় করিয়া যতন।
সকলে পাইল প্রাণ উঠিয়া তখন॥
আনন্দে ত্রিনাথ ধ্বনি করেন ব্রাহ্মণ।
ত্রিনাথের করে পূজা আনন্দিত মন॥
ঘট যে স্থাপনা করি পূজা আরম্ভিল।
ধনে পূজে লক্ষ্মী লাভ ক্রমেতে হইল॥
মেলা হইল তথা ত্রিনাথ পূজার।
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক আইসে যায়॥
অন্ধ খঞ্জ দোহে আছে পথেতে বসিয়া।
জিজ্ঞাসা করিল খঞ্জ লোকেরে চাহিয়া॥
কহ কহ মহাশয় কহ বিবরণ।
বলহ কোথায় সবে করিছ গমন॥

একজন কহে যাই ত্রিনাথ দেখিতে।
বর মাগি লব আমি তাঁহার পদেতে॥

অন্ধে পায় চক্ষু দান দরিদ্রে পায় ধন।
মানস করিলে পায় খঞ্জেতে চরণ॥

শুনি দোহে মাসন করিয়া যতনেতে।
অন্ধ পাইল চক্ষু পা পায় খঞ্জেতে॥
মানসেতে নৃত্য করে তুলি দুই হাত।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য হে ত্রিনাথ॥
ত্রিনাথ করেন কৃপা সবাকার তরে।
দুই বাহু তুলি নৃত্য করে প্রেম ভরে॥

হরি হরি বল সবে যত বন্ধু জন।
ত্রিনাথের পালা তবে হইল সমাপন॥

www.pathagar.com

৮. শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালি

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদিরয়েৎ॥

রাম রাম প্রভুরাম কমলালোচন ।
কৃপা কর নারায়ণ লইনু শরণ॥
রাম ভাব রাম চিন্ত রাম সার ।
যে রাম স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার॥
রাম রাম বল ভাই বারেক এবার ।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর॥
গবিন্দ শ্রীগুরুদেব কমললোচন ।
জ্ঞানদাতা মহাপ্রভু মুক্তির কারণ॥
গোলক ধামেতে যার সদায় বসতি ।
আনন্দে শরণ লহ দেবী ভগবতী॥
বৃক্ষাবিষ্ণু হর বন্দ করিয়া যতন ।
হংস ও গরুড় আর বৃষভ বাহন॥
বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী ভূবন ঈশ্বরী ।
ভক্তিভাবে করজোড়ে সাবিত্রী সুন্দরী॥
গণেশাদি দেবগণ যত স্বর্গবাসী ।
বন্দিব অনন্ত আদি পাতাল নিবাসী॥
যোগী ঋষি মুণি আর সাধু যত জন ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দ সবার চরণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিবা শুদ্রজাতি ।
শ্রীনাথ চরণে যেবা করয়ে ভকতি॥
সবার চরণ বন্দ হয়ে সাবধান ।
যাদের প্রসাদে হয় অশেষ কল্যাণ॥
রুদেব বিপ্রগণে দণ্ডবত করি ।
কহিব সত্যের কথা অমৃতলহরী॥
ভক্তিতে সত্যের কথা শুনে যেই জন ।
চতুর্বর্গ ফর তারে দেন নারায়ণ॥
সত্যের মহিমা এই পুরানের সার ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করিয়া পয়ার॥
করিবেন নারায়ণ করিল মোচন ।
যুধিষ্ঠির নরপতি জিজ্ঞাসে তখন॥

www.pathagar.com

কহ কহ নারায়ণ ভুবনের সার।
কলি অবতার যুগ তেমন প্রকার॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরের জানি যুগধর্ম।
কহ কলিযুগে লোকে করিবে কি কর্ম।
শুনিয়া রাজার কথা কহে নারায়ণ।
শুন রাজা ধর্মপুত্র কলির লক্ষণ॥

সত্যপুর্ণ ধর্ম ছিল ত্রেতাতে ত্রিপাদ।
অর্ধ ধর্ম দ্বাপরেতে অর্ধেক আপদ।
কলিযুগে তিন পাদ অধর্ম ব্যাপিবে।
এক পাদ ধর্ম মাত্র ক্ষিতিতে রহিবে।

যখন হইবে কলি প্রবর্ত সংসারে।
ধর্ম্ম হবে সঙ্কুচিত তপ যাবে দূরে॥
সত্যের না রবে লেশ শস্যহীন ক্ষিতি।
অস্ত্রধারী বিপ্র হবে, কপট নৃপতি॥

বীরশ হইবে লোক নারীও চপলা।
নিজ পতি নিন্দিবেক যতেক অবলা॥

সাধুলোক দুঃখী হবে, দুর্জন প্রবল।
কলির আরম্ভ মাত্রে হবে এই সকল॥

কাম-ক্রোধ-লোভ আদি সদা যুক্ত হবে।
স্ত্রীবাক্যেতে বশ হয়ে ভাইকে ত্যাজিবে॥

জন্মদাতা মাতা-পিতা কিবা গুরুজন।
সবাকে কুবাক্য কবে শুনি স্ত্রীবচন॥
নিজ ধর্ম্ম যত সবে ত্যজিবে কলিতে।
অধর্ম নৃপতি হবে কলির ক্ষিতিতে॥

এই যে ব্রাহ্মণ সব আমার পূজিত।
অধার্মিক দিলে দান লইবে নিশ্চিত॥

www.pathagar.com

শিষ্যে না মানিবে গুরু ধনমত্ত হয়ে।
সাধুকে হিংসিয়ে দুষ্ট নির্ধন দেখিয়ে॥

তীর্থ সজ্ঞ পূণ্য ক্রিয়া যাইবে সকল।
শুন রাজা যুধিষ্ঠির কলিযুগ ফল॥
অযুত বৎসর পরে কিছু না রহিবে।
কলির প্রতাপ ঘোর যখন হইবে॥

ধর্মাধর্ম জ্ঞান কার না রহিবে আর।
অধীন হবে লোক সব পৃথিবী মাঝার॥

একথা শুনিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসে রাজন।
কহ প্রভু নারায়ণ পতিতপাপন॥

অযুত বৎসর মধ্যে কি আছে উপায়।
তরিবারে ঘোর কলিকালে রমদায়॥

কৃষ্ণ বলে শুন রাজা দুষ্ট কলিকালে।
রহিবে অযুত বর্ষ আমি ক্ষিতিতলে॥
এখন যে মোরে তুমি দেখ বিদ্যমান।
কলিযুগে শালগ্রামরূপে অধিষ্ঠান॥

তুলসী জাহ্নবী আর ক্ষেত্র জগন্নাথে।
প্রয়াগ মথুরা আদি থাকিব তাহাতে॥

অযুত বৎসর পরে ত্যজিব এ ভাবে।
শিলাক্ষেত্র জগন্নাথ কিছু নাহি রবে॥
পতিতপাবনী গঙ্গা হবে অন্তর্ধান।
তদন্তরে গ্রাম্য দেব করিবে পরান॥
শুনহ কলির জীব তরণ উপায়।
কদাচিত ভাগীরথী দরশন পায়॥
গঙ্গা গঙ্গা বলে কি আর খায় গঙ্গা নীর।
কিবা তনু ত্যাগ জাহ্নবীর তীর॥

www.pathagar.com

কোটি ব্রহ্মবধ আনি পাপে মুক্ত হয়ে।
পুষ্পরথে চরি যায় শমন জিনিয়ে॥

গয়াশিরে বিষ্ণু পদে কদাচিত মরে।
সামিপত্র প্রমাণেতে পিণ্ডদান করে॥

সর্বপাপে মুক্ত হয়ে তার পিতৃগণ।
দিব্যরথে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

প্রায়াগেতে যেইজন করয়ে মুণ্ডন।
পূর্বাচিত পাপ সব হয়ত খণ্ডন॥

কাশীর মাহাত্ম্য কিবা করিব নির্ণয়।
কাশী দরশনে জান মহাপূণ্য হয়॥

বিশ্বেশ্বর মারে দয়া করে কদাচিত।
কাশ্মীর দর্শন সেই পাইবে নিশ্চিত॥

জগন্নাথ ক্ষেত্রকথা শুনহে রাজন।
ইন্দ্রদ্যুয় পুরী মাঝে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
বলরাম শুভদ্রা আর দারুময় হরি।
আর যে অক্ষয় বট মনোহর পুরী॥

মণিকোঠা মধ্যে দেব সাক্ষাৎ নারায়ণ।
দেখিলে মোচন হয় ভবের বন্ধন॥

রন্ধন করেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভুঞ্জে হরি।
তাঁহার মাহাত্ম্য কিছু কহিতে না পারি॥

কলিকালে জগন্নাথ উড়িষ্যাতে সাক্ষাত
বলরাম সুভদ্রা সহিত
রত্ন সিংহাসনোপরি দারুব্রহ্মমনে হরি
মণিকোঠা মাঝে বিরাজিত
লক্ষ্মী করে যে রন্ধন স্বয়ং ভুঞ্জে জনার্দ্দন

www.pathagar.com

অন্য ব্রহ্মা যেখানে প্রকাশ
কুকুরের মুখ হতে পরে যদি কদাচিত
ব্রহ্মা তারে করে অভিলাষ॥
কিবাক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকাবে ভাত
ক্ষীরসর পরমান্ন পিঠা
লুচি, পুরি মণ্ডা খাজা পায়স রসের গজা
কে বণিবে কতশত মিঠা॥
স্নান সৌচ কিছু নাই প্রাপ্তিমাত্রে সুখে নাই
খেয়ে পরে মাথে মুছে হাত।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ মুখে দিতেছে পরম সুখে
খেয়ে বলে জয় জগন্নাথ॥
সিংহদ্বারে বেত্র খায় সর্বপাপ দূরে যায়
ইন্দ্রতারে মনোবাঞ্ছা করে।
কবে আমি ক্ষেত্রে যাব বেত্রের প্রহার খাব
নিরবধি ভাবে পুরন্দরে॥
জগন্নাথ চাঁদমুখ দেখিলে পরম সুখ
ক্ষেত্রে যে প্রসাদ খাইলে।
শুন রাজা যুধিষ্ঠির কলি ঘোর তিমির
যমদার সেই এড়াইলে॥
আর এক ধর্ম আছে কহিব তোমার কাছে
মহাবিদ্যা আগমের মতো।
তরুপদ প্রিয় কবি যেভাবে ভকতি করি
ঘোর কলি তার তৃণবৎ॥
এখন সাক্ষাতে মোরে পাও তুমি দেখিবারে
কলিকালে মম হরিনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম সদা জপে যে এ নাম
তাহার বসতি মোর ধাম॥
শ্রীনাথ চরণে মম দৃঢ় করে যেই জন
কলি তারে কি করিতে পারে॥
মনে মনে অভিলাষ করে দীনহীন দাস
দয়া কর শ্রীনাথ আমারে॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির বলি বিবরণ।
কলিকালে যে উপায়ে তরিবেক জন॥

www.pathagar.com

অনন্ত যে মূর্তি মোর অনন্ত যে নাম।
সর্বভূতে আছি আমি সকাম নিষ্কাম॥
তার মধ্যে এক নাম সত্যনারায়ণ।
কলিযুগে প্রকাশিব শুনহে রাজন॥

সত্যনারায়ণ নাম প্রকাশ করিবে।
পৃথিবীতে যাব আমি কল্পতরু হয়ে॥

দুঃখী বা দরিদ্র লোক উদ্বেগ পীড়িত।
সত্যদেব পূজা যদি করে কদাচিত॥

যে যেই কামনা করে সেই সিদ্ধি হবে।
বাঞ্ছা কল্পতরু হব কলিকালে ভাবে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
ভালো মন্দ ছোট বড় কিবা রাজ্যপতি॥

স্বজাতির জন কিম্বা উত্তম অধম।
ভক্তিতে করিবে সেবা সাধ্য অনুক্রম॥

সোয়া সের আটা দিবে গুড় তার সম।
সোয়া সের দুগ্ধ দিবে তাহার নিয়ম॥

সোয়া কুড়ি রম্ভা দিয়ে করিবে রচনা।
সোয়া পরিমাণে দিবে উপহার নানা॥

তাম্বুল কর্পুর দিবে ভকতি করিয়া।
পূর্ণ ঘট পূর্ণ সব স্থাপন করিয়া॥
আমার যে এই মূর্তি মনে ধ্যান করি।
ভক্তি করি নিবেদিবে মনস্থির করি॥

নিমন্ত্রিয়া আনিবেক যত জ্ঞাতিগণ।
ইষ্টমিত্র আদি করি যত বন্ধুজন॥

পয়ার প্রবন্ধে কহি সত্যের কথন।
যেই রূপে সত্যদেব দিলা দরশন।

www.pathagar.com

পশ্চাতে নৈবেদ্য যত একত্র করিয়া।
ক্রম ক্রমে সকলের দিবেক বাটিয়া॥
ভক্তি করি লইবেক সকলে ক্রমেতে।
অবজ্ঞা করিলে শাস্তি পাবে ভাল মতে॥

সত্যের প্রসাদ যেবা খায় ভক্তি করি,
ইহ পরকালে তারে দয়া করে হরি॥

সত্যপদ যেবা নাহি কয়ে অভিলাষ।
ইহ পরকালে তার হয় সর্বনাশ॥

কলিযুগে যেবা পূজে সত্যনারায়ণ।
তাহার মাহাত্ম কহি পাণ্ডর নন্দন॥

অপুত্রের পুত্র হয় দরিদ্রের ধন।
রোগীর খণ্ডয়ে রোগ বন্ধন মোচন।
নারী নাহি ঘরে যার হবে দিব্য নারী।
অন্তকালে যাবে সেই বৈকুণ্ঠ নগরী॥

এইরূপে পূজা করি সত্যনারায়ণে।
যথাসাধ্য দক্ষিণা যে দিবেক ব্রাহ্মণে॥

শুনিয়া কলির কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
কহিলা গোবিন্দে তবে হইয়া অস্থির॥

না রহিব পৃথিবীতে শুন গদাধর।
শুনিয়া কলির রীতি হলেন কাতর॥

কৃষ্ণ বলে শুন রাজ ধর্মের নন্দন।
অবিলম্বে স্বর্গে তুমি করিবে গমন॥

একথা শুনিয়া রাজা গোবিন্দ বন্দিলে।
বিদায় হইয়া হরি দ্বারকাতে গেল॥

www.pathagar.com

প্রবেশি হস্তিনাপুরে রাজা যুধিষ্ঠির
স্বর্গে নেতে দিবানিশি চিন্তিয়া অস্থির॥

দীনহীন দাসে মাগে কাতর হইয়া।
দয়া কর সত্যদেব অধম জানিয়া॥
পুর্নবার কহি শুন সত্যের কথন।
যেরূপে প্রচার হ'ল সত্যনারায়ণ॥

গঙ্গা তীরে দুঃখী এক ব্রাহ্মণ ছিল।
আজন্ম দরিদ্র করি বিধাতা সৃজিল॥

পুত্র-কন্যা ইষ্ট-মিত্র নাহি কিছু লক্ষ।
ভিক্ষা করি সারাদিন আনে নিজ ভক্ষ॥

ব্রাহ্মণী আছয়ে তার পতিব্রতা সতী।
ভিক্ষা করি দুইজনা সংসারে বসতি॥

একদিন দৈবযোগে এরূপ ঘটিল।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় কাতর হইল॥

মনেতে ভাবিল দ্বিজ জীবনে কি কাজ।
আত্মঘাতী হব আমি জাহ্নবীর মাঝ॥

ব্রহ্মবধ দিব আমি গোবিন্দ উপরে।
বিপ্রবংশে জন্মাইয়া দুঃখ দিল মোরে॥

ব্রহ্মবধ দেখি হরি ত্বরিত গমনে।
কপট ব্রাহ্মণ বেশে আসিল সেখানে॥

ব্রাহ্মণেরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে।
কিবা চিন্তা কর তুমি কহ মোর স্থানে॥

ব্রাহ্মণ বলয়ে দেব কহিলে কি হবে।
খানিক দাঁড়াও যদি এখনি দেখিবে॥

www.pathagar.com

জন্মাবধি দুঃখী আমি শুনহ গোসাই।
ব্রাহ্মণী বিনা যে মোর আর কেহ নাই॥

তাহারে প্রসন্ন আমি করিতে না পারি।
এমত দরিদ্র মোরে সৃজিল শ্রীহরি॥

আর দুঃখ শরীরে না সহে কদাচিত।
গঙ্গাতে ডুবিয়া আমি মরিব নিশ্চিত॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি বলে নারায়ণ।
আমার বচন তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ॥

আত্মঘাতী গতিহীন সংসার ভিতর।
অনুচিত কর্ম নাহি কর দ্বিজবর॥

সত্যদেব নারায়ণ ত্রিদশ ঈশ্বর।
তাহারে সেবিলে পাবে মনোমতো বর॥

বিপ্র বলে বল দেব সব বিবরণ।
কোন দেব হয় প্রভু সত্যনারায়ণ॥

পূজার বিধান কিবা কিবা রূপ ধ্যান।
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র কিবা শাস্ত্রজ্ঞান॥

ধনহীন দুঃখী আমি দরিদ্র সংসারে।
বিনা ধনে কিবা রূপে পূজিব তাঁহারে॥
গোবিন্দ বলেন দ্বিজ শুনহ বচন।
সেবা কর ভক্তিভাবে সত্যনারায়ণ॥

আজ ভিক্ষা করি তুমি যে কিছু পাইবা।
তাহা দিয়া কর তুমি সত্যদেব সেবা॥

আটা কলা দুগ্ধ গুড় সোয়া পরিমাণে।
সত্যপূজা কর তুমি ভক্তি করি মনে॥

www.pathagar.com

কহিতে কহিতে প্রভু নিজ মূর্তি করে।
অনুগ্রহ করি দেখা দিলা ব্রাহ্মণেরে॥

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী।
পীতবাস মৃদুহাস জগমনহারী॥

কণ্ঠেতে কৌস্তব হার গরুর বাহন।
পদ নখে শত চাঁদ মেঘের বরণ॥

সুনার কমল জিনি শোকিত নয়ন।
আকর্ণ ব্যাপৃত ধনু ভুরুর সুঠাম॥
জিনিবে মুকতা পাঁতি দশন সুন্দর।
তিলফুল তুলা নাশা অতি মনোহর॥

দেবঋষি সিন্ধু মুণিগণ স্তুতি করে।
বামে রাণী লক্ষ্মী দেবী শোভে নিরন্তরে॥
পরিষদগণ শোভে তার চারিপাশে।
ঐ চরণ মাগে সদা দীনহীন দাসে॥

পুর্নবার কহে হরি শুনহ ব্রাহ্মণ।
এই মূর্তি দেখ মোর সত্যনারায়ণ॥

এই মূর্তি ধ্যান করি পূজা কর তুমি।
মনের বাঞ্ছিত বর সব দিব আমি।
আনন্দ পূর্ণিত বিপ্র দণ্ডবৎ হয়।
ভক্তিতে হরিকে করে তুষ্ট অতিশয়॥

অন্তর্বান হল প্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
স্বপ্নপ্রায় দেখি বিপ্র বিস্মিত অন্তর॥

নগরেতে গেল বিপ্র ভিক্ষা করিবারে।
পাইল প্রচুর ভিক্ষা প্রতি ঘরে ঘরে।

যত কিছু পেয়েছিল একত্র করিয়া।
যথায় ব্রাহ্মণী তথা উতরিল গিয়া॥

www.pathagar.com

অনেক দেখিয়া দ্রব্য পুছে দ্বিজসুতা।
কহ নাথ আজি এত ভিক্ষা পেলে কোথা॥

সকল বৃত্তান্ত কহে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
দুইজন ভক্তিভাবে পূজে নারায়ণে॥

তদবধি ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য অপার।
ধনে জনে পুত্রপৌত্রে রাজ্যে অধিকার।

মাসে মাসে সত্যদেবে করয়ে ভকতি।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতি তুষ্ট লক্ষ্মীপতি॥
একদিন বিপ্র নানাবিধ উপহারে।
মনের আনন্দে সত্যদেব পূজা করে॥

আটা কলা দুগ্ধ গুড় রচনা করিয়া।
সত্যের মাহাত্ম্যা পূজে হরষিত হইয়া॥

হেনকালে এক দুঃখী কাঠুরিয়া ছিল।
কাষ্ঠভার মাথে লয়ে সেইখানে গেল।
কিবা পূজা করে তাহা জানিবার তরে।
কাষ্ঠভার ভূমে রাখি নিরীক্ষণ করে॥

পুস্তক হইল পাঠ পূজা সাঙ্গ করি।
প্রসাদ লইল সবে দণ্ডবৎ করি॥
তাহা দেখি কাঠুরিয়া ভক্তিযুক্ত মন।
প্রসাদ খাইল মাগি করিয়া যতন॥

মনে মনে কাঠুরিয়া কামনা করিল।
দরিদ্র করিয়া প্রভু আমারে সৃজিল।
যাউক আমার যত ক্লেশ দুঃখ দূরে।
এইরূপে সেবা আমি করিব তোমারে॥

দণ্ডবৎ হয়ে তবে বিদায় হইল।
কাষ্ঠভার লয়ে মাথে নগরেতে গেল॥

www.pathagar.com

আর দিন হতে কাষ্ঠ দ্বিগুণ বিকায়।
সত্যনারায়ণ প্রভু স্মরে সব দায়॥
সে অবধি তার প্রতি সদয় শ্রীহরি।
নানাবিধ ধনেজনে মনোহর পুরী॥

বেড়াইতে বনে বনে লয়ে কাষ্ঠভার।
কত কাঠুরিয়া করে নকরি তাহার॥

সত্যনারায়ণ পূজা করে মাসে মাসে।
ঐ চরণ মাগে সদা দীনহীন দাসে॥

দৈবযোগে এক সাধু বাণিজ্যে চলিছে।
নদীতীরে কাঠুরিয়া পূজা আরম্ভিছে॥
ধ্বজা পতাকাদি তথা করিয়া রচন।
নিরবধি পূজে দেব সত্যনারায়ণ॥

ধনপতি নাম সে যে সাধুর কুমার।
নৌকা চাপাইয়া গেল পূজা দেখিবার॥
দেখিয়া পূজার রীতি ভক্তি উপছিল।
মনে মনে সদাগর মানস করিল॥
অদৈন্য করিয়া মোর ধন আদি দিলা।
কিবা অপরাধে সন্তানে বঞ্চিলা॥

কিবা পুত্র কিবা কন্যা হউক আমার।
লক্ষ মুদ্রা দিয়া পূজা করিব তোমার।
শ্বেত নেতা বস্ত্র দিব সোনার আসন।
সোনার পাদুকা দিব যত লাগে ধন॥
নানাবিধ উপহারে পূজিব শ্রীহরি।
মানস করিলা সাধু দণ্ডবৎ করি॥

নৌকাতে চড়িয়া গিয়া লইয়া প্রসাদ।
সর্বদা বলিছে প্রভু ক্ষম অপরাধ॥
যেইদিন উপস্থিত আপন নগরে।
লীলাবতী তার পত্নী মনস্কাম করে॥

www.pathagar.com

ষোড়শী বয়সী তবে হল গর্ভবতী॥
দশ মাসে এক কন্যা হইল সন্ততি।
অন্নারম্ভে করি সাধু আনন্দে সুদিনে।
কলাবতী নাম রাখে সাধ করে মনে॥
পরমাসুন্দরী কন্যা দিনে দিনে বাড়ে।
দেখিয়া সদাগরের আনন্দ না ধরে॥
দশবর্ষ বয়ঃক্রম কন্যার হইল।
বিবাহ দিবার তরে মনেতে ভাবিল॥

হীরামতী সদাগর তাহার নন্দন।
শঙ্খপতি নাম আর বিদিত ভুবন।
কুলেশীলে বণিকের বংশে শিরোমণি।
ঘটক পাঠিয়ে দিল মনে অনুমানি॥
দারুন ঘটক জাতি অঘট্য ঘটায়।
কার্য করিতে তার কত বড় দায়॥
ত্বরিতে সম্বন্ধ তথা করে নিরূপণ।
বিবাহ দিবস শোভা হইল তখন॥

এতক্ষণে ধনপতি মহোতৎসব করি।
দিলেক কন্যার বিয়ে মঙ্গল আচরি॥
শঙ্খপতি স্থানে কন্যা করে সম্প্রদান।
কুলেশীলে রূপেগুণে বড়ই প্রধান।
ধনপতি সদাগর পুত্রহীন ছিল।
জামাতাকে গৃকার্য ভার সমর্পিল।
এইরূপে সদাগর আছে কতদিন।
জামাতাও বাণিজ্যেতে হইল প্রবীণ।
একদিন জামাতাকে কহে ধনপতি।
অনেক দিবস ধরে করিলা বসতি॥
গৃহে থাকা আর নহে উচিত এখন।
বিদেশেতে চল দোহে বাণিজ্য কারণ॥

নৌকা পূর্ণ ভরাভরি করি শুভক্ষণ।
যাত্রা করি বাণিজ্যেতে করিল গমন॥
দক্ষিণ শহরে সাধু জামাতা সহিত।

www.pathagar.com

বিক্রম কেশের দেশে হল উপস্থিত॥
ঘাটে নৌকা চাপাইয়া উঠিল তটেতে।
বিক্রয়ে আছয়ে লভা দেখিল তাহাতে॥
জিনিস তুলিয়া সেই শহর উপরে।
শ্বশুর-জামাতা দোহে বিকিকিনি করে॥
তার মধ্যে শুন সত্যদেবের কথন।
যেরূপে সাধুর তথা হ'ল বিড়ম্বন।
পূর্বের সন্তান লাগি মানস করিয়া।
না পূজিল সত্যদেব মনে পাসরিয়া।
সেই অপরাধ হেতু ক্রুদ্ধ নারায়ণ।
আচম্বিতে রাজগৃহে চুরি হয় ধন॥
কোতোয়ালে আনি রাজা বলিল তর্জিয়া।
যথা পাও চোর তবে আনহ ধরিয়া॥
সাতদিন মধ্যে যদি নাহি আন চোর।
সবংশে কাটিব আমি যত আছে তোর॥
তদবধি কোতোয়ালে ফিরিছে নগরে।
নানা বেশে ফিরে তারা প্রতি ঘরে ঘরে॥

দৈবযোহে কণ্ঠমালা বিকায় নগরে।
সাধুর জামাতা তাহা কিনিল সত্বরে॥
গলায় দিলেক হার হরষিত হইয়া।
হরকরা কোতোয়ালে দেখি কহে গিয়া॥

শুনিয়া সকল কথা কোতোয়াল জাত।
দুইকে বান্ধিয়া নেয় রাজার সাক্ষাৎ।
শ্বশুর-জামাতা দোহে বিচার না করি।
রাজ আজ্ঞা হয় নিতে বন্দীশালা পুরী।
চোর যতেক ধন আনিল ভাণ্ডারে।
সত্যদেব সর্বনাশ করিল সাধুরে॥
শ্বশুর-জামাতা দুই নিগড় বন্ধন।
কারাগারে দিবানিশি করায় ক্রন্দন॥

এইরূপে বঞ্চিয়াছে দ্বাদশ বৎসর।
দুঃখের সাগর মাঝে ডুবি সদাগর॥

www.pathagar.com

হেথায় সাধুর গৃহ অগ্নিতে দহিল।
ধনরত্ন আদি করি সর্বনাশ হল॥

কত চোর লয়ে গেল নানাবিধ ধন।
বার কত দ্রব্য তাহা কে করে গমন॥
কন্যা সঙ্গে করি ভিক্ষা মাগি খায় ধনী।
এইমত দুঃখ পায় সাধুর রমণী॥

ইষ্টামিত্র বন্ধু কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
মায়ে-ঝিয়ে ভিক্ষা করে নগরে নগরে॥

একদিন সাধুর স্ত্রী ভিক্ষাতে বেড়ায়।
দেখে লোক সত্যপূজা দেখিবারে যায়॥

সেইসব লোক সঙ্গে দহিতা সহিত।
পূজার নিকটে গিয়া হল উপনীত॥

কোন দেব পূজা করে দেখে দাঁড়াইয়া।
আটা কলা দুগ্ধ গুর রচনা করিয়া॥

পাঁচালি পড়িয়া পরে পূজা সাঙ্গ করি।
প্রসাদ লইল সবে দণ্ডবৎ করি।

সাধুর রমণী দেখি পূজার বিধান।
প্রসাদ মাগিয়া খায় করি ব্রহ্মজ্ঞান॥
কামনা করিল সতী মনে সাধ করি।
আসুক জামাতাসহ স্বামী নিজ পুরী।

দুঃখ দূর কর মোর সত্যনারায়ণ।
সাধ্যমত আমি তব পূজিব চরণ॥
এমত করিব সেবা আমি অভাগিনী।
পুর্নবার দয়া কর সত্য গুণমণি॥

মানস করিয়া ধনী নিজ গৃহে গেলা।
সত্যদেব নারায়ণ প্রসন্ন হইলা॥

www.pathagar.com

পূর্বের স্থাপিত ধন হারাইয়াছিল ।
ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্য পাইতে লাগিল॥
ইষ্টমিত্র জ্ঞাতিজন তত্ত্ব করে সবে ।
সাধুর কুশল করে সত্যদেব যবে॥

আটা কলা দুগ্ধ গুড় করিয়া রচন ।
নিরবধি সেবে বামা সত্যনারায়ণ॥

হেথা কারাগার মধ্যে শ্বশুর-জামাতা ।
যেমতে মোচন হল শুন তার কথা॥

মহাক্রোধে সত্যদেব বিস্তার গজিয়া ।
নিদ্রাতে রাজারে স্বপ্ন দেখাইল গিয়া॥

দুই সাধু কারাগারে রাখ কি কারণ ।
আমার পরম ভক্ত সাধু দুইজন ।
চোর নহে সাধু তারা করহ মোচন ।
যত ধন নিলা তাহা দেও এইক্ষণ॥

নহিলে করিব তোর সর্বনাশ আমি ।
নিশ্চয় জানিও নাহি তুচ্ছ কর তুমি ।
একথা বলিয়া প্রভু অন্তর্ধান হল ।
চমৎকৃত মহারাজ তখনে জাগিল॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা বসি সিংহাসনে ।
স্বপ্ন বিবরণ কহে পাত্র-মিত্র স্থানে॥
কারাগার হ'তে দুই সাধু আনাইয়া ।
দোহায় করায় কৃচ্ছ নিগড় কাটিয়া॥

স্থান করাইয়া দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার ।
দিলা নিজ কণ্ঠ হতে মণিমুক্তা হার ।
সিংহাসনে বসাইয়া দুই মহাশয় ।
নানামতে বসাইয়া দুই মহাশয় ।
যত কিছু অপরাধ ক্ষমা কর মোর ।
না বুঝিয়া মিছা দোহে বলিয়াছি চোর॥

www.pathagar.com

অদ্যাবধি তুমি মোর হও মিত্রজন।
এইমত বহু স্তুতি করিলা রাজন॥

সাধু বলে মহারাজ তব দোষ নাই।
দৈব দোষে বিড়ম্বনা কর কার ঠাই।

আজ্ঞা কর দেশপানে করিয়ে গমন।
সেলামী দিলেন তারে বিক্রম রাজন॥
সাধুর যতেক ধন দ্বিগুণ করিয়া।
আপনি নৌকাতে সব দিলেক ভরিয়া॥
নৃপতিকে বহুরূপে বিনয় বচনে।
সন্তোষ করিল তবে সাধু দুইজনে॥
রাজাকে প্রণাম করি শ্বশুর-জামাই।
নৌকাতে চড়িয়া গিয়া ভাবিয়া গোসাই॥
জয় জয় শব্দ করে বাদাম তুলিয়ে।
দেশেতে চলিল নৌকা বায়ু গতি হয়ে॥
সন্ন্যাসী বেশে প্রভু জিজ্ঞাসে তাহায়।
কিবা দ্রব্য ভরিয়াছ তোমার নৌকায়॥

উপহাস করি সাধু করিল উত্তর।
লতাপাতা রাখিয়াছি নৌকার ভিতর॥

তথাস্তু বলিয়া দ্বিজ হয় অন্তর্ধান।
লতা-পাতা পরিপূর্ণ হল নৌকাখানা।
শ্বশুর-জামাতা দোঁহে করে হায় হায়।
বঞ্চনা করিলা বিধি কেন পুনরায়।
সত্যদেব মায়া সাধু পারিয়া বুঝিতে।
স্তুতি করে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে॥
ক্ষম প্রভু সত্যদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
আমি মূঢ় ভক্তিহীন তোমার কিঙ্কর॥

অপরাধ করিয়াছি পদে বহুতর।
তাহার উচিত শাস্তি পেয়েছি বিস্তর।
এইবার ক্ষম মোরে সত্যনারায়ণ।
হইলেক তরি ভরা মাণিক্য রতন।

www.pathagar.com

সাধুর বাটিতে হেথা সাধুর রমণী ।
ভক্তিভাবে সত্যদেব পূজা কর ধনী॥
পূজা সাঙ্গ করি ঘরে প্রসাদ যে বাটে ।
তখন সাধুর নৌকা লাগাইয়া ঘাটে ।
জয় জয় শব্দ হ'ল সাধুর পুরীতে ।
বহুকালে আসে সাধু জামাতা সাহিতে॥
প্রসদ লইয়েছিল সাধুর কন্যায় ।
হস্ত হতে ভূমে ফেলি দৌড়ি ঘাটে যায়॥

তাহা দেখি সত্যদেব ক্রুদ্ধ অতিশয় ।
আমার প্রসাদ ফেলে মনে নাহি ভয় ।
সাধু মাত্র উঠেছিল জামাতা নৌকাতে ।
ঘাটেতে ডুবিল নৌকা জামাতা সহিতে॥
ফিরিয়া দেখিল সাধু একি আচম্বিত ।
ঘাটেতে ডুবিল নৌকা-জামাতা সহিত ।
দীনহীন দাস কহে ভাবি সত্যনাম ।
শুকনাতে ভরা ডোবে বিধি যারে বাম॥

ত্রিপদী-রাগিনী ভাটিয়ারী

শোকে কান্দে সাধুর রমণী (ধুয়া)
হায় বিধি কি করিলা মোর আশে
অগ্নি দিলা ।
কিবা ছিল তোমার সনে বাদ ।
জনম বিফলে গেল রহিল মনেতে শেল ।
না পুরিল পতিসুখ সাধ॥
আমি অতি অভাগিনী চিরকাল ।
বিরহিনী
নানা দুঃখে গেল মোর কাল ।
সদয় হইয়া কেন, বঞ্চনা করিলা পুনঃ॥

ঘাটে আনি করিলা জঞ্জাল ।
দ্বাদশ বৎসরাবধি বিদেশেতে নিরবধি ।
গিয়াছিল না ছিল উদ্দেশ্য ।
মায়ে ঝিয়ে সদাকালে রহিয়া দুঃখের জালে ।
এই দশা হ'ল অবশেষে ।

www.pathagar.com

করিয়াছি কত পাপ তাতে এই মনস্তাপ
হ'ল মোর কপালের লেখা।
অগ্নিতে প্রবেশ করি কিবা বিষ খেয়ে মরি।
মনে খেদ হইল না দেখা।
যখন আছিলা দেশে তখন হে সবিশেষে।
নাহি জানি আবার ধর্ম।

দেখতে অঙ্কুর পাত তাহে মাথে বজ্রাঘাত
কিবা মোর ছিল পাপকর্ম।
কান্দে সাধু মহাশোকে বিধি কি করিলা মোরে
হেন দশা বল কার হায়।
বিদেশেতে দুঃখ পেয়ে আসিলাম নিজালয়ে
ঘাটে আসি হইল প্রলয়॥

সাধুর রমনী ধনী শোনলে দহে প্রাণী
কান্দিতেছে লোটায়ে ধরণী॥
কন্যাকে কোলোতে করি লোটায়ে ধরণী পড়ি।
বলে কোথা যাব অভাগিনী।
অপুত্রা ছিলাম ভাল কেনে কন্যা জনমিল
কিবা পাপে হেন বিড়ম্বিত।
গলায়ে কলসি দিয়ে সাগরের তীরে যেয়ে
ঝাপ দিব দুহিতা সহিত॥

যত ছিল মনে আশা আরে বিধি সর্বনাশা
সকলি করিলা মোরে দূর॥
ধনজন আদি করি সকলি করি চুরি।
কেনে প্রভু দয়ার ঠাকুর।
এইরূপে গলা ধরি করিয়া ক্রন্দন।
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে ভুমে অচেতন।
দীনহীন সদা বলে কি হবে কান্দিলে।
ভাব সত্যদেব হরি যারে পারিলে॥

দয়ার ঠাকুর হরি সত্যনারায়ণ।
সাধুর কন্যায় তবে দেখায় স্বপন॥
শোকে অচেতন ধনী ভূমেতে পড়িয়ে।

www.pathagar.com

হেন কালে প্রভু কহে বায়ুরূপ হয়ে॥
সত্যপূজা মানস যে করি তোর বাপ।
না পূজিয়া কারাগারে পায় কত তাপ।
তথাপি ক্ষমিনু আমি সেই অপরাধ।
এক্ষণে প্রসাদ ফেলে ঘটালে প্রমাদ॥

আমার প্রসাদ ফেলে স্বামীর গৌরবে।
না জান মহিমা মম কলিকালে ভাবে॥
সেই সে প্রসাদ তুলি পুনর্বার খাও।
এইক্ষণে স্বামী সঙ্গে উঠিবেক নাও।
একথা শুনিয়া বামা স্বপ্ন বিবরণ।
মাতা-পিতা স্থানে কহে স্বপ্নের কথন॥

হস্তের প্রসাদ ফেলে ছিল যেইখানে।
উর্ধমুখে মুক্তকেশে গেল সেই স্থানে।
হস্তেতে লইয়া বামা সেইত প্রসাদ।
মুখে দিয়া বলে প্রভু ক্ষম অপর্য্যাধ॥

তিনজন সত্যনাম জপে একমনে।
জামাতা সহিত নৌকা উঠে ধনেজনে॥
আনন্দিত হইলেক দেখি সদাগর।
জয় জয় ধ্বনি হল সকল নগর।
যতেক যুবতী সঙ্গে সাধুর রমণী।
মঙ্গল রচিয়া সবে ঘরে নিল ধনী।
সত্যনারায়ণ পূজে নানা দ্রব্য দিয়া।
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় মঙ্গল রচিয়া।
আটা, কলা, দুগ্ধ, চিনি ক্ষীর ছানা দধি।
নানা উপহার দ্রব্য নাহিক অবধি।
সোনার পাদুকা আনা সকলি সোনার।
বিচিত্র যে চন্দ্রাতপ বাদ্যভাণ্ড আর॥

এইরূপে সত্যদেব পূজেন সদায়।
কুবের সমান হল সত্যেল কৃপায়।
এই যে সত্যের কথা শুনে যেবা জন।

www.pathagar.com

ইহকালে সুখ পরে বৈকুণ্ঠে গমন॥
মাসে মাসে যেই করে সত্যদেব পূজা।
আয়ু যশ কীর্তি বাড়ে ধনী হয় প্রজা॥

সত্যদেব স্মরি করে যে কামনা যেই।
কিছুই সন্দেহ নাই কার্য সিদ্ধি সেই॥
হেলা না করিও লোক শুনহ বচন।
কলিযুগে মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ॥

দীনহীন দান সদা ধর্ম কর্মহীন।
পাতকে পুর্ণিত দেহ বড়ই কঠিন।
পতিতপাবন তুমি কহিছে আগমে।
সকলেতে সম দয়া উত্তমে অধমে॥

সত্যনারায়ণ প্রভু করহ করুণা।
দূর কর এই ভবে দুঃখের যন্ত্রণা।
হরি বল কৃষ্ণ বল বলহে গোবিন্দ।
মনেতে পাইবা ভাই বড়ই আনন্দ।
কলি ঘোর তিমিরিতে ঘেরিল সংসার।
হরি নাম বিনা আর নাহিক নিস্তার।
সত ব্রত কথা তবে হল সমাপন।
সত্যদেব প্রীতে বল হরি সর্ব্বজন॥

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

১. বালাম চাউল

প্রচলিত রয়েছে– ধান, নদী খাল এই তিনে বরিশাল। আবার অনেকে বলে থাকেন– ধানের দেশ, গানের দেশ, নদীর দেশ বরিশাল। একসময় বাংলার শষ্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত ছিল এই বরিশাল। বরিশালের বালাম চাউল বাংলার বিখ্যাত। কালের আবর্তে এবং খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ধান উৎপাদনে এসেছে পরিবর্তন। বালাম চাউলের জায়গায় স্থান পেয়েছে অধিক বা উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান। তবুও কৃষকদের কেউ কেউ বরিশালের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন।

বরিশালের বালামের মধ্যে টিকে থাকা চাউল হল– মলেঙ্গার বালাম, লেবুখালীর বালাম, বানারীপাড়ার বালাম। বর্তমানে হাতেগোনা দুচারজন কৃষক নিজ খোরাকির জন্য বালাম চালের জন্য চিকন ধানের চাষ করেন। বালাম চালের জন্য চাষ করা ধানের মধ্যে বাঁশফুল, দুধকলম, সুন্দর সাইল, কাজল শাইল জাতের ধান প্রধান। এর মধ্যে কোন কোনটি চিকন বা গায়ে ভারি। এছাড়াও গিরমী, চাপরাশ, হাইল গিরমী, কার্তিক শাইল, রাজা শাইল, নলডুক, কালাগোড়া, টেপুশাইল, কাজলা, বরিশাল অঞ্চলের ধান। এখনো এর বেশ কয়েকটি জাতের ধান গৃহস্ত কৃষকরা বংশ পরম্পরায় টিকিয়ে রেখেছেন। বরিশাল অঞ্চলে খৈ-এর জন্য মৌলতা, লোয়াশুরা, বহুরী, কাজলা শাইল, বিন্নি এবং মুড়ি তৈরির জন্য মোটামোথা ধানের চাষ করে থাকেন। এর কয়েক প্রজাতির ধান এখনো টিকে আছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের কৃষকরা সাক্কোরখোরা নামের সুগন্ধী চালের চাষ করত।

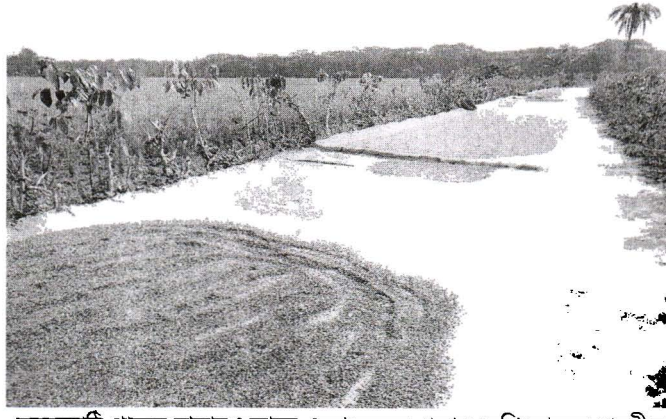

কলসকাঠি গ্রামের রাস্তায় শুকাতে দেয়া কয়েক প্রকার দেশি জাতের ধানবীজ

www.pathagar.com

এখনো কিছু কিছু এলাকায় বর্ধিষ্ণু কৃষকরা এই ধানের চাষ করেন। ধানের পাশাপাশি কাউন নামের একপ্রকাশ বীজ উৎপন্ন করা হয়। কাউন থেকে কাউনের চাউল তৈরি হয়। সাক্কোরখোরা বা কাউনের চাউল দিয়ে তৈরি পায়েশ ভোজন রসিকদের জিভে পানি আনে। অতিথি আপ্যায়নে এখনো কাউনের চাউলের পায়েশ অদ্বিতীয়। তাছাড়া সাক্কোরখোরা চালের পোলাও রসনা বিলাসীদের কাঙ্ক্ষিত। বর্তমানে পাইকারী বা খুচরা চালের বাজারে উল্লিখিত ধান বা চাউল পাওয়া দুস্কর। তবুও কালো, লালচে, সোনালী, বাদামী, হালকা বাদামী রঙের ধান শুকাতে দেখা যায় এখনো কোন কোন কৃষকের উঠানে। প্রয়োজনে নয়, আবেগের বশবর্তী হয়ে বা পারিবারিক ঐতিহ্য বা বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য স্বল্প পরিসরে কেউ কেউ এসব ধানের চাষ করে থাকেন বীজধান পাওয়া সাপেক্ষে।

২. গৌরনদীর দই

বরিশাল অঞ্চলে নিমন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়ন যেন গৌরনদীর দই ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায়। তবে কে কবে এই দই তৈরি করা শুরু করেন তা বর্তমানের কারিগররা বলতে পারেন না। বর্তমান প্রজন্মের কারিগর এবং দই ব্যবসায়ীদের ধারণা গৌরনদীর দই বরিশালের হাজার বছরের সম্পদ। দুধ ও চিনি এর প্রধান উপকরণ।

গৌরনদী বন্দরের শচীন ঘোষ, সুশীল ঘোষ, জগদীশ ঘোষ, ননী ঘোষ; গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড এলাকার দিলীপ দাস, চিত্ত সাহা, ইব্রাহীম মোল্লা, ফরিদ হোসেন এবং টরকী বন্দরের শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষীরমোহন ঘোষ, রাজের দোকানে দই তৈরি এবং বিক্রি হচ্ছে। গৌরনদীতে তৈরি দই প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা দরে।

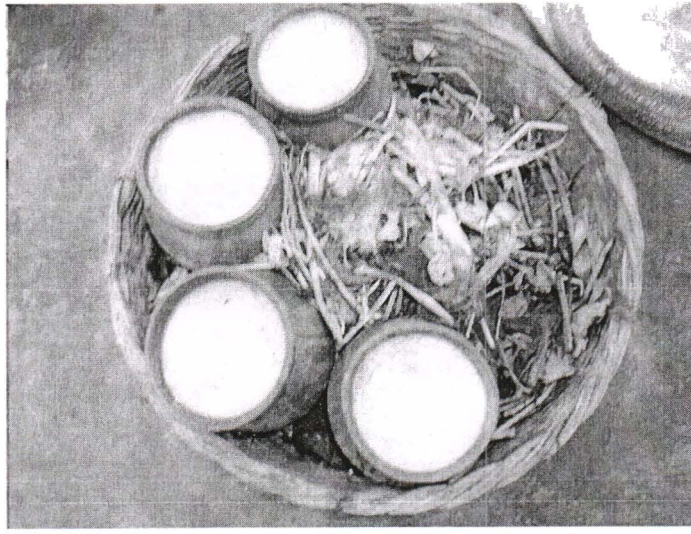

বরিশাল অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং লোকখাদ্য গৌরনদীর দই

www.pathagar.com

দই তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুশীল ঘোষের ছেলে আদী গৌরনদী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সত্ত্বাধিকারী সুদান ঘোষ বলেন– দুধ ছেকে বড় কড়াইতে ঢেলে জ্বালাতে হয়। জ্বালাতে জ্বালাতে দইয়ের রঙ আনতে হয়। নারকেলের আঁচি থেকে তৈরি লম্বা ডাটওয়ালা চামচ (স্থানীয় নাম ভাধু) দিয়ে নেড়ে নেড়ে এবং লোহার তৈরি খুন্তি (স্থানীয় নাম সল্লি) দিয়ে দুধ নাড়তে হয়। ৫/৬ঘণ্টা জ্বালাবার পর তা নামিয়ে ঠাণ্ডা করে টিনে করে নদী-পুকুর বা জলাশয়ে নিয়ে আরো ঠাণ্ডা করতে হয়। সেই ঘন দুধ ছেকে ৬০ থেকে ৬৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখতে হয়। এরপর দেয়া হয় চিনি। মাটির পাতিলে একাধিকবার ঢেলে (স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ছান্দা) পাতিল পূর্ণ করে ১০/১২টি চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। এতে তৈরি হয় আধাপাকা দই। কাঠকয়লা বিছিয়ে তার পাশে আধাপাকা দইয়ের পাতিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখে দইকে পাকা করতে। সেই দই ফ্যানের নিচে রেখে পাঠানো হয় বিক্রির জন্য।

দই তৈরির দুধের যোগান আসে গৌরনদী, টরকী, কালকিনি থেকে পদ্মার তীরবর্তী রামচর পর্যন্ত এলাকা থেকে। সময়মতো দুধ পেতে দই প্রস্তুতকারীরা দুধউৎপাদনকারী বা বিক্রেতাদের বাৎসরিক দাদন দিয়ে থাকে। এই দাদন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ সালে বরিশাল জেলার দীর্ঘ সময় ধরে আয়কর প্রদানকারীর সম্মাননাপ্রাপ্ত সুশীল ঘোষের পুত্র সুদান ঘোষের মতে বছরে কমপক্ষে ৩৫হাজার মণ দই গৌরনদী-টরকী এলাকায় তৈরি এবং তা বাজারজাত করা হয়।

৩. গুঠিয়ার সন্দেশ

বরিশালের অন্যতম লোক খাবার গুঠিয়ার সন্দেশ। কবে কে এই সন্দেশ তৈরি করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা কেউই বলতে পারেন না। স্থানীয়দের মতে এক থেকে দেড়শ বছর আগে সতীশ ঘোষ নামের এক মিষ্টির কারিগর এই সুস্বাদু সন্দেশ তৈরি করেন। বরিশাল অঞ্চলে সাধারণত কড়াপাকের সন্দেশ তৈরি হয়ে থাকে। তাও আবার সাজে অথবা হাতে তৈরি দুপাল্লার। কিন্তু গুঠিয়ার সন্দেশ সাধারণত এক পাল্লার হয়ে থাকে।

বরিশাল নগরীর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে বরিশাল-বানারিপাড়া সড়কের পাশে উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া প্রাচীন জনপদ হিসেবে পরিচিত। শাধবপাশা রাজবংশ পত্তনের পর থেকেই ওই অঞ্চল হয়ে ওঠে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী। গুঠিয়ার সত্তোরোর্ধ আমজেদ আলী হাওলাদার জানান, কে এই সন্দেশের প্রথম প্রস্তুতকারক তা আমাদের জানা নেই। অনেক আগে থেকেই গুঠিয়ায় এই সন্দেশ তৈরি হয়ে আসছে। লোকমুখে প্রচলন আছে সতীশ ঘোষ নামের মিষ্টি প্রস্তুতকারী পরিবারের সন্তান এই সন্দেশ তৈরি করে বাজারে নিয়ে আসেন। বর্তমানে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ গুঠিয়ার সন্দেশে মজে কিনে নেন প্যাকেটে প্যাকেটে।

বর্তমানে গুঠিয়া বাজারে ১২টি দোকানে সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে। তবে এব মধ্যে পরিমল দাস, বাদশা মিয়া, জালাল মৃধা, ভদ্র বাবু, টিটুল সরদারের দোকান অন্যতম। সন্দেশ তৈরির বিষয়ে প্রস্তুতকারী এক শ্রমিকের সাথে আলাপ করলে নাম প্রকাশ না

www.pathagar.com

করার শর্তে তিনি জানান– দুধ এই সন্দেশের প্রধান উপকরণ। দুধ থেকে ছানা তৈরি করার পরপরই সন্দেশ তৈরি করতে হয়। ছানা বেশি সময় ধরে রাখলে তা দিয়ে ভালো সন্দেশ তৈরি হবে না। পাক লালচে হবার সম্ভাবনা থাকে। কাচা ছানার সাথে সামান্য পরিমাণ ময়দা দেয়ার কথা তিনি স্বীকার করে তিনি আরো বলেন, গুঠিয়ার সন্দেশ দেখতে হালকাপাকের মনে হলেও তা নয়। সন্দেশ তৈরিতে কড়াপাক প্রয়োজন। ছানা ডলে ডলে মিহি করা বা না করার মধ্যে এই সন্দেশের কেরামতি রয়েছে। তাছাড়া পাক দেবার সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সন্দেশ তৈরি হবার পর তার উপরে একটি পরিষ্কার কিসমিস এটে দিতে হয়। বর্তমানে এক কেজি গুঠিয়ার সন্দেশের দাম চারশ টাকা। অতিথি আপ্যায়ন কিংবা ভোজন রসিক বা মিষ্টিপ্রিয় মানুষের মন সহজেই আকৃষ্ট করবে এই সন্দেশ। বরিশাল নগরীর অনেকেই এই সন্দেশ তৈরি করে বিক্রি করার চেষ্টা করলেও তা আকারে-স্বাদে-গন্ধে বা প্রাথমিক দেখায় গুঠিয়ার নয় বলে বোঝা সম্ভব।

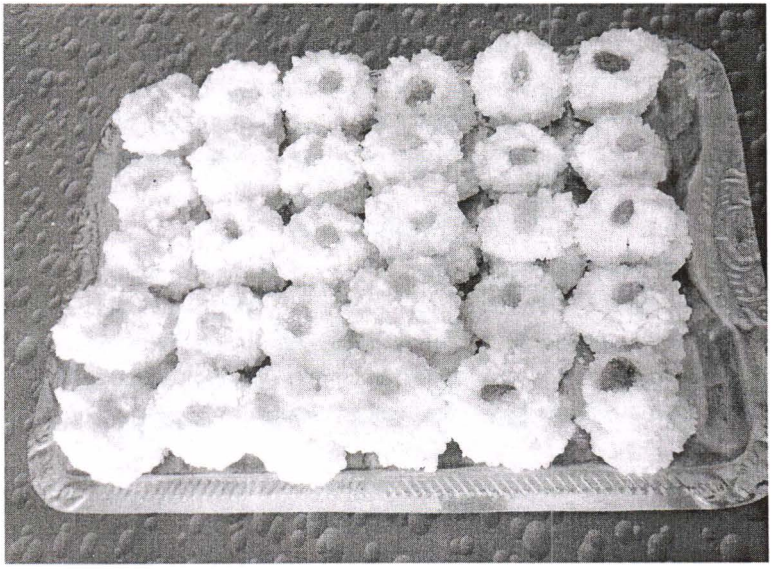

ছানার তৈরি সুস্বাদু গুঠিয়ার সন্দেশ

৪. নকশি পিঠা

পিঠা বাংলার ঐতিহ্যে লালিত সম্পদ বিশেষ। বাঙালি নারীরা ব্রত-পার্বন, শব-ই-বরাত, নবান্ন বা পহেলা বৈশাখসহ বিভিন্ন সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে পিঠা তৈরি এবং পরিবেশন করে আসছে। লোকজীবন থেকে আধুনিক জীবনেও অতিথি আপ্যায়নে পিঠা অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন কারণে লোকসমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারে পিঠা তৈরি করা একটি সাধারণ গৃহকর্ম হিসেবে বিবেচিত।

www.pathagar.com

বৃহত্তর বরিশালের লোকসমাজে পুলি, পাকোয়ান, পান, দুধখেজুর, পাটি-সাপটা, তালপিঠা ইত্যাদি ধরনের রকমারি পিঠা তৈরি হয়। এছাড়াও রূপরেখা, চন্দ্রমুখী, পাতাপোড়া, ফুলমতি, পাটিসাপটা, গোকুল, আলুশংকর, ভাপা, খেজুরচ্যাবা, চুশি, লালকাতা, দুধখেজুর, মনমোহন, বিবিখানা, লকেট, ঝালপোয়া, মালপোয়া, বেণী, এলাচ, নকশী, ঝিনুক এবং ফলের রসে ভেজানো হরেক রকমের পিঠা তৈরি করেন নারীরা। সাধারণত চালের গুড়া, খেজুর বা আখের গুড়, চিনি, দুধ, ক্ষীর, তেলসহ বিভিন্ন উপাদান পিঠা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আকৃতি, স্বাদ আর নকশার বৈচিত্রে প্রত্যেক ধরনের পিঠার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই সকল পিঠাকে আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষে নারীরা বিভিন্ন নকশায় পিঠা তৈরির কাজ সম্পন্ন করে। এই অঞ্চলের নকশাকৃত পিঠার খ্যাতি নকশি কাঁথার মতোই। নকশি পিঠা এখানকার নারী সমাজের সৌন্দর্য ও সুরুচির পরিচয় উপস্থাপন করে থাকেন।

পিঠা তৈরিকারী এক গৃহবধূর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন
প্রধান সমন্বয়কারী দেবাশীষ চক্রবর্তী

পিঠা লোক সমাজের গণ্ডি পেড়িয়ে আধুনিক সমাজেও সমাদৃত লোক খাবারের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০১০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি *'আনন্দে উৎসবে এসো, রইলো নিমন্ত্রণ'* এ স্লোগানকে সামনে রেখে বরিশাল নগরীর অমৃতলাল দে মিলনায়তনে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন সমাজ সেবিকা জেবুন্নেছা আফরোজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি

www.pathagar.com

কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র শওকত হোসেন হিরণ। হরেক রকমের পিঠাসহ জাকজমক আয়োজনে ৮৫ জন গৃহবধূ ও বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা পর্বের বিচারক ছিলেন অধ্যাপকা শাহ্ সাজেদা, অধ্যাপক নার্গিস আক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট কানিজ ফাতেমা এবং প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন। প্রতিযোগিতায় জাফরিন জামান তানিয়া প্রথম, দিল আফরোজ দ্বিতীয় এবং লুৎফুন্নাহার ও কৃষ্ণচূড়া বিউটি পার্লার তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। সন্ধ্যায় লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারি বরিশাল প্রেসক্লাবের আয়োজনে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এছাড়া জাতীয় দৈনিক কালেরকণ্ঠ পত্রিকার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বরিশাল অফিসে পিঠা-পুলির আয়োজন অতিথিবৃন্দকে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানভুক্ত বরিশালের অন্যতম নাট্য সংগঠন শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার সাংগঠনিক আপ্যায়নে পিঠা-পুলির ব্যবস্থা করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

পিঠা উৎসবে কাঠালপাতার তালপিঠা

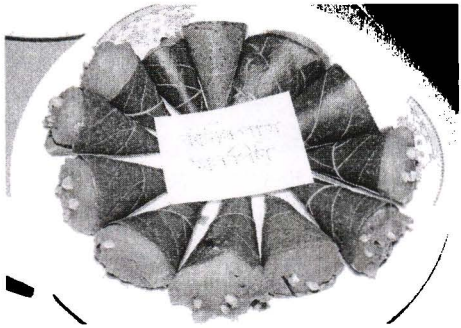

পিঠা উৎসবে প্রদর্শিত চন্দ্রপুলি

শীত মৌসুমে বরিশাল নগরী ও উপজেলা সদরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাট-বাজারে ভ্রাম্যমান পিঠার দোকান বসে। ওই সব দোকানে মুঠয়া পিঠা, চডা, চিতই পিঠা,

www.pathagar.com

পাটিসাপটা বিক্রি করা হয়। এছাড়াও ভাপাপিঠা বিক্রি করে অনেক নারী পারিবারিক প্রয়োজন মেটান। প্রায় প্রতিটি হাট-বাজার বা বন্দরে পিঠার দোকান দেখা যায়। ওইসব দোকানে সাধারণ মানুষের আনাগোনা বেশি। বর্তমান সময়ে বরিশাল নগরীরর অভিজাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বা কনফেকশনারীতে পিঠা বিক্রি হচ্ছে। ওই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাটিসাপটাসহ চিনির সিরায় ভেজানো নানা প্রকার নকশি পিঠা পাওয়া যায়। আধুনিক নগর জীবনে পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অতিথি আপ্যায়নে পিঠার কদর বাড়ছে।

৫. মুড়ি

বরিশালে জেলার অন্যতম লোকখাদ্য মুড়ি। আকারে মোটা এবং সুস্বাদু বলে বরিশালের মুড়ি আজ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। জেলার সদর উপজেলার কয়েকটি গ্রামসহ বাকেরগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি গ্রাম এবং ঝালকাঠি জেলার নলছিঠির বেশ কয়েকটি গ্রাম আজ মুড়ির গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এসব গ্রাম থেকে উৎপন্ন মুড়ির কদর এবং মেশিনে উৎপন্ন মুড়ির চেয়ে দামও একটু বেশি। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ধান থেকে মুড়ি ভাজা হয়। বর্তমানে বরিশাল নগরীতে প্রতি কেজি মুড়ির দাম প্রকারভেদে ৬৫/৭০ টাকা।

বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া, সাহেবেরহাট কর্ণকাঠি গ্রামের ৩০/৪০ পরিবার এবং বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরাদি, রাণীরহাট, হলতা, চরামদ্দি, চরকাউন্দি গ্রামের দেড়শো পরিবার মুড়ি ভাজা এবং বিক্রির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া পার্শ্ববর্তী ঝালকাঠি জেলার নলছিটির উপজেলার তিমিরকাঠি, ভরতকাঠি, বুড়িরহাট, রাজাখালি গ্রামের শতাধিক পরিবার মুড়ি ভাজা এবং বিক্রির উপর নির্ভরশীল।

তিমিরকাঠি এবং বুড়িরহাটে মুড়ির পাইকারী আড়ৎ রয়েছে। তিমিরকাঠি বাজারের আড়ৎদারদের মধ্যে গিয়াস খান, বুরজুগ খান, সালাম মিয়ার এবং বুড়িরহাটের ইউসুফ মিয়ার আড়ৎ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুড়ি বিক্রি করা হয়। পাইকাররা এসে পছন্দসই মুড়ি কিনে নেন। বরিশাল অঞ্চলের মুড়িগ্রামের উৎপাদিত মুড়ি গৃহস্থরা সরাসরি পাইকারদের কাছে বা বরিশাল নগরীতে নিয়ে এসে বিক্রি করেন।

মুড়ি উৎপাদনের উপকরণ : মুড়ির চাউল, চুলা, ঝাঝর, বালি, খোলা, পাইল্লা, জ্বালানিকাঠ, পলিথিনের এবং প্লাসিকের বস্তা।

বরিশাল অঞ্চলে উৎপন্ন মোতামোটা এবং নাকুচি ধানের চাউল মুড়ির জন্য উৎকৃষ্ট। আশ্বিনের প্রথম দিকে চাষ করার পর পৌষ মাসের প্রথম দিকে এইধান ওঠে। ধান থেকে চাউল তৈরির সময় ২ বার সিদ্ধ করতে হয়। তারপর চাউলগুলো ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে তা দিয়ে মুড়ি ভাজা হয়।

www.pathagar.com

বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরাদী গ্রামে মুড়ি ভাজায় ব্যস্ত এক দম্পতি

মুড়ি ভাজার পদ্ধতি : মুড়ি গ্রামের নারী-পুরুষরা খুব ভোরে উঠে গোসল করে। ধোয়া কাপড়-চোপড় পড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে মুড়ি ভাজার জন্য প্রস্তুত হন। এরপর আগের দিন লেপা-পোছা চুলা জ্বালিয়ে মাটির খোলায় (মাটির তৈরি আংটাবিহীন কড়াইয়ের মতো) বালি দিয়ে তাপ দিতে থাকেন। বালি নিদৃষ্টমাত্রায় উত্তপ্ত হলে তাতে চাউল দিয়ে খোলা অনবরত নাড়তে নাড়তে মুড়ি তৈরি করেন। ঝাঝর দিয়ে নেড়ে নেড়ে মুড়ি এবং বালি আলাদা করা হয়। তৈরি মুড়ি বড় পাইল্লায় রাখা হয়। যা প্রথমে পলিথিনের বড় বস্তায় ভরে এবং তারপর প্লাস্টিকের বস্তাবন্দি করা হয় বিক্রির জন্য। মুড়ি ভাজার চুলা সাধারণত চারমুখের হয়ে থাকে। তুলামূলক একটু গভীর চুলায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। শীতকালের চারমাস মুড়ি ভাজার সময় হিসেবে বিবেচিত। তবে রমজান মাসে মুড়ির চাহিদা বেশি থাকায় ওই সময়ে মুড়ি প্রস্তুতকারীরা শ্বাস ফেলার সময় পান না। বর্ষাকালে মুড়ি উৎপাদনকারীরা অলস সময় কাটান।

মুড়ির ধান কেনার কাজটি সাধারণত পুরুষেরাই করেন। তবে ধান সংরক্ষণ, চাউল তৈরি, চাউল রোদে দেয়া এবং তা সংরক্ষণ, চুলা তৈরি এবং মুড়ি ভাজার কাজটি প্রধানত নারীরাই করে থাকেন। পুরুষরা বিক্রির বিষয়টি দেখেন। বরিশাল নগরীর বাজার রোডে পাইকারী মুড়ি বিক্রেতা দিলীপ খাসকেল বলেন– মুড়িগ্রামগুলোর পাঁচ শতাধিক পরিবারের অর্থনীতি মুড়ির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের এক একটি পরিবার মুড়ি ভেজে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৮/১০ হাজার টাকা উপার্জন করে থাকেন। আড়ৎদার বা পাইকারী ব্যবসায়ীদের আয় অনেক বেশি।

www.pathagar.com

৬. হোগলের গুড়ি

হোগল পাতার ফুলের রেণু হোগলের গুড়ি হিসেবে বিবেচিত। এই রেণু বাসন্তী বর্ণের হয়ে থাকে। বরিশাল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ হোগলের গুড়ি দিয়ে পিঠা-পায়েস তৈরিসহ ওরসাথে সামান্য আটা মিশিয়ে রুটি তৈরি করেও খেয়ে থাকেন। এই গুড়ের সাথে চাউলভাজা-নারকেল-চিনি-দুধ মিশিয়ে বিশেষ একধরণের খাবার তৈরি করা হয়। স্থানীয়রা যার নাম রেখেছেন বিস্কি। তবে বিস্কি হোগলের গুড়ো ছাড়াও তৈরি করা যায়। বরিশাল জেলার চরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে হোগল জন্মে থাকে। ওই হোগলের বন থেকে সংগ্রহ করা হোগল ফুলের রেণু ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে ময়দার মতো মিহিগুড়ো বাসন্তি বর্ণের হোগলের গুড়ো বিক্রি বা খাবার তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়। বরিশাল শহরে প্রতি কেজি হোগলেরগুড়ো একশো পঁচিশ থেকে দেড়শো টাকায় বিক্রি হয়। জেলার হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দিগঞ্জসহ বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া, ভাষাণচর, চরমোনাই, শায়েস্তাবাদ, চরাদী এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে হোগলের গুড়ো সংগ্রহ করা হয়।

বরিশাল নগরীর চকেরপুলে হোগলের গুড়ো বিক্রি করছেন চরবাড়িয়া এলাকার এক কৃষক

৭. শামুক চুন

বরিশাল জেলার সর্বত্রই জলাশয় থাকায় এই অঞ্চলে শামুক-ঝিনুকের খোলা থেকে চুন তৈরির রীতি প্রচলিত রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। এই চুন প্রধানত পানের ব্যাঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জেলার বানারীপাড়া, উজিরপুর, আগৈলঝাড়ার বিল অঞ্চল থেকে শামুক-ঝিনুকের খোলা সংগ্রহ করেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তা প্রতি বস্তা (প্লাস্টিকের মাঝারী বস্তা) পাইকারী ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি করেন পুইন খোলা পুড়িয়ে চুন উৎপাদনকারী মালিকের কাছে। শামুক-ঝিনুক খোলার অন্যতম উৎস হলে

www.pathagar.com

মাছের ঘের মালিকদের কাছ থেকে। জ্যান্ত শামুকের ভেতরের নরম অংশ মাছের খাবারের জন্য রেখে শক্ত খোলস চুন তৈরির কারখানায় বিক্রি করে থাকেন মাছের ঘের মালিকেরো। শামুক-ঝিনুকের শক্ত খোলো পুইনে পুড়িয়ে মেশিনে তা গুড়ো করা হয়। পুইনে জ্বালানী হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। ইট পোড়ানো বা মৃৎপাত্র পোড়ানোর পুইনের সাথে এই পুইনের সাদৃশ্য রয়েছে। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া সদরের কৌড়া বাড়িতে জেলার একমাত্র পুইন এবং গুড়ো করার মেশিন রয়েছে। এছাড়া ঝালকাঠিতে বেশ কয়েকটি পুইন এবং মেশিন আছে বলে জানিয়েছেন পাইকারী চুন বিক্রেতা বাবুল সূত্রধর। এছাড়াও বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠিতেও অনুরূপ পুইন রয়েছে। বানারীপাড়ার পুইন এবং গুড়ো করার মেশিনের মালিক রবি সূত্রধর, গৌতম সূত্রধর, বিমল সূত্রধর। ঝালকাঠি পুইনের মালিক গৌরহরি এবং শ্রীহরি।

তাম্বুল রসিকদের প্রিয় শামুক চুন বিক্রির জন্য কলসকাঠি বাজারে বসে আছেন চুনারি

একবস্তা গুড়ো করা চুন ৫শ টাকা দরে কিনে তা পানি দিয়ে মিলিয়ে ছোট বড় প্যাকেট করে বাজারে বিক্রি করা হয়। বড় বড় চাড়িতে (মাটির বড়পাত্র) বৈঠাকৃতির কাঠের চামচ দিয়ে গুড়ো চুনের সাথে পানি মিশিয়ে চুন বিক্রর জন্য প্রস্তুত করতে হয়। ৫০ কেজির এক বস্তা গুড়ো চুনে ৫ মণের বেশি চুন উৎপন্ন হয়। তার পর পানের দোকানে ৫ থেকে ১০ টাকা করে প্যাকেট করে খুচরা বিক্রি করেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। চুন বিক্রেতা ভুলু সূত্রধরের মতে পাথর চুনের তুলনায় তাম্বুল আসক্ত মানুষের কাছে শামুক চুন জনপ্রিয় বিধায় এই চুনের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে।

www.pathagar.com

৮. আমড়ার চাটনি

বরিশাল অঞ্চলের অন্যতম ফল আমড়া। বর্ষাকালীন এই ফল কাচা খাওয়ার পাশাপাশি চাটনি তৈরি করে খাওয়া হয়। রোদে শুকিয়ে মিষ্টি বা ঝাল আচার বা চাটনি তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি আমড়া সিদ্ধ করে চাটনি রান্না করা হয়। বিয়ে থেকে শ্রদ্ধানুষ্ঠানে আমড়ার চাটনি নিমন্ত্রিতদের কাঙ্ক্ষিত খাদ্যবস্তু।

৯. কাঁকড়া

নদ-নদী-খাল-বিলপূর্ণ বরিশালে মাছ এবং অন্যান্য জলজপ্রাণীজাত খাদ্য বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এদের মধ্যে কাঁকড়া অন্যতম। খাল-নালা-নদীতে পাওয়া কাঁকড়াগুলোকে আকৃতিগত কারণে স্থানীয়রা ভিন্ন ভিন্ন নামে চেনে। ছোট আকৃতির কাঁকড়া পেউচ্চা, মাঝারি ধরণের হৃষ্টপুষ্ট কাঁকড়া তেউল্লা, দক্ষিণের সাগর মোহনায় পাওয়া ছোট কাঁকড়া চাউম্মা এবং শক্ত খোলসযুক্ত বড় কাঁকড়া সাগরের কাঁকড়া নামে পরিচিত। পেউচ্চা কাঁকড়া সাধারণত পাটায় বেটে পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে বড়া বানিয়ে খাওয়া হয়।

তেউল্লা কাঁকড়া একইভাবে অথবা খোলস ছাড়িয়ে ভেজে রান্না করে খাওয়া হয়। নদী এবং সাগর মোহনায় পাওয়া মাঝারি আকৃতির চাউম্মা কাঁকড়া একইভাবে খাওয়া হয়। বড় কাঁকড়া মসলা মাখিয়ে তেলে ভেজে বা বেশি মসলা দিয়ে মাংসের মতো ভুনা রান্না করে খাওয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বড় কাঁকড়া খেয়ে থাকেন। সমপ্রতি বড় কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া সামুদ্রিক খাবার হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এছাড়াও বরিশাল অঞ্চলের নদী-সাগরে পাওয়া বেশ কিছু মাছ বা প্রাণী লোকসমাজ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। এর মধ্যে খটকমাছ (এক প্রজাতির হাঙ্গর), শাপলাপাতা মাছ (শংকরমাছ), তেলকুঁচে অন্যতম। তাছাড়া নদী-সাগরের মোহনায় পাওয়া বা বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছ বিশেষ বিশেষ ভাবে রান্না ও পরিবেশন করা হয়, যা অন্য কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। আর এই রান্নার বিশেষত্ব বজায় রয়েছে আবহমান কাল ধরে।

১০. শাপলা

বরিশাল অঞ্চলের অন্যতম লোকখাদ্য শাপলা। সাধারণত সবজি হিসেবেই শাপলা খাওয়া হয়। বর্ষা মৌসুমে জেলার জলাভূমি পানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত থাকে। ওই সময় জলাভূমিতে শাপলা ফোটে। শাপলা সাধারণত তিন প্রকার– ১. সাদা শাপলা, ২. লাল শাপলা, ৩. ক্ষুদে শাপলা। এর মধ্যে সাদা এবং লাল শাপলা খাওয়া হয়।

জলাভূমি থেকে তুলে বা হাট-বাজার থেকে কিনে শাপলা ডাটার উপরের পাতলা অংশ তুলে ফেলে টুকরো টুকরো করে কেটে রান্না করা হয়। সাধারণত সিদ্ধ করে তেলে সরষে ফোড়ন দিয়ে শাপলা রান্না করা হয়ে থাকে। এর সাথে হলুদ-মরিচ এবং

www.pathagar.com

প্রয়োজন অনুযায়ী পেঁয়াজ ও লবণ দেয়া হয়। তবে শাপলার সাথে ছোট চিংড়ি যা স্থানীয় ভাষায় ঘুচাচিংড়ি ভোজনরসিকদের কাছে আকর্ষণীয়। বর্ষা মৌসুমে শাপলা তোলা এবং তা বিক্রি করে অনেকে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। বরিশাল নগরীতে ১৫/২০টি শাপলার এক মুঠি ২০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হয়। গ্রামাঞ্চলে এর দাম কম। খাবার জন্য সাধারণত সাদা শাপলা জনপ্রিয়। বরিশাল অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শাপলাকে বর্ষাকালীন সবজি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়া জেলার বিল এলাকায় শালুকও খাবার হিসেবে প্রচলিত।

আগৈলঝাড়া বিলে শাপলা তুলছেন একগ্রামবাসী

১১. মোচা ও থোর

বরিশাল অঞ্চলের লোক খাবারের মধ্যে কলার মোচা ও থোর অন্যতম। সাধারণত মোচাকৃতি কলার ফুলকে মোচা বা মোচরা বলা হয়। আর কলাগাছের কাণ্ডের ভেতরের অংশকে থোর বা ভারালি বলা হয়। আইড্ডা কলার (বিচিকলা) মোচা এবং থোর খাবার উপযোগী। মোচা কুচি কুচি করে কেটে তেল-মসলার সাথে নারকেল-চিংড়ি মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার হিসেবে পরিচিত।

অপরদিকে থোর লাবরায় (পাঁচফোড়ন দিয়ে বিভিন্ন সবজি সমন্বয়ে রান্না করা তরকারি) ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সরষে ফোড়ন দিয়ে চিংড়ি মাছের সাথে থোর

www.pathagar.com

ভাজি আকর্ষণীয় খাবার। কবিরাজদের মতে থোর এবং মোচায় প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে। তাই বিশেষ করে নারীদের থোর এবং মোচা খাওয়া ভাল।

আইড্ডা কলার মোচা

১২. ইলিশঝুড়ি

বরিশাল ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত। ইলিশ আরোহন, রপ্তানি এই অঞ্চল থেকেই হয়ে থাকে। স্থানীয় হাট-বাজারে জেলেদের বিক্রি করা ইলিশ ভোজন রসিকরা নানাভাবে খেয়ে থাকেন।

ইলিশ মাছের দোপেঁয়াজু, ইলিশ ভাজা, সরষে ইলিশ, ইলিশের টক, ইলিশ পোলাও, ইলিশ খিচুরি, ইলিশের পাতলা ঝোল, ইলিশ পাতুরি, ইলিশের মুড়িঘণ্ট, নোনা ইলিশ, সাতলানো ইলিশ, ভপা ইলিশ প্রভৃতি খাবারের পাশাপাশি ইলিশঝুড়ি লোকসমাজে প্রচলিত একটি খাবার। মাথা ছাড়িয়ে তেল-নুন-মরিচ-পেঁয়াজ মাখিয়ে রান্না করা নরম হয়ে যাওয়া ইলিশই– ইলিশঝুড়ি।

তথ্যসহায়ক

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ বিশু, সকাল-সন্ধ্যা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, সদর রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল
২. সুদাম ঘোষ, আদি গৌরনদী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, সদর রোড, ববিশাল সদর, বিশাল

www.pathagar.com

৩. বাচ্চু সিকদার, উজিরপুর, বরিশাল
৪. দিলীপ খাসকেল, মহিম বাবুর কাচারী, বাজার রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল
৫. প্রবীর বিশ্বাস ননী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. আলেয়া বেগম, নাজিরের পুল, রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল
৭. মোসা. মিনারা বেগম, সাগরগল্লি, বাজাররোড, বরিশাল সদর, বরিশাল
৮. অনিল ঘোষ, উজিরপুর, বরিশাল
৯. মিসেস আনোয়ারা, সাগরদী, বরিশাল সদর বরিশাল
১০. প্রতিমা রাণী কয়াল, চরাদী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
১১. ময়না মিস্ত্রি, কাউনিয়া, বিসিকি, বরিশাল সদর, বরিশাল
১২. আ. ওহাব, চরাদি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, বয়স ৬৫
১৩. মো. সিরাজুল ইসলাম, কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, বয়স ৭২
১৪. বিনয় মণ্ডল, দুর্গাপুর, বরিশাল সদর, বয়স ৫৫
১৫. ইদ্রিস মুন্সি, হলতা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, বয়স ৬০
১৬. ফিরুজ মিয়া, বাইশারি, বানারীপাড়া, বরিশাল, বয়স ৬০
১৭. সোনা মিয়া, বাইশারি, বানারিপাড়া, বরিশাল, বয়স ৫৫
১৮. হরি খাসকেল, বাজার রোড, মহিমবাবুর কাচারি, বরিশাল, বয়স ৩৫
১৯. টেনু ঘোষ, বাজার রোড, বরিশাল, বয়স ৬৫
২০. বরুণ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বাজার রোড, বরিশাল, বয়স ৪৮
২১. তোজাম্মেল, ভাসানচর, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, বয়স ৩৫
২২. মো. বেলায়েত হোসেন, চরমোনাই, বরিশাল সদর, বরিশাল বয়স ৫০

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

১. আসমান সিংহ

চরিত্র পরিচিতি

আসমান সিং	:	সুজাবাদ অধিবাসী
দল সিং	:	ঐ ভাই
রাধুমাঝি	:	ঐ দেশী জেলেজাতি (মাঝি)
খোদা নেওয়াজ	:	ঝালকাঠির বাসিন্দা তালুকদার
শীতল সিং	:	দুর্গার বাবা
ঘটক	:	ঘটক
বেল সাহেব	:	
মেম	:	
দুর্গা	:	আসমানের স্ত্রী
লক্ষ্মী	:	বেশ্যা
কালিয়ার মা	:	বুড়ি

বরিশালের লোকনাট্য :
আসমান সিংয়ের ফাঁসি

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

আসমান সিংয়ের প্রবেশ পালঙ্কে ঘুমাবে।

অধিকারী : গান-

আসমান সিংগো বাবুরে,
ঘুমের ঘোরে থাইককারে,
স্বপনেতে দ্যাখেরে-
দেখে দুর্গা খ্যালে পাশারে
অকি আয় হায়রে।

আসমান : কি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। আমার মন এত চঞ্চল হইল কেন?

www.pathagar.com

আমি তো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। তারা মতো চক্ষু লাল-লাল ঠোট, ঠোঁটের উপর তিলকের ফোঁটা। টেরি কাটা সিঁথি, কপালে তিলক-শীতল সিংয়ের কন্যা। এখনি সাজ- গোজ কইরা রওয়ানা হইব। (প্রস্থান)

অধিকারী : গান-

ফিতা পাইরের ধুতিরে,
চিলা পাইরের চাদর রে।
বাবু পরিচ্ছদ করিল রে,
অকি আয় হায় রে।
সাদা এ উককা ঘোড়ারে,
পিষ্ঠে ছোয়ার হইয়ারে–
যায় রামদুর্গার বাড়িরে,
অকি আয় আয় রে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আসমান সিংয়ের প্রবেশ)

আসমান : ঘোড়াটা গাছের সঙ্গে বাইন্দা রাখলাম। ওটা আবার হক-হক কইরা না ওঠলে হয়। আমি এখন ঐ সানবান্দা ঘাটের পারের আম গাছটির উপর উঠিয়া বসব। দুর্গা নিশ্চয়ই ছ্যান করতে আসবে। (দুর্গা দাসীসহ কলস লইয়া ঘাটে ছ্যান করার জন্য প্রবেশ)

অধিকারী : গান–

হোরে আগে-পিছে পঞ্চনা দাসীরে,
ওযে মধ্যে দুর্গা যায়ওরে।
যায়েন তো ছ্যান করিবার রে,
ও যায়েন সানবান্দার ঘাটেরে।

দুর্গা : ঐ দাসী, আমার, কলসিডা একটু মাইজা-ঘইষা দে।

দাসী : দেও দিদি মাইজা দিই!

দুর্গা : এবার সকল কলস ঘাটের উপর রাখ। (তথাকরণ)

অধিকারী : গান-

ওরে পাতা জলে নাইম্মারে দুর্গা,
পাতা ছেনান করেরে।
আইজ মনেরই হাউসে,
হোরে কোমর জলে নাইম্মারে দুর্গা,
কোমর ছেনান করেরে
আইজ মনেরই হাউসে,
হোরে গলা জলে নাইম্মারে দুর্গা।

www.pathagar.com

গলা ছেনান করেরে,
আইজ মনেরই হাউসে।
হোরে পঞ্চ ডুবও দিয়া কন্যায়রে,
কলসি ভরিলরে।
আইজ মনের হাউসে,

দুর্গা : শাড়ির আঞ্চল দিয়রে,
জলের মধ্যে খেওয়ায়রে,
দেখে জলে ভাসে মানুষেরা!
আইজ মনের হাউসে।

দাসী : ও দিদি, তুমি শাড়ি দিয়া কি করতেছ?

দুর্গা : কিছু না। চল বাড়ি যাই! (প্রস্থান)

অধিকারী : কাংকে কলস লইয়ারে,
ভিজা কাপড় গায় ওরে।
যায় বাড়িরও দিগেরে,
অকি আয় হায়রে–
গাছের ডালে থাইককারে,
আসমান সিং বাবুরে।
ও থাকে কন্যার পানে চাইয়ারে,
অকি আয় হায় রে!

তৃতীয় দৃশ্য

(আসমান সিংয়ের প্রবেশ)

আসমান : ও খ্যাদা, খ্যাদা। (খ্যাদার প্রবেশ)

খ্যাদা : বাবু আমাকে কি জন্য আদেশ করেছেন?

আসমান : এক্ষুণি ঘটক ডাইকা লইয়া আয়।

খ্যাদা : আমি এক্ষুনি চললাম বাবু। (প্রস্থান)

(ঘটনের প্রবেশ)

ঘটক : আমাকে কিসের জন্য আদেশ করিয়াছেন?

আসমান : তোমাকে আদেশ করতে ডাকি নাই। কাজের জন্য ডাকিয়াছি। তা তুমি বুঝতে পারছ না?

ঘটক : তা আমি বুঝতে পারিয়াছি। বিয়ার কথা মনে পরছে বুঝি। আচ্ছা বলেন আপনি কোথায় বিয়া করতে চান?

ঘটক : আচ্ছা, আপনে এই কন্যার কথা কি প্রকারে জানলেন?

আসমান : আমি কি প্রকারে জানছি, তাই শোনবে? তবে শোন! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।

www.pathagar.com

ঘটক : আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াই পাগোল হইয়াছেন। আমি এক্ষুণি রওয়ানা হইলাম।
(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(শীতল সিংয়ের প্রবেশ)

ঘটক : সিং মশায়– ও সিং মশায়। বাড়ি আছেন?

শীতল : কে ডাকাডাকি করিতেছ? (শীতলের প্রবেশ)

ঘটক : (প্রবেশ) আমি ঘটক। আপনার মেয়ের সম্বন্ধ নিয়া আসিয়াছি।

শীতল সিং : কোথায় সে সম্বন্ধ? কার ছেলে?

ঘটক : আপনার মেয়ে বিবাহ দেবেন কিনা-তাই বলুন? না হয়তো আমি চলে যাচ্ছি।

শীতল : মেয়ে বিয়া দেব না কেন? মেয়ে কি কলাগাছ যে তা দিয়া ঘরে খুঁটি দেব? ছেলের পরিচয় দিলে না, চলে যাবে? ব্যাটা, তুই শীতল সিংয়ের নামও শোনো নাই? তোকে একটা ঘাড়-ধাক্কা দিয়া দেব। ইয়ার্কি মারতে আইছ? তুই আমারে চেন?

ঘটক : চিনি না আবার? যে সিংয়ের সিং। গুতাইয়া আবার ফাইডা-ছিড়ড়া ফালাইবেন নাকি? ও সিং মশায়, ভাল সম্বন্ধ এনেছি।

শীতল : বল, কার ছেলে-কি নাম?

ঘটক : রামপতি সিংয়ের পুত্র- আসমান সিং। গ্রাম সুজাবাদ ভূতের বাড়ির পাশে।

শীতল : তাতো ভাল সম্বন্ধই! তুমি বলতে পার ঘটক, ছেলে কি পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছে?

ঘটক : উচ্চ প্রাইমারি পাশ করিয়াছে।

শীতল : তবে তো ভালই লেখাপড়া করিয়াছে। এই সম্বন্ধই আমি করিব। আচ্ছা, ছেলে কি দিতে পারবে বলতে পার?

ঘটক : তা আমি বলতে পারি। ছেলে অল্প কিছু দিতে পারবে। বেশি কিছু দিতে পারবে না।

শীতল : আচ্ছা তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। আচ্ছা ঘটক, তোমার কাছে কি পঞ্জিকা আছে?

ঘটক : আছে সিং মশায়। (পঞ্জিকা বাহির। উভয়ে দেখল)

শীতল : কোনও দিন তারিখ তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে এই একটা দিন পাওয়া গেল, আগামীকাল রাত্র ৮ টার পর শুভলগ্ন আছে।

ঘটক : তাতে আমি স্বীকৃত হইলাম। তবে এখন চলিলাম।
(প্রস্থান)
(শীতল সিংয়ের প্রস্থান)

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গা, দাসী, ঘটক, চাকর, ব্রাহ্মণ, শীতল সিং, আসমান সিং। ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পাঠ–

কাশ্য কাশ্য গোত্রেং- কন্যাদানে বাবু শীতল সিং বাবু রামপতি পুত্রং বাবু আসমান সিং তস্যং বিবাহ সম্পন্নং করনাস্তে।

অধিকারী-গান

রামদুর্গার বিয়ারে,
আরও বাজনারে।
কত বাজাইতে লাগিলরে
অকি আয় হায়রে।
বাজী-বাজনার চোটেরে,
ছোট বড় ঘররে।
পুইড়ে ছাড়-খাড় যে হইলরে,
অকি হায় হায়রে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রামদুর্গার তৈল-গামছা লইয়া প্রবেশ। পরে আসমান সিংয়ের প্রবেশ)

আসমান : দাও, তৈল গামছা দাও। আমি স্নান কইরা আসি।

দুর্গা : তা যাও, আমি তোমার ভাত নিয়ে আসি। তবে একটা কথা বলতাম।

আসমান : তা বল-কি বলতে চাও?

দুর্গা : তুমি রাগ হইও না প্রাণনাথ! এভাবে বইসা বইসা কতদিন চলবে প্রাণনাথ।

আসমান : এ কথার অর্থ কি?

দুর্গা : তুমি একটা চাকরী কর। না হইলে সংসার চলবে কেমনে?

আসমান : তোমাকে রাখিয়া আমি যে থাকতে পারব না।

দুর্গা : তুমি যদি চাকরী পাও, তারপর আমাকেও নিয়ে যাইও প্রাণনাথ।

আসমান : আচ্ছা, দেখা যাবে। (প্রস্থান)

দুর্গা : আমারও তো মন চায় না তারে বিদায় দিতে, কি করি? ঘরে যে চাল নেই, কি খাইব? (প্রস্থান)

(কাইল্যার মা বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে প্রবেশ)

কাইল্যার মা বুড়ির গান–

ও মশায়রা চেনেননি
ও মশায়রা জানেননি
আইলাম আমি কাইল্যার মা বুড়ি
ধান খ্যাতের আগুন ছোন খ্যাতে দি

www.pathagar.com

ছোন খ্যাতের ধান দি
আইলাম আমি কাইল্যার মা বুড়ি।
(গান শেষে আসমানের প্রবেশ। বসল)

কাইল্যার মা : এখানে বসা কে? তোমার নাম কী?
আসমান : তাতে তোমার দরকার কী?
কাইল্যার মা : আমার দরকার না থাকলে জিজ্ঞেসা করছি কেন?
আসমান : আমার নাম আসমান সিং।
কাইল্যার মা : তুমি এখানে এসেছ কেন?
আসমান : স্নান করিতে এসেছি।
কাইল্যার মা : তোমার নাকি অনেক দিন হয় বিয়ে হয়েছে।
আসমান : হ্যাঁ, কেন?
কাইল্যার মা : তবে তুমি আমার একটা কথা শোন।
আসমান : কি বলবে, বল দেখি?
কাইল্যার মা : তবে একটা কথা শোন- বিয়ে করে ঘরে বসিয়া থাকিলে কোনও কাজ হবে না। তাতে তোমাকে লোকে চেনবে না বা সম্মানও করবে না। তুমি একটা কাজ কর, একটা চাকরী কর।
আসমান : ও বুড়ি, মুখ সামলাইয়া কথা বলবা। আমি নতুন বিয়া করছি, আমি আনন্দ করব, আমি কেন চাকরীতে যাব?
কাইল্যার মা : আচ্ছা, তুমি কি মেয়েলোক? তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার ঘরে থাকা সাজে না।
আসমান : আচ্ছা, আমি চারকী করতে যাব না।
কাইল্যার মা : যাবেতো সত্য?
আসমান : নিশ্চয়ই যাব।
কাইল্যার মা : যদি না যাও, রামদুর্গার মাথা খাও।
আসমান : রাম দুর্গার মাথা খাব কেন? তোমার মাথা খাব।
কাইল্যার মা : আচ্ছা হইল রাজি হইছে তো? যাও, এখন বাড়ি যাই। (উভয়ের (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[দুর্গার ভাতসহ প্রবেশ। আসমানের প্রবেশ। খাইতে বসল]
দুর্গা (ভাত-জল দেবার সময় গ্লাস কাত হয়ে পড়ল)

আসমান : (দাঁড়াইয়া) না, খাব না। আমি এখনই চাকরী করতে যাব।
দুর্গা : না-না, নাথ! দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন।
আসমান : না, কোন কথাই শুনব না। আমি এখনি যাব-
আমায় বিদায় কর।
দুর্গা : আমি কেমন করিয়া আপনাকে বিদায় দেব প্রাণনাথ!

www.pathagar.com

আপনাকে বিদায় দিতে মনের মধ্যে বড় ভয় হয়।

আসমান : কেন ভয় হবে?

দুর্গা : প্রাণনাথ! আপনাকে বিদায় দিলে আর বুঝি আপনার শ্রীচরণ পূজা করতে পারব না। নাথ আপনাকে বিদায় দিতে পারব না।

দুর্গার গান :

ও নাথ ও প্রাণ ও বিদায় চাইও নারে
তোমাকে প্রাণনাথ বিদায় দিব নারে
বড় দুঃখেরই কথা
কিছু চাব না, খাওয়ার কথা বলব না,
দেখিব নয়ন ভরে রে প্রাণনাথ
বড় দুখেরই কথা

আসমান : প্রিয়তমে! এ সময় চোখের জল ফেলতে নাই। তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না। মাঝে মাঝে তোমায় দর্শন দেবো।

দুর্গা : সব জানি, সব বুঝি, অবোঝ মন যে বুঝে না। হায় কদিন হ'লো বিয়ে হয়েছে। আইজ আমাকে ফেলে চলে যাবেন? কোন্ প্রাণে বিদায় দিব প্রাণনাথ! আমি বিদায় দিতে পারব না।

আসমান : প্রিয়ে, কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার কথা মনে রাখব, আমি বাড়ি আসব।

দুর্গা : আমি অবলা বোকা নারী হয়ে কি করে এমন নিঠুর কাজ করব?

আসমান : আর কেদ না প্রিয়ে। যদি চাকরী পাই, তখন তোমাকে নিয়ে সুখের সাগরে ভাসব। তোমার জন্য শাড়ি আনব, ভাল ভাল গয়না আনব, এখন যাই।

দুর্গার গান–

যেও না যেও না রে নাথ
ও নাথ আমারে ফেলিয়ারে
ওরে, একা ঘরে কেমনে রে রব,
আমি রইতে নাকো পারব রে (২)
তুমি যেও নারে, আমার মাথা খাও রে
একবার কথা শোন রে (২)
ও নাথ ফেলিয়া না যাও রে।

আসমান : যদি কপালে থাকে চাকরী পাই, নিশ্চয়ই বাড়ি এসে তোমাকে শুভ সংবাদ দিয়ে যাব। তোমার চাঁদ মুখখানা দেখে যাব।

দুর্গা : আমার যদি কপাল ভাঙ্গিয়া সুখ আসে- সে সুখের জন্য আপনাকে বিদায় দিতে রাজি না।

আসমান : তুমি কিছু বোঝ না, আমি চললাম। (প্রস্থান)

অধিকারী : (পাঠ। দুর্গা পিছে পিছে অল্প হেটে যেয়ে)

www.pathagar.com

গান
দুর্গা ঝামটা মেরে গেলরে হে'টে
সামনে ফিরিয়া নাইকো দেখেরে
আইজ মনেরই কথা-
গেল আপন ঘরে, ফিরিয়া চাইল নারে (২)
আজই মনেরই কথা।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আসমান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : আমি এখানে কি দেখলেম? আমার মনে হয়, এখানে চোর-গুণ্ডা আসিয়াছে। (প্রবেশ)

প্রহরী : তুমি এখানে কে? কী তালাশ করিতেছ- তোমার নাম কি?

আসমান : আমার নাম আসমান সিং। আমি এখানে চাকরী খোঁজ করতে এসেছি। তুমি এখানে কে?

প্রহরী : তাতে তোমার দরকার কি? চাকরী খোঁজ করতে এসেছ বিছানার পাশে? ভদ্রলোকের বিছানার নিচে কত টাকা থাকে, কত পয়সা থাকে। তোমার চাকরী দরকার হলে, আমাদের সাহেবের কাছে যাও।

আসমান : তোমার সাহেব কোথায়?

প্রহরী : সাহেব তার বৈঠকখানায়। এস, তুমি আমার সাথে এস।

আসমান : আচ্ছা, তবে চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(সাবেহ ও মেমের প্রবেশ। পরে প্রহরী ও আসমানের প্রবেশ।)

সাহেব : হোয়াট ইজ ইওর নেইম? হোয়াট ইজ ইওর ফাদার্স নেইম। হোয়াট ইজ ইওর কোয়ালিফিকেশন এন্ড হোয়েয়ার্স হ্যাভ ইউ কাম ফ্রোম?

আসমান : সাহেব, আমি ইংরেজি বুঝি না।

সাহেব : তুমি কি চাকরী করিতে পারিবে?

আসমান : আপনি যে চাকরী দিবেন, তাই করতে পারব।

সাহেব : ভেরি গুড! তুমি মেম সাহেবের কাছে চলিয়া যাও। (মেমের প্রবেশ)

মেম : হু ইজ দি ম্যান! টুমি কেন আসিয়াছ?

আসমান : চাকরী করিতে আসিয়াছি।

গান
ওরে ছোটকালে মরছে রে মোর মাতা গো পিতা রে
ও মেম সাহেব, আমার কেহ নাইও রে

www.pathagar.com

আহারে অকি আয় হায় রে
ওরে মায়ের কাঙ্গাল হইয়া রে, মা বোলাইলাম তোমারে
ও মেম সাহেব আমার কেহ নাইও রে
অকি আয় হায় রে।

মেম : আচ্ছা, তুমি কী পাশ করিয়াছ?

আসমান : আমি উচ্চ প্রাইমারি পাশ করিয়াছি।

মেম : তুমি কি কাজ করিতে পারিবা?

আসমান সিং : আপনি যেই কাজ দিবেন, সেই কাজই করতে পারব।

মেম : তবে তুমি সাহেবের মাছের বাজার পাহারা দিতে পারবে?

আসমান : পারব মা!

মেম : আজ হতে তোমাকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরী ঠিক করিয়া দিলুম।

আসমান : মা, আপনি বড় ভাল। আপনি আমার মা!

মেম : তোমার চেহারা খুব সুন্দর। তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমার ছেলে নাই। তোমাকে আজ হতে পুত্র ডাকিলাম। তুমি আমার পুত্র। যাও, চাকরী কর যেয়ে। তোমাকে আমি ২০ বিশ টাকা বখশিষ দিলাম।

অধিকারীর গান :

আর আশি তোলা রূপা দিয়া,
মেম সাইব চাপরাস তৈয়ার করাইয়া
দিল আসমান বাবুর গলেরে
অকি আয় হায় রে!
চাপরাসখানা পাইরারে
আসমান খুশি হইয়ারে
দিল কোমর আরও গলায়রে
অকি আয় হায় রে।

তৃতীয় ব্যক্তি : ওরে বেটা, চাপরাস গলায় আর কোমরে দেয় কেমন কইরারে?

অধিকারী : লাল ফিতার লগে বাইন্দা দেহ নাই চাচা! আদালতের পিয়নে যে দেয়।

তৃতীয় ব্যক্তি : বুঝছ চাচা। এহন তো হ্যাঁ আইন এক্কালে আসমান ব্যাডা হইয়া গেল! আসমানের কপাল খুইল্লা গেল! আমার কইলম সন্দেহ হয় চাচা! বেল সাইবের মাছুয়া বাজারে আবার লক্ষ্মী লাহীর প্যারমে না পইররা যায়।

অধিকারী : ঠিকই কইছ ব্যাটা, লক্ষ্মীর পেরমেই পরবেরে! যে রূপ আসমানের, অরে কি ছাড়েরে?

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য
(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

আসমান : ও লক্ষ্মী বেশ্যা-

লক্ষ্মী : দেখ বাবু, বেশ্যা বেশ্যা করব না। তুমি কী জন্য এসেছ?

আসমান : আসলাম তোমার বাসায় পান তামাক খাইতে।

লক্ষ্মী : পান-তামাক খাইতে? ওরে আমার কপাল! তোমার মতো কত বাবু ঘরের পিছে পিছে ঘোরে?

আসমান : দেখ লক্ষ্মী! ছোট মুখে এত বড় কথা? সাবধান! আর কখনও এরূপ কথা বলিস না। আমি বেল সাহেবের চাপরাসী।

লক্ষ্মী : দেখেন বাবু আপনি এত রাগ হইয়াছেন কেন? আমরা সদাসর্বদা এইরূপ কথাই বলিয়া থাকি।

আসমান : তুমি যাই বল না কেন? হাবোল-তাবোল কথা আর কখন বলিও না। ভদ্রলোকের কি মান-সম্মান নেই? আমাকে যা ভাবিয়াছ তাহা নয়।

লক্ষ্মী : বাবু, খুব রাগ হইয়াছেন তো? আচ্ছা বাবু! আমার বাসায় পান-তামা খাইতে আশা করিয়াছেন? কিন্তু আমার সঙ্গে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

আসমান : কী প্রতিজ্ঞা করব, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

লক্ষ্মী : আমি যা বলব তাই করবেন?

আসমান : হ্যাঁ, তাই কবব। বল, তুমি কি বলতে চাও?

লক্ষ্মী : দেখেন বাবু! আমার কাছে আসেন, আপনিত হাত পাতেন। (পাতিলো) এই তামা-তুলসি ও লবণ আপনার হাতে দিলাম। যদি আপনে আমাকে ছাড়িয়া যান, তবে লবণে পুড়িয়া মরবেন আর তামা মাগিয়াও পাইবেন না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আসমান : আচ্ছা! তাতেই আমি স্বীকৃত হইলাম, তবে এখন চল। (প্রস্থান)

অধিকারী : (গান)

অই রঙ্গেরই খ্যালা
খেলব এইও ব্যালা
মনেরই হাউসে
হোরে রঙ্গরসে প্রেম সাগরে ভাসে।
ঐ ভাসে আসমান
মনেরই হাউসে
লক্ষ্মী বেশ্যার ঘরেরে
আসমান নাগর সাজেরে
আজি মনেরই হাউসে

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

(রামদুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা : ও পতি আইল না, প্রাণ বাঁচে না, পতিরও দুঃখেতে
অকি আয় হায়রে
দুঃখ কইব কারে, গলে রসি দিয়ে, মরব জলে ডুবে
বাঁচে না আর প্রাণরে
অকি আয় হায়রে।

(কাইল্যার মা বুড়ি লাঠি ভর দিয়া প্রবেশ)

কাইল্যার মা : ও রাম দুর্গা, বাবু কী বাড়িতে এসেছেরে?

দুর্গা : দেখ বুড়ি, বাবুর যদি আমার কথা মনেই থাকত, তবে একবার বাড়ি আসতেন।

কাইল্যার মা : দেখ রাম দুর্গা, তোর দুঃখ দেইখ্যা আমার চক্ষে জল আসেরে হায়-হায়। তুই এখন কী করবি বল?

দুর্গা : বুড়ি, তুমি তবুও আমার খবর-বার্তা নেও, আর তো কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। তুমি একটা বুদ্ধি দাও, কি করিব?

কাইল্যার মা : দেখ দুর্গা, আমার কথা শোন। তুই বরিশাল যা। বাবুর সঙ্গে দেখা কর যেয়ে। তোকে দেখলে সে বাড়িতে আসবে।

গান

হোরে শোন শোন কাইল্যার মা বুড়ি
শোন আমার দুঃখের কথারে
হোরে বার বৎসর ধইরা যে প্রাণনাথ,
ওযে ছাইড়া গেছে মোরেরে
পতি আর না ভাল দেখিরে
হোরে আয় না ভাল দেশেরে
দুঃখ বলব কারে বুড়ি শুনিয়া লরে,
আমার দুঃখের কথা বুড়ি শুনিয়া লরে।

কাইল্যার মা : না হয় একটা চিঠি দে।

দুর্গা : দেখ বুড়ি, আমার বিয়ে হয়েছে পর ঘর থেকে নেমে বাড়ির বাইরে যাই নাই, কেমন কবিয়া আমি চিঠি লিখিব বল?

অধিকারী : ওরে হস্তের আঙ্গুল কাইটারে দুর্গা
ওগো দুর্গা কলম তৈয়ার করে রে
আহারে অকি আয় হায় রে
ওরে শাড়ির অঞ্চল কাইটারে দুর্গায় কাগজ
তৈয়ার করে রে
আহারে অকি আয় হায় রে
হোরে মাথার কেশও পুড়িয়ারে দুর্গায় কালি

www.pathagar.com

তৈয়ার করে রে
অকি আয় হায় রে।
চোখের জলও দিয়া দুর্গা সেইও কালি পাতে রে
আহারে অকি আয় হায় রে।
ওযে দণ্ডের মধ্যে আবা রে প্রাণনাথ
কেবল দেখা দিয়া যাবা রে।
আমি একলা ঘরে রইতে পারি না রে।
আবা দণ্ডের মধ্যে যাবা দেখা দিয়া রে

(চৌকিদারের প্রবেশ)

দুর্গা : দেখ চৌকিদার, তুমি কি বরিশাল যাইবা?
চৌকিদার : হ্যাঁ, আমি বরিশাল যাইব। কেন জিজ্ঞাসা করলেন?
দুর্গা : বাবুর কাছে আমার এইপত্র খানা নিয়ে যেতে হবে, পারবে?
চৌকিদার : আচ্ছা! আপনার পত্র আমার কাছে দিন, আমি বাবুর কাছে নিয়া দেব।
দুর্গা : এই নাও পত্র। পত্রের উত্তর নিয়া আসিও।
চৌকিদার : আচ্ছা। আমি বাবুর নিকট হইতে উত্তর নিয়া আসব। (প্রস্থান)
দুর্গা : চল কাইল্যার মা বুড়ি, একটু পুকুর পার হইতে বেড়াইয়া আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(আসমান সিংয়ের প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গেই চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার : দেখেন বাবু! আপনার একখানা পত্র আছে।
আসমান : কোথায় পত্র?
চৌকিদার : আপনার বাড়ির দুর্গামণি ঠাকরুন দিয়েছে।
আসমান : দেখ চৌকিদার! তুমি একটি কাজ কর, তুমি চকবাজারে যেয়ে অপেক্ষা কর। আমি তোমার নিকট পত্রের উত্তর দিয়া দেব। আর একটা শাড়িও দিয়া দেব। তুমি দুর্গাকে বলবে, বাবু সাতদিন পরে বাড়ি আসবে। যাও আমি আসতেছি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী : দেখেন বাবু! আপনি অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেন?
আসমান : শোন লক্ষ্মী, অদ্য রাত্রে আমি একটি কুস্বপ্ন দেখিয়াছি। তাতেই আমার মন খুব ব্যস্ত।
লক্ষ্মী : বাবু! আপনি আমার কাছে বলিয়াছেন যে, এ জগতে আমার কেউ নেই। আপনি এখন কি স্বপ্ন দেখলেন, তা বলতে হবে। আমার কাছে মিথ্যা বলতে পারবেন না।

www.pathagar.com

আসমান : লক্ষ্মী! আমি ঠিক কথাই বলিয়াছি, আমার দেশে কিছু নেই। তবে একটা কথা- আমার দেশে কিছু না থাকলেও কত বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের উপরই কুস্বপ্ন দেখিয়াছি। তাতেই আমার মন খুব খারাপ।

লক্ষ্মী : আপনি যত কথাই বলেন, আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না। আপনাকে না দেখলে আমি রইতে পারব না। বাবু! আপনার পায়ে পরি, আমাকে ফেলিয়া যাবেন না বাবু।

আসমান : আচ্ছা, যাব না, হইলে তো?

লক্ষ্মী : না বাবু! আপনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলেন যে, আপনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।

আসমান : আচ্ছা তোমার মাথায় হায় দিয়া বললাম, তোমাকে ছাড়িয়া যাব না। তুমি এখন বাসায় যাও। আমি একটু ঘুরিয়া আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

অধিকারী : হোরে, চকবাজারে যাইয়ারে বাবু
বাবু শাড়ি একখানি কেনে রে!
আজি মনেরই হাউসে।
হোরে, শাড়ি একখান কিনিয়ারে বাবু
দিল চৌকিদারের হাতে রে;
আজি মনেরই হাউসে।
হোরে চিঠি একখান দিয়া রে
চৌকিদারকে বলে রে
সাতদিন পরে আসব রে
বইল রামদুর্গার কাছে রে
আজি মনেরই হাউসে।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার : ও দুর্গামণি ঠাকরুণ- ও দুর্গামণি ঠাকরুন, বাড়ি আছেন? আপনার চিঠির উত্তর নিন।

(দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা : চৌকিদার, বাবু কেমন আছেন? তার সংগে তোমার দেখা হইছে তো?

চৌকিদার : হ্যাঁ, দেখা হইছে। বাবু ভাল আছেন। তিনি পত্র দিয়েছেন।

দুর্গা : হায়রে কপাল আমার পত্র দিয়া কি করিব আমার কপালে বাইট্টা দিব?

চৌকিদার : ঠাকরুণ দুঃখ করেন কেন? বাবু হাজার টাকা দিয়া একখানা বানারাসী শাড়িও কিনিয়া দিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, সাতদিন পর তিনি আসিবেন। আপনি চিন্তা করিবেন না। আমি চললাম।

www.pathagar.com

(চৌকিদারের প্রস্থান)

(কাইল্যার মা বুড়ির প্রবেশ)

কাইল্যার মা : ও রামদুর্গা তোর হাতে ওখানা কিরে?

রামদুর্গা : বাবু একখানা পত্র পাঠাইয়াছেন, আর একখানা শাড়ি পাঠাইয়াছেন।

কাইল্যার মা : কত টাকা দিয়া পাঠাইয়াছেন বলতে পার?

দুর্গা : হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া পাঠাইয়াছেন।

কাইল্যার মা : বাবু আর কি বলিয়াছেন?

দুর্গা : তিনি সাতদিন পর বাড়ি আসবেন।

(গান)

আইসরে বন্ধু এইনা বর্ষা রাইতে
অভাগীর বাসরে রে,
প্রাণনাথ আইসরে
ও বন্ধু আনাইয়া রাখব আমি
চিকুন্দিরও খিরা, ফতুল্লার চিরা
প্রাণনাথ আইসরে।

কাইল্যার মা : দেখ রামদুর্গা! আমার মনে হয়, বাবু ফাঁকি দিয়াছে, সে বাড়িতে আসবে না।

দুর্গা : আমার কথা যদি তার মনে থাকে, তবে নিশ্চয়ই বাড়ি আসবেন।

কাইল্যার মা : তার চেয়ে তুই একটা কাজ কর, তুই নিজেই বরিশাল যা। বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

দুর্গা : শোন বুড়ি! আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ দেখি নাই। কেমন কইররা বরিশাল যাইব বল?

কাইল্যার মা : তুই কি হাটি যাইবি? তোকে নৌকার মাঝি নিয়া যাইবে।

দুর্গা : ও বুড়ি, তুমি কেমন কথা বলছ? আমি ভিন পুরুষের সাথে একেলা কেমনে যাইব বলো?

কাইল্যার মা : তা হইলে আর কেমন কইররা যাইবা।

দুর্গা : তুমি যদি আমার সাথে যাও, তা হইলে আমি যাইতে পারি।

কাইল্যার মা : দুর্গা, তুমি একথা আর বলিও না। আমি নৌকা ভাড়া করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার সাথে যাইতে পারিব না।

দুর্গা : দেখ কাইল্যার মা ওসব কথা বলিও না। আমার সঙ্গে তোমার যেতেই হবে।

কাইল্যার মা : দুর্গা। আমি তোমার বাড়ি পাহরা দিব। তুমি তোমার সাজন গাজন করিয়া লও, নৌকা আমি ঠিক করিয়া আসিয়াছি।

www.pathagar.com

অধিকারী : দুর্গা সাজেবে, কালমেঘ যেন সাজে
অষ্ট অলঙ্কারি বন্যায় সাজে পতির দুঃখেরে
কালমের যেন সাজে
গায়ে দিল পাতামল, কন্যার মাজায় বিছা হার
নাকেতে তুলিয়া দিল কন্যার সোনারই নাক ফুল ওরে
কালমেঘ যেন সাজে
কানে দিল টক ফুল কন্যা, গলায় চন্দ্রহার
ওরে নাকের নিচে শোভা পাইল আংটি অলংকার রে
কালামেঘ যেন সাজে
ওরে সাজিয়া পড়িয়া দুর্গা বামে বান্দে খোঁপা
খোঁপার উপর তুইলা দিল গন্ধরাজ ফুল চাঁপারে
কালমেঘ যেন সাজেরে।
সাজিয়া পড়িয়া দুর্গার মুখে দিল পান।
ঘরের থেকে বাইর হয় কন্যা পূর্ণিমার চান রে
কালমেঘ যেন সাজেরে
ব্যাসন-বসন পড়িয়া কন্যা অমনি হইল খাড়া
ঘরে গোনে বাইর হয় কন্যা। আসমানেরই তারারে
কালমেঘ যেন সাজেরে।

দুর্গা : ও কাইল্যার মা, চল এখন নৌকায়। তুমি না গেলে আমি যাব না।

কাইল্যার মা : তবে চল।

তৃতীয় ব্যক্তি : ও দাদা অধিকারী, কাইল্যার মা বুড়ি বরিশাল যাওনের লাইগ্যা হালায় কেমন কইরা তেলাই করছিল হেইডা একটু হুনাও দেহি।

অধিকারী : এতক্ষণ হুনলা হেইডায় আর অইল না? ঠেকাইলা একটা দায়। হালার শ্মশান ঘাটের বুড়ি, হ্যারে আবার কেমন কইরা তেলাই কইরমু। আইচ্চা, ঐ তোরা হুনিচ, না হইলে আবার কইচ কইলাম। (সুর ধরল) আঃ হা-আঃ-হা-হইতাছেন না, বাদ দিয়া যাওগা।

তৃতীয় : হে অইলে আর তোমার দাদা বাবুরা আর তোমার দুলা ভাইরা ছাইরব না। কিল- গোস্বামী আর কেনু মোল্লা দিয়া পিট চেপটা। কইরা দিব। আসমান সিং গাইয়া যাইতে হইব না। নাক যহন ছিদা করছ, আংটি দিতেই হইব, বুঝলা?

অধিকারী : বিধি ঠেকলাম বুঝি দায় ওরে
বিধি মরলাম বুঝি প্রাণে রে বিধি
ঐ যে বুড়ির তেলাইর লাইগ্যারে
আজি মনেরও হাউসে

www.pathagar.com

হোরে ভ্যারণ তৈলও দিয়া বুড়ি চুল গাছন পাইর
করে রে
হোরে দুফ তিল্লা ব্যাত নিয়ারে বুড়ি, বুড়ির কইশ্যা
খোঁপারে
ওযে কইশ্যা বান্দে খোপারে
আজি মনেরও হাউসে।

কাইল্যার মা : দেখ দুর্গা। তুই বুঝি, আমারে মাইররাই ফালাবিরে! যদি একবার বরিশাল সানের উপর একটা গাছার দিতে পারস, তা হইলেই শেষ।

(গান)

অধিকারী : আগে চলে দুর্গামণি, পাছে কাইল্যার মা বুড়ি
যায়নতো নদীরও কিনারে
আজই মনেরই কথা!
মনের মধ্যে কত কথা, প্রাণেতে আছে ব্যথা
পাবে স্বামীর দেখারে
আজই মনেরই কথা।
ভাবে দুর্গা মনে মনে কইবা কথা পতির সনে
বহুদিনের পরেরে
আইজ মনেরই কথা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাধু মাঝি ও সাধু মাঝির নৌকাসহ প্রবেশ)
(কাইল্যার মা বুড়ি ও রামদুর্গার প্রবেশ)

কাইল্যার মা : ও রাধু- রাধু মাঝি, নৌকাটা একটু কূলে ভিড়াইয়া দে। ও দুর্গা, নৌকায় ওঠ-।

(এবার নৌকা চলল)

দুর্গা : ওরে বাবা। এযে, জালিয়া নৌকা।

কাইল্যার মা : অন্য নৌকা পাই নাই, কি করা যায়? ও রাধু মাঝি-
ও নাও বাইয়া যাওরে-যাওরে
গঙ্গা ভবাণী মায়ের বরে।
রামদুর্গা চলছে কেবল পতির অন্বেষণে রে
গঙ্গা ভবাণী মায়ের বরে
ঐ পূবে গোনে আইল বাতাস ধাইয়া ধাইয়া রে
হোরে গাঙ্গের পানি তাইয়া দ্যাইখ্যা উথাল পাথাল করে রে
গঙ্গা ভবাণী মায়ের বরে

রাধু : ও বুড়ি, নাও ভাটার খালে রাখলাম। এখন তোমরা শহরে যাও।

www.pathagar.com

দুর্গা : মাঝি, তুমি পাকশাক কর! আমরা আসিতেছি। (উভয়ের প্রস্থান)
রাধু : ও সাধু ভাই, চল আমরা খাল আগায় যাই। (নৌকাসহ প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(সাহেব ও মেমের প্রবেশ। বসল)
(গান গাইয়া দুর্গার প্রবেশ সঙ্গে কাইল্যার মা বুড়ি)

দুর্গা : ও মা, দুয়ার খোলেন
কথা যে বলেন।
বলেন অভাগিনীর লগে রে
বড় দুঃখেতে পড়িয়ারে
সাহেব : দেখ মেম হামার বাড়ততে ডাকাত আসিয়াছে
দুর্গা : (গান) চোরও নয় গো মা। ডাকাতও নয়,
দুর্গামণি নামটি মোর রে
এসেছি পতিরও খোঁজ
অভাগিনী চির দুঃখিনী,
পতিরও খোঁজে এসেছি আমি
ভাসি নয়নেরই জলে
এসেছি পতিরও খোঁজে।
মেম : দেখ সাহেব, আমাদের পুত্রবধূর মতো কথা বলতেছে মনে হয়,

আমাদের পুত্রবধূ আসিয়াছে।
সাহেব : তবে কপাট খুলিয়া দাও। (দুর্গার প্রবেশ)
মেম : তুমি কী জন্য এসেছ মা?
দুর্গা : আমি আমার পতির অন্বেষণে এসেছি মা!
সাহেব : আচ্ছা! মাই-ডটার, আমার কন্যা, তুমি আমার ঘরে চল, আমি আসমান সিংকে খবর দিয়া জানাইতেছি। সিপাই! (প্রহরীর প্রবেশ)
প্রহরী : হুকুম করুন সাহেব।
সাহেব : তুমি বাজার হইতে আসমান সিংকে নিয়ে এস। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(আসমানের প্রবেশ। পিছনে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : তোমার নাম কী?
আসমান : আমার নাম আসমান সিং।
প্রহরী : বেল সাহেব তোমাকে ডেকেছে।
আসমান : আমি পরে যাব। এখন যেতে পারব না, তুমি যাও।

www.pathagar.com

প্রহরী : তুমি না গেলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাব। এক্ষুণি যেতে হবে।
আসমান : এত সাহস। তবে এস। দেখি কেমন করে ধরে নিয়ে যাও।

(উভয়ের যুদ্ধ)

দ্বিতীয় সেপাই : (প্রবেশ) ওরে বর্বর। তোর নাম কি আসমান সিং-
আসমান : হ্যাঁ, আমারই নাম আসমান সিং।
দ্বিতীয় সেপাই : তুই নাকি বেল সাহেবের সেপাইকে অপমান করে তাড়াইয়া দিয়াছিস? আজি নাহি তোর নিস্তার।
আসমান : জানিও নেশ্চয়, জমের হাতে পড়িয়াছে এখন। নিশ্চয় আমার হাতে তোর হইবে মরণ। ধর অস্ত্র-
দ্বিতীয় সেপাই : কাপুরুষ। আজি নিশ্চয় হইবে মরণ তব। সহ্য করা আমার আঘাত।
(আঘাত করলে আসমানের হাতের অস্ত্র পড়িয়া গেল। আসমানকে নিয়ে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

আসমান : (প্রবেশ) সাহেব! আমি অপরাধী! আমায় ক্ষমা করুন।
সাহেব : হামি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। তুমি হামার সিপাইদের অপমান করেছ।
আসমান : আমি আসব বলছিলাম, ওরা আমাকে জোর করে ধরে আনতে চাইছিল, তাই আমি অপমান করেছি। আমায় ক্ষমা করুন।
সাহেব : তবে যাও, মেমের কাছে, সে তোমাকে ক্ষমা করবে। (প্রস্থান)

(মেমের প্রবেশ)

মেম : কে ওখানে?
আসমান : আমি আসমান সিং, মা।
মেম : তুমি এখানে এসেছ কেন?
আসমান : আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।
মেম : আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তুমি রামদুর্গার কাছে যাও, সে তোমাকে ক্ষমা করবে। (প্রস্থান)
আসমান : রামদুর্গা! কোথায় সে? দুর্গা, রাম দুর্গা!

(দুর্গার প্রবেশ)
(এবার দুর্গা পায়ে প্রণাম করল)

আসমান : দুর্গা! তুমি একা কেমন করে বরিশাল এলে?
দুর্গা : আমি মাঝি নিয়ে এসেছি প্রাণনাথ!

www.pathagar.com

আসমান : আমার অন্বেষণে তুমি ভিন পুরুষ নিয়ে এসেছ? না না, তোমার ঐ কলংক মুখ আমি দেখতে চাই না, তুমি যাও।

দুর্গা : প্রাণনাথ! আমার সঙ্গে কাইল্যার মা বুড়িকে নিয়া এসেছি। কেন আমার প্রতি রাগ করতেছেন? চিন্তা করিয়া দেখুন, বার বৎসর আপনি আমাকে দেখা দেন না। আমি কি করব বলিয়া দেন।

আসমান : তুমি বাড়ি যাও, আমি পরে আসব।

দুর্গা : আজ আর আমি একা বাড়ি যাব না। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়া যাব। আপনি চলুন প্রাণনাথ, কেন আমাকে দুঃখ দেন?

আসমান : আমাকে বিরক্ত করিও না, তুমি যাও, আমি পরে আসব। আমার অনেক কাজ আছে।

দুর্গা : প্রাণনাথ, আপনি কি এই দাসীর প্রতি রাগ করেছেন? আপনি কি মায়া-মমতা ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি মেয়েমানুষ, কেমন করে একা থাকব?

আসমান : আমি মায়া-মমতা ভুলি নাই, কেন তুমি এসব বলছ?

দুর্গা : আপনি চাকরী ছাড়িয়া দিন। আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচব না- আমি কাপড় চাই না, গয়না চাই না, কিছুই চাই না। শুধু আপনাকে চাই। আমি ভাত চাই না, মাছ চাই না, ফ্যান খেয়ে থাকব প্রাণনাথ। আর আমাকে কাঁদাবেন না, বাড়ি চলুন।

আসমান : তুমি অবুঝ, সেইজন্য এইরূপ করতেছ?

দুর্গা : না, না, আমি কিচ্ছু বুঝব না, কিচ্ছু শুনব না, তুমি আমার স্বামী। তুমি যদি না যাও, কি হবে সিঁথির সিদুর দিয়ে? আর কিইবা হবে হাতের সোনা দিয়ে?

আসমান : বললাম তো, সাতদিন পরে বাড়ি যাব।

দুর্গা : প্রাণনাথ! আমি আপনার হাউসের স্ত্রী, ধর্ম স্বাক্ষী করে বিবাহ করেছেন। আমি বার বৎসর আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি, আর কত কাঁদাবেন নাথ, বাড়ি চলুন-।

আসমান : বাড়ি গেলেই তো হবে না। খাবে কী?

দুর্গা : সে কথা তো বলেছি, ভিক্ষা করে খাব। না খেয়ে থাকব-বাড়ি চলুন। নয়ত; আমি বিষ খেয়ে মরব। (আসমানকে ধরল)

আসমান : (ধাক্কা দিয়া ফেলাইয়া দিয়া রওয়ানা করল) এত যে বলি, কথা বুঝি কানে যায় না?

দুর্গা : (উঠিয়া ধুতির খোট ধরল) না, না গো তুমি যাইও না, তোমার পায়ে পড়ি প্রাণনাথ।

আসমান : (টান নিয়া ধুতি ছাড়াইয়া প্রস্থান)
(অগত্যা সকলের প্রস্থান)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রামদুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা : প্রাণনাথ সাতদিনের কথা বলল, অথচ আজ ছয় মাস। তিনি তো বাড়িতে আসলেন না। হায় হায়, এখন আমি কী করি? কোথায় যাই?

(কাইল্যার মার প্রবেশ)

কাইল্যার মা : ও দুর্গা, আরে ও রামদুর্গা। বাড়ি আছ?

দুর্গা : বাড়ি না থেকে আর যাব কোন চুলায়?

কাইল্যার মা : বলি, বাবু কি বাড়ি আসল?

দুর্গা : না, সে বাড়ি আসে নাই। সে আসবেও না।

কাইল্যার মা : ওমা! (কপালে হাত দিয়া) সাতদিনে বাড়ি আসবে আর আজ ছয়মাস।

দুর্গা : কাইল্যার মা, তুমি একটা সৎ উপায় করিয়া দাও, নইলে আমি আর বাঁচব না।

কাইল্যার মা : শোন দুর্গা। আমার একটা কথা যদি লও, তবে বলতে পারি।

দুর্গা : কি বলবে কাইল্যার মা বল।

গান

শোন দুর্গা মনেরই কথা
এউককা উপপতি রাখিবা
পরাণের সুখ মিটাইবা
মনেরই হাউসে।
রসলীলা করিবা।
কিবা ক্ষতি হবে তাতে
যদি কেহ নাহি জানেরে
মনেরই হাউসে।

দুর্গা : ও কাইল্যার মা! হাবোল-তাবোল কথা এখানে বলিও না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হয়ে যাও।

গান

ওরে হাতের কাছে তলোয়াররে থাকলে
বুড়ি তোরে কাটতাম একই কোপেরে
তোরে দিতাম যমের ঘরেরে
আজি মনের দুঃখে।
বুড়ি কইলি কিরে,
লজ্জায় বাঁচিনারে

www.pathagar.com

লজ্জায় মইরে যাইওরে
আজি মনের দুঃখে ।

(পাঠ) বুড়ি, মনে-মনে তুই ভাবছ কিরে? দূর হ আমার বাড়ি হইতে ।

কাইল্যার মা : তবে আমি চললাম, (কতদূরে গেলে)

দুর্গা : ও কাইল্যার মা যেও না, কথা শোন ।

কাইল্যার মা : আরে আমাকে তো তাড়াইয়া দিলে, আবার ডাকতেছ ক্যান?

দুর্গা : কি যেন বলছিলে?

কাইল্যার মা : বলছিলাম একটা নাগরের কথা, একটা উপপতির কথা ।

দুর্গা : তাহলে তাকে এখনই নিয়ে এস ।

কাইল্যার মা : ওরে আমার পরমেশ্বর । নাগর আনা কি মুখের কথা? এখনই পাব কোথায়? যোগাড় করতে হবে তো ।

দুর্গা : তাহালে নাগর আনতে কি লাগবে?

কাইল্যার মা : নাগর আনতে! কত টাকা, কত কিছু দরকার ।

দুর্গা : নেও বুড়ি, এই দশ টাকা । আর এই নেও চাবি, তুমি সেজে-পরে তবে যাও ।

গান

অধিকারী :

চাবিটা নি দিয়ারে
বাকসডারে খুইল্লারে
ও বুড়ি কাজল দিল গালে
মনেরই হাউসে ।
পাউডার মাথায় দিয়ারে,
লাল রং দিল দাঁড়িতে
ও বুড়ি সিন্দুর দিল নাকে
মনের হাউসে ।

কাইল্যার মা : (চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া কাজল দিল গালে পাউডার দিল মাথায়, লিপষ্টিক দিল দাঁড়িতে, সিঁদুর দিল নাকে) । দেখতো দুর্গা আমাকে কেমন দেখায়?

দুর্গা : ও বুড়ি তুমি ও কি করছ? ঐ রকম সাজে? তুমি আমার কাছে এস ।

গান

চিলা পাইড়ের ধুতি একখানা পরাইয়া
লাঠিতে ত্যাল দিয়ারে

www.pathagar.com

দুইডা তাও মাইরবারে
বুড়ির সাজন করিলরে।
ওরে কোমরে দিল রূপার গোট
রাঙ্গা করল দুইও ঠোঁটের
এবার বুড়ির সাজন হইলরে
বুড়ির সাজন করিলরে।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

(গীতি কণ্ঠে খোদা নেওয়াজের প্রবেশ))

খোদা নেওয়াজ : (গান)
আইলাম নম্বরী শিকারী আমি পক্ষী মারিতে
পশু মারি, পংখী মারি, বাইচ্ছা মারি টিয়া রে।
কে মোরে পাকাইয়া দেবে, মুই করি নাই বিয়া রে
সরকেল মারি, ঘু ঘু মারি, আরও মারি ডাউক,
পংখী মাইরা করব কি ভাই ঘরে নাই মোর মাউক!
(খোদা নেওয়াজ ধনুকে তির সংযোজন করেছে অমনি
মাটির কলস কাংখে ও গামছা কাঁধে দুর্গার দিঘিতে
প্রবেশ। কলস ভরে রেখে দুর্গা স্নান করতেছে। নেপথ্যে
খোদা নেওয়াজ তির ছুড়ল, কলস ছেঁদা হয়ে জল পরতে লাগল।

দুর্গা : কে-কে আমার কলসি ভাংলরে? ও, তুমি–

(গান)
ওরে মাইট্টা কলসি ভাংছরে চোরা
মোরে পিতলার কলসি দেবারে
আইজ মনেরই কথা
ওরে পিতলার কলসি ভাংলেরে চোরা
রূপার কলসি দেবারে
আইজ মনেরই কথা
ওরে রূপার কলসি ভাংলেরে চোরা
সোনার কলসি দেবারে
আইজ মনেরই কথা

দুর্গা : হায়রে! মানুষ কত সুখে-কত আনন্দে পৃথিবীতে বাস করে, আর আমার পোড়া কপাল! আমার মনে কত দুঃখ। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কাইল্যার মার প্রবেশ)

কাইল্যার মা : (টাকা গুনতেছে) এক দুই তিন চাইর সাত নয় দশ ওরে বাবারে। দুর্গা দেহি দশ টাহা আরও দিছে দুই টাহা)।

(খোদা নেওয়াজের প্রবেশ)

খোদা নেওয়াজ : বুড়ি- বুড়ি, বাড়ি আছ। (প্রবেশ)

(বুড়ি তাড়াতাড়ি টাকা-পয়সা সরাল)

কাইল্যার মা : কেরে? কে ডাকাডাকি করিতেছ? ও মা। তালুকদার সাহেব। তা তুমি কি মনে করে, শিকার করতে এসেছো বুঝি?

খোদা নেওয়াজ : হ্যাঁগো, হ্যাঁ, একটু বসার ব্যবস্থা করে দাও তো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কাইল্যার মা : আচ্ছা, বস তালুকদার।

(তালুকদার বসল)

খোদা নেওয়াজ : আচ্ছা বুড়ি তোমাকে একটা কথা বলতাম।

কাইল্যার মা : কি কথা? বল।

খোদা নেওয়াজ : তুমি আমার কাছে সত্য বলবা?

কাইল্যার মা : সত্য কথাই বলব।

খোদা নেওয়াজ : ঐ যে দিঘির ঘাটে একটা মেয়েলোক দেখলাম, তুমি বলতে পার, ও কে?

কাইল্যার মা : ও, এই কথা? ওতো আসমান সিংয়ের স্ত্রী রামদুর্গা।

খোদা নেওয়াজ : ওর স্বামী কি বাড়িতে?

কাইল্যার মা : হারে আমার কপাল! আইজ বার বৎসর সে বাড়ি আসে না। সে লক্ষ্মী বেশ্যার বাড়ি। হায়রে হায়। পুরুষ মানুষ এমন হয় গো।

খোদা নেওয়াজ : তাহলে তো বৌটার খুব দুঃখ। কি বল নানি।

কাইল্যার মা : শোন তালুকদার। এখন নাগর খোঁজ করে।

খোদা নেওয়াজ : নানি, দোহাই, দোহাই তোমার পায়ে পড়ি।

কাইল্যার মা : ও রকম করছেন কেন?

খোদা নেওয়াজ : রামদুর্গার হাতের পান খাওয়াইয়া দাও না। তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেব। পারবি ও নানি।

কাইল্যার মা : পারব না, এমন কাজ আমার কাছে কি আছে? ধান ক্ষেতের আগুন ছোন খ্যাতে আর ছোন খ্যাতের আগুন ধান খ্যাতে নিতে পারি। আইচার চর দিয়া ডুবদিয়া কাউয়ার চর ভাড়াইতে পারি। তুমি চল আমার সাথে।

(এবার বুড়ি আগে আগে, নেওয়াজ পিছে পিছে)

www.pathagar.com

অধিকারী : বাঁশি বাজাইয়া নেওয়াজ যায়, যায়, দুর্গার বাড়িরের বাঁশি বাজায় খোদা নেওয়াজ আর বাজাইবে কে? সরলা বাঁশেরও বাঁশি কাইনচা বাঁশের আগা ওরে বাও নেই, বাতাস নেই।
বাঁশি বলে দুর্গা, দুর্গারে।

কাইল্যার মা : ও দুর্গা-দুর্গা। (দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা : আমাকে ডাকাডাকি কর কেন বুড়ি? ও মা। ইনি কে বুড়ি?

কাইল্যার মা : ইনি ঝালকাঠীর তালুকদার সাহেব। ইনি তোমার এখানে একটু পান-তামুক খাইতে আসিয়াছেন, আমি এখন যাই।

খোদা নেওয়াজ : দুর্গামনি। সেই ভোরে বাড়ির থেকে এসেছি, এখন রাত্র দশটা, আমাকে কিছু খেতে দাও তো!

দুর্গা : আপনি আমার হাতের পাক খাইবেন?

খোদা নেওয়াজ : কেন খাব না? আমি তো খাইতেই চাইলাম। আবার কি রকম খাব না?

দুর্গা : এখন রাত্র দশটা। এত রাত্রে তো পাক হবে না। আপনি যদি আদেশ করেন, তবে যাহা পাক করা আছে তাহা আনিতে পারি।
(তারামনির প্রবেশ)

তারামনি : মা, মা! এই লোক কে, মা।

দুর্গা : এনাকে চেন না? ইনি তোমার মামা হয়েন।

তারামনি : মামা হয়? কৈ, একে তো আর দেখি নাই।

দুর্গা : ইনি হরিদ্বারে থাকতেন, কাশীতে থাকতেন, তাই তুমি দেখ নাই।

তারামনি : মা! এনার মুখে দাঁড়ি কেন? আমার মনে হয়, ইনি মুসলমান।

দুর্গা : ওরে, হরির নামে রাখছেরে দাঁড়ি
তারা তাতে দোষও নাই ওরে
তারা তাতে দোষও নাই ওরে।
তোমার মামা হয়, তুমি জিজ্ঞেস কর, রাখছে
হরির নামে
তাতে দোষ নাইরে।

দুর্গা : যাও তো মা। তোমার মামার জন্য খাবার নিয়ে এস।

তারামনি : তা, মামা কি বাসী ভাত খাবে?

দুর্গা : তা খাবে নাতো কি করবে? এত রাত্রে আর কি করা যায়।
(তারামনির প্রস্থান)

খোদা নেওয়াজ : দুর্গামনি এদিকে একটু এস তো। তুমি দূরে দূরে থাক কেন?

দুর্গা : আপনি অত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি সময় হইলে আপনার কাছেই আসব। কিন্তু!

খোদা নেওয়াজ : কিন্তু কি দুর্গামণি?

www.pathagar.com

দুর্গা : আপনিও যদি বাবুর মতো আমাকে ত্যাগ করেন, আমি কোথায় যাইব?

খোদা নেওয়াজ : আমরা বাবুদের মতো নেমকহারাম না। আমাদের কথার ঠিক আছে।

দুর্গা : আমি বোকা নারী। যদি আপনি আমাকে নদীতে নামাইয়া সরিয়া পড়েন, সেটা আপনার দয়া।

খোদা নেওয়াজ : আমি বিবাহ করি নাই, আমার আর কেহ নাই। দরকার হইলে তালুক বিক্রয় করে তোমাকে নিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইব।

(তারামনি খাবারসহ প্রবেশ)

তারামনি : এই তোমার খাবার, মামা!

দুর্গা : তারামনি, তুমি যেয়ে এখন ঘুমাও। তোমার মামার খাওয়া হইলে আমি আসব। (তারামনির প্রস্থান)

দুর্গা : আসুন তালুকদার সাহেব। গরিবের ঘরের খাবার একি আপনার ভাল লাগেব?

(খোদা নেওয়াজ খাইতে বসল। শুধু দুর্গার মুখের পানে চাহিয়া খাইতে লাগল, মাঝে মাঝে খাবার মুখে না দিয়ে নাকে দিতে লাগল। আবার শুধু ডাইল খেতে লাগল, আবার শুধু ভাতই আলুনি খেতে লাগল।)

দুর্গা : আপনি ওরকম করেন কেন? ভাল করে খাবার খান, আপনার কোন ভয় নাই। আমার জীবন দিয়াও আপনার মান রাখব। যদি আমার তারামনি না থাকতো, আপনাকে নিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইতাম। দূরে চৌকিদার হাঁক দিল।

খবরদারীরে-হুঁশিয়ার রে।

আশ্রাপ চৌকিদার : খবরদারীরে-হুঁশিয়াররে।

দুর্গা : হায় হায়! চৌকিদার আসতেছে, আপনি একটু খাটের নিচে বসেন। আমার সন্দেহ হয়, আপনাকে আসার সময় চৌকিদার দেখেছে।

(নেওয়াজ তাড়াতাড়ি চেয়ারের নিচে ঢুকল)

(আশ্রাফ চৌকিদারের প্রবেশ)

আশ্রাফ চৌকিদার : ও দুর্গা ঠাকরুণ। আপনার এখানে কে আসিয়াছে?

দুর্গা : কেউ আসে নাই।

আশ্রাফ চৌকিদার : নিশ্চয় আসিয়াছে। আমি যে দেখলাম কে যেন ঢুকল?

দুর্গা : কেউ ঢোকে নাই।

আশ্রাফ চৌকিদার : নিশ্চয় ঢুকছে, এই যে এখন মাত্র খাবার খেয়েছে, বেশ, আমি খুঁজিয়া দেখি।

(খুঁজিয়া ঠ্যাং ধরে টাইন্না বাইর করল)

www.pathagar.com

আশ্রাফ চৌকিদার : কি ঠাকরুণ। এখন সতীত্ব কৈ গেল?

দুর্গা : চৌকিদার, তুমি এ কথা কারো কাছে বলিও না। আমার জাতি মাইররো না। তোমাকে পাঁচটা টাকা দিতেছি।

আশ্রাফ চৌকিদার : পাঁচ টাকায় হবে না, বিশ টাকা লাগবে।

খোদা নেওয়াজ : তোমাকে এই ষাইট টাকা দামের আংটিটা দিলাম। তুমি দুর্গার টাকা ফিরাইয়া দাও। আবার যখন আসব তখন ঝালকাঠি হইতে তোমার জন্য ধুতি, চাদর, জুতা, ছাতি ও লাঠি সব নিয়া আসব। তুমি সব সময় আমার সাহায্য করিও।

আশ্রাফ চৌকিদার : তা করব, তা করব। এই নিন ঠাকরুণ, আপনার টাকা নিন! তালুকদার সাহেব, আমি বাঁচিয়া থাকতে আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

খোদা নেওয়াজ : সেটা তোমার ধর্ম।

আশ্রাফ চৌকিদার : তা আপনি যেন ঠাকরুণকে ছাড়িয়া যাইবেন না। এদের দেখা-শুনা করবে, এমন কেহ নাই। আমি এবার চলি। (প্রস্থান)

দুর্গা : অত দামের আংটিটা দিয়া দিলেন?

খোদা নেওয়াজ : ওকে হাতে রাখা ভাল। চিন্তা কি সখী, আমার হাতে আরও তিনটা আংটি আছে, এখন আমরা শয়ন করি যেয়ে। (প্রস্থান)

কমিক,

সরলা : (পিছা হাতে প্রবেশ। ঘর ঝাট দিতে দিতে বলছে) না, আজ বাড়ি আসলে হয়? ঝেঁটিয়ে তবে বিদায় করব। ইস্ মিন্‌সের আক্কিলটা একবার দেখ, বাড়ি থেকে গেছে সাতদিন, রেখে গেছে আঁধাসের চাল, আমি খাই কি বলত? মুঁখ পোড়া ড্যাকরা মিনসে খেতে-পরতে দিতে পারবিনে, তোর বিয়ের কি দরকার ছিল? (এবার খুব জোরে সপাত সপাত করে ঝাড়ু দিতে লাগল ওর স্বামী সিধু ঠাকুর দূর হইতে ডাকতে ডাকতে শুরু করে দিল।)

সিধু : ও সরলা, সরলা শুনছ ও স-র-লা!

সরলা : বলি, ষাঁড়ের মতো চেঁচা- চেচী করছ কেন?

সিধু : (প্রবেশ) [সঙ্গে বিছানা] বলি, আমি ষাঁড় হতে যাব কেন? আমার সিং আছে?

সরলা : সিং না থাকলে কি হয়, তুমি একটি ডবল ষাঁড়। বাড়ি থেকে গেছ সাতদিন, রেখে গেছ আধাসের চাল!

সিধু : তাও কি কম রেখে গেছি? ওকি! কথা বলছ না কেন?

সরলা : কি বলব? হতচ্ছারা মিনসের সঙ্গে কি বলব?

সিধু : বলি, সব খেয়েছ? ওকি! চুপ করে রইলে যে? বলি, তুমি একা খেয়েছ না অন্য কেউ ছিল?

www.pathagar.com

সরলা : এইরে, মিনসে আবার রঙ্গ করেরে! বলি, একা খাবনা তো দুজন পাব কোথায়? (এবার ঝাঁটা নিয়া ঠাকুরকে মারতে উদ্যত।)

সিধু : আরে দাঁড়াও! তুমি যে আমাকে তেড়ে আসলে, থাক যাকগে, খেয়ে এখন আবার শিষ্যবাড়ি যেতে হবে। তুমি পাক চাপাইয়া দেওগে যাও।

সরলা : মিনসের আক্কিলডা দেখ, বলি, ঘরে চাল নেই, পাক চাপাব কি?

সিধু : এ বেলা ধার-ধোর করে, চালিয়ে নাওগে।

সরলা : ধার করতে কোথাও বাকি রেখেছি?

সিধু : ওরে বাবা-মাগো! গেছি, আমার সংসার চলবে না। আধাসের চাল, তার উপর আবার ধার করেছ? এ যে হাতীর খোরা গো।

সরলা : তাহলে তুমি করতে বল কি? না খেয়ে মরি, কেমন আজই বাবার বাড়ি যাব।

সিধু : মরবেই বা কেন- আর বাবার বাড়িই বা যাবে কেন? আমি তো বাড়িই থাকি না। দুএকটি নাগর ধরলে হয় না।

সরলা : [এবার তেড়ে এল] তবে রে মিনসে ... ...।

সিধু : দাঁড়াও! দাঁড়াও! স-র-লা! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতুম।

সরলা : কটাই তো জিজ্ঞেস করলে, বল কি বলতে চাও।

সিধু : (অনুনয়ের সুরে) বল, সত্যি করে বলবে?

সরলা : তোমার ঘর যখন করতে হবে, তখন না বললেও বলতে হবে।

সিধু : তাহলে দিব্যি কর।

সরলা : (চেঁচিয়ে উঠল) বল, কি দিব্য করতে হবে?

সিধু : (চারিদিক ঘুড়াইয়া ধরিয়া দিব্য করাল) বল, সত্য।

সরলা : সত্য! (শেষের বার রাগিয়া) সত্য-সত্য-সত্য! (বসে পড়ল) হাঁপাইতে লাগল।

সিধু : বাড়ির কাছের নারায়ণ ঠাকুর বিয়ে করেছে মোট তিন বৎসর। এর মধ্যে দুইটি ছেলে হয়েছে। আমাদের বিয়ে হল পাঁচ বছর। একটাও সন্তান হল না। দোষটা কার?

সরলা : দোষটা তোমার।

সিধু : তোমার।

সরলা : তোমার, তোমার, তোমার। মিলনের মুরুদ নেই, এয়েছে রাসলীলা করতে?

সিধু : আমার যদি দোষ হবে, তাহলে আমায় শিষ্যবাড়ি ডাকে কেন? থাক, দরকার নেই, তাঁর চেয়ে তুমিই আমাকে বাবা ডাক।

(এবার সরলা ঝাঁটা পিটা করে বিদায় করল এবং যেতে যেতে বলল)

সিধু : সরলা আমার নাম সিধু ঠাকুর। বাবা ডাকিয়ে তবে ছাড়ব।

www.pathagar.com

(সরলার বাবা জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে প্রবেশ)

সরলার বাবা : ও সরলা, গেছি রে, গেছি মা! আমায় একটু বিছানা দে। আমি আর বাঁচব না। (বিছানা দিল, কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইল।)

সরলা : বলি শোনছ, এদিকে একটু এস, বাবা ভীষণ অসুখ নিয়ে এসেছেন। এ সময় ঝগড়া কর না।

(সিধুর প্রবেশ)

সরলা : শোন, বাবা আমার ভয়ানক অসুখ নিয়ে এসেছে। তুমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস অথবা একজন কবিরাজ।

সিধু : (যেন গাছ থেকে পড়ল) ডাক্তার! ক-বি-রা-জ। তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। আমার যে ছিরি, তাতে আমার কথায় কেউ আসবে না। তার চেয়ে তুমিই যাও, তোমার ঐ কাজল চোখের কটাক্ষ আর হংস দোলানী পাছা দেখলে কেউ টাকা চাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে।

সরলা : এ সময় রাগ রাখ। আমিই যাই। (একটু যেয়ে আবার এসে) দেখ লক্ষীটি, তুমি যেন কোথাও যেও না। বাবার কি চাই না চাই খেয়াল রেখ কিন্তু আমি যাব আর আসব। (প্রস্থান)

সিধু : যে বাজার তাতে আবার ঘরে নেই চাল। শালার শ্বশুর এয়েছে অসুখ নিয়ে, তার আবার ডাক্তার আনতে হবে। মেয়ে তো দিয়েছে একটা বাঁশ। বেটাকে এখনই ভাগাব। ও শ্বশুর মশাই, শোনছেন। ও শ্বশুর মশাই। ও শালার শ্বশুর শুনছ-! না, বেটা এখন ইচ্ছে করে জবাব দিচ্ছে না। বেটাকে দুএকটা থাপ্পড় না দিলে ভাগান যাবে না (তথাকরণ) না বেটা যে একেবারে মিরগীর ভান ধরে আছে। বেটাকে পাতলা পাতলা কিছু শীল শ্রীষুত কেনু মোল্লা দিলেই ভাগবে। (গোটাকতক কেনু দিল। এবার সরলার বাবা বলতে বলতে প্রস্থান)

শ্বশুর : জামাই বাবু পায়ে পড়ি, আমায় মারবেন না।

সিধু : মারবেন না। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাল, মারবেন না! (শ্বশুরকে বিদায় দিয়ে) সরলাকে এবার বাবা ডাকিয়ে তবে ছাড়ব। আমার নাম ছিদেম ঠাকুর। (পরিত্যক্ত বিছানায় চাঁদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শক্ত হয়ে সোজা মড়ার মতো পড়ে রইল। সরলার বলতে বলতে প্রবেশ)

সরলা : না! গোটা গ্রামটা চষে এলুম, কোথাও ডাক্তার পেলুম না। (প্রবেশ) আরে এই দেখ, মিনসে আবার বাবাকে একথা ফেলে কোথায় গেছে। যাই দেখি বাবার কিছু লাগে কিনা? [মাজা সোজা বসে] বাবা! বা-বা! একি, বাবা কথা বলছে না কেন?

www.pathagar.com

[ধার] বাবা! [ধাক্কা দিল, শরীর সব একসঙ্গে নড়ে উঠল] তবে যে বাবা নড়ছে না! ও বাবা- বাবাগো [বলে পেটের উপর চিৎকার দিয়ে পড়ে, বাবা বাবা করে মরণ কান্না শুরু করল। ঠাকুর মাঝে মাঝে মুখে উঁচু করে পিট-পিট করে চায়, আর মৃদু-মৃদু হাসে। এবং জিভ বার করে ভেংচায়, আবার খেতামুড়ি দেয় ২/১ বার করলেই হঠাৎ সরলার নজরে পড়ল। তবেরে মিনসে বলে ঝাড়ু দিয়া পিটাইয়া নাক ধরে, টেনে হাসির কোলাহল মধ্য হতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বাচ্চা মেয়েসহ প্রবেশ)

দুর্গা — হায় আমার কাপল! শেষকালে কপালে আমার এই ছিল? যাক, ও জন্য দুঃখ কি? বার বৎসর আমি অপেক্ষা করিয়াছি– আর কত অপেক্ষা করব? সে যদি অন্য মেয়েলোক নিয়ে থাকতে পারে, তাহা হইলে আমি কেন অন্য পুরুষ নিয়া থাকতে পারব না? তার যদি সাধ হয়, তাহলে আমারও সাধ হবে না কেন? লোকে মন্দ বলে বলুক। তারা তো আমার মতো দুঃখ পায় নাই। বার বৎসরে তবুও আমি দুবার তাকে আনতে গিয়াছি। সে আসে নাই কেন? আমি তার কথা ভুলিয়া যাইব।

(চৌকিদারের প্রবেশ)

আশ্রাফ চৌকিদার : ও দুর্গামনি ঠাকরুণ। তোমার বুঝি মেয়ে হয়েছে?

দুর্গা : হ্যাঁ চৌকিদার। কি করবে? তুমি তো সব জান, সব শোন, চৌকিদার।

ছড়া

নারীর যৌবন তামা-কাসা, জোয়ারেরই জল!
নারী হইয়া ভরা যৌবন রাখব কতকাল॥
কেহ চাবে আড়ে আড়ে, কেহ চাবে রইয়া।
আর কতকাল থাকব আমি পন্থ পানে চাইয়া॥

আশ্রাফ চৌকিদার : তুমি তো ভালই করেছ। তোমার কোন দোষ নাই। কিন্তু আমি তো মেয়ের ডায়রী করব। মেয়ের বাবার নাম কি দেব বল দুর্গামনি?

দুর্গা : কেন? বাবুর নামই দেবে, অন্যের নাম দেবে কেন?

আশ্রাফ চৌকিদার : আচ্ছা, তাই হবে। এখন যাই। (প্রস্থান

(খোদা নেওয়াজের প্রবেশ)

www.pathagar.com

খোদা নেওয়াজ : দুর্গা-দুর্গামনি! এই যে, তুমি এখানে? আর আমি ডেকে ডেকে অস্থির।

দুর্গা : তুমি মেয়ে রাখ, আমি দেখে আসি, অন্য কেহ আসে নাকি? ঐ যেন বাতি দেখতে পাচ্ছি। (প্রস্থান)

খোদা নেওয়াজ : কাইন্দ না কাইন্দ না, শোন মনু আমার কথা। কাইন্দা না খুকুমনি, আমি তোমার জন্য খেলনা নিয়ে আসব। (নবজাতক শিশুকে নিয়ে খোদা নেওয়াজ বাজে রকম খেলা করতে লাগল) (দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা : তালুকদার সাহেব! দিন তো, আমার কাছে দিন। (শিশু প্রদান)

খোদা নেওয়াজ : দুর্গা, বাড়িতে একটু কাজ আছে, এখন আমি যাই, কালকে আবার আসব। (প্রস্থান)

দুর্গা : আমিও যাই, দেখি তারামনি কি করছে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চৌকিদার : তাইতো, একটা বিপদে পড়িয়া না যাই। বাবু বাড়ি হইতে আসিয়াছে আজ তের বৎসর। না-না বাবুকে না বলে ডাইরী করতে পারব না। যাই দেখি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি বলেন। (প্রস্থান)
(আসমান সিংয়ের প্রবেশ)

আসমান : আজ তের বৎসর বাড়ি গেলাম না। না জানি দুর্গার কত কষ্ট হইতেছে। কি করি, লক্ষ্মীকে না বলে একদিন বাড়ি চলিয়া যাইব। (চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার : বাবু! আপনার একটি ভীষণ খবর আছে।

আসমান : বল, কি খবর আছে?

চৌকিদার : আপনার একটি মেয়ে হয়েছে।

আসমান : মেয়ে! তুমি বল কি আশ্রাফ। একি সত্য কথা?

চৌকিদার : হ্যাঁ, সত্য কথা বাবু! আপনি বিশ্বাস করুন। এ খবর আপনাকে আমি বলতাম না, শুধু অসুবিধা হচ্ছে যে, এই মেয়ের ডাইরী করব, কার মেয়ে বলে? এ জন্য আপনাকে এই খবর দিলুম।

আসমান : চৌকিদার, আজ বার-তের বৎসর আমি বাড়ি যাই নাই। আজ কি করে আমার মেয়ে হবে? হায়-হায়! রামদুর্গা অসতী নারী! সে কি নারী? চৌকিদার, আমি আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। দুনিয়া আমার কাছে আন্ধার হইয়া গেছে।

চৌকিদার : বাবু আপনি শান্ত হউন। কেন এ রকম উতলা হইতেছেন। আপনি মনকে শান্ত করুন।

www.pathagar.com

আসমান : আশ্রাফ চৌকিদার, তুমি বাড়ি যাও। আমার মাথা ঠিক নাই, তুমি বাড়ি যাও।

চৌকিদার : তাহা হইলে আমি চললাম বাবু। (প্রস্থান)

আসমান : দুর্গা, দুর্গারে, তুমি কি কাজ করলিরে, ও লক্ষ্মী-লক্ষ্মী। (লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী : আমায় ডাকছেন বাবু।

আসমান : হ্যাঁ, তোমায় ডাকছি। আমি এখন বাড়ি যাব।

লক্ষ্মী : কেন বাড়ি যাবেন বাবু। আমার কাছে বলেন।

আসমান : এতদিন তোমার কাছে বলি নাই, আজ সত্য কথা বলব। রামদুর্গা নামে আমার স্ত্রী ছিল, সে মারা গেছে। বাড়ি হইতে খবর আসিয়াছে, আমি যাই। (প্রস্থান)

লক্ষ্মী : বাবু, বেশি দিন থাকবেন না, জলদি আইসা পড়বেন কিন্তু। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(আসমানের প্রবেশ)

আসমান : মা, মাগো, আপনি একটু কথা শুনুন। (মেয়ের প্রবেশ)

মেম : কি হইয়াছে আসমান।

আসমান : মা! আমি বাড়ি যাব, এই নিন আপনার চাপরাশ।

মেম : তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছে কেন? তোমায় কি হইয়াছে বল তো?

আসমান : আমার কিছু হয় নাই মা। আমি বাড়ি যাব।

মেম : তুমি আমার কাছে বলতেছ না। তুমি না বলিলে তোমাকে আমি যেতে দিব না। বল, কি হইয়াছে।

আসমান : মা! বড়ই লজ্জার কথা। আজ তের বৎসর আমি বাড়ি যাই না। আজ খবর পাইলাম, আমার স্ত্রী রামদুর্গার নাকি একটি মেয়ে হয়েছে।

মেম : এ খবর কে বলেছে?

আসমান : একজন চৌকিদার, সে আমার বাড়ির কাছের লোক।

মেম : ওসব মিথ্যা কথা? তুমি বাড়ি যাইও না।

আসমান : আমার যে বাড়ি যাইতেই হবে মা।

মেম : যদি তোমার সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহলে আমি রামদুর্গারকে এখানে আনাইয়া তোমাদের ভুল বোঝাবুঝি মীমাংসা করিয়া দেব। ওজন্য তোমার মন খারাপ কইরা লাভ নাই।

আসমান : মা! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ছাড়িয়া দিন মা।

www.pathagar.com

মেম : আসমান! আমি নিষেধ করি, তুমি আমার কথা শোন। তুমি বাড়ি যাইও না। তুমি বাড়ি গেলে আজ দুইটা লোকের জীবন যাবে। এমনও তো হইতে পারে? তখন তুমি খুনের দায়ে পড়বা। তুমি যেও না আসমান। আমার কথা রাখ।

আসমান : না মা, আমি যাব। আমায় যেতে দিন। আমি আর দাঁড়াব না, আমি চললুম। (প্রস্থান)

মেম : মাই গড, তুমি আসমানকে দেখ।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

[দুর্গা, তারামনি ও ছোট শিশুটিসহ প্রবেশ]

(সকলে শুইল)

খোদা নেওয়াজ : ও দুর্গা, দুর্গা, কপাট খোল।

দুর্গা : কপাট খোলা আছে তালুকদার সাহেব, আসুন।

(খোদা নেওয়াজের প্রবেশ)

খোদা নেওয়াজ : দুর্গামনি, খুকিকে আমার কাছে দাও।

দুর্গা : এই নিন! (মেয়ে প্রদান)

খোদা নেওয়াজ : মনু ভাল, সুনু ভাল। কাইন্দ না যাদুমণি! কাইন্দ না। না, তুমিই নাও, এ আমার কোলে থাকবে না। (প্রদান)

তারা : মা, মাগো, আমি যেন বাবার গন্ধ পাচ্ছি-মা।

খোদা নেওয়াজ : বাবার গন্ধ। কে তোর বাবা! তোর বাবা তো আমি। তোর আবার বাবা কে?

তারা : তুমি আমার মামা! আমার বাবা আসমান সিং বাবু।

খোদা নেওয়াজ : বটে, আমার খাও, আর আমাকে চেন না। (হাতের ছড়ি দিয়া একটা আঘাত)

দুর্গা : তালুকদার, এটা আপনার অন্যায়। কেন আপনি ওকে মারলেন?

খোদা নেওয়াজ : কি! তুমিও আমার কাজের বিচার কর, আমার খাও আর আমাকে মান না? (ছড়ির আঘাত) (নেপথ্যে আসমান সিং)

আসমান : দুর্গা, দুর্গা! আমি বাড়ি আসছি, তুমি কপাট খোল।

গান

ওরে কপাট খোল, দুয়াররে মেল ও দুর্গা, আমি আইছি বাড়িরে
আইজ মনেরই কথা
ওরে বার বছর ধইরারারে, গেছলাম কেবল চাকরি করিবারে
আইজ মনেরই কথা।

দুর্গা : (গান)

www.pathagar.com

আমার গায়ওরে জ্বর মাথায়রে কামরি
আমি ওঠতে নাইকা পারিরে
আইজ দুঃখেরই কথা।

আসমান : ওসব কথা বলকে না। তুমি সত্বর কপাট খোল।

দুর্গা : দেখুন, সত্যই যদি এসে থাকেন তবে, ঢেকিঘর অথবা গোয়ালঘরে যেয়ে থাকুন। ভোরে যা হয় করা যাবে।

আসমান : দেখ দুর্গা। যা হয় তুমি সত্বর বল? কপাট খোলবা কিনা? আমার ঘর আমি থাকব বাইরে।

দুর্গা : তালুকদার, আপনি পালঙ্কের নিচে যান। না হয়তো উপায় নাই। আর আমি বাতি জ্বালাব না। ভয় নাই।

অধিকারী : ওরে লাথি মেইরে, কপাট রে ভেইঙ্গে
বাবু উঠলো আপন ঘরেরে
আইজ মনেরই কথা
ওরে ভয়ের চোটে, ঘরেরই মধ্যে,
দুর্গা বাতি নাহি জ্বালায় রে
আইজ মনেরই কথা
ওরে আন্ধার ঘরে উইঠারে বাবু
ঐ যে কোপাইতে লাগিল রে
আইজ মনেরই কথা।
ওরে আন্ধার ঘরে উইঠেরে বাবু,
একও কোপও ছাড়েরে
আইজ মনেরই দুঃখে।
ওরে সুতার বালিস-সিমইলে তুলা
দুর্গারে বালিস কাটা যায়ওরে
আইজ মনেরই দুঃখে।
ওরে দুইও কোপও ছাড়েরে বাবু।
ঐ যে দুর্গা মাইয়া পাতিয়া ধরেরে
আইজ মনেরই দুঃখে।
ওরে মাইয়ার নামটি তারাগো মনি
ও দুর্গার মাইয়া কাটা গেলরে
আইজ মনেরই দুঃখে।

তৃতীয় : আচ্ছা, মিয়া ভাই। এখন খোদা নেওয়াজের দশাটা কি রকম হইল, একটু ধর দেখি।

অধিকারী : ওঠে বেড়া বাইয়া, পড়ে ছ্যাড় ছ্যাড়াইয়া।
ওঠে চংগা বাইয়া, পড়ে দুপরাইয়া।
ওরে পাছের ব্যাডা ভাইংগারে শালায়

www.pathagar.com

শালায় পড়ল ঘরের পিছেরে।
শালায় জঙ্গলে যায়, বল্লায় কামড়ায়
শালায় পাট খেতে যায় ডাইয়ায় কামড়ায়
শালায় দৌড় দেয় পাছার খায়
পড়ল রাস্তার কিনারায় রে
আইজ মনেরই কথা।

[রামদুর্গা ও খোদা নেওয়াজের সাথে সাথে ঘরের বাহির হইবে]

অধিকারীর গান–

আসমান সিংয়ের ডাকেরে, খোদা নেওয়াজ কাঁপেরে
ওঠে বেড়া বাইয়া পড়ে ছাড়-ছড়াইয়া
হাঁটু ঠক্ ঠন্ করে ঢোকে খাটের নিচে
হাড়ি ঠন্ ঠন্ করে গায়েতে কালী মাখে।
পিছের বেড়া ভাইঙ্গারে-লাফ্ দিয়া পড়েরে
যায় ব্যাত বোনে- কামরায় বল্লা পোকে
হোরে আইজও দৌড় আর কাইলও দৌড় দেয় ঘরে-
প্রাণেরও ভয়েতে।

আসমান : সব দোষ আমার, কেন আমি লক্ষ্মীর প্রেমে ভুলিয়া বার বছর রইলাম। আর কেনই বা আমার নিজের মাইয়া কাটিলাম। না-না, সব দোষই আমার। যাক, আমি মিথ্যা বলিব না- কিচ্ছুতে না, তাতে যদি আমার ফাঁসি হয়, হবে। তবুও না, আমার অন্যায়ের জন্য আমি অন্যকে দোষী করিব না।

[হঠাৎ চৌকিদার-দফাদার ও দারোগার প্রবেশ]

দারোগা : তোমার কী নাম?
আসমান : আমায় নাম আসমান সিং।
দারোগা : গত রাতে যে খুন হয়েছে, তুমি জান!
আসমান : জানি হুজুর।
দারোগা : তোমার কি হয়?
আসমান : আমার মেয়ে।
দারোগা : তার নাম কি?
আসমান : তারামণি।
দারোগা : কে খুন করিয়াছে বলতে পার?
আসমান : পারি হুজুর! আমি খুন করেছি।
দারোগা : কেন খুন করেছ?
আসমান : এ কথা তো জিজ্ঞাসা না করলেই পারেন।
দারোগা : না-না, তোমার বলিতে হইবে।

www.pathagar.com

আসমান : তবে শুনুন। বারো বছর হয় আমি বাড়ি না। গতকল্য শুনিলাম, আমার একটি মেয়ে হইয়াছে, তাই বাড়ি আসিয়া রাগ হইয়া স্ত্রীকে খুন করিবার জন্য কোপ দিয়াছি। কিন্তু ঘর অন্ধকার থাকায়, মেয়ের গায়ে কোপ পড়িয়া সে মারা গেছে, সব দোষ আমার, অন্য কাহারও দোষ নাই।

দারোগা : চৌকিদার, দফাদার, তোমরা লাশ নিয়া ময়না তদন্তের জন্য নৌকায় বরিশাল যাও। আমি আসামী নিয়া আসতেছি। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান– কোর্ট

প্রথম আদালীর প্রবেশ

পরে– সাহেবের প্রবেশ

সাহেব : বাদীনী বোলাও।

আদালী : বাদীনী রামদুর্গামণি হাজির হ্যাঁয়।
(রামদুর্গার প্রবেশ, ডান পার্শ্বে দাঁড়াইল)

দুর্গা : হাজির।

সাহেব : আসামী বোলাও।

আদালী : আসামী আসমান সিং বাবু হাজির হ্যাঁয়?
(আসমানের প্রবেশ, বাম পার্শ্বে দাঁড়াইল)

সাহেব : আসমান সিং তুমি এখন বল যে, আমি খুন করি নাই।

আসমান : হুজুর, আমি ক্ষত্রীয় বংশ। প্রাণ গেলেও মিথ্যা বলিতে পারিব না।

দুর্গা : হুজুর, উচিত বিচার করবেন। ভগবান আছেন।

আদালী : চুপ কর, সাহেব বিচার করবেন।

সাহেব : তাহলে, এখন বল, কে খুন করেছে।

আসমান : আমি, হুজুর।

সাহেব : আসমান, তোমার কিছু বলবার আছে।

আসমান : আছে। আমার বলবার আছে হুজুর। ঐ দুর্গা একজন উপপতি গ্রহণ করে। সেই সংবাদ পেয়ে বাড়িতে যাই, কিন্তু বাড়ি গেলে দুর্গাকে ডাকলে সে কপাট খুলল না। তখন ঐ ঘরের মধ্যেই ওর উপপতি ছিল। আমি কপাট ভাঙ্গিয়া আমার হাতের দাও দিয়া কোপাইতে থাকি, ইচ্ছে ছিল, দুর্গাকে ও তার উপপতিকে হত্যা করিব। ভগবানের কি ইচ্ছে আমার নিজের মেয়েকে আমি শেষ করেছি হুজুর। এ খুনের জন্য কে দায়ী তার বিচার করুন।

জজ : গভর্নমেন্ট পক্ষের লইয়ার সাহেবের কিছু বলবার আছে?

www.pathagar.com

গভর্ণমেন্ট উকিল : আমার আর কি বলবার থাকতে পারে ইউর অনার। আপনি দেখুন, আসামী যেখানে নিজ হাতে খুন করেছে বলে স্বীকার করছে, সেখানে তিনশত দুই ধারামতে সেই দোষী।

জজ : আসমান সিং এর উক্তিতে বুঝা যায় যে, সে একলা দোষী নয়। দুর্গামণিও দোষী। কারণ দুর্গামণি যদি উপপতি গ্রহণ না করত, তাহলে এই খুন হত না। অতএব, এজন্য দুর্গামণিকেও দায়ী করা হয়েছে।

গভর্ণমেন্ট উকিল : ইউর অনার। আসামীর এ একটা উদ্ভট উক্তি বই আর কিছুই নয়।

প্রথমত, কথা হল যে স্বামী-স্ত্রী সমান সমান অংশীদার সব কিছুতে। আসমান সিংতো একে সমঅধিকার দেয় নাই। বিগত বার বৎসরের মধ্যে সে একটি দিনের জন্যও স্বামী-স্ত্রীর সদ্ব্যবহার করে নাই।

কথা প্রসঙ্গে বলতেছি, আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। এই আসমান সিং লক্ষ্মী বেশ্যাকে রক্ষিতা (অর্থাৎ এ্যাজলাইক এ্যাজকেপট) করে তার কাছে থাকত। দুর্গামনি তাকে বাড়ি নেবার জন্য বরিশাল আসলে তাকে সাতদিন পরে যাবার কথা বলে যায়নি এ কথা সত্য কিনা।

মহামান্য আদালত! পেট যখন আছে, ক্ষুধাও তখন আছে। আসমান সিংতো বেশ্যার সাহায্যে ক্ষুধা নিবৃত করল, দুর্গামণি কোথায় যাবে? হিন্দুর মেয়ে, স্বামীকে তালাক দেবার ক্ষমতাও নাই। ধরি আসামীর কথাই সত্য। আসমান সিংহ যদি উপপত্নী গ্রহণ করতে পারে, তাহলে দুর্গামণির উপপতিতে কি অপরাধ হয়েছে? (যেমন কবি নজরুলের কথা মনে পড়ে যে অসতী মায়ের পুত্র জারজ যদি হয়, অসৎ পিতার পুত্র জারজ সুনিশ্চয়) আমার মতে দুর্গামণি এ খুনের জন্য দায়ী নহে। আসমান সিংই দায়ি।

জজ : আপনার আর কিছু বলবার আছে?

উকিল : ইউর অনার, আমার বক্তব্য শেষ। সবকিছু আদালতের ইচ্ছে।

জজ : আগামীকল্য এই মোকদ্দমার রায় শুনানী হবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(দুর্গা, রাধু মাঝি ও খোদা নেওয়াজের প্রবেশ)

রাধু : দুর্গামণি দিদি, কোর্টের খবর কী?

দুর্গা : আগামীকল্য রায় হবে।

রাধু : রায় কি হইতে পারে দিদিমণি।

www.pathagar.com

দুর্গা : কেমন করিয়া বলিব, কি রায় হইতে পারে?

রাধু : দিদিমণি, খুব সাবধান থাকিবেন, এই সব খবর যদি ব্যারিস্টার দল সিং পায়, তাহা হইলে কিছুই করিতে পারবেন না।

দুর্গা : রাধু মাঝি, এ খবর দল সিং কেমন করিয়া পাইবে? আগামীকাল রায় হইয়া যাইবে। তারপর সে আসিয়া কী করবে?

অধিকারী :

গান

ওরে একবার না যদি খবর রে পায় রে
ওরে দল সিং যদি জানতে রে পারে
ঐ যে আসবে বরিশালে রে।
অকি ভাই ভাই রে।
ওরে পংখী হইয়া উইড়া রে আসবে।
ও যে ভাইয়ের দুঃখে ভাই ভাই যে বইলে
ও যে আসবে ভাল কোটেতে
অকি ভাই ভাই রে
ও যে কলিকাতায় ধর্ম রে তলায়
ওরে বিরাট বাড়ির পাঁচ ওরে তলায়
ও যে আছে বাবু মনেরই সুখে
অকি ভাই ভাই রে।

রাধু : তালুকদার সাহেব। আপনি আমার কথা শোনেন। আমি লোকের মুখে শুনলাম যে, আসামীর সাজা হবে।

খোদা নেওয়াজ : হ্যাঁ তা হবে বলেই মনে হচ্ছে।

রাধু : শুনুন, তালুকদার সাহেব। আপনি যাই বলেন, দল সিং খবর পাইলে সে আসিয়া আমাদের সবাইকে শেষ করবে।

দুর্গা : তাহা হইলে এক কাজ কর রাধু মাঝি।
তুমি আমাদের মামলার পর তোমার নৌকায় করিয়া চাঁদপুর পৌঁছাইয়া দিবা। আমরা চিটাগাং চলিয়া যাইব।

রাধু : বাড়ি-ঘরের কি হইবে ঠাকরুণ।

দুর্গা : আমার যা কিছু থাকবে, সব তোমাকে লিখিয়া দেব, তুমি নিয়া নেও।

খোদা নেওয়াজ : চল, এখন খাওয়া সারিয়া নিই যেয়ে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(জজ সাহেব ও আসমান সিংয়ের প্রবেশ)

অধিকারী : ওরে শেষ বিচারের দিনে,
ঐ যে বিচার করবে সৃষ্টিকর্তা রে

www.pathagar.com

আইজ মানুষের বিচারে
ও যে কর্ম দোষে দোষীরে হইলে
দোষ দিবি তুই কাহারে রে
আইজ মানুষের বিচারে।

জজ সাহেব : আমি অত্র খুনে আসামী আসমান সিংয়ের বিরুদ্ধে উপস্থিত ৩০২ ধারার সম্পূর্ণ দোষে দোষী সাব্যস্ত করে একে ফাঁসীর হুকুম দিলাম।

আসমান : (দাঁড়ান হইতে পড়িয়া গেল)

জজ সাহেব : এই সাতদিনের মধ্যে এ যাহাকে দেখিতে চায়, যাহা খাইতে চায়, সব দেওয়া হইবে। (সিপাই)

(সিপাইর প্রবেশ)

সিপাই : আদেশ করুন হুজুর।

জজ সাহেব : আসামীকে এখন নিয়া হাজত ঘরে খুব সাবধানে রাখিও (প্রস্থান)

আসমান : হায়রে ভাই দল সিং

অধিকারী : ওরে ভাই ভাই বলিয়া রে,
আসমান সিঙ্গো বাবুরে
ঐ যে কাঁদিয়া উঠিল রে
হোরে নিদান কালেতে
ওরে ভাই শত্রু, ভাই মিত্র, ভাই রক্তের রক্তরে
কোথায় রইল দল সিং দাদা এমন বিপদকালে রে
হোরে নিদান কালেতে।
দলসিং আমার দাদা রে
জলদি ছুইটে এসরে
তোমার জোড়ের ভাই যায় ছাইড়ারে
হোরে নিদান কালে
দেখা যদি হইত রে,
মুখে মুখে ও দিয়া রে
ওযে কইতাম মনের কথা রে
হোরে নিদান কালে।

সেপাই : চল, আসমান, তোমার হাজত যেতে হবে।

আসমান : সেপাই, আমার ভাই দল সিংকে একটু খবর দিতে হবে, মৃত্যুকালে একবার তাকে দেখব, তুমি ব্যবস্থা কর।

সেপাই : বহুত আচ্ছা, তোমাকে কাগজ-কলম দিব, তুমি পত্র লিখিয়া দিও, আমি ডাকে দিয়া দিব।

আসমান : তুমি আমাকে কাগজ-কলম দাও, আমি এখনই পত্র লিখিব।

www.pathagar.com

সেপাই : এখনই লিখবে। তবে এই নাও। (কাগজ ও কলম প্রদান)

অধিকারী : কাগজ-কলম লইয়া রে,
চোখের জলে ভাসে রে
ভাবে, কি লিখিব পত্রেরে
নিদান কালে।
প্রাণের ভাই মোর দাদা রে,
কি লিখিব পত্রেতে
ওকে কপাল পুইড়া গেছে রে
নিদান কালে
মাত্র সাতদিন বাকি রে
আসমান সিংয়ের ফাঁসি রে–
ওযে মাইয়া খুনের দায়ও রে
নিদান কালে
দণ্ডের মধ্যে আবা রে
একবার তোমায় দেখব রে
ও ভাই দল সিং আমার দাদা রে।
নিদান কালে
পত্রখানা লেইখ্যা রে।
শিরোনামা দিয়া রে,
দিল সেপাই বেটার হাতে রে
নিদান কালে

সেপাই : চল আসমান! তোমাকে হাজত ঘরে রাইখ্যা তোমার চিঠি ডাকে দিয়া আসব। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(দল সিংয়ের প্রবেশ। সঙ্গে চাকরের প্রবেশ)

অধিকারী : কলিকাতার বাড়ি রে
দল সিং বাবু থাকে রে–
ঐ যে চাকরি করে রে–
ওরে মনেরই সুখে।
অফিস থেইক্কা আইসা রে–
চাকর ডাইক্ক কয়ও রে
ওরে তামাক ভইররা আন রে
ওরে মনেরই সুখে।
এমন সময় আসে রে,
ডাকে পিয়ন বাবু রে–

www.pathagar.com

বলে দল সিং বাবু কে ওরে
ওরে মনেরই সুখে।

পিয়ন : দেখেন বাবু, আপনার একখানা পত্র আছে।

দল সিং : কোথায় পত্র দেখি–॥

(পিয়ন পত্র প্রদান ও বিদায়)

দল সিং : (পত্র পড়িয়া) হায়–হায়–হায়রে ভাই আসমান সিং! আমি এক্ষুণি রওয়ানা হব।

অধিকারী : ওরে ভাই-ভাই বলিয়া রে
কান্দিরা উঠিল রে–
ও বিধি আর কি দেখিব তোরে
কলিকাতা হইতে রে–
খুলনাতে আইসারে–
ঐ যে জাহাজে চড়িল রে,
অকি আয় হায় রে–
হায়রে বিধি হইল না বাদী–
দেখাইল আমার ভাইরে
আর কি দেখিব তোরে রে–
(প্রস্থান)

শেষ দৃশ্য

[রামদুর্গা, রাধু মাঝি ও খোদা নেওয়াজের প্রবেশ]

দুর্গা : দেখ মাঝি, আমরা যেয়ে ঐ গাছটার নিচে বসি, বাবুর ফাঁসি শেষ হইলেই আমরা চাঁদপুরের পথে রওয়ানা হইব।

রাধু : দরকার নাই ঠাকরুণ! জজ যখন আদেশ দিয়াছেন, তখন এর ফাঁসি হইবেই। তবে দলসিং পত্র পাইয়া এখন আসিয়া পড়বে।

খোদা নেওয়াজ : তা হইলে তো সর্বনাশ হইবে মাঝি! আমাদের হাতের কাছে পাইলে একেবারে হত্যা করিবে। রাধু মাঝি ঠিকই বলছে, ফাঁসি তো হবেই আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা আমাদের পথে রওয়ানা করি।

দুর্গা : তাহলে চল, আমরা রওয়ানা হই।

(সকলের প্রস্থান)

(আসমানের কালো একটা টুপি গলা পর্যন্ত মাথায় দিয়া সিপাই দড়ি হাতে প্রবেশ করল। সাথে এক জল্লাদ)

আসমান : সেপাই! আজ সাতদিন, আমার ভাইকে নিশ্চিয়ই তোমরা পত্র দেওনি, তাহা হইলে সে আসিত। হায়, প্রাণের ভাই দলসিং।

www.pathagar.com

জীবনের শেষকালে তোমাকে দেখলাম না ভাই! আমার দেখা পাবা না– তোমার আদরের আসমান চলল।

সিপাই : জল্লাদ! ভোর পাঁচটা বাজে, এখন আর দেরি করা চলে না।

জল্লাদ : আসমান। আমাদের দোষ নাই, জজের হুকুম তামিল করতে হবেই।

(দড়িটা কপিকলের ভিতর ফিট করা শেষ প্রান্তে সরা-গিড়া দেওয়া থাকবে, অপর প্রান্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে। তবে দড়িটা এত বড় হইবে যে, আসমান যেন গলায় দিয়া শুইয়া পড়লেও দড়িতে অভাব না হয়। এবার আসমানের গলায় দিল, সেপাই বলল, এক, দুই, তিন। আসমান বসে পড়ে শুইয়া পড়ল। জল্লাদ এবার দড়িটার মাথা কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দলসিং কোথায় ভাই আসমানসিং কোথায় আমার ভাই। (প্রবেশ)

সিপাই : কে আপনি? কী চান? কেন আপনি এখানে এসেছেন? কে আপনাকে পারমিশন দিল যে এখানে ঢুকলেন?

দলসিং : আমি জজের পারমিশন নিয়ে এসেছি, এই হুকুমনামা আমার কাছে আছে। আসমান সিংয়ের জন্য আমি ইংল্যান্ডের কাউন্সিলে বিচার চাইব। অদ্য আসমানের ফাঁসি বন্ধ থাকবে এই আদেশ। (নোটিশ প্রদান)

সিপাই : এ নোটিশ গতকাল পিয়ন মারফত জেলার সাহেবকে দেন নাই কেন?

দলসিং : আমি অন্য লোক বিশ্বাস করিনি। ভাবলাম, নিজ হাতে আদেশ নিয়া যাইব। তাইতো আসিয়াছি। রাত্রে আসার অনুমতি পাই নাই, আর কাউকে দিয়া পাঠাইতেও পারি নাই।

সিপাই : জল্লাদ! এখন কী করা যায়?

দলসিং : কেন, কি হইয়াছে? আসমান কোথায়? কোথায় গেলে তাকে পাইব? আসমানের সঙ্গে যে আমার দেখা করতে হবে?

সিপাই : এখন কটা বাজে?

দলসিং : সাড়ে পাঁচটা।

সিপাই : পাঁচটায় তার ফাঁসি হয়েছে। ঐযে, আসমান সিংগের লাশ– (জল্লাদ ও সিপাইর প্রস্থান)

দলসিং : হায় ভাই। এত কষ্ট করিয়াও তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না। হায়রে অদৃষ্ট (কপালে কষাঘাত করিয়া আসমানের দেহের উপর পড়ল।) চল ভাই। তোমাকে শ্মশানে রাখিয়া আমি সবাইকে খুন করব, (আসমানের লাশসহ প্রস্থান)

(যনবিনকা পতন)

www.pathagar.com

গুনাই বিবি

চরিত্র

পুরুষ

লাল মিয়া — সাল গ্রামের জমিদার

তোতা মিয়া — ঐ পুত্র

দলু মিয়া

জমিদারের ভ্রাতা

রহমান খাঁ — ঐ দোস্ত

রফিক কাজি — গুনাইর বড় ভাই

খালেক — ঐ ছোট ভ্রাতা

রতন, কালু, ভুলু, মাস্টার, ছাত্রগণ, বছির, দারোগা, সিআই ডি, উকিল, জজ, কৃষকগণ, হিরু ঘটক।

স্ত্রী

হালিমা — দলু মিয়ার স্ত্রী

গুনাই — রফিক কাজির বোন

মর্জিনা — ঐ সখি

এখানে তিন নং গুনাই বিবির পাঠ সংকলন করা হলো। পাঠের ভিন্নতা নির্দেশের জন্য দুই নং 'গুনাই বিবি' থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেয়া গেল। ভবিষ্যৎ গবেষকগণ এ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র বাড়াতে পারেন।

গুনাই বিবি ও তোতা মিয়া

প্রথক অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

জমিদার লালমিয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত। পাশে দলু ও হালিমা।

লালমিয়া : আমি আর বাঁচবনা ভাই। আমার মৃত্যু কাল উপস্থিত, আমার দম আটকে আসছে, বড় কষ্ট আমি যে আর নিশ্বাস ফেলতে পারছিনা।

দলু : এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেলুন ভাই জান, আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

লাল : আমায় আর তোমরা মিছে আশ্বাস দিও না। আমি শেষ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলুম, আমার নৌকায় চড়ে চলেছেন, আমাকে হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন, বললেন, এতদিন পর এলি। যাদু আমার, মানিক আমার। আমার বুকের ধন বুকে আয়। আমি যে তোর আশায় পথ চেয়ে আছি বাপ। আমি যেন সেই নৌকায় চড়ে কোন অজানা দেশে চলেছি। মা আমায় নিতে এসেছে, আমি আজ আমার মায়ের কাছে চলেছি।

দলু : ভাই জান স্বপ্ন মনের বিকার। বায়ু রোগে লোকে স্বপ্ন দেখে।

লাল : শেষ রাত্রে স্বপ্ন কখন নিস্ফল হয় না। আমি আজ তোমাদের ছেড়ে চলেছি। আমার এই বিশাল জমিদারী তোমাকে উইল করে দিয়ে গেলাম। নয় লক্ষ টাকা দিয়ে এই জমিদারী আমি কিনেছিলাম। আমার নাবালক পুত্র তোতার ভার তোমাদের হাতে দিলাম। তাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও। সৎ বংশীয় পাত্রী দেখে বিয়ে দিও, এই তিন শর্ত পালন করবে তো ভাই।

দলু : ভাইজান তোমার শর্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব।

বাল : আর ভাতৃ বধূ হালিমা, ছোট বেলা তোমাদের মা মরে গেছে, তুমিই তোতাকে মায়ের মতো প্রতিপালন করেছ। আমার নাবালক পুত্র তোতার ভার তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম।

হালিমা : তোতার মা মরে যাওয়ার পর আমি তোতাকে প্রতি পালন করেছি। আল্লাহ দেখবেন, আমার নিজের কোন সন্তান নাই। আমি তোতাকে নিজের সন্তানের মতই দেখব।

লাল : একবার তোতাকে ডাক ভাই। আমি জন্মের মতো তাকে দেখে যাই।

দলু : তোতা! তোতা! এদিকে এস। ভাইজান যেন কেমন করছে।

২. গুনাই বিবি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মৃত্যু শয্যায় শায়িত লাল মিয়া নিদ্রিত)

লাল : (নিদ্রা হইতে উঠিয়া) নিশিথে নিদ্রাবশে শুয়েছিলাম পালঙ্ক মাজার, কে যেন আমায় আকাশের দ্বার খোলে ডেকে বলল, লাল! তুমি শীঘ্রই স্বর্গধামে চলে এস। এই অবোধ বালক তোতা, এই নয় লক্ষ টাকার জমিদারী কার হস্তে অর্পণ করে যাই। এখন ভেবেচিন্তে দেখলাম, আমার ভাই দলুর হস্তে অর্পণ করে যাব। কোথায় আবদুল হামিদ।

(আবদুল হামিদের প্রবেশ)

আ হামিদ : কী জন্য আমায় ডেকেছেনে বড় মিয়া সাহেব।

লাল : আমার ভাই দলু মিয়া ও তোতাকে নিয়ে এস।

আ. হামিদ : আপনার আদেশ শিরোধার্য। (হামিদের প্রস্থান)

www.pathagar.com

বরিশালের অন্যতম নাট্য সংগঠন শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার পরিবেশিত
গুনাই বিবি নাটকের একটি দৃশ্য

(তোতা ও দলুর প্রবেশ)

দলু : দাদা আমায় কী জন্য ডেকেছেন?

লাল : ভাই নিশিথে নিদ্রাবেশে শুয়েছিলাম পালঙ্ক মাজার, কে যেন আমাকে আকাশের দ্বারা খুলে ডেকে বলল, লাল, তুমি শীঘ্র স্বর্গধামে চলে এস।

www.pathagar.com

এই অবোধ বালক তোতা, এই নয় লক্ষ টাকার জমিদারী কার হস্তে অর্পণ করে যাই? এখন ভেবেচিন্তে দেখলাম আমার ভাই দলু হস্তে অর্পণ করে যাই।

আচ্ছা, ভাই দলু তোমাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা দিয়ে যাই পালন করবে তো।

দলু : কি বললেন দাদা। আপনার কথা পালন করব না? আর কার কথা পালন করব।

লাল : আচ্ছা ভাই তিনটি প্রতিজ্ঞা দিয়ে যাই। প্রথম প্রতিজ্ঞা হল তোতাকে উত্তম বিদ্যা শিক্ষা দিবা, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হল তোতাকে উচ্চ বংশের বন্যার পানি গ্রহণ করাবে। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা হল, তোতা যখন সাবালক হবে তখন এই নয় লক্ষ টাকার জমিদারি ফিরাইয়া দিবা, দিবে তো ভাই দলু।

দলু : বলছেন কি দাদা! নিশ্চয়ই দিব!

লাল : তোতা কাঁদছ কেন?

তোতা : পিতা আমি কাঁদছি না, শুধু ভাবছি শিশুকালে মাতৃহারা। আজি হতে হালাম পিতৃহারা। আমি কার কাছে দাঁড়াবো কেবা আশ্রয় দিবে আমাকে, কেবা লালন পালন করবে আমাকে।

(বিবেকের প্রবেশ)

আসবে শমন করবে বন্ধন,
লালের তোতা যায় চলে
তোতাকে ছেড়ে গেলে
দুষ্টের হাতে সপে গেলে
তোমার মৃত্যু হলে
পরে তোতা যে পড়বে ফেরে।

(বিবেকের প্রস্থান)

লাল : দলু আমি আর স্থির থাকতে পারছি না, আমার শেষ অনুরোধ তুমি অবহেলা কর না, এস তোতা আমার কাছে এস। ভাই দলু তোতাকে তোমার হাতে সপে গেলাম আমি যাই (মৃত্যু)।

(তোতার গান)

শিশুকালে মাতৃহারা
অজ হলেম পিতৃহারা
জানি না আমি সংসার কেমন,
জানি না আমি রাজ্য শাসন।

www.pathagar.com

দলু : তোতা! আয় বাপ আমার কোলে আয়। সকলকেই একদিন দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এখন চল তোতার বাবার সৎকারের বন্দোবস্ত করি গিয়ে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাস্টার : আজ সাত দিন হল শালগ্রামে এই নতুন স্কুল খুলেছি। এই কয়েক দিনের মধ্যে মাত্র একটি ছাত্র ভর্তি হইয়াছে- দেখি আজ ছাত্র আসে কি না?

(তোতাকে লইয়া দলুর প্রবেশ)

দলু : আদাব মাস্টার সাহেব।

মাস্টার : বসুন, ছোট মিয়া সাহেব, আপনার কি জন্য আগমন?

দলু : আপনার স্কুলে একটি ছাত্র ভর্তি করতে নিয়ে এসেছি।

মাস্টার : ছাত্র আপনার কি হয়?

দলু : আমার ভ্রাতুস্পুত্র।

মাস্টার : ওর নাম রেখেছেন কি?

দলু : তোতা মিয়া।

মাস্টার : অগ্রে বিদ্যা লাভ করেছে কি?

দলু : সামান্য বিদ্যা লাভ করেছে উত্তম বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিয়ে এসেছি।

মাস্টার : আচ্ছা মাসিক বেতন ও ভর্তির ফিস এনেছেন।

দলু : মাসিক বেতন ও ভর্তি ফিস কত?

মাস্টার : মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা ভর্তি ফিস ১৫,০০ টাকা।

দলু : তাহলে একটা কাজ বড় ভুল করে এসেছি।

মাস্টার : বলেন কি? আপনি হলেন শালগ্রামের জমিদার মোতি মিয়ার ছেলে মো. দলুদ্দিন মিয়া- মাসিক বেতন ও ভর্তির ফিস সঙ্গে করে আনেন নাই- জানেন ত আজ কাল দুধ মাছের কত অভাব!

দলু : জানি বই কি! বাড়িতে গিয়ে চাকর দ্বারা টাকাটা পাঠাইয়া দিলে চলবে তো।

মাস্টার : বাড়িতে যাইয়া টাকটা পাঠাইয়া দিবেন তো সত্যি।

দলু : নিশ্চয়ই বাড়িতে যাইয়া টাকাটা পাঠাইয়া দিব। তবে এখন যাই? যাবার সময় দুটি কথা বলে যাই। এই বালকের মাংসগুলো আপনার, আর হাড়গুলো আমার।

মাস্টার : তা আর বলতে হবে না।

(দলু মিয়ার প্রস্থান)

www.pathagar.com

(গুনাইকে লইয়া রফিক মিয়ার প্রবেশ)

রফিক : আদাব মাস্টার সাহেব।
মাস্টার : কি জন্য রফিক মিয়ার আগমন?
রফিক : আপনার স্কুলে একটি বালিকা ভর্তি করতে নিয়ে এসেছি।
মাস্টার : বালিকাটি আপনার কি হয়?
রফিক : আমার বোন
মাস্টার : ওর নাম রেখেছেন কি?
রফিক : গুনাই।
মাস্টার : অগ্রে কোন বিদ্যালাভ করেছে?
রফিক : সামান্য বিদ্যালাভ করেছে। উত্তম বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিয়ে এসেছি।
মাস্টার : ভর্তির ফিস ও মাসিক বেতন এনেছেন কি?
রফিক : ভর্তির ফিস ও মাসিক বেতন কত?
মাস্টার : ভর্তির ফিস ১০,০০০ টাকা, মাসিক বেতন ১৫.০০ টাকা
রফিক : তাহলে একটি কাজ বড় ভুল করে এসেছি।
মাস্টার : কি কাজ ভুল করে এসেছেন?
রফিক : মাসিক বেতন ও ভর্তির ফিস সংগে করে আনতে পারি নাই।
মাস্টার : বলেন কি? আপনি হলেন হোসেন গাজীর ছেলে রফিক মিয়া আপনি যদি এই কথা বলেন যে মাসিক বেতন ও ভর্তির ফিস সঙ্গে আনি নাই- জানেন তো আজকাল দুধ মাছের কত অভাব।
রফিক : জানি বই কি! বাড়ি গিয়া চাকার দ্বারা টাকাটা পাঠাইয়া দিলে চলবে তো-
মাস্টার : বাড়ি গিয়া চাকর দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন তো?
রফিক : নিশ্চয় দেব, তবে এখন যাই!
মাস্টার : আসুন তা হলে। (রফিকের প্রস্থান)
মাস্টার : তুমি রফিক সাহেবের বোন।
গুনাই : জী হাঁ।
মাস্টার : আজকে যে আলাচাঁদের আসতে বড় বিলম্ব হয়ে গেল আলাচাঁদ এখন পর্যন্ত আসছে না কেন। আজকে যদি আলাচাঁদ স্কুলে না আসে তাহলে আলাচাঁদকে খুব শক্ত চারটে কথা শুনিয়ে দেব।

(আলাচাঁদের প্রবেশ)

আলাচাঁদ : আদাব মাস্টার সাহেব আদাব।
মাস্টার : কিরে বেটা আলাচাঁদ তোর দেরি হল কেন?
আলাচাঁদ : মাস্টার মহাশয় তবে শুনেন আমার মায় বলছে কি আলাচাঁদ তোর গায়ে বড় জ্বর এসেছে। এই কথা শুনে আমি করলুম কি একটা

www.pathagar.com

ভিজা লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পরলুম। কতক্ষণ শুয়েছি পর আমি থাকতে পারলুম না। অমনেই আমি স্কুলে ছুটে এসেছি।

মাস্টার : এসব বাজে কথা বাদ দে, তোর বইটা দে দেখি আমার হাতে।

আলাচাঁদ : এই নেন মাস্টার সাহেব।

(মাস্টার বইটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দুই তিন পৃষ্ঠা দেখবে পরে বলবে)

মাস্টার : কিরে বেটা আলাচাঁদ তোর বইয়ে যে একটাও অক্ষর নেই, বই হতে অক্ষর গেল কোথায়?

আলাচাঁদ : তবে শুনেন, আমি স্কুল থেকে বাড়ি যাবার সময় করে ছিলাম কি নদীর পানিতে নামছিলাম বইটা আমার কাছেই ছিল। এমন সময় দেখি কি একটি দাঁড়কাক এসে বইয়ের লেখাগুলো ঠুকরাইয়া খাইয়াছে। আমি নদী হইতে উঠিতে না উঠিতেই কাকটি পালিয়ে গেল।

মাস্টার : ঐ ব্যাটা আলাচাঁদ কাক আবার কোনদিন লেখা খায় নাকি।

আলাচাঁদ : সেইদিন তো দেখলাম খেতে।

মাস্টার : আচ্ছা যাক। আলাচাঁদ, বানান করত-কানাই চৌকিদার।

আলাচাঁদ : কাকে কয় কা, গাছে আছে নাই, ঘরে আছে চৌকি নদীতে আছে নার মধ্যে দার- কানাই চৌকিদার।

মাস্টার : বেশ বেশ! আলাচাঁদ, তোর কোন অক্ষরের প্রয়োজন পড়ে না।

আলাচাঁদ : মোটেও না মাস্টার সাহেব মোটেও না।

মাস্টার : আচ্ছা বানান করতো মধু টানি।

আলাচাঁদ : মায়ে দিছে এক বোতল মধু আমি বইসা টানি তাতে হলো মধুটানি।

মাস্টার : যাক, আচ্ছা বানান করতো গুনাই।

আলাচাঁদ : কালকে মামাবাড়ি গিয়াছিলুম। যাবার সময় দেখি কত গুলিগু আসার দেখি নাই- গুনাই।

মাস্টার : বেশ তোরে আলাচাঁদ, তোর কোন অক্ষরেরই দরকার পরে না।

আলাচাঁদ : না মাস্টার সাহেব মোটেও না?

মাস্টার : আচ্ছা আলাচাঁদ, একটা কথা শোন, আজকে দুজন নতুন ছাত্র-ছাত্রী এসেছে দেখে বল তুই চিনিস কিনা। (আলাচাঁদ তোতাকে উঁকি ঝুকি দিয়ে দেখবে তার পর বলবে)

আলাচাঁদ : মাস্টার মহাশয়, ও তো সেদিন আমার সাথে গরু চড়িয়েছিল!

মাস্টার : তুই বলছিস কি আলাচাঁদ, জমিদারের ছেলে আবার কোনদিন গরু চড়ায় নাকি?

আলাচাঁদ : সত্যি মাস্টার সাহেব, আমার কথা বিশ্বাস করুন।

মাস্টার : দেখতো এই মেয়েটাকে চিনিস কিনা।

(আলাচাঁদ উঁকি-ঝুকি দিয়ে বলবে)

www.pathagar.com

আলাচাঁদ : মাস্টার সাহেব ও তো সেদিন আমার সাথে গোবর কুড়িয়াছে।

মাস্টার : তুই পাগলের মতো একি বলছিস? জমিদারের মেয়ে কোনদিন গোবর কুড়ায় নাকি।

আলাচাঁদ : সত্যি মাস্টার সাহেব।

মাস্টার : আলাচাঁদ, বিশেষ কাজে আমার যে এখন বাড়ি যেতে হবে, এই ছাত্র দিগকে খুব ভাল করে পড়াতে পারবিতো।

আলাচাঁদ : খুব পারব মাস্টার সাহেব খুব পারব।

মাস্টার : স্কুলের মধ্যে যেন গোলমাল না হয়।

(মাস্টারের প্রস্থান)

আলাচাঁদ : না স্যার, কোন গোলমাল হবে না।

(একটু আস্তে আস্তে আলাচাঁদ বলবে কিছু গোলমাল হতে পারে– এই সময়ে আলাচাঁদ তামাস দেখাবে কতক্ষণ পরে মাস্টার এসে বলবে)

মাস্টার : কিরে ব্যাটা আলাচাঁদ একি হচ্ছে।

আলাচাঁদ : না স্যার, একটু চেয়ারে বসে দেখলাম কেমন লাগে।

(মাস্টারের প্রস্থান)

আলাচাঁদ : আচ্ছা বলত তোতা, একটি গাছে দশটি ডাল। প্রত্যেকটি ডালে দশটি করে ফল হলে কতকগুলো ফল হলো?

তোতা : আমি পারব না।

আলাচাঁদ : কেন পারবে না?

আলাচাঁদ : আচ্ছা বলত গুনাই তুমি বলত?

গুনাই : একশটি ফল হলো।

আলাচাঁদ : এর বাবা যেমন জমিদার সেইরূপ জমিদারের মেয়েই বটে। (আলাচাঁদ তোতাকে একটি বেত্রাঘাত করে বলবে) যাও তোতা, তোমার আর স্কুলে লেখাপড়া হবে না। তুমি কেবল আস মেয়ে ছেলের মুখ দেখতে। তুমি এখানে থেকে বের হয়ে যাও।

তোতা : সামান্য একটি অংকে পরাজিত হয়েছি সেজন্য আলোচাঁদ আমাকে বেত্রাঘাত করিল। জেনে রেখ গুনাই যতদিন পর্যন্ত তোমার এই রূপখানি আমি দর্শন করতে না পারব ততদিন আমার প্রাণে শান্তি নেই।

(দ্রুতবেগে তোতার প্রস্থান)

আলাচাঁদ : যাও যাও এখন বাড়ি গিয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটগে!
যাও তোমাদের সকলের ছুটি। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

(রফিক মিয়া বসা, গুনাইর প্রবেশ)

গুনাই : দাদা আমি আর স্কুলে যাব না।

রফিক : কিরে গুনাই মাস্টার তোকে মেরেছে নাকি?

গুনাই : না!

রফিক : তবে স্কুলে যাবে না কেন? (গুনাইর গান)

দাদা আর যাবো না ঐ স্কুলে
ঐ স্কুলে গেলে দাদা,
সম্মান কি বাঁচে ঐ
জমিদার তোতা মিয়া গালি দিল মোরে ঐ
পিতা যদি থাকতো মোরে যেতে দিত নারে ঐ
পড়াইবার ইচ্ছা থাকলে পড়াও আপন ঘরে ঐ
খালেক দাদার শুনতে পেলে যেতে দিত নারে ঐ
হাতে ধরি পায়ে পড়ি দাদা
ক্ষমা কর মোরে ঐ

রফিক : তুই স্কুলে যা, আমি তার বিচার করব।

গুনাই : বিচার করলে কি হবে দাদা। অপমান মুছবেনা। তার চাইতে ঐ স্কুলে না যাওয়াই ভাল।

রফিক : আচ্ছা গুনাই, তোকে আর কান্নাকাটি করতে হবে না। আমি মাস্টার রেখে তোকে পড়াবো।

(খালেকের প্রবেশ)

খালেক : মিয়া ভাই আমি এসেছি! আদাব?

রফিক : বেশ খালেক তুমি এসেছ! এ জগতে যে আমরা কি হয়েছি তা তুমি জান।

খালেক : না, ভাই তা আমি কি করে জানব?

রফিক : এ জগতে আমরা মাতা-পিতা হারা হয়েছি।

খালেক : দাদা তা হলে কি আমার মাতা-পিতার মুখ দর্শন হলো না।

রফিক : আমর পত্র পাওনি তুমি?

খালেক : না ভাই, আপনার একখানা পত্রও পাইনি। থাক ভাই এখন আমার পড়ার সম্বন্ধে কি বলো?

রফিক : ভাই খালেক, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আমরা গরিব হয়ে গেছি।

খালেক : এখনো গুনাই স্কুলে যায়নি?

রফিক : না দাদা, আমাকে বড় দাদা স্কুলে যেতে নিষেধ করেছে।

খালেক : আমার পড়াও বন্ধ হয়ে গেল এবং গুনাইর পড়াও বন্ধ করে দিলেন।

www.pathagar.com

রফিক : গুনাই যে বয়স্কা হয়েছে। ওকে স্কুলে দিতে গেলে আমি যে লজ্জা পাই। (দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : রফিক ও রফিক মিয়া।

রফিক : কি? ও ছোট মিয়া গরিবের বাড়িতে আজ কি জন্যে আগমন?
(দলু মিয়া গুনাইর দিকে আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে তাকাবে কিছু পর গুনাইয়ের প্রস্থান।)

দলু : আমার বড্ড পানির পিপাসা হয়েছে। শিকারে বেড়িয়েছিলাম পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি। তাড়াতাড়ি পানি পিপাসা দূর করুন।

রফিক : ছোট মিয়া আপনি এখানে বসুন আমি এক্ষুণি পানি আনিয়া দিচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, খালেক তুমি শীঘ্র বাড়ি হতে এক গ্লাস পানি এনে দাও।

খালেক : আচ্ছা দাদা এক্ষুনিই আমি পানি এনে দিচ্ছি।
(খালেকের প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে পানি নিয়ে প্রবেশ)

খালেক : এই নেন ছোট মিয়া।

দলু : হ্যাঁ রফিক মিয়া আমি লোকের মুখে শুনতে পেলাম আপনারা নাকি মাতা-পিতা হারা হয়েছেন।

রফিক : হ্যাঁ ছোট মিয়া, আমরা মাতা-পিতা হারা হয়েছিল।

দলু মিয়া : তার জন্য কোন দুঃখ করবেন না। কেউ আজ কেউ কাল এভাবে দুনিয়ার সকলকেই মরতে হবে। আচ্ছা তাদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য কিছু করছেন তো।

রফিক : হ্যাঁ ছোট মিয়া সাধ্যমত করছি।

দলুমিয়া : বেশ উত্তম কাজ করছেন। আসবার সময় এখানে যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল সে মেয়েটা কে?

রফিক : মেয়েটি আমার বোন গুনাই।

দলু মিয়া : সে মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন?

রফিক : লেখাপড়া মাইনার পর্যন্ত শিখেছে। কোরআন শরীফে হাত দিয়েছে।

দলু মিয়া : বেশ উত্তম বিদ্যা শিখিয়েছেন। তাহলে এখন আমি আসি।

(সকলের প্রস্থান)
(দহলিজে দলুমিয়া উপবিষ্ট)

দলুমিয়া : একদিন শিকারে গিয়েছিলাম- কালিগঞ্জের বনে। হুসেন কাজির মেয়ে গুনাইকে দেখে আত্মহারা পাগল হয়েছি। যতই আমি ঐ রূপখানা ভুলতে চেস্টা করি ততই যেন আরো আকর্ষণীয়ভাবে গুনাইর রূপ আমাকে আকড়িয়ে ধরে। কিছুতেই যেন ভুলতে পারছি না-কি করি-এর একটা বিহিত করতেই হবে।

www.pathagar.com

রহমান : কি ব্যাপার বন্ধু। এত বিমর্ষ ভাব কেন?

দলু মিয়া : এস বন্ধু। শিকারে গিয়াছিলাম কালিগঞ্জের বনে। বড্ড জল পিপাসা হয়েছিল। পিপাসা নিবারনার্থে গিয়েছিলাম রফিক কাজির বৈঠকখানায়। তাহার বোন গুনাইকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি!

রহমান : এতে চিন্তার কি আছে? কিছু টাকা হইলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দলু মিয়া : কত টাকা লাগবে বন্ধু।

রহমান : পাঁচশ টাকা মাত্র।

দলু মিয়া : পাঁচশত টাকা কেন বন্ধু? আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। তাতে যদি না হয় দুই হাজার টাকা দেব। তাতেও যদি না হয় তবে আমার এই আঠারো লক্ষ টাকার জমিদারি নয় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেব। তবু আমি চাই সেই গুনাই সুন্দরীকে। রূপে যৌবনে সে ঝলমল করছে তাকে আমার পেতেই হবে বন্ধু।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : এ মতল তুই ছাড়রে অবুঝ, এ মতলব তুই ছাড় ভালো আজো আছিস তুই পরিস না অগ্নিহারে।

এ মতলব তুই ছাড়
দুই বিয়া করলে পরে
শেষে ঠেকবে ভীষণ ঠেকায়
অকুলে তুই কুল পানি না হায়
এ মতলব তুই ছাড়।

দলু মিয়া : দূর ছাই! পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়। গুনাই কে আমার চাই? তার অপরূপ রূপের শিখা আমার ভিতরে কমনার ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাকে না পেলে আমি বাঁচবো না।

রহমান : আপনি টাকার কৃপনতা যদি না করেন তাহলে ইচ্ছা করলে পূর্বের চন্দ্র পশ্চিমে নিয়ে উদয় করাতে পারেন।

দলু মিয়া : এই নেন পাঁচশত টাকা। আমার আর ধৈর্য ধরছেনা। আপনি তাড়াতাড়ি গমন করুন। (উভয়ের প্রস্থান)

(তোতার প্রবেশ)

তোতা : হায়! কি করি কোথায় যাই। পিতার মৃত্যুর সময় আমাকে কাকার হাতে রেখে গেল। কাকাও এখন আমাকে ভালোবাসতে চায় না। আমার নিজ হস্তে পাক করে খেতে হয়। না, না, না, আমার নিজের পাক চলবে না।

তোতা : দাদুন এসেছেন? আসুন বসুন দাদুন সাহেব-

www.pathagar.com

আমার যে মাতা পিতা কেহই নাই তা আপনি জানেন এখন আমার নিজ হাতে পাক করে খেতে হয়।

দাদুন সাহেব : তাহলে একটা বিয়ে কর না।

তোতা : আপনার হাতে কি কোন ভাল পাত্রী আছে?

দাদুন সাহেব : হ্যাঁ আছে বৈকি? এই গ্রামের মধ্যেই আছে।

তোতা : সে কে দাদুন সাহেব?

দাদুন সাহেব : হোসেন কাজির একটি মেয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী। তুমি রাজি হলে আমি এ কাজটুকু করে দিতে পারি।

তোতা : ওই মেয়ে আর আমি যে একই স্কুলে পড়তাম। স্কুলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে মেয়েটিকে এক দিন আমি যে ভাবেই হোক বিয়ে করব।

দাদুন সাহেব : তাহের তোমাদের আগেই ভাব বিলাস হয়েছে যাক ভাই, কেবল প্রতিজ্ঞা করলেই চলবে না। কিছু টাকা লাগবে।

তোতা : কত টাকা লাগবে দাদুন সাহেব।

দাদুন : বিশেষ টাকা নয় কয়েকটা টাকা।

তোতা : এই যে দাদুন সাহেব- কয়েকটা টাকা। গুনাইকে আমার। জাতি শীঘ্র সৎপথে গমন কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

(রফিকের প্রবেশ, পরে রহমান খাঁর প্রবেশ)

রফিক : খান সাহেব কি জন্য গরিবের বাড়িতে আগমন।

রহমান : আমি লোক মুখে শুনতে পেলাম আপনার নাকি একটি বোন আছে?

রফিক : হ্যাঁ আছে খান সাহেব।

রহমান : তাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছেন?

রফিক : মাইনর পাশ করেছে!

রহমান : বেশ তাহলে আপনার বোনের কোন বিয়ের সম্বন্ধ আসলে সম্বন্ধ করবেন নাকি?

রফিক : যদি ভাল ছেলে পাই নিশ্চয়ই সম্বন্ধ করব।

রহমান : আমার হাতে একটি ভাল পাত্র আছে।

রফিক : সে কে, পরিচয় বলেন।

রহমান : মতি মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ দলিল উদ্দিনের জন্য।

রফিক : সে নাকি পূর্বে একবার বিয়ে করেছে?

রহমান : হ্যাঁ সে পূর্বে একটি বিয়ে করেছে।

রফিক : সে শখের বশে আবার একটি বিয়ে করতে চায়।

রহমান : না না, খান সাহেব, আমি সে সতীনের ঘরে আমার বোনকে বিয়ে দেব না।

www.pathagar.com

(খালেকের প্রবেশ)

খালেক : সতীনের ঘরে বিয়ে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

রফিক : না ভাই, তুমি জান না তুমি আমার চাইতে বেশি বুঝনা। সতীনের ঘরে বিয়ে দিলে কোন দিন সুখী হতে পারবে না।

(দাদুনের প্রবেশ)

দাদুন সাহেব : ও কেরে, ও কে? ঐ খানসার পো খান সা ঐ চোরের বাচ্চা চোর সরে পর চেয়ার হতে নেমে বস।

রহমান : সাবধান বোম্বাইয়া হাজি। তোমার পাকা দাড়ি ছিঁড়ে পরনের আগে উড়িয়ে দেব।

রফিক : কে দাদুন সাহেব এসেছেন? আসুন বসুন।

(রফিক দাদুন সাহেবকে ধরে চেয়ারে বসাবে।)

দাদুন সাহেব : আমি লোক মুখে শুনতে পেলাম তোমার নাকি একটি বোন আছে।

রফিক : হ্যাঁ আছে।

দাদুন সাহেব : তার বিয়ে হয়েছে?

রফিক : না এখন পর্যন্ত বিয়ে হয় নাই।

দাদুন সাহেব : আমার হাতে একটা ভাল পাত্র আছে।

রফিক : সে কে? পরিচয় খুলে বলুন।

দাদুন সাহেব : শাল গ্রামের লালমিয়ার ছেলে তোতা মিয়ার জন্য।

রফিক : সে কি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবে?

দাদুন সাহেব : তা না হলে দাদুন সাহেব এসেছে কি জন্যে?

রফিক : সত্যি সত্যিই যদি তোতা মিয়া রাজি হয়, তাহলে আমি খুশি মনে বিয়ে দেব।

খালেক : আমি তোতা মিয়ার সঙ্গে আমার বোনকে বিয়ে দেব না। একদিন আমি সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম একটু পানি খেতে কিন্তু পানি দিলে না।

রফিক : ভাই খালেক, তোতা মিয়া যখন ছোট ছিল তখন তার বুদ্ধি তত প্রখর ছিল না। তুমি তাতে কিছু মনে কর না।

খালেক : আমি একাজে কিছুতেই সম্মত নই।

(রহমান খালেকের গায়ে হাত দিয়ে বলল)

রহমান : বন্ধু খালেক দলুর সহিত বিয়ে দিলে আমি আপনাকে সুন্দর একটি বৌ দেখে বিয়ে দেব।

(রহমানের প্রস্থান)

খালেক : দাদা, আমি এখনও বলছি আমি তোতা মিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে রাজি নই। আমি দলুর সঙ্গেই আমার বোনকে বিয়ে দেব।

রফিক : খালেক! কিছুতেই দলুর সঙ্গে আমার বোনকে বিয়ে দেব না।

www.pathagar.com

খালেক : গুনাই কি আপনারই বোন? না আমারও বোন?
রফিক : না ভাই, তোমারও বোন?
খালেক : তা'হলে কোনক্রমেই তোতা মিয়ার সঙ্গে গুনাইকে বিয়ে দিব না।
রফিক : আমার জীবন গেলেও দলুর সঙ্গে বিয়ে হতে পারবে না কিছুতেই না।
খালেক : তাহলে আমার কথা শুনবেন না? দেখুন খালেক কি করতে পারে! সেদিন দেখা যাবে কে আপনাকে রক্ষা করে।
রফিক : আচ্ছা দাদুন সাহেব তাহলে পাকা আলাপ শেষ করুন। টাকা পয়সা ও গহনা পত্র কি দেবেন।
দাদুন সাহেব : তাতে তোমরা যা চাও তাই দেবে। আগে তোমার বোনকে দেখাও দেখি।
রফিক : আপনি বসুন। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি। (রফিকের প্রস্থান ক্ষণপরে গুনাইকে নিয়ে আবার প্রবেশ। সঙ্গে আয়া)
রফিক : এই আমার বোন, দাদুন সাহেব। গুনে লক্ষ্মী। বিদ্যায় সরস্বতী। চাচাজানকে সালাম কর গুনাই।
(গুনাই সালাম করিল)
দাদুন সাহেব : বেচে থাক, সুখী হও মা।
(আয়া মুখ দেখাল। দাদুন দিন কাল ভুলিয়া নির্নিমেশ নেত্রে চাহিয়া রহিল। চমক ভাঙ্গিল রফিকের কথায়। দাদুন সাহেব গুনাই বিবিকে দেখিয়া দশটি টাকা দিল।)
রফিক : গুনাইকে নিয়ে যাও বছিরের মা। কেমন দেখলেন- দাদুন সাহেব?
দাদুন সাহেব : রফিক মিয়া, তোমার বোনের রূপের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু এত সুন্দর আগে জানতাম না।
রফিক : আপনার পছন্দ হয়েছে শুনে সুখী হলাম।
দাদুন সাহেব : তাহলে তুমি বিয়ের তারিখটা ঠিক করে দাও।
রফিক : পঞ্জিকা দেখে একটা ভাল দিন ঠিক করে নিন? (রফিক দাদুন সাহেবকে একটি পঞ্জিকা দিবে।)
দাদুন সাহেব : মাঘ মাসের ২৫ তারিখ বিয়ে হোক। কি বলো?
রফিক : আমার তাতে কোন অমত নেই।
দাদুন সাহেব : তাহলে উঠি, পাকা কথা কিন্তু হলো।
(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(গুনাই বিবি ও সখীর প্রবেশ)

গুনাই : দেখলো সখী কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে।
সখী : তোমার জীবনেও এমন সুন্দর চাঁদ একবার উঠবে।

www.pathagar.com

গুনাই : দূর ছাই! ফাজলামি করিস না।
সখী : নাই বা করলাম। ঐ দেখ ফুল বাগানের আড়ালে তোতা মিয়া।
(গুনাই চমকিয়া, হাসিয়া উঠিল)
প্রাণ সখীগো তুমি প্রেমে মইজা গেছ।
পিরিতের এমনিগো ধারা
এক প্রেমেতে আর দুদিন রবে না।
ঐ যে বনফুলে বন দোলে
তাতে যেন তোমার মন দোলে,
এতদিন যেন বুঝলাম সখী কারে দিল মন।
ফুলে যেমন ভ্রমর আসবে ভ্রমর হয়ে তোমার গো
সখী তুমি প্রেমে মইজা গেছ।
গুনাই : মিছামিছি বইলনা কথা, কথা শুনবেন ভাইজান, এ
লজ্জা শরমে সখী আমি বাঁচবনা পরাণে, এ
কেবা তোতামিয়া আমি সখী চিনি না তাহারে
তার কথা লইয়া সখী জ্বালাইও না মোরে এ।
সখী : অইছে, অইছে আর বইল না ছলনার কথা।
একনজরে বুঝেছি আমি তোমার মনের কথা?
মিছা বলে সখী তুমি উড়াইয়া দিওনা নাগরের নাম
তাড়াতাড়ি বিহিত কইরা তুমি লও নাগরের নাম
গুনাই : বাজে কথা বললে আমি যাবই ঘরে চলে
মিছা কথায় সত্যের বীজ কভু নাহি ফলে।
সখী : বাজে কথা উড়াও যত, যত ইচ্ছা হয় তোমার
মনে দেখি আইছে তোমার রসের জোয়ার।
যৌবন রসে তোমায় করছে টলমল
তবে কেন সখী গো আমার সাথে চল।
বুকেতে ফুটেছে কলি রসের লাগিয়া
ভ্রমর যত আসবে এখন মধু নিরব আশে
সবারে তাড়াইয়া তবে যাইবা তাহার পাশে।
মাঘ মাসের ২৫ তারিখে হবে তোমার বিয়ে
জমিদার তোতা মিয়া হরণ করে যাবে তোমায় নিয়ে।
গুনাই : কী কী বললে সখী?
সখী : আহ! তুমি যেন কিছুই জান না। জমিদার তোতা মিয়া তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে। সে আসবে মনপ্রাণ হরণ করে নিতে।
গুনাই : দুৎ। তুই ভারি নিলজ্জ।
সখী : আর তুমি? আহারে ভাল কথা বললে সখী নিলজ্জ। তোতামিয়াকে পেলে তো আর সখীর কথা মনে থাকবে না।

www.pathagar.com

সখীর গান : সখীগো আমি জানি তোমার মনের কথা
তুমি জান তোতামিয়ার কথা–
বিয়ে করে দুজনে সখী কইবে মনের কথা।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(বৈঠকখানায় দলিলউদ্দিন বসা, সুন্দরী গুনাইর রূপভেসে উঠছে ছায়াছবির মতো। বন্ধু রহমানকে বিয়ের সম্বন্ধ পাতাতে পাঠানো হয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত কোন খবর নেই। চিন্তায় বিমর্ষভাব) (রহমানের প্রবেশ)

রহমান : বন্ধুর জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। বন্ধু আপনার পিছনে পিছনেই আছে।

দলু : আসুন আসুন-বসুন। আপনার জন্যই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছি বলুন বন্ধু। আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কি করেছেন।

রহমান : না বন্ধু! সে সুন্দরী আপনার জন্য সাজে নাই। গুনাইর বর সেজেছে তোতামিয়া।

দলু : হুম! বল কি! এত বড় স্পর্ধা। আচ্ছা দেখা যাবে।
(নেপথ্যে খালেকের কণ্ঠ)

খালেক : দলু চাচা। বাড়ি আছেন নাকি।

দলু : কে, ও, খালেক এস, (খালেকের প্রবেশ)

দলু : তুমি যে আসবে তা জানতাম। বসো, বসো।

খালেক : কেন আসতে বলেছিলেন?

দলু : তুমি বোধ করি শুনেছ গুনাইর বিয়ে ঠিক হয়েছে?

খালেক : জি হ্যাঁ।

দলু : কার সঙ্গে?

খালেক : তোতা মিয়ার সঙ্গে।

দলু : এটাও তো জান, আমি কিছু দয়া না করলে এক পয়সায় সম্পত্তিও সে পাবে না।

খালেক : জানি না।

দলু : বেশ এখনতো শুনলে।

খালেক : শুনেছি।

দলু : তবে এক কাজ কর। এই নাও তিন হাজার টাকা।
(টাকা হাতে দিল)

খালেক : টাকাতে কি হবে? কেন দিলেন?

দলু : গুনাইকে আমার চাই?

খালেক : দাদার মতো হবে না। নিন টাকা। (উঠে দাঁড়ায়)

দলু : আরে বসো। (তাকে বসাইল)

www.pathagar.com

খালেক : বলুন।
দলু : তোমাকে দশ হাজার টাকা দেই।
খালেক : দাদার মতো হবে না।
দলু : তবে দাদাকে মেরে ফেল।
খালেক : দলু চাচা! (অগ্নি দৃষ্টিতে দলু মিয়ার দিকে চাহিয়া) মনে রাখবেন তিনি আমার বড় ভাই।
দলু : তোমাকে বিশ হাজার টাকা দিচ্ছি।
খালেক : সত্যি মেরে ফেলবেন।
দলু : দলু মিয়া! মিথ্যে বড়াই করে না, বালু, ছিন্ন বিলু ছুরি। (তিনজনে ছুরি নিয়ে প্রবেশ)
খালেক : এ শয়তানকে মেরে ফেলে দাও গর্তের ভেতরে। (তারা এসে খালেকের হাত ধরে মাটিতে শুয়াইয়া উপরে চড়ে বসল।)
দলু : এখন বল রাজি আছি কিনা?
খালেক : না।
দলু : চালাও ছুরি। (গলায় ছুরি দিতে উদ্যত হল)
দলু : রাজি আছ?
খালেক : আছি।
দলু : ছেড়ে দাও। (সবাই ছেড়ে চলে গেল)
নাও, বিষ খাইয়ে মারবে। কেমন রাজি আছ?
খালেক : আছি! (খালেক প্রস্থানোদ্যত)
আর শুন যদি না মার আর ঘটনার বিন্দু পরিমাণ যদি কারো কাছে কও, তবে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। বুঝলে।
খালেক : হ্যাঁ।
দলু : মনে রেখ আমার কথার নড়চড় হবে না।
খালেক : মনে থাকবে।
(খালেকের দ্রুত প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

(মৃত্যু শয্যায় রফিক, পাশে খালেক ও গুনাই, বছিরের মা ও বছির।
রফিক : গুনাই বোনটি?
গুনাই : ভাইজান।
রফিক : আমার জন্য তুই দুঃখ করিসনে বোন। মানুষ জন্ম নিলেই মরে, দুঃখ রইল বোন তোকে সুখী দেখে যেতে পারলাম না। দোয়া করছি তুমি সুখী হও আর একটা কথা বোন, ইস গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু পানি দাও তো বোন। (গুনাই পানি খাওয়াল) খোদার উপর ভরসা রেখ। বিপদে ভয় পেওনা। সুপথে থেকো।

www.pathagar.com

গুনাই : ভাইজান।

খালেক : ভাই সাহেব।

রফিক : দোয়া করি তুমি সুখে থাকো। আমি এখনও বুঝলাম না কেন তোমার এ দুর্বুদ্ধি হল। আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে ক্ষমা করলাম। তুমি সুখে থেকো আর তোতার সঙ্গে গুনাইর বিয়ে দিও। বুঝেছে?

খালেক : বুঝেছি ভাইজান।

রফিক : আল্লার উপর ভরসা রেখ।

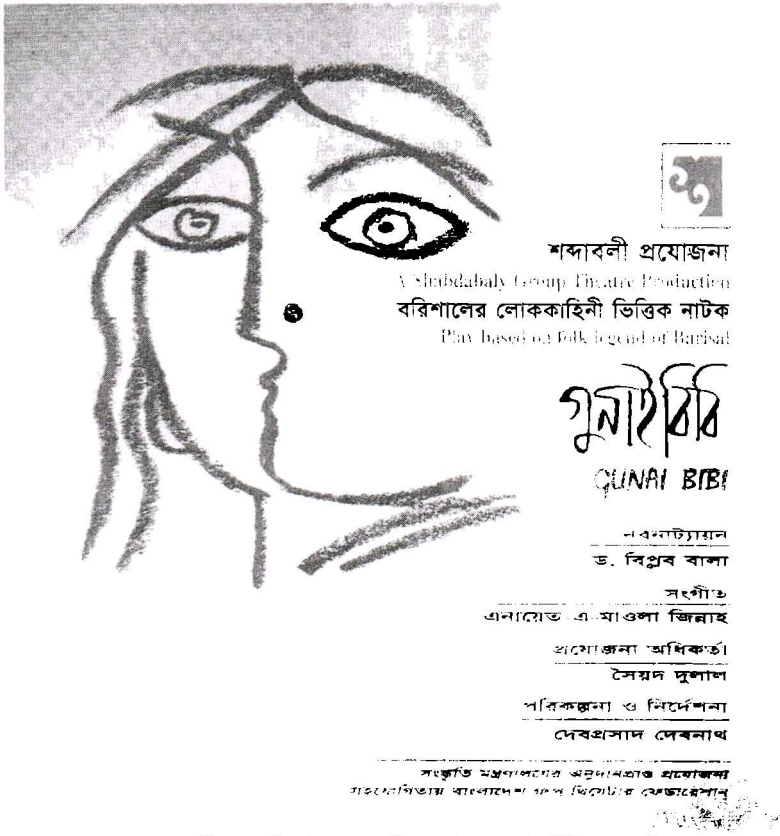

শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত নাটক গুনাই বিবির পোস্টার

খালেক : ভাইসার। (সে উপুড় হইয়া পায়ে পড়িল) তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাইজান। আমি-
(সে কিছু বলতে পারলনা)

www.pathagar.com

রফিক : ওরে তুই যে ছোট ভাই। তোকে কি ক্ষমা না করে থাকা যায়।

খালেক : আমার পাপের মার্জনা নেই। তুমি আমাকেও নিয়ে যাও। তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচবো না।

রফিক : আল্লা আছে। গুনাইকে দেখ। লা-ইলাহা ইল্লল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল উল্লাহ। যাই বোন গু-না-ই, খা-লে-ক। (তার আত্মা মুক্তি লাভ করিল) (দাদা বলে উভয়ে লুটিয়ে পড়ল তার বুকের উপর)

বছির : একি করলে খোদা! (সেও চোখ মুছতে লাগল)

গুনাই গান : আগে যদি জানতাম গো দাদা যাইবা
জনম আমি নিতাম না গো তোমার বোন হইয়া
কত সুখী হইয়াছিলাম দাদা তোমার আদর পাইয়া
সেই কথা মনে হইলে পরাণ যায় ফাটিয়া।
কোন প্রাণে থাকিব আমি তোমারে ছাড়িয়া।

আয়া : চল মা ঘরে যাই।

গুনইর গান : কে বা আছে ঘরে, আর দাদা যে মোর নাই।
কোন প্রাণে বল মা গে দাদারে ছাইড়া যাই
কোন প্রাণে বল মা গো দাদারে ছাইড়া যাই
দাদার কথা মনে হইলে মোর বুক যায় ফাটিয়া
কোন প্রাণে বল তারে আমি যাইব ছাড়িয়া।

খালেক : কাঁদিসনে বোন, কাদিসনে। যত পাপ যত অন্যায় আমি করেছি, কেঁদে জ্বালা বারাসনে। উঠ বোন।
(তাকে তুলিল)

খালেক : যাও বোন, ঘরে যাও। নিয়ে যাও বছিরের মা (গুনাই মা বলিয়া কাদিয়া তার বুকে পড়িল তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বছিরের মার প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

(দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : যাক! এতদিনে একটা পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার রূপসী সুন্দরী তরুণী গুনাই বিবি আমার, আমার কাছে থেকে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

রহমান : দোস্ত। (রহমানের প্রবেশ)

দলু : আরে দোস্ত যে। এস শুনেছ কিছু?

রহমান : রফিক মরেছে এই তো?

দলু : হ্যাঁ দোস্ত, এই।

www.pathagar.com

রহমান : কিন্তু কাজটা কি ভাল হল। একটা নারীর জন্য একটা সুন্দর, এমন কি, দেবতার মতো চরিত্রবান মানুষকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিলে, তুমি এমন কাজ করবে কোনদিন ভাবতে পারি নাই।

দলু : আজ তো পেরেছ।

রহমান : হা কিন্তু এমন অধর্ম আল্লাহ সইবেনা।

দলু : আবার দেখছি আজকাল ধর্ম রোগ দেখা দিচ্ছে হে।

রহমান : আমি মানুষ তাই।

দলু : বেশ বেশ, তুমি মানুষ। কিন্তু এবার আরো ভালো মানুষের মতো আমার বিয়ের কাজটা সেরে ফেল। আমার আর দেরি সইছে না। কখন আসবে আমার স্বপ্নরাণী স্বপ্নের মতো আমার পার্শ্বে। তার কোকিল কণ্ঠ দিয়ে করবে গান- হাসবে মায়াভরা হাসি। স্বপ্নভরা চাওয়ায় দিকে মনমাখি? তাকে বুকে চেপে শুনবো বসন্তের কোকিলের গান। বিকেলে সোনালী রোদের মাঝে তার কোমল গণ্ডের সুষমা করব পান। আকণ্ঠ পান করব যৌবনসুধা আর দেরি সইছে না দোস্ত। এবার স্বপ্নরাণীকে এনে দাও।

রহমান : বোধ হয়ে সে স্বপ্নের মতই আসবে দোস্ত।

দলু : কারণ?

রহমান : মানুষের আশা সব সময় সফল হয় নয় না।

দলু : কিন্তু আমার হবে। (সকলের প্রস্থান)

৯ম দৃশ্য

(বিয়ের দৃশ্য। মোল্লা সাহেব, খালেক, বছিরের মা ও সখী বেস্টিতে গুনাইয়ের জামাই বেশে তোতা বসে আছে।)

মোল্লাজী : বাবা তোতা মিয়া। গোলাম আলী শেখের মেয়ে মোসাম্মৎ গুনাই বিবি খোশ দিলে তোমার উপর বিয়ে এজিন আনছে তুমি বল 'কবুল;।

তোতা : কবুল। (তিনবার) (মোল্লাজীর প্রস্থান)

খালেক : গুনাই- তোতা (দুজনে সালাম করিল)

খালেক : আল্লাহ তোমাদিগকে চিরসুখী করুক। তোতা মিয়া আমাদের একমাত্র বোনকে তোমার হাতে দিলাম। জানি শত্রু আছে, তুমি তাদের হাত থেকে গুনাইকে রক্ষা কর। আমার বোন গুনাই। পতি সেবা করতে ভুলেও পতির মনে আঘাত দিবে না। তোমার নিজের সুখ বিসর্জন দিবে বছির ভাই, বোন তুমিও যাও, দাইমা তুমিও। (একে একে সকলের প্রস্থান) একটা দুর্ভাবনা হতে মুক্তি পাওয়া গেল। জানি আমার জীবনেও শেষ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষের হাতে জীবন নস্ট হতে দেবনা। যে দুস্কৃত হাত দিয়ে আমি প্রাণের ভাইকে মেরেছি– সেই হাত দিয়েই আমার জীবনকে আমি এই পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিব,

www.pathagar.com

কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না- (একটা ছুরি বের করিল) এই আমার মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী। তাকেও নদীর জলে আমার মতো ফেলে দেব ভাই। তোমর উপর যে অবিচার করেছি, তোমার কাছে যে পাপ করেছি তোমার দেওয়া কর্তব্য সমাপনের পর এই নিতেছি তার প্রতিশোধ- নির্মম প্রতিশোধ- তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হে ছুরিকা, কোন দিন ভাবিনি তুমিই হবে আমার একমাত্র আপন, আজ তা হলে আর কোন ভয় নেই চল। (প্রস্থান)

(তোতার প্রবেশ) গুনাইকে লইয়া দাদুন সাহেবের প্রবেশ)

দাদুন : বস গো বউ, বস। বিয়া পড়ান দোয়া শুন। তোতা মিয়া, তুমি পিতা ও মাতৃহীন অবোধ বালক। তোতা তোমার গুনাইর বাড়িতে আর কেউ নাই। (গুনাইর নিকট গিয়া) শোন গো বউ, তোমাকে বুঝাই তুমিও পিতৃহীনা অবোধ বালিকা। তোমারও তোতা বিনে আর কেহ নাই নাই। তোতা যখন যা আদেশ করে তুমি তাহা পালন করিবে, স্বামীর চরণ সেবা ব্যতীত তোমার কোন গতি নাই।

তোতা : দাদুন সাহেব আমি আপনার বিবাহ কার্য ও আপনার উপদেশে সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে পনের টাকা উপহার দিলাম।

গুনাই : আমিও দাদুন সাহবেকে ত্রিশ টাকা দিলাম।

দাদুন : আরে তোতা- তুমি জমিদার হলে কি হবে তোমার আত্মা একেবারে ছোট, বউ দিল ত্রিশ টাকা আর তুমি দিলে পনেরো টাকা?

তোতা : আমার পকেট হইতে নিয়া গিয়াছে।

দাদুন : আরে পকেট হইতে নিয়াছে, না কোথা হইতে আনিয়াছে তা ত আর জানি না। (প্রস্থান)

তোতা : ওগো প্রিয়ে এ জগতে আমি পিতৃহীনা অবোধ বালিকা আমারও আপন বলিতে কেহ নাই।

গুনাই : প্রাণেশ্বর, আমিও এ-জগতে মাতৃ-পিতৃহীনা আবোধ বালিকা আমারও আপন বলিতে কেহ নাই।

তোতা : আচ্ছা প্রিয়ে! আমি কাকার নিকট যাব জমিদারী ফিরাইয়া আনতে, তারপর যাব হরিণ শিকারে। তুমি দিঘি হতে জল এনে পাক কর।

গুনাই : প্রাণেশ্বর! আমি হলেম কুলের বউ, আমি একা কেমন করে জল আনিতে যাব?

তোতা : প্রিয়ে একা যাবে কেন, সঙ্গে করে মর্জিনাকে নিয়ে যাও।

গুনাই : তা হলে আপনি ডেকে দেন।

তোতা : কোথায় গো মর্জিনা। (মর্জিনার প্রবেশ)

মর্জিনা : কি জন্য আমাকে ডেকেছেন বড় সাব?

তোতা : তুমি আমার প্রিয়ার সঙ্গে দিঘি হইতে জল আনতে যাও।

www.pathagar.com

মর্জিনা : আপনার প্রিয়ার সঙ্গে জল আনতে যেতে না পারলে মর্জিনা আছে কি জন্যে?

তোতা : তাহলে প্রিয়ে মর্জিনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, জল এনে পাক করগে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

(কাখেতে কলসিসহ গুনাই ও সখীর প্রবেশ)

(আসতে আসতে গান)

গুনাই : চল সখী জল আনিতে পুস্কুনিতে যাই
জল আনিয়া পাক করিয়া পতিরে খাওয়াই।
পতি ছাড়া সতীর থাকার আর কি বা আছে
চল সখী জল আনিয়া বসব পতির কাছে।
পতী বিনা সতী নারীর নাই গো কোন ঠাই
চল সখী জল আনিতে পুস্কুনিতে যাই।

সখী : স্বামী পাইছ স্বামীর মতন মানিক রতন।
তুমিও আছ সতী নারী মুক্তার মতন।
যথা ইচ্ছা তথা যাইব সনে
তোমার সঙ্গ বিনা রাখব না পরাণ।
(যাইতে যাইতে উভয়ে মিলিত হবে।)

উভয়ের গান : চল সখী জল আনিতে পুস্কুনিতে যাই।

গুনাই : জল আনিয়া পাক করিয়া পতিরে খাওয়াই।

উভয়ের : চল সখী জল আনিতে পুস্কুনিতে যাই।

গুনাই : পতি বিনে সতী নারীর নাইগো কোন ঠাঁই।

উভয়ের : চলগো সখী জল আনিতে পুস্কুনিতে যাই।

(তাহারা জলের ঘাটে আসিয়া ঠুনকো সুরের গান গাহিতেছে।) আড়ালে লুকাইয়া দেখিতেছে দলু মিয়া ও রহমান। ইঙ্গিতে কি সব কথাবার্তা বলিতেছে। তাহাদিগকে তাহারা দেখে নাই। সহসা জলের মধ্যে ঢিল ছুড়িলে তাহারা গান থামাইয়া দিল ও চাহিয়া দেখিল দলু ও রহমানকে। তাহারা ঘাট ছাড়িয়া দ্রুত বাড়ি গেল। (গুনাই ও সখীর প্রস্থান)

দলু : কেমন দেখলেন?

রহমান : এত রূপ মানুষের দেহে থাকতে পারে নাকি?

দলু : এবার দেখতে পেয়েছ ত?

রহমান : সত্যি দোস্ত আমার মাথাটা বিগড়ে গেছে।

দলু : তখন ত ভারি ধর্ম কথা শুনেয়েছিলে?

রহমান : তখন কি ছাই এত রূপ দেখেছিলাম।

www.pathagar.com

দলু : এবার থেকে সঙ্গে থাকবে ত।
রহমান : থাকব মানে। হাজার বার তবে চল।
(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(তোতার উপবেশন ও গুনাইর প্রবেশ)

তোতা : ওগো প্রিয়ে, পাক হয়েছে নাকি?
গুনাই : প্রাণেশ্বর এখনও যে পাক হয় নাই?
তোতা : কেন প্রিয়ে এখনও পাক হয় নাই?
গুনাই : এস, বলি প্রাণের নাথ, পাকের সময় তো বহিয়ে যায়, না পারিলাম জল আনিতে পাক করিব কি রূপেতে। নাকি ঐ জ্বালা প্রাণে সয়।
তোতা : ওগো প্রিয়ে, স্পষ্ট করে বল কি হয়েছে।
গুনাই : শুন শুন নাথ শুধু অপরাধ, একি হল জ্বালা, আপনার কাকা দলু মিয়া রহমান চাচার সাথে গোপনভাবে সোনার মানুষ দেখতে যায় বকুল তলে।
তোতা : গোপনভাবে তোমাকে বকুল তলে দেখে গেল।
গুনাই : আপনার কাকা দলু মিয়া ও হায়রে প্রাণনাথ
দেখে গেল মোরেও প্রাণনাথ হে।
আউল কেশে পাগল বেশে
প্রাণনাথ দেখে গেল মোরে হে
ও হায়রে প্রাণনাথ হে॥
তোতা : প্রিয়ে। তোমার কথায়, আমার বিশ্বাস হয় না। সঙ্গে আর কি ছিল।
গুনাই : সঙ্গে ছিল মর্জিনা। হায়রে দাসী হায়রে প্রাণনাথ জিজ্ঞাস করে দেখেন ঐ
তোতা : কোথায় মর্জিনা। (মর্জিনার প্রবেশ)
মর্জিনা : বড় মিয়া সাহবে। আমার কি জন্যে ডেকেছেন?
তোতা : তুমি আমার প্রিয়ের সঙ্গে জলের ঘাটে কি দেখেছ?
মর্জিনা : আপনার কাকা দলু মিয়া, রহমান চাচার সাথে গোপনভাবে দেখে গেল বকুল তলে।
তোতা : তাদের দেখবার কারণ?
মর্জিনা : তা আমি কেমন করে জানি।
তোতা : ওগো মর্জিনা। তা তুমি বুঝতে পার নাই এই বকুল গাছে দুইটি পাখি থাকে। পাখিগুলো উড়ে যাওয়ার সময় মুখে শীষ দিয়ে গাছের পাতার আড়ালে চলে গেছে।
মর্জিনা : তা আমার বুঝবার বাকি নাই, গুনাইর প্রেমে দুইজনে...
তোতা : দুর দুর পাপিষ্ঠা, প্রিয়ে এখন রাত্র অধিক হয়েছে চল আমরা শয়ন কক্ষে যাই।

www.pathagar.com

(কিছুক্ষণ পরে তোতা হায় হায় করে জেগে উঠবে। বলবে, হায়রে, আমি ঘুমে একি স্বপ্ন দেখলাম।)

গুনাই : প্রাণেশ্বর। আপনি উম্মদ হয়েছেন কেন?

তোতা : ওগো প্রিয়ে। আমি কি যেন একটা স্বপ্ন দেখলাম কিছুই বুঝতে পারি না, তা তুমি বলতে পার?

গুনাই : প্রাণেশ্বর! আপনি আগে বলে যান, আমি পিছনে বলে দিচ্ছি।

তোতা : পূর্ব আকাশে একটি চন্দ্র উদয় হল, কৃষ্ণ বরণ এক খণ্ড মেঘ এসে চন্দ্রখানা আবৃত করে ফেলল আর চতুর্দিকে কতকগুলি মানুষ ঠাট্টা করে হাসতে লাগল আর তিনজন লাল পোশাকধারী লোক এসে আমাকে বন্ধন করে ফেলল।

গুনাই : তা আমি বলতে পারব না।

তোতা : কেন অগ্রে করেছিলে প্রতিজ্ঞা!

গুনাই : প্রাণেশ্বর ও পাড়ার গণকঠাকুরকে ডেকে একবার গণনা করে দেখুন?

তোতা : তাহলে তুমি এখন গৃহে চলে যাও। (গুনাই প্রস্থান)
কোথায় আবদুল হামিদ। (হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : আদাব বড় মিয়া। আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

তোতা : পাড়ার গণক ঠাকুরকে ডেকে আন।

হামিদ : আপনার আদেশ শিরোধার্য। (প্রস্থান)

(গণক ঠাকুরের প্রবেশ)

গণক : কি জন্য আমাকে ডেকেছেন বড় মিয়া সাহেব?

তোতা : আমি নিশাকালে কি যেন একটি স্বপ্ন দেখলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। তা আপনি গণনা করে দেখুন।

গণক : তবে আপনি বলে যান গণনা করে দিব।

তোতা : পূর্ব আকাশে একটি চন্দ্র উদয় হল, একটি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ এসে সেই চন্দ্রখানা আবৃত করে ফেলল। আর চর্তুদিকে কতকগুলি মানুষ ঠাট্টা করে হাসতে লাগল, আর তিনজন লাল পোশাকধারী লোক এসে আমাকে বন্ধন করে ফেলল।

গণক : বড় মিয়া! এটা বড় মস্ত গণনা।

তোতা : তবে আপনি গণনা করে দেখুন।

গণক : ইতুং ইতুং দেওয়া দিল টাকা হাড় মাংস খাইয়া সব ভয় হয়ে যাক? বড় মিয়া। গণনা ঠিক হয় নাই, বোধ হয় এ জায়গায় কোন ছেলেমেয়ে প্রস্রাব করেছে।

তোতা : এদিকে বসে গণনা করে দেখুন।

গণক : (মনে ২ গণনা) আহা- বড় মিয়া সাহেব আমার যে একটি ভুল হইয়াছে, আমি বাড়ি হতে আমার পাঁজি ও পুথিখানা আনতে ভুলে গেছি।

www.pathagar.com

তোতা : তুমি আমার সাথে মসকারী করতে আসিয়াছ নাকি? গণনা করতে আসিয়াছ বড় মিয়ার বাড়িতে আর পুথি ফেলিয়া আসিয়াছ নিজ বাড়িতে?

গণক : বড় মিয়া সাহেব। রাগ করবেন না। এই যে আনাইতেছি।

(কোথায় গদাই)

(গদাইর প্রবেশ একটি হইতে গান)

গদাই : নারায়ণগঞ্জের খালে একটি বাজ পড়েছে ছয় জন মানুষ মরেছে। আচম্বিতে এসে পা, নাক, নিল, চোখ নিল, কান নিল, লোকে বলে কি হল?

গণক : আরে আরে- থাম–থাম।

গদাই : থামিতে পারি না।

গণক : অবেটা গদাই। তোর আসতে এত দেরি হল কেন?

গদাই : ঠাকুর কর্তা এইটা জানেন না? বাড়ি থাইকা আইতে আমার ঠাকুররাণী কইছে কি?

গণক : আরে বলিস কি?

গদাই : না, ঠাকুর কর্তা; আপনার ঠাকুর রাণী।

গণক : আচ্ছা কি বলছে- বল?

গদাই : বলছে এ বেটা গদাই- তুইযে যা বিবড় মিয়ার বাড়িতে গণনা গণিতে, পানি ভাতের পেট্টা দিয়ে যা

গণক : (ধাক্কা দিল)।

গদাই : কেমন করে হলো গোষ্ঠীর হালা?

গণক : আর কি বলছে বল?

গদাই : আর বলছে ও বেটা, গাদাই, তুই যে যাইবি গণনা গণতে কলাই ক্ষেতটার ভিতরে পেটটা দিয়ে যা।

গণক : ও বেটা গদাই, বড় মিয়াকে আদাব দে।

গদাই : কোনখানের পাঠা?

গণক : এটা শালগ্রামের বড় মিয়া সাহেব।

গদাই : ও বড় মিয়া (মাসুমসহ) আদাব।

তোতা : ও ঠাকুর তোমার সঙ্গে এটা কি গর্দভ এসেছে নাকি?

গণক : না বড় মিয়া সাহেব শিক্ষা দিতেছি।

গদাই : (ভালমতে আদাব)

তোতা : আশীবাদ জয় হউক?

গদাই : ঠাকুর কর্তা আমার বলে জ্বর হইবে।

গণক : আরে জ্বর হওয়ার কথা বলে নাই আশীর্বাদ করেছে তোর জয় হইবে।

গদাই : আমাকে আশীর্বাদ করেছে।

www.pathagar.com

গণক : ও বেটা গদাই, আমার পাঁজি পুথি খাতাটা দে তো।

গদাই : কেমন কও হালো গোষ্ঠীর হালা-হালা।

গণক : ও বেটা বই দে।

গদাই : ঠাকুর কর্তা আমাকে একটা বিবাহ করাইবেন?

গদাই : আর এখানে মেয়ে দিব কোথায় থাকে?

গদাই : হাওলাত করে দেন।

গণক : ওগো ছেমড়িরা, তোমরা কেহ গদাইর নিকট বিবাগ বইতে পার নাকি?

সকলে : (সকলেই) না না।

গদাই : ঠাকুরকর্তা আপনে তো বুঝেন না, আমার কাছে বিয়া হইব কি? চেহারাটা দেখেছেন?

গণক : অ গদাই, সভার লোক একটা গান শুনতে চায়?

গদাই : (গান) আমায় জানি বানাইল কেটায়। পাওটা মোটা মাজাটা চিকন। ঐ হাত করে লর চর। ঐ

গণক : বড় সাহেব আপনার গণনা গণতে পারলাম না। কোথায় থেকে শনিঠাকুর এসে আমার পাঁজি পুথি খানা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে।

তোতা : বুঝেছি আমার কপালে বড়ই দুর্গতি আছে।

গণক : তবে যাওয়ার সময় দুটো কথা বলে যাই। কানের গোড়ায় কলম দিয়া হাঁটবেন না, ঘন ঘন মানুষের বাড়িতে যাইবেন না, আর এই কদিনের মধ্যে আপনার লাল কাপড়ের বন্ধন উঠবে। (প্রস্থান) (গুনাইর প্রবেশ)

গুনাই : প্রণেশ্বর? ও পাড়ার গণক ঠাকুর কি বলে?

তোতা : ওগো প্রিয়ে? কানের গোড়ায় কলম নিয়ে হাঁটতে মানা করেছে, ঘন ঘন মানুষের বাড়িতে যাইতে মানা করেছে আর বলেছে কয়দিনের মধ্যে আমার হাতে বন্ধন উঠিবে। এখন কী করিতে বল?

গুনাই : (গান)- দিঘির পাড়ে বকুল হায়রে গাছটি অঃ হায়রে প্রাণনাথ কেটে দিতে হবে রে। গাছ যদি নাহি কাটরে ও হায়রে প্রাণনাথ ত্যজিব পরাণ।

তোতা : ওগো প্রিয়ে তুমি এখন গৃহে চলে যাও, আমি গাছটি কাটবার ব্যবস্থা করিতেছি? ওগো প্রিয়ে। তুমি মানিককে ডেকে গাছটি কাটাইতেছি।

(গুনাইর প্রস্থান)

কোথায় আবদুল হামিদ? (হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : আদাব। আমায় কি জন্য ডেকেছেন?

তোতা : ও পাড়ার মানিক কে আন।

হামিদ : আপনার আদেশ শিরোধার্য।

(হামিদের প্রস্থান) (পরে তোতার প্রস্থান)

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

(মানিকের মার প্রবেশ ও পরে হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : মানিকের মা বাড়ি আছে?
তোতা : হাঁ বাড়ি আছি।
হামিদ : তোমার মানিক কোথায়?
মানিকের মা : কিসের জন্য।
হামিদ : বড় মিয়ার বাড়িতে বকুল গাছ কাটতে হবে।
মানিকের মা : পয়সা দিবে তো?
হামিদ : হ্যাঁ পয়সা দিবে।
মানিকের মা : কত দিবে?
হামিদ : দশ টাকা।
মানিকের মা : দশ টাকায় হবে না।
হামিদ : কত হলে পারবে?
মানিকের মা : পনেরো টাকা দিলে মানিক গাছ কাটিবে।
হামিদ : হ্যাঁ পনেরো টাকাই দেবে। ডাক তোমার মানিককে।
মানিকের মা : মানিক-রে (ডাকল) (মানিকের প্রবেশ)
মানিক : আমায় কেড়ে ডাকতেছ গো মা।
মানিকের মা : বড় মিয়ার বাড়ির গাছ কাটতে হবে।
মানিক : ওগো মাগো, কইতেছ বড় মিয়া, বড় মিয়ার বাড়ির বেগার দিতে দিতে আমার বুকের হাড় নাই।
মানিকের মা : বাজীরে, চাল আনব, ডাইল আনব, নুন আনব, মরিচ আনব তোমার লাগি একটা কোর্তা আইনা দিব।
মনিক : আমারে কোতায় কামড়াইব না?
মানিকের মা : নারে বাজীরে গায়ে যে দেয় কোর্তা?
মানিক : ও গায় দিলে যে শীত ছাড়ে এই কোর্তা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(তোতার প্রবেশ ও পরে হামিদ মানিককে নিয়ে প্রবেশ)

মানিক : বড় মিয়া সাহেব। আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?
তোতা : মানিক। আমার দিঘির পাড়ের বকুল গাছটি কেটে দিতে হবে।
মানিক : আপনার বাড়ির বেগার দিতে দিতে আমার বুকের হাড় নাই।
তোতা : তুমি কবে আমার বাড়িতে বেগার দিয়াছ?
মানিক : ঐ দিন তো আপনার বড় মান্দার গাছটি কেটে দিলাম।
তোতা : ইহা যে আমার না, আমার কাকার।
মানিক : আপনারা ভিন্ন হয়েছেন?

www.pathagar.com

তোতা : হ্যাঁ, ভিন্ন হয়েছি।
মানিক : আমাকে যে জানান হয় নাই।
তোতা : তোমার দরকার হয় নাই।
মানিক : আজ দরকার হলো কি করে?
তোতা : বকুল গাছ কাটতে।
মানিক : গাছ কাটতে হলে মানিকের দরকার আর অন্য সময় লাগে না, আচ্ছা বড় মিয়া- আমার মায় কি কইছে জানেন কি?
তোতা : কি কইছে?
মানিক : মায় কইছে পনেরো টাকা দিলে গাছ কাটব, না হইলে কাটাব না।
তোতা : মানিক পনেরো টাকা দিলে পৌণে চার সের চাল পাবে।
মানিক : না না বড় সাহেব। পনেরো টাকাই ভাল, পৌনে চার সের চালেই ভাল, আমি চার আনা দিব না।
তোতা : এই নেও আবদুল হামিদ, এ নোটটি ভাঙ্গাইয়া তাকে একটি টাকা দিয়ে যাও। (প্রস্থান)
হামিদ : নেও মানিক, তুমি নোটটি নিয়ে যাও।
মানিক : নোট নিয়ে আমি কি করব।
হামিদ : আরে মানিক নোট ভাঙ্গাইলে টাকা হল।
মানিক : আমি টাকা দিয়ে কি করব। মাগো বেটায় খালি টেটে করে। (মানিকের মার প্রবেশ)
মানিকের মা : নারে বাজিরে পনেরো টাকা দিবে।
হামিদ : নে বেটা পনেরো টাকা।
মানিক : এইটা দেহি কানি কাটা।
হামিদ : পনেরো টাকা কানি কাটাই থাকে।
মানিক : ঘরে রাখাল আইটা যাইত না।
হামিদ : না যাবে না। অ মানিক তোমার বকুল গাছ কাটতে হবে, দেখত তোমার কুড়াল খানার ধার আছে কিনা। হাঙ্গাল দিয়া রাখছি। না জানি কি হইতাছে। মানিক তোমার কুড়ালে ধার দিয়া লও।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(মানিকের স্টেজের উপর গাছ কাটিতে ছিল। সহসা তার উপরে পড়িয়া গেল। সে 'মা' বলে চিৎকার করে উঠলো। সুবিধার্থে একটা বড় ডালা পুতে নিলেই হবে।)

(বয়াতির প্রবেশ)

গান

আল্লাহর নামটি লইয়া মুখে মানিক কুড়াল হস্তে নেয়

www.pathagar.com

নাচিতে খেলিতে মানিক কুড়ালের ধার দেয়
একধার দুই ধার তিন ধার দেয়
চার ধার দিয়া মানিক কুড়ালের ধার চায়
(কুড়াল হাতে থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করিল)
আল্লার নামটি লইয়া মানিক কুড়াল হস্তে হইল
নাচিতে খেলিতে মানিক গাছের তলে গেল।
এক কোপ দুই কোপ তিন কোপ দেয়
চার কোপের বেলায় গাছে ঝাঁকা দেয়
পাঁচ কোপ ছয় কোপ সাত কোপ দেয়
আট কোপ দিয়ে মানিক গাছের তলে পড়ে,
আমার আল্লারে।
(গুনাই ও সখীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গুনাই : এই দিঘির পশ্চিম পাড়ে মা মা বলে চিৎকার করে চল গো সখী দেখে গো আসি কান্দে কাহার ছেলে।

সখী : ঐ না দিঘির পশ্চিম পাড়ে মানিক এসে কুঠার ধরে
গো সখী দেখে গো আসি–
যাই কান্দে কিসের ছলে,
হয়ত দুঃখী দুঃখ পাইছে
নইলে কি আর কানতে আছে
চল গো সখি দেখে লো আসি কান্দে কিসের তরে॥
(মানিকের মার প্রবেশ)

মানিকের মা : উঠ-উঠ-মানিকের মানিক
একবার বল কথারে মানিক
একবার বল কথা।
মা মা বল মানিকের মানিক
জুড়ার মনের ব্যথারে মানিক
জুড়ার মনের ব্যথা।
উঠ উঠ মানিকরে মানিক
আঁখি মেলে চাওরে মানিক
আঁখি মেলে চাও।
মা এনেছে পানিরে মানিক
একটু খানি খাওরে মানিক
একটু খানি খাও।
উঠ-উঠ-মানিকের মানিক
মা বল একবাররে মানিক
মা বল এ কবার।

www.pathagar.com

সুধায় ভরুক মানিকের মানিক
মায় তোমাররে মানিক
মরে তোমার।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

দলু : সর্বনাশ হয়েছে। এই দেখ দোস্ত মানিককে খুন করে ফেলেছে।
রহমান : সত্যি তো।
দলু : তুমি যাও দোস্ত দারোগা নিয়ে এস।
রহমান : এই যাচ্ছি-। (প্রস্থান)
দলু : ডেকে এনে খুন কি সর্বনাশ।
গুনাই : মিছে বলবেন না। আমার স্বামী আপনার মতো নীচ লোক নয়। (সখীসহ গুনাইর প্রস্থান)
দলু : তোমার দেমাগ এবার ভাঙ্গবো। সতীত্ব এবার ভাঙ্গবে এইবার তোতারে যেমন করে হোক জেলে পাঠাবো। তারপর দেখে নেব তোমাকে। হে-হে-হে তোমার দেমাক ভেঙ্গে চুরমার করে টেনে আনব আমার বুকে তোমার সুধা আকণ্ঠ পান করে মিটার আমার মরুতৃষ্ণা। ফুলে ফুলে ভরে তুলব আমার শুষ্ক জীবন। তুমি হবে আমার, আর আমি তোমার। হা-হা-হা।

(দারোগা, পুলিশ ও রহমানের প্রবেশ)

দারোগা : কই কোথায় লাশ।
রহমান : এ যে দেখছি গাছ পড়ে মারা গেছে। তবে বললেন খুন করা হয়েছে।
দলু : দারোগা সাহেব।
দারোগা : বলুন।
দলু : এই নিন দশ হাজার টাকা।
দারোগা : বলুন কি করতে হবে?
দলু : খুনের দায়ে তোতাকে জেলে দিতে হবে। আর তার পর আমি আপনাকে দেব আরও বিশ হাজার টাকা।
দারোগা : বেশ, সে আমি ব্যবস্থা করছি। এখন লগে নিয়ে চলুন।
দলু : ধর দোস্ত। (লাশ নিয়া সকলের প্রস্থান)

(গুনাই ও তোতার প্রেবেশ)

তোতা : চিন্তিত মনে হচ্ছে যেন?
গুনাই : দলু চাচা কি বললে জান।
তোতা : কী?
গুনাই : তুমি মানিককে ডেকে এনে খুন করেছ।
তোতা : ধর্ম আছেত গুনাই। ভয় কেন?
গুনাই : হ্যাঁ আল্লা আছেন ভয় কি?

www.pathagar.com

তোতা : আমার খারাপ কিছু হলেও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দেখবে বিপদ কেটে যাবে।

(নেপথ্য) তোতা মিয়া বাড়ি আছেন কি?

তোতা : হ্যাঁ আছি আসুন।

(দারোগা, পুলিশ দলু ও রহমানের প্রবেশ)

দারোগা : আপনি আইন মানেন তো।

তোতা : মানি।

দারোগা : তবে আমরা আপনাকে গ্রেফতার করলাম। কারণ আপনি মানিককে খুন করেছেন।

তোতা : এ মিথ্যা কথা বলতে আপনার মুখে বাঁধলো না?

দারোগা : মিথ্যা নয় সত্য।

তোতা : অধর্ম করবেন না দারোগা বাবু ধর্ম আছে, ইহার ফল একদিন ভোগ করতে হবে।

দারোগা : আপনার কাছে ধর্ম কথা শুনতে চাই না।

তোতা : একদিন নিজেই শুনতে আসবেন।

দারোগা : পুলিশ এরেস্ট কর।

(পুলিশ কড়া নিয়ে এগিয়ে গেল)

গুনাই : ছুইওনা ছুইওনা পুলিশ ও পুলিশ
আমার পতীর দেহরে পুলিশ
আমার পতীর দেহ
নহেন খুনি তিনি রে পুলিশ ও পুলিশ
খুনি নহে কেহরে পুলিশ
খুনি নহে কেহ।
গাছের তলে পইড়াছে পুলিশ ও পুলিশ
চুরছে মানকার দেহরে পুলিশ
চুরছে মানকার দেহ

দারোগা : এরেস্ট কর।

(পুলিশ হাত কড়া পড়াইয়া দিল)

তোতা : কেদ না গুনাই। তিনি সব কিছু দেখছেন। তারই নির্দেশে এত বড় মিথ্যা সংঘটিত হচ্ছে। এর ভিতরে নিশ্চয় কোন মঙ্গল নিহিত আছে। তুমি কেদ না। কেদে লাভ কি? চলুন দারোগা বাবু।

দারোগা : চলুন।

গুনাই : গান-নাও, ভিড়াও নাও, ভিড়াও
দারোগা বাবু নাও ভিড়াও মোর ঘাটেরে
ও প্রাণ গেলরে।
পাঁচশ টাকা নগদ দিব বাবু

www.pathagar.com

ছেড়ে দাও মোর পতিরে।
তাতেও যদি না ছাড় বাবু
ও বাবু বেচব বাবার বাড়িরে
ও প্রাণ গেলরে।

দারোগা : যাও গুনাই তোমার গানে সন্তুষ্ট হয়ে তোমার স্বামীকে এক ঘণ্টার সময় দেওয়া গেল।

তোতা : গান – আমায় ভুইলো না ভুইলো না।
ওগো প্রাণেশ্বরী
আমার কথা মনে হলে যেও বরিশালের বাড়ি
আমায় ভুইলো না প্রাণেশ্বরী।
নয় লক্ষ টাকার জমিদারী বেচে মামলা কর জরী
তাতেও যদি না কুলায় বেচবো ঘরবাড়ি
আমায় ভুইলো না ভুইলো না ওগো প্রাণেশ্বরী।

গুনাই : আমি কাকে লইয়া যাইব থানায় গো বন্ধু নাহি মিলে
ও আমার অন্তর বিচ্ছেদ অনলে জ্বলে।
আমার নাইকো শ্বশুর ভাসুর
নাইকো শাশুড়ি
বড় ভাই মরল দারুণ বিষে
ছোট ভাই নাই বাড়ি
ও প্রাণ গেলরে

দারোগা : আমার কোন ক্ষমতা নাই।

গুনাই : হাজার টাকা দেব গো ও বাবু
ছাইড়া দাও মোর পতিরে।

দারোগা : আমার কাছে কান্নাকাটি বৃথা।

গুনাই : ২০ হাজার টাকা দেব বাবুগো ও বাবু
ছাইড়া দাও মোর পতিরে
পতি ছাড়া কে দেখবে মোরে?

দারোগা : অসম্ভব! পুলিশ চল।

গুনাই : নয় লাখ টাকার জমিদারী বাবু
ও বাবু দিব তোমারে
ছাইড়া দাও মোর পতিরে
তবু যদি নাহি ছাড় দিব গলার হার।
ছাইড়া দাও মোর পতিরে

দারোগা : না চল পুলিশ।

www.pathagar.com

তোতা : গুনাই পাষাণ। চির জনমের পাষাণ। তারা কান্নায় গলে না তুমি খোদার উপর ভরসা রেখ। দেখবে আমার এ বিপদ থাকবে না। আল্লাহ বিপদের কাণ্ডারী।

(দারোগাসহ পুলিশ, তোতা ও রহমানের প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

(দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : এবার মিটবে আমার সাধ। আমার জীবনে অনেক পিপাসা। আমার মন সুন্দরীর অধর সুধা পান করব আকণ্ঠ। তার চোখে চোখে রেখে কাটিয়ে দিব পূর্ণিমার নিশি। তার মুখের হাসিতে ঝরবে মুক্তা। সেই মুক্তার ঝণাৎ ঝণাৎ ধ্বনি শব্দের মিলিয়ে দেব আমার ঠোঁট দুটো।

বসন্তের কোকিল দেখবে রাত, দেখবে চাঁদ, দেখবে অনন্তকালের এই সুন্দর পৃথিবী। (রহমানের প্রবেশ)

রহমান : স্বপ্নের কথা বলছো দোস্ত।

দলু : স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়। এ জীবনের সবচেয়ে বড় আশা এবার হইয়াছে বাস্তবে পরিণত। আমার মরুময় বুকে এবার আসবে মরুদ্যান। মিটবে মোর আশা, শান্ত হবে মোর তাপিত পরাণ।

রহমান : হয়ত হবে। যদি বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে না পড়ে তোমার কল্পনার প্রাসাদ- যদি ভেঙ্গে না যায় এই ক্ষণিকের স্বপ্ন।

দলু : ভাঙবে না ভাঙবে না। আমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে জোর করে আকড়ে ধরব তার দেয়াল। ভাঙতে দেব না কিছুতেই না।

রহমান : বালির বাঁধ কি সমুদ্র স্রোত আটাকাতে পারে?

দলু : পারে দোস্ত পারে। আমি তাই প্রমাণ করব। দেখবে তুমি, দেখবে আকাশ-বাতাস দেখবে অনন্ত পৃথিবীর লক্ষ কোটি মাটি মানুষ।

রহমান : কি জানি দোস্ত, হয়ত হতে পারে। কিন্তু কি জান। এখনও সতীর শ্বাসে ঝড় উঠে- বান ডাকে নদীতে। এখনও সত্য বেচে আছে। কাল তাকে মুছে দিতে পারেনি।

দলু : এবার মুছবে। সবকিছু মিথ্যে হয়ে যাবে, হতে দেখো তুমি এই আমি চললাম তাকে বুকে টেনে নিতে। আমার বুকে তার বুক মিলিয়ে গেয়ে যাব জীবনের জয় গান।

(সে যেতে অগ্রসর হল। বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : যাস না রে তুই যাস না রে ওরে অবুঝ সতির দেহ ছুবারে।
সতীর দেহ ছুইলে পরে, ওরে অবুঝ
মরবি আগুনের পুড়ে
এ যে সতী সবার বাড়া
তুই যাসনে বেচারা

www.pathagar.com

অকালে কেন মরবিরে বল
সতীর তেজে পুড়ে
ওরে যাস না রে- ছুইবারে

দলু : দুর হয়ে যা পাগল।

বিবেক : পাগল-পাগল আমায় বলিস না আ-আ-আ
ও তুই নিজে পাগল, বলিস
আর পাগল তোর দিল কামাই।
তুই পাগল আমায় বলিস না আ-আ তুই পাগল বলিস না। (প্রস্থান)

দলু : আরে দোস্ত তুমিও দেখি পাগল হয়ে গেছ।

রহমান : অসম্ভব নয়। তবে যা করো বুঝে শুনে করিও।

দলু : বেশ বেশ, এবার চল মিষ্টি খেয়ে আসি। (প্রস্থান)

(গুনাইর প্রবেশ)

গুনাইর গান- ও কোকিল ডাইকো না ডাইকো না।
ঐ কদম ডালে।
শীত বসন্ত সুখের কালে
আমার পতি নাই ঘরে
ও পতি নাই ঘরে, নাই দেশে
পতি পইরাছে জেলে।
কারে লইয়া খেলব পাশা আমি
বইসে নিরালে।

(সখীর প্রবেশ)

সখী : সখী।

গুনাই : এসো সখী। কি খবর?

গুনাই : বছির ভাই তোমার নৌকায় আমাকে নিতে হবে।

বছির : কই যাইবা।

গুনাই : বরিশাল।

বছির : কেন গো?

গুনাই : স্বামীকে দেখতে।

বছির : যাইবার কাম নাই গো। তুমি একটা কাজ করগে।

গুনাই : কি?

বছির : আমাকে বিয়ে কইরা লও। সুখে থাকবা।

গুনাই : অ দাদা বছির রে বছির তুই না ধর্মের ভাই
আমার যে করবি বিয়ে লজ্জা সরম নাই।

বছির : অ গুনাই গুনাই লো তুইতো পরের ঝি।
তোরে আমি করব বিয়া লজ্জা শরম কি?

www.pathagar.com

গুনাই : অ বছির, বছিররে তোমারে বুঝাই।
আমারে করবি বিয়া তোর খাওয়ার সংস্থান নাই।

বছির : অ গুনাই গুনাই তোর চিন্তা নাই।
আমারে করলে বিয়া তোর সুখের সীমা নাই।

গুনাই : আমি তোমার ধর্মের বোনরে বছির
নিজেই বলসিরে নিজেই বলিস।
কোন বানে আজরে বছির।
এই কথা কহিছ।

বছির : থাম পাগলি। আলাবালা তুই বুঝবি না।

গুনাই : সত্যি বলছ।

বছির : ছোটলোক মিছা কয় নারে বোন। চল কোথায় যাবি।

গুনাই : তুমি নৌকা ঠিক কর। আমরা আছি।

বছির : আচ্ছা (বছিরের প্রস্থান)

গুনাই : তুমি ছাড়া নাই কেহ প্রভু গো
প্রভু, এ ভব সংসারে।
তোমার দয়ায় বাইচা আছি প্রভু গো
প্রভু এ জগৎ মাঝারে
আমার স্বামীকে তুমি প্রভু, গো
প্রভু মুক্ত করে দাও
স্বামী ছাড়া সতীর কেবা আছে প্রভু গো
আমারে জানাও।

(দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : আমি আছি গুনাই, আমি আছি।

গুনাই : দুর হও।

দলু : হা-হা-হা, মিছামিছি রাগ কর না সুন্দরী। এস আমার বুকে এস। গলায় দেব রত্নহার। রত্নে সাজিয়ে দেব তোমার দেহাবরণ। এস সুন্দরী।

গুনাই : আমি না তোমার ভাইয়ের পুত্রবধূ?

দলু : ভ্রাতু-পুত্র বধূ নও সুন্দরী। এখন আমার বধূ। এস মোর বুকে এস। শান্ত করে দাও মোর বুক। মিটিয়ে দাও মোর অনন্ত পিপাসা এস-এস।

গুনাই : হাঃ- হাঃ -হাঃ কেউ নেই সুন্দরী- কেউ নেই। বৃথা চিৎকার করে লাভ নেই। কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে। এখানে তুমি আমার- একান্ত ভাবে- আমার। এস, এ বুক তোমার জন্য খালি হয়ে আছে।

(ধরতে গেল)

গুনাই : বাঁচাও, ওগো বাঁচাও।

দলু : নেই। হাঃ হাঃ হাঃ কেউ নেই। এস সুন্দরী।

(ধরিল তার হাত। সে চিৎকার দিল)

www.pathagar.com

(রহমানের প্রবেশ)

রহমান : থাম! কে বলে তার কেউ নেই? আমি আছি বোন আমি আছি।

(দলু তাকে ছাড়িয়া দিল। গুনাই দৌড়ে রহমানের কাছে এসে পড়ল)

রহমান : তুমি এত বড় পাষাণ?

দলু : তুমি চলে যাও- যাও।

রহমান : এস বোন।

দলু : না তুমি একা যাও।

রহমান : একা যাব না।

দলু : তবে মরতে হবে।

রহমান : বটে তবে এস।

(বীর বিক্রমে সে দলুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুচারটা কিল দিয়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিয়ে প্রস্থান)

(নৌকায় চড়িয়া, সখী ও বছির গান গাহিতে গাহিতে চলিল)

বছির : গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খেলে ও বুবজান
গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খেলে।
আগা দিয়া আসে ঢেউ পাছারে ঠেলে ও বুবুজান।
গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খেলে
আল্লাহর নাম জপ হে বাঁচিতে চাইলে ও বুবুজান
গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খেলে
দেখছনি তোমরা কেউ, দেখছনি চাহিয়া,
সতীর তেজ যে নৌকা ঠেলে ও বুবজান
সতীর তেজ ঢেউ মিশাইল সকালে ও বুবুজান
গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খেলে।

বছির : বুবুজান আইয়া পড়ছি। এস নাম।

গুনাই : আমরা বসি তোমরা জেনে এস।

বছির : কি?

গুনাই : কি করে দেখা করা যায়?

বছির : আচ্ছা আল্লা ভরসা!

গুনাই : সখী।

সখী : কি?

গুনাই : দেখা হলে কি বলব?

সখী : চিন্তা করে দেখ।

গুনাই : আমার কান্না আসছে।

সখী : কেদো না ঐ যে বছির আসছে?

(বছির ও জেল দারোগার প্রবেশ)

দারোগা : কেন এসেছ মা?

www.pathagar.com

গুনাই : আমি স্বামীর কাছে যাব।
দারোগা : দেখা করার অনুমতি তো নেই।
গুনাই : কি হবে বাবা।
দারোগা : মা।
গুনাই : কি?
দারোগা : আমার মনে হয় তোমার স্বামী নির্দোষ।
গুনাই : ইহা সত্য বাবা।
দারোগা : তুমি এক কাজ কর, সমস্ত বন্দোবস্ত আমি করে দিব। তুমি বাড়ি চলে যাও।
গুনাই : যা খুশি করেন বাবা।
দারোগা : আমি ত মা গেলাম বেটি। চল তোর স্বামীকে যেমনে পারি মুক্ত করব।
বছির : ইশাল্লাহ।
গুনাই : আল্লাহ হাফেজ।
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

(জজ বসে আছেন। পাশে উকিল। পিছনে ডিটেকটিভ হাতে একটা দরখাস্ত)

জজ : ছয়মাস আগে তোতা মিয়া নামে যে আসামীকে একটা লোম-হর্ষক খুনের দায়ে যাবতজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সেই তোতা মিয়ার স্ত্রী নিজে বলছেন তার স্বামী সত্যিই নির্দোষ। আর তার নির্দোষের প্রমাণ জানেন গ্রামের প্রতিটি মানুষ। এই সেই দরখাস্ত পড়ে দেখুন। (উকিল পড়িয়া দেখিল)
উকিল : তাহলে।
জজ : এই কেসকে পুনরায় বিবেচনা করা হবে এবং পূর্ণ সাক্ষী সাবুদসহ তার মীমাংসা করতে হবে। গ্রামে গিয়ে জেনে আসতে হবে উহার মমার্থ। কি বলুন?
উকিল : নিশ্চয়। একটা নির্দোষ মানুষকে অযথা কারাবাস রাখার কোন অর্থই হয় না। অবশ্য সে যদি সত্যিই নির্দোষ হয়। তাহলে সি.আই.ডি. পাঠান।
জজ : তাই পাঠাব। দেখুন। আমি আপনাকে বিশ্বস্ত ও ভাল করে জানি বলে একটা নারীর আকুতির মীমাংসার্থে পাঠাবো বলে মনে করেছি। আশা করি আপনি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন।
ডিটেকটিভ : আপনার আদশে যথাযথ পালন করা হবে।
জজ : বেশ, এর আগে জেনে জান কেন তাকে জেল দেওয়া হয়েছে। উকিল সাহেব তার ব্যবস্থা করুন।
(জজের প্রস্থান)

www.pathagar.com

উকিল : চলুন আমার চেম্বারে।
ডিটেকটিভ : চলুন।
(একটা অন্ধ লোকের লাঠি ভার দিয়া স্টেজে প্রবেশ।) সি.আই.ডি. আর কটি লোক আগেই প্রবেশ করবে)
(১ম গ্রাম্য চাষী)
অন্ধ : ভাই, সামনে কেউ আছেন।
চাষী : কেন?
অন্ধ : ভাই তোতা মিয়ার বাড়ি কোন দিকে?
চাষী : কেন?
অন্ধ : তার কাছে একটা দরকার আছে।
চাষী : সে ত জেলে আছে।
অন্ধ : জেলে কেন?
চাষী : খুন করে জেলে গেছে।
অন্ধ : না-না, মিছে কথা। সে খুন করার ছেলে নয়।
চাষী : আমরা তো জানি বাপু। বকুল গাছের চাপে পড়ে ছেড়া মরল। আর তার দায় চাপলো নির্দোষ তোতার ঘাড়ে। একেই বলে কলিকাল (প্রস্থান)।
(তাড়াতাড়ি নোট বাহির করে এই সব নোট করে নিল, তারপর প্রস্থান)
(২য় চাষীর প্রবেশ)
চাষীর গান : অল্প বয়সে মোরে করলি দেওয়ানা রে
অল্প বয়সে মোরে করলি দেওয়ানা।
কোথায় গেলে পাইব তোমায়- জানি না রে
(সাহেববেশী ওই ডিটেকটিভের প্রবেশ)
সাহেব : তুমিত ভাল গাইতে পার ভাই। বেশ গাওত?
চাষী : এখন আর হবে না সাহেব সুর কেটে গেছে।
সাহেব : প্রেমে পড়েছ নাকি?
চাষী : ও কথা বলুন সাহেব। এ বড় পাপ কাম।
সাহেব : কেন?
চাষী : এই প্রেমে পড়েই তো তোতা মিয়ার জেল হল।
সাহেব : বুঝলাম না।
চাষী : অর্থাৎ গুনাইর প্রেমে এক ব্যক্তি পড়ল বটে। হলো সে তোতা মিয়ার বৌ। তাইতো অনেক বাঁধা। এর মধ্যে দৈবের বসে মানিক নামে এক ছেঁড়া গাছের চাপা পড়ে মারা গেল। সুযোগ বুঝে তোতা মিয়ার উপর দিল খুনের দায় চাপিয়ে। নির্দোষ বেচারা এখন জেলের ঘানি ঘুরাচ্ছে।
সাহেব : সেই প্রেমে পড়া ব্যক্তি কে?
চাষী : তার নাম বলতে পারব না সাহেব। গলা কটা যাবে। আমি চললাম।
অল্প বয়সে মোরে করলি দেওয়ানা।

www.pathagar.com

(গান গাইতে গাইতে চাষী ও সাহেবের প্রস্থান)

(দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : শান্তি নাই- কোথাও নাই। পাপের বোঝা এত ভারি হয়ে গেছে যে বলতে পারি না। অসহনীয় জ্বালায় বুকের ভিতরটা পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝবার কেউ নাই, কেউ নাই আমার কেউ নাই। (প্রস্থান)

৩য় চাষী : ধন্য দেশের চাষারে ভাই ধন্য দেশের চাষা।
তুমিই আন সবার মনে ক্ষণি কাঁদা হাসা?
নাই তোমার দালান-কোঠা আছে শুধু ঘটি বাটি লোটা।
আরও আছে লাঙ্গল জোয়াল আরও গরু মুখের ভাষা!
ধন্য দেশের চাষা।

(পাগলবেশে গান গাইতে গাইতে ডিটেকটিভের প্রবেশ)
তার মুখের শোভা পায়রে জীবনের জয়গান।
তারাই দেশের যন্ত্র তন্ত্র মানে নাকো অস্ত্র মন্ত্র।
সদানন্দে আনন্দিত তাদেরই পরাণ।
জীবনের জয়গান।

৩য় চাষী : তুমি কে ভাই?

পাগল : ভিন্ন দেশী পাগল।

চাষী : কোথায় যাবে ভাই।

পাগল : যাইব কোথায় জানিনে ভাই খুঁজি মনের মন।
মন পাওয়া হল আমার কামনার ধন
রে ভাই-- ধন
পরে যাঘ তোতা মিয়ার বাড়িতে।

চাষী : কেন?

পাগল : কতগুলো টাকা আনতে যাব।

চাষী : তোতা দেশে নাই।

পাগল : কোথায় গেছে?

চাষী : জেলে। মিছামিছি খুনের দায়ে।

পাগল : মিছামিছি আবার খুন হয় নাকি? (পাগল হেসে উঠে)

চাষী : তার মতো ছেলে তো খুন করতে পারে না। একটা ছেলে গাছ কাটতে গিয়ে মারা পড়ে, আর তার জন্যে শত্রুরা তার ঘাড়ে চাপিয়ে জেল দিয়েছে।

পাগল : এতে শত্রুদের স্বার্থ?

চাষী : স্বার্থ টাকা পয়সা বিরাট সম্পত্তি সুন্দরী স্ত্রী।

পাগল : ও আচ্ছা চলি ভাই।

চাষী : চল না মোদের বাড়ি।

www.pathagar.com

পাগল : না ভাই। চল গান করতে করতে যাই। (চাষী ও পাগল) ধন্য দেশের চাষা রে ভাই।

(দারোগা ও গুনাইর প্রবেশ)

দারোগা : মা।

গুনাই : কি বাবা?

দারোগা : কোন চিন্তা করোনা- মা তোতা মুক্তি পাবে।

গুনাই : সত্য বলছেন?

দারোগা : মায়ের জকাছে ছেলে মিথ্যা বলতে পারে বেটি?

গুনাই : আল্লাহ্ হাফেজ।

(সখী গুনাই ও দারোগার প্রস্থান)

(পাগল বেশে দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলু : বলে দাও, বলে দাও খোদা কোথায় গেলে আমি পাব আমার দুস্কৃতির পাপ মার্জনা, বলে দাও, যে হা বলে দাও (আপন মনে হাসতে লাগল অকারণ হাসি) না নাই আমার মুক্তি নাই। তোতার কাছে মাফ নেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই অনুতাপের অশ্রুতে এ গুরুভার শেষ হবে না। আকাশে বাতাসে, পাতালে খুঁজে বের করব তোতাকে, আমার মা গুনাইরে। যে দুস্কৃতি করেছি তাদের পদধুলি ছাড়া এর মার্জনা নেই- নেই- নেই।

(পাগলের মতো প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(জজ, উকিল, ডিটেকটিভ ও জুরিগণ আর দর্শক বৃন্দ। তোতামিয়া আসিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান)

জজ : আজ প্রায় নয় মাস আগে তোতা মিয়া নামের যে ব্যক্তির খুনের দায়ে যাবতজীবন করাদণ্ডের হুতুম হয়েছিল তারই সংশোধনার্থে পুনরায় তার বিচার হচ্ছে। (দর্শকগণকে) (জজ সাহেব ডাইরি হাতে দিল)

জজ : (পাঠান্তে) জুরিগণ

(জুরিগণসহ বেরিয়ে গেলেন ও ক্ষণপরে প্রবেশ)

জজ : উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। আশা করি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। সরকার তদন্ত করে জেনেছেন, মানিক নামে যে ছেলেটি হত্যা করার দায় তোতা মিয়ার উপর চাপানো হয়েছিল, সেই মানিক বকুল গাছ কাটতে গিয়ে তাতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী বিনা তদন্তে যে আসামীকে করাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল সে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

তার মঙ্গল কামনা করি। (হাততালি) পুনরায় ঘোষণা করছি, যে দারোগা বাবুর রিপোর্টে তার জেল হয়েছিল সরকার তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার সাব্যস্ত করেছে এবং তার উপর এখন থেকেই গ্রেফতারী পরোয়ানা

www.pathagar.com

প্রযোজ্য হবে। (হাততালি প্রদান) আর যিনি ইহার মূলে ছিলেন তিনি ছিলেন তোতার চাচা দলু মিয়া। তার উপর উক্ত আদেশ কার্যকর হবে।

তোতা : তাকে মুক্তি দেওয়া হউক।

(পাগলবেশী দলু মিয়ার প্রবেশ)

দলুমিয়া : নানা মুক্তি নয়। এখনই আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আমি মুক্তি চাই না। যে অন্যায় আমি করেছি মুক্তিতে তার বিচার হতে পারে না।

জজা : নির্দোষ তোতা মিয়ার অনুরোধ একজনের উপর থেকে আদেশ প্রত্যাহার করা হল। আজকার মতো বিচার কার্য এখানেই সমাপ্ত হল।

তোতা : চাচাজান।

দলু : আমাকে ক্ষমা কর বাবা।

তোতা : বাপের অপরাধ ছেলে মানে না। ছেলের কাছে সে সব সময় নির্দোষ।

(দারাগোর প্রবেশ)

দারোগা : চল বাবা ঘরে যাই।

তোতা : আপনাকে চিনলাম না।

দারোগা : আমি গুনাইর ধর্ম পিতা।

তোতা : ওঃ (সালাম করিল) গুনাই কোথায়?

দারোগা : বেচে থাক বাবা। আমার বাড়িতে আস।

তোতা : চলুন।

দলু : চল তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার এ পাপ আত্মার মুক্তি নাই।

তোতা : ছিঃ চাচাজান অমন করে বলতে নাই। অনুতাপই মার্জনার চূড়ান্ত মিমাংসা। চলুন। (সকলের প্রস্থান)

(গুনাই ও সখীর প্রবেশ)

গুনাই : তিনি কি মুক্তি পাবেন?

সখি : সত্যই (দারোগা, তোতা ও দলুর প্রবেশ)

দারোগা : গুনাই

গুনাই : বাবা।

দারোগা : কেমন। ছেলেকে বিশ্বাস হল বেটি।

গুনাই : তুমি মহা পুরুষ। (নত হয়ে সালাম করল)

দারোগা : বেঁচে থাক মা।

দলু : এ অধম সন্তানকে তুই ক্ষমা কর মা তোর কাছে বহু অপরাধ করেছি। আজকে আনন্দের দিনে সে কথা আর মনে রাখিসনে।

গুনাই : কাকা।

দলু : মা

(গুনাইকে বুকে টেনেট নিয়ে আদর করতে লাগল)

গুনাই : তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ কাকা।

www.pathagar.com

দারোগা : বেয়াই সাহেব, বৈঠকখানায় বসি গিয়ে।
দলু : চলুন বেয়াই সাহেব।
(দারোগা ও দলু মিয়ার প্রস্থান)
সখী : আমি শরবত নিয়ে আসি সখী।
(মুচকি হাসিসহ তার প্রস্থান)
তোতা : গুনাই কেমন ছিলে?
গুনাই : ভাল নয়, ওগো ভাল নয়।
(বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয়ে জড়াজড়ি করে ধরে প্রস্থান)
(বছির মাঝি নৌকা নিয়ে হাজির। তোতা ও গুনাই দারোগা সাহেবকে সালাম করিল। তারপর দলুমিয়া উঠিল)
দারোগা : তোকে বিদায় দিতে মন চায় না বেটি।
তোতা : আবার আসব বাবা।
দারোগা : এস মা এস তোমাদের বুড়ো ছেলেকে ভুলে যেওনা।
(তাহারা নৌকায় উঠিল)
দলু : চলি বিয়াই সাব। মাঝে মাঝে আসব।
দারোগা : আসবেন।
(নৌকা ছেড়ে দিল। দারোগা সাহেব দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মাঝি গান ধরিল)
বছির : মাঝি বাইয়া যাওয়ে
অকূল দরিয়ার মাঝে
আমার ভাঙ্গা নাও রে
মাঝি বাইয়া যাও রে।
শিল কাঠের নৌকাখানি,
মাঝখানে তার ছইয়া
আগা হইতে গাছায় গেলে
গুলাই যায় খইয়া
(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

শিবের গাজন ও নীলের নাচ

'হায় হায়... রে, শোন সবে মন দিয়া, শিবের আজকে হইবে বিয়াগো...। এপার হতে বাজায় বাঁশি গো ওপার বসে শুনি...।' এসব গান গেয়ে খোল-করতাল-বাঁশি- কাঁশর বাজিয়ে শিবের গাজন ও নীল উৎসব পালন করা হয়। মাসব্যাপী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শিবের গাজন ও নীল পূজার আগামীকাল শনিবার শেষ দিন। পূজারীরা পুরো চৈত্র মাসব্যাপী প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে আজও গ্রামবাংলার মেঠোপথ পেরিয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিবের গাজন গেয়ে নীল উৎসবের নাচ নেচে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের আনন্দ প্রদান করে থাকেন। এক একটি দলে শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, নারদসহ ১০/১২ দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি সেজে সন্ধ্যা থেকে সারারাত শিবের গাঁজন ও

www.pathagar.com

নীল উৎসব পরিবেশন করে। পূজার জন্য প্রতিটি হিন্দু পরিবার থেকে নগদ অর্থ, চাল-ডাল ও অন্যান্য উপাচার প্রদান করে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রাচীন এ লোকসংস্কৃতিকে আজকের নতুন প্রজন্ম ভুলতে বসেছে। গ্রামের সংস্কৃতিমনা মানুষের মধ্যে এধরণের উৎসব উদযাপনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এসব পার্বণ এখন বিলুপ্তির পথে। অথচ পূর্বে প্রতিটি গ্রামে ২/৩টি নীল নাচন দল থাকত। বরিশালের আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, কাশিয়ানীসহ প্রত্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় এখনও চৈত্রমাসের শুরু থেকেই শিবের গাজন ও নীল নাচে শিল্পীরা উৎসব উদযাপনের জন্য বেড়িয়ে পরেন। এলাকাভেদে বৈশাখ মাসেও এই নীল উৎসব পালন করা হয়। উজিরপুরের কারফা গ্রামের বিমল হালদারের পরিচালনায় 'হালদার সম্প্রদায়' নামে এরকম একটি নীল নাচের দল রয়েছে। তারা বুধবার রাতে জল্লা, রত্নপুর ও গৈলা ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ির আঙিনায় রাতভর উৎসব পালন করেছে। এছাড়া পশ্চিম মোল্লাপাড়া, ঐচারমাঠ, বারপাইকা, তালতারমাঠ, কাঠিরা, অশোকসেন, ভাউধর, বিলগাববাড়ি, পশ্চিম সুজনকাঠি, কোদালধোয়াসহ বেশকিছু এলাকায় একসময় নীল পূজার দল থাকলেও এখন হাতেগোনা কয়েকটি দল ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

খেলাধুলা মানব সমাজের ঐতিহ্য। বংশ পরম্পরায় প্রবাহমান এই খেলাধুলা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের মাধ্যমে প্রচারিত বা প্রসারিত না হয়ে, লোক মানসের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে এক যুগ থেকে অন্য যুগে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। এই খেলাধুলা জীবনের অনুকৃতির প্রতীকিস্বরূপ এবং এর মধ্য দিয়ে ফ্যান্টাসি বা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে। দৈহিক কসরত বা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলাধুলার প্রচলন। লোকসমাজ বহু লৌকিক খেলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলাধুলার মধ্যে কিছু ঘরের মধ্যে এবং কিছু ঘরের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। গৃহাভ্যন্তরের লোকক্রীড়ার মধ্যে কড়ি, চার গুটি বা পচা কুমড়া খেলা, পাঁচ ঘুঁটি, তাস ইত্যাদি প্রধান। লোকসমাজে প্রচলিত উঠানে খেলা হয় এমন খেলাধুলার মধ্যে দাঁড়িয়াবান্ধা, পলাপলি, বউচি, মোরগ লড়াই, মার্বেল, ছিবুড়ি, গোল্লাছুট, উপানটি বায়স্কোপ, এলাটিং-বেলাটিং, ছিবুড়ি, এক্কা-দোক্কা বা কুতকুত, ডাংগুলি, চারামারি, চোর-পুলিশ খেলা জনপ্রিয়। বৃহৎ পরিসরে প্রদর্শিত খেলার মধ্যে নৌকা-বাইচ, লাঠিখেলা, কাবাডি বা হা-ডু-ডু অন্যতম। এ অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়। এসব খেলা অনুষ্ঠিত হয় চিত্তবিনোদন, শরীরচর্চা, অবসরযাপন ইত্যাদি কারণে। অধিকাংশ লৌকিক খেলা প্রতিযোগিতা ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়। হা-ডু-ডু, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকা বাইচ, ঘুড়ি উড়ানো, ঘোড়াদৌড় ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১. বউচি খেলা

বউচি শিশুদের ব্যায়ামনির্ভর ও আনন্দদায়ক খেলা। এ খেলায় দুটি পক্ষ থাকে। রাজা থাকে দুজন। উভয়পক্ষে খেলোয়াড় থাকে দশ-বারোজন বা অধিক। খেলোয়াড়েরা দূরে গিয়ে নাম পাতিয়ে রাজাদের কাছে আসে। এরপর বলে– 'ডাক ডাক ডাক কিস্কো' রাজাদ্বয় জবাব দেয়,– 'আম মারি মিস্কো' এরপর আবার খেলোয়াড় দুজন বলে– 'কে নেবে আকাশ কে নেবে বাতাস' তখন একরাজা আকাশ নামধারী খেলোয়াড় ও অপর রাজা বাতাস নামধারী খেলোয়াড়কে টেনে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় খেলোয়াড় নির্বাচন করার যুক্তি হলো সবই চালাক ও বুদ্ধিমান খেলোয়াড় দলে রাখতে চায়। আবার লটারির মাধ্যমেও এ কাজটি করা হয়। এরপর আগে দান নেওয়ার প্রসঙ্গ। লটারির মাধ্যমে এ ঝামেলারও অবসান হয়। বউচি খেলায় কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না। উঠানে বিশ পঁচিশ হাত ব্যবধানে দুটি ঘর কাটা হয়। একটি ঘরে বউ থাকে অপর ঘরে থাকে বউয়ের পক্ষের খেলোয়াড়রা। বউয়ের ঘর থাকে আকারে ছোট ও বৃত্তাকার। খেলোয়াড়দের ঘরের আয়তন আকারে বড় ও চারকোণা আকৃতির হয়।

www.pathagar.com

বউয়ের লক্ষ্য থাকে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বউঘর থেকে বেড়িয়ে নিজ ঘরের খেলোয়াড়দের ঘরে যাওয়া। প্রতিপক্ষ দল চেষ্টা করে বউকে সে সুযোগ না দেওয়ার। বউয়ের পক্ষের খেলোয়াড় দম ধরে মুখে ছড়া কাটতে কাটতে বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড়কে ধাওয়া করে ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

ছড়া কেটে ধাওয়া করার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ খেলোয়াড় মারা না পড়ার জন্য ধাওয়াকারীর যাতে না ছুতে পারে সে জন্য চেষ্টা করে। নিজের ঘর বা বউয়ের ঘরে পৌঁছানো ছাড়া দম ছাড়লেই বিপক্ষ খেলোয়াড় উল্টো ছুঁয়ে দেয় তখন ওই খেলোয়াড় মারা পড়ে। এভাবে দুই পক্ষের খেলোয়াড়ই মারা পড়তে পারে। এক পক্ষের খেলোয়াড় পচা হলে তাকে বাঁচানোর জন্য বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড় মারতে হবে। বউয়ের পক্ষের খেলোয়াড় দম করে বিরোধী খেলোয়াড়কে যখন মারতে যাবে সেই সুযোগে বউ নিজের ঘর ছেড়ে তার পক্ষের খেলোয়াড়দের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। বউ নির্বিঘ্নে নিজের পক্ষের খেলোয়াড়দের ঘরে পৌঁছতে পারলে বিপক্ষ দলের ঘাড়ে এক পয়েন্ট। আর বউ মারা পড়লে দান চলে যাবে বিপক্ষ দলের হাতে। এই খেলায় বুড়ি বা বউয়ের বুদ্ধিমত্তা, সফলতা এবং ব্যর্থতার উপর খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। বউচি খেলায় ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি ছড়া : :

১
আড়ির ভিতর খুদ
বউ পাদে পুতপুত
আড়ির ভিতর ময়দা
বউ কিলাইতে কায়দা।

২
ছি আত্তা কচুপাতা
কচুর ঝোল
পটল তোল।

৩
কচু পাতা লটকন
তোরে ছুঁইতে কতক্ষণ।

৪
ইলিশ মাছের তেলে
বুকপিট জ্বলে।

৫
ছি বুড়ি ছত্তর ঘোটা
রক্ত পড়ে ফোঁটা ফোঁটা।

৬
আমি যামু আকাশে
জল খামু গেলাসে।

www.pathagar.com

৭
কুতকুত কুতানি
লাইলি আমার মামানি
মজুন আমার ভাই
সোহরাবের দাড়ি ধইর‍্যা
মক্কাশরিফ যাই।

৮
ছি ছি কানাইয়া
নৌকা দিমু বানাইয়া
নৌকা যদি ওড়ে
বিয়া দিমু তোরে।

৯
ছি বুড়ি ছাইয়া
বাবুলের মাইয়া
বাবুল কাঁন্দে
পচা কলা খাইয়া।

১০
ছি কুতকুত তারে নারে
ঘুঘু ডাকে বারে বারে।

২. হা-ডু-ডু বা কাবাডি

হা-ডু-ডু খেলা বাংলাদেশের সব অঞ্চলে প্রচলিত। জনপ্রিয়তার জন্য এ খেলাকে বাঙালির জাতীয় খেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। লোকক্রীড়াসমূহের মধ্যে হা-ডু-ডু খেলাই সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত এবং জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হিসেবে মর্যাদা এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। হা-ডু-ডু খেলার পরিচিতি এতো ব্যাপক যে এই খেলার বিবরণ নিশ্চিতভাবে বাহুল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। তারপরেও সাধারণত যে দুটি নিয়মে হা-ডু-ডু খেলা হয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোটবন্দী এবং ছড়াকপাটি নামে এই প্রকরণদ্বয় খ্যাত। প্রথমটিতে সমান দুই ভাগে ভাগ করা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে খেলোয়াড়গণ অবস্থান করে। দ্বিতীয়টিতে নির্দিষ্ট কোনো সীমানা থাকে না। দলবদ্ধ এই খেলায় উভয় দলে সাধারণত আটজন করে খেলোয়াড় থাকে। দলের খেলোয়াড় একের পর এক একদমে ছড়া আবৃত্তি করে বিরুদ্ধপক্ষের চিহ্নিত স্থানে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁতে চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে দম শেষ হওয়ার আগে যদি সে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে তবে সে পরাজিত হয়। অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষের কাউকে স্পর্শ করে নিজেদের চিহ্নিত স্থানে ফিরে আসতে পারলে বিরুদ্ধপক্ষের সে খেলোয়াড়ের পরাজয় হয়। এভাবে কোনো একটি দলের সকল খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত খেলা

www.pathagar.com

চলতে থাকে। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড় মাঝরেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপরপক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ করে ফিরে আসতে একে ডুক দেওয়া বলে। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে ডুক ডুক, টাক-টিক, টি-টি-টি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি দিয়ে থাকে।

হা-ডু-ডু বা কাবাডি

হা-ডু-ডু খেলা দাগ কেটে ও সীমানা বেঁধে খেলা হয়। কোটবন্দি খেলায় কোট বা দৈর্ঘ প্রস্থের উপর নজর দেওয়া হয়। এই কোটের দৈর্ঘ ও প্রস্থের মাপ হয় লম্বা ২১ হাত চওড়া ১৪ হাত। ঘরটি মাঝের একটি সরলরেখা দ্বারা সমান দুটিভাগে ভাগ করা হয়। সীমানা নির্দেশক সীমান্ত রেখাটির পারাপারের উপর খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা ও স্বাধিকার নির্ভর করে। ঘর দুটিতে দুই পক্ষের সমান খেলোয়াড় আশ্রয় নিয়ে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে নিজেদের সজ্জিত করে। এ খেলায় বাইরের সীমানার বাধ্যবাধকতা মানতে হয় অর্থাৎ খেলার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সীমানা রেখা অতিক্রম করা নিষেধ।

হা-ডু-ডু খেলার উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের খেলোয়াড়কে জীবিত করা। যখন কোনো একপক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা যায় তখন একটি গেম হয়। যাকে বলা হয় এক গেইম। এই খেলা সারাবছরই চলতে পারে। তবে বর্ষা পরবর্তীকালে মাটি নরম থাকে বিধায় ওই ময়ই হা-ডু-ডু খেলার প্রচলন বেশি দেখা যায়। ঈদুল-ফিতর, ঈদুল-আজহা, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, বিজয় দিবস ও পূজা পার্বণ উপলক্ষে প্রতিযোগিতামূলক হা-ডু-ডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য খেলোয়াড়ের সংখ্যা এর কমবেশিও হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক এই খেলা সারা বছর এনমকি জ্যোৎস্নারাতেও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে হা-ডু-ডু খেলা তীব্র

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা এবং উত্তেজনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময়ে এই খেলার হার-জিতের সংগে খেলোয়াড় এবং আয়োজকদের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। সে কারণে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য খেলোয়াড়ী দক্ষতা ছাড়াও কোনো কোনো সময়ে নানা প্রকার তুকতাকের সাহায্য নেয়ার কথা শোনা যায়। মন্ত্রবিশ্বাসী খেলোয়াড় গুণীদের কাছ থেকে 'পড়া তেল' সংগ্রহ করে গায়ে মেখে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সহজে পরাভূত করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। অন্তর্নিহিতভাব বিচারে এই লৌকিক খেলাটি অতীতের দলবদ্ধ সমাজের সংগ্রামী জীবনকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন স্থানে নানা আয়োজনে হা-ডু-ডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্নস্থানে হা-ডু-ডু খেলার প্রচলন আছে। তাছাড়া গ্রামবাংলার প্রায় সর্বত্রই হা-ডু-ডু খোলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

৩. নৌকা বাইচ

শ্রমের খেলা, কৌশলের খেলা নৌকা বাইচ বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকক্রীড়া। বাইচের নৌকা সাধারণত চল্লিশ থেকে ষাট হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রস্থ থাকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় হাত। বাইচ খেলার জন্য নির্দিষ্ট দিনে সকাল হতে দুপুর নাগাদ বাইচের নৌকার গায়ে আলকাতরা, গাব, কলা ও ময়দা মাখে। এতে নৌকার গা এত পিচ্ছিল হয় যে নৌকা পানিতে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে একটু ধাক্কায়ই তীরের বেগে ছুটতে থাকে। নৌকা বাইচের আগে বাইচ পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির নির্দেশনানুযায়ী বাইচ শুরুর আগে প্রতিযোগিতার শুরু এবং শেষ প্রান্তে নিশান গেড়ে দেয়। বাইচের নৌকা প্রথম নিশান থেকে যাত্রা শুরু করে অপর প্রান্তের নিশান নিয়ে যে দল আগে ঘুরে আসতে পারে সেই দল খেলায় জয়লাভ করে।

বাইচালের বৈঠার তালে তালে নৌকায় ঢোল, কাঁসর, সারিন্দা, ঘুঙুর ব্যবহৃত হয়। এ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে বাইচালের মনে শক্তি সঞ্চার করে। পুরুষেরা মহিলা সেজে নৌকায় নাচগান ছাড়াও নৌকায় শক্তি সঞ্চারণমূলক গীত পরিবেশিত হয়। বরিশালের উজিরপুর উপজেলার হারতায় সন্ধ্যা নদীতে, বরিশাল সদর উপজেলার কীর্তনখোলা নদীতে, বাকেরগঞ্জের তুলাতলী নদীতে, ছাড়াও হীজলা , মেহেনাদীগঞ্জ, আগৈলঝাড়ায় একাধিক বাইচ অনুষ্ঠিত হয়।

উজিরপুরে হাবিবপুরের সন্ধ্যা নদীতে বাইচ : ১৮ বছর পর হাবিবপুরের সন্ধ্যা নদীতে ২০১২ সালের ১১ নভেম্বর ২০০ তম নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই দিন বিকেলে এলাকার প্রবীণ শিক্ষক চক্রপাণী সরকারের সৌজন্যে নৌকাবাইচে বিভিন্ন জেলা থেকে ৭টি নৌকা অংশগ্রহণ করে। ষাট বছর আগে থেকে সন্ধ্যা নদীতে হাবিবপুর স্কুলের সহকারী শিক্ষক চক্রপাণী সরকার নৌকা বাইচ পরিচালনা করে আসছিলে। তিনি বৃদ্ধ হওয়াতে গত ১৮ বছরে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচের জন্য কেউ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তারই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘকাল প্রচলিত নৌকা বাইচ অনুষ্ঠানটি শিক্ষক জীবিত থাকতেই পুনরায় চালু করার জন্য ওটরা ইউনিয়নের

www.pathagar.com

তৎকালীন চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ইকবাল এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। নৌকাবাইচের উদ্বোধন করেন উজিরপুর-বানারীপাড়া সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মনিরুল ইসলাম মণি। শিক্ষক চক্রপাণী

নৌকা বাইচ

সরকারের সভাপতিত্বে চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ইকবাল, খালেক হোসেন রাঢ়ী এবং শহিদুল ইসলাম মোল্লার ব্যবস্থাপনায় হাজার হাজার নারী-পুরুষ বাইচ উপভোগ করেন। বাইচে কোটালিপাড়া থেকে গৌতম ভক্ত, শান্তি রানী বাড়ৈ ও অনিতা বোসের নেতৃত্বে ১শ জন মহিলা প্রতিযোগীর অংশগ্রহণের কারণে নদীর দুই পাড়ে লক্ষাধিক দর্শনার্থীর আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন ওটরার গোলাম কিবরিয়া নান্নুর নেতৃত্বে কোটালিপাড়ার গৌতম ভক্তের নৌকা, দ্বিতীয় নির্বাচিত হন যৌথভাবে হালিম আকনের নেতৃত্বে অমূল্য বালার নৌকা ও দেলোয়ার মৃধার নেতৃত্বে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নৌকা, তৃতীয় হন রবি মল্লিক ও শংকর বিশ্বাসের নৌকা। এছাড়াও এই প্রথম মহিলাদের নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের কারণে তাদেরকে এবং অন্য প্রতিযোগিদের বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর নভেম্বর মাসে সন্ধ্যা নদীতে বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

গৌরনদীর পালরদী নদীতে নৌকা বাইচ : শারদীয় দুর্গাপূজার মহাদশমী উপলক্ষে ২০১৪ সালের ৪ অক্টোবর, শনিবার বিকালে এক যুগ পর বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পালরদী নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক বছর পর বাইচ দেখার জন্য ভারি বর্ষণ উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

নদীর দুতীরে ১০ সহস্রাধিক দর্শক ভিড় করেন। পালরদী নদীর তীরে টরকী বন্দর ট্রলারঘাট এলাকায় পৌর কাউন্সিলর খাইরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এইচ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন টরকী বন্দর বণিক সমিতির সাধারণ রাজু আহম্মেদ হারুন, বন্দরের ব্যবসায়ী সুকদেব মণ্ডল, শেখর দত্ত বণিক, ইতালীর রোম সিটির কাউন্সলর কামরুল হাসান দিলীপ। নৌকা বাইচে বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০টি নৌকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। শেষে প্রথম স্থান অধিকারী নিত্যানন্দ রায়কে ২১ ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মহানন্দ বিশ্বাসকে ১৭ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন ও তৃতীয় স্থান অধিকারী অমূল্য বালাকে একটি মোবাইল সেট পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে শান্তনা পুরস্কার ও বাইচ প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আক্কেল আলী শরীফকে মরণোত্তর সম্মাননা জানানো হয়।

উজিরপুরে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে নৌকা বাইচ : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোঁজগারি লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে উজিরপুর উপজেলার হারতারপাড়া এলাকায় সন্ধ্যা নদীতে ১৫৪তম নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা এ নৌকা বাইচে প্রতি বছর মাদারীপুরের রাজৈর, গোপালগঞ্জ সদর ও কোটালীপাড়া উপজেলা থেকে আসা সুসজ্জিত নৌকা এসে যোগ দেয়। ২০১৪ সালের প্রতিযোগিতায় ১০টি নৌকার মধ্যে তুলিকা মজুমদার ও প্রভাতি হালদারের নেতৃত্বে ২টি নৌকার চালকের আসনে ছিলেন প্রায় ১৮০ জন নারী প্রতিযোগী। ঢোল বাদ্যের তালে তালে ১০টি সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে হাজারের অধিক নারী-পুরুষের নৌকা, যখন মাঝ নদীতে প্রতিযোগিতায় নামে তখন নদীর দুই পাড়ে আড়াই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে উৎসুক দুই লক্ষাধীক দর্শনার্থীর ঢল নামে। হাতের তালি, শীষ, উৎফুল্ল চিৎকার-চেচামেচির, মধ্য দিয়ে নদীর দুই পাড়ের দর্শকগণ মাঝ নদীতে প্রতিযোগিতায় নামা নৌকার প্রতিযোগিদেরকে মাতিয়ে রাখে। প্রতিযোগিতায় রাজৈরের সুকুমার বাইন ও তার দল প্রথম স্থান, কোটালীপাড়ার রনজিৎ বালা, দ্বিতীয় স্থান, একই উপজেলার নিত্যানন্দ রায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে। সন্ধ্যায় বাইচ শেষে প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধানঅতিথি বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুচ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সোহরাব হোসেন, বরিশাল সদর সার্কেলের এএসপি সুদীপ্ত সরকার, বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর জেনারেল ম্যানেজার হেমচন্দ্র বৈদ্য, উজিরপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অপূর্ব কুমার বাইন রন্টু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সীমা রানী শীল, এসএম জামাল হোসেন, আব্দুল মজিদ সিকদার বাচ্চু, ডা. এসকে বল্লভ, হারতা ইউপি চেয়ারম্যান ডা. হরেন রায়, সাবেক চেয়ারম্যান সুনীল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

মেয়র নৌকা বাইচ : বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র শওকত হোসেন হিরণ কীর্তনখোলা নদীতে মেয়র নৌকা বাইচের আয়োজন করেন ২০১০ সালের বিজয় দিবস উপলক্ষে। পরবর্তী বছরও বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল জেলার বিভিন্ন

www.pathagar.com

উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা-উপজেলা থেকে বেশ কয়েকটি দল এই বাইচে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মেয়র নৌকা বাইচ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করে দেশের একটি টেলি কমিউনিকেশন কোম্পানি। ২০১৪ সালে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আহসান হাবিব কামাল আবারও কীর্তনখোলা নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এই প্রতিযোগিতা নগরবাসীর জীবনে আনন্দের সৃষ্টি করে। বাইচ দেখতে হাজার হাজার মানুষ কীর্তনখোলার দুই তীরে জমায়েত হন। বাইচ নগরীর দক্ষিণ প্রান্তের শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু (দপদপিয়া সেতু) এলাকা থেকে শুরু হয়ে বরিশাল নৌবন্দর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ছি-বুড়ি

কোনো কোনো বিষয়ে হা-ডু-ডু খেলার সংগে মিল থাকলেও ছি-বুড়ি নামের খেলাটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বরিশালের পল্লী অঞ্চলে কিশোরীদের মধ্যে ছি-বুড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। স্কুলের খেলার মাঠে কিংবা ছুটির দিনে বাড়ির উঠোনে তারা প্রায়ই এই খেলাটি খেলে থাকে। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক এই খেলায় সমান সংখ্যক খেলোয়াড় আবশ্যক। নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি স্থান চিহ্নিত করে একটিতে ছোট একটি গোলাকৃতির এবং অন্যটিতে বর্গাকৃতির একটু বড়ো ঘর কাটা বা আঁকা হয়। প্রথম দলের একজন বুড়ি হয়। সে তার দলের একজন একজন খেলোয়াড়কে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে সহায়তা করে থাকে।

প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যদি বুড়ির দলের একজন খেলোয়াড় অন্য ঘরে যেতে পারে তবে বুড়ির দল এক পয়েন্ট অর্জন করে। এভাবে একে একে সবাই যেতে পারলে বুড়ির দল সেই খেলায় জিতে যায়। আর প্রতিপক্ষের হাতে মারা অর্থাৎ বুড়ির একদমের মধ্যে যদি তার দলের খেলোয়াড় অন্য ঘরে যেতে ব্যর্থ হয় তা হলে খেলোয়াড় দ্বিতীয়বার আর সুযোগ পায় না। এভাবে সবাই মারা পড়লে বুড়িকে প্রতিপক্ষের বাধা এড়িয়ে বড় ঘরে যেতে হয়। পরবর্তী সময়ে অন্যপক্ষ একইভাবে খেলা চালিয়ে যায়। ছি-বুড়ি খেলা পর্যালোচনায়ও আদিম সমাজের নেতৃত্ব এবং নেতার দায়িত্বের চিত্রটি পরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

৫. গোল্লাছুট

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো বৃহত্তর বরিশালের শিশু এবং কিশোরীদের মধ্যে এই খেলাটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়। সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত দুই দলের মধ্যে খেলার নির্দিষ্ট মাঠে গোল্লাছুট খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। একটি ছোট গর্তে প্রথমে একটি কাঠি রাখা হয়। এই কাঠিটিকেই গোল্লা নামে অভিহিত করা দূরত্বের কোনো অবস্থানকে লক্ষ্য করে প্রথম দলের একজনকে বেষ্টনী ভেঙ্গে ছুটে যেতে এভাবে খেলার এক পর্যায়ে দলপতিকে অন্যান্যদের মতো গর্ত ছেড়ে ছুটতে হয়। এ সময়ে বিপক্ষীয় দলের কেউ তাকে ছুঁয়ে দিতে পারলে তার পুরো দল মারা যায়। আর সফল হলে গর্ত

www.pathagar.com

থেকে লাফ দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পার হতে পারলে দল বিজয়ী হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিপক্ষ খেলার সুযোগ পায়।

৬. দাড়িয়াবান্ধা

বরিশাল অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকার সর্বত্রই এই খেলাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিশু-কিশোরদের খেলা হলেও অনেক সময় বয়স্করাও দাড়িয়াবান্ধা খেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। হা-ডু-ডু খেলার মতো এই খেলাতেও নির্দিষ্ট আকারের ছক কাটা ঘর প্রয়োজন হয়। তবে এই ঘরের সংখ্যা হতে হয় আটটি। প্রয়োজনে এই ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন স্থানে এই ঘরগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে খেলা হয়। একদল আক্রমণে এবং অন্যদল রক্ষণে অবস্থান করে থাকে। খেলার শুরুতে আক্রমণকারী দল প্রতিপক্ষ দলকে ফাঁকি দিয়ে একটির পর একটি ঘর পার হয়ে যেতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে রক্ষণভাগের অর্থাৎ প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা চেষ্টা করে তাদের বাধা দিতে। আক্রমণকারীরা সফলভাবে সব কয়টি ঘর পার হতে পারলে একটি খেলায় জয়লাভ করা হয়েছে বলে ধরা হয়। এরপর একই নিয়মে দ্বিতীয় দলের পালা।

শারীরিক দক্ষতা এবং কৌশল প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে ধোকা দিতে পারা এই খেলায় জয়লাভের মূলকথা। দাড়িয়াবান্ধা খেলার শারীরিক দক্ষতা এবং বুদ্ধির প্রয়োগ স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের প্রথমদিককার কৌম ভিত্তিক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আক্রমণ এবং প্রতিআক্রমণের কথা, যে সমাজে টিকে থাকার জন্য শক্তি এবং কৌশল প্রয়োগ ছিল অপরিহার্য।দাড়িয়াবান্ধা খেলার কিছু আইন কানুন নিচে তুলে ধরা হল :

খেলার মাঠ : বছরের বারোমাস খেলা হয় না বলে নির্ধারিত মাঠ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফসল কাটা জমি অথবা পতিত জমি মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুদলে চারজন করে মোট আটজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারে। স্থানবিশেষে আঁকা ঘরের বিভিন্ন নাম হয় বরিশাল অঞ্চলে এক নং ঘরকে 'রেডি ঘর'। ২ নং ঘরটিকে পাকা ঘর বলা হয়। সতর্কতার সঙ্গে এ ঘর পাহারা দেওয়া হয়।

ঘরের মাঝ বরাবর লম্বা রেখাটিকে শিরদাঁড়া বা খাড়াকোট বলা হয়ে থাকে। প্রস্থ বরাবর রেখাগুলির নাম পাথাল কোট। খাড়াকোট ও পাথাল কোটে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে বাধা হয়। যে পক্ষ প্রথম দান পায়, তারা দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাছে দাইড়া চায়। সম্মতি পাওয়ার সাথে সাথে খেলোয়াড়রা অন্যান্য ঘর ঘুরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে কোনো একজন সব ঘর ঘুরে এসে বদন ঘরে প্রবেশ করলে এক পয়েন্ট হয়। ঘাই তাদের দখলেই থাকে। কিন্তু বিপক্ষদলের হাতে যে কোনো একজন ছোঁয়া গেলে তাদের ঘাই হারাতে হয়। দাড়িয়াবাঁধা খেলার সকল খেলোয়াড়ের সমান দায়িত্ব। একজনের অসতর্কতা বা অক্ষমতার জন্য সমস্ত দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বরং দলীয় স্বার্থে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে সমাজজীবনের আদর্শের পরিচয় বহন করে। খেলার মাঠে কোর্ট কাটা হয়। কোর্টটি ৮০ × ২১ ফুট একটা চৌকা কোর্ট কাটতে হয়। কোর্টের ঠিক মাঝখান দিয়ে

www.pathagar.com

লম্বালম্বিভাবে ১ ফুট চওড়া একটি ঘর দ্বারা কোর্টটিকে যে ভাগ করা হয় সেই দাগদ্বয়কে বলা হয় শির বা কেন্দ্রীয় দুর্গ। কোর্টের ৮০ ফুট লম্বাকে আড়াআড়িভাবে দাগ কেটে ১১ ফুট অন্তর একটা করে ঘর করতে হয়। এই ঘরগুলিকে বলা হয় দুর্গ বা পাতি। এ দুর্গগুলি হবে আয়তাকার। দুর্গগুলির আকার হবে ২১ ফুট ১ ইঞ্চি × ১ ফুট ১ ইঞ্চি। সুর ও দুর্গের সংযোগস্থলে ১৬ ইঞ্চির একটি বর্গাকৃতির ঘর থাকে। কোর্টের দুইপাশের লম্বা রেখাদ্বয়কে বলা হয় সাইড লাইন। এই সাইডন লাইন সাধারণত হয় ২ ইঞ্চি চওড়া।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুসারে দুর্গ সংখ্যা হয় ৭ থেকে ৯টি। প্রয়োজন মতো এই সংখ্যা বাড়ানো যায়। সে ক্ষেত্রে কোর্টও লম্বায় আরো বাড়াতে হবে। তবে কোনোভাবেই তা চওড়ায় ২১ ফিটের কম বা বেশি হবে না। দুটি দুর্গ থেকে ১১ ফিট দূরে সমান্তরাল দুটি লাইন টানা হবে। তবে কোর্টের চারপাশে কমপক্ষে ১০ ফিট জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। দাড়িয়াবাঁধা খেলা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে। একদল থাকে আক্রমণকারী এবং অন্যদল রক্ষণকারী। আক্রমণকারী দলের কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে এবং ফাঁকি দিয়ে একটার পর একটা ঘর অতিক্রম করে যাওয়া। রক্ষণকারী দলের কাজ হবে আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করা অর্থাৎ ঘর বা দুর্গ অতিক্রম করতে না দিয়ে আটকে রাখা এবং নিজ দুর্গ রক্ষা করা। যারা দুর্গ রক্ষা করে তাদেরকে বলা হয় পাতিয়াল।

৭. আনিগুনি খেলা

শিশু দুপায়ে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় ঘুরতে থাকে এবং ছড়া কাটে–

আনিগুনি মাজা ভাই
ডিঙ্গি আনতে মনে নাই
ডিঙি গেছে ভাইস্যা
আমেনা বইছে হাইস্যা।

একসময় সে পড়ে যায়। য়ে বেশি সময় ঘুরতে পারে সে বিজয়ী হয়। এভাবে প্রতিযোগিতা চলে।

৮. পলাপলি/ লুকোচুরি

উপকরণবিহীন খেলাধূলার মধ্যে লুকোচুরি বা স্থানীয়ভাবে পলাপলি নামে পরিচিত খেলাটি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। একাধিক খেলোয়াড় এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বরিশালের গ্রামাঞ্চলে পলাপলি খেলার জন্য বসত বাড়ির আনাচে-কানাচে, উঠোনের বিভিন্ন স্থানসহ আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গল আদর্শ স্থান। এই খেলাটিদে বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণ করে থাকে। খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দের একজনকে চোর করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চোর চিহ্নিত এলাকায় লুকিয়ে পড়ে এবং লুকানো হয়ে গেলে 'পলাপলি কুক' বা 'কুক' ধ্বনির মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

খেলার অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তখন চোর খুঁজতে থাকে। চোর খুঁজে পাওয়া গেলে অন্য একজন আবার চোর হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা চলতে থাকে। শহর এলাকাতেও পলাপলি খেলার বেশ প্রচলন রয়েছে।

৯. ঘোড়দৌড়

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরাদি এবং বাবুগঞ্জ উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চরাদিতে নববর্ষ এবং অগ্রহায়ণ মাসের শেষে মাঠ থেকে ফসল কেটে নেয়ার পর এই ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। নবান্ন বা পৌষ মাসে এই অঞ্চলে একসময় ঘোড়দৌড়ের আয়োজন হতো যা আবারে শুরু হয়েছে।

বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরাদীতে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত ঘোড়দৌড়

এই এলাকায় ১৪/১৫জন ঘোড়া পালনসহ ঘোড়দৌড়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। অপরদিকে স্থানীয়দের আয়োজনে চণ্ডিপুরের ঢালি বাড়ির মাঠে প্রতিবছর ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় মানুষের ঢল নামে। বসে মেলা।

২০১৪ সালে বাবুগঞ্জে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বাকেরগঞ্জের ঘোড়ার মালিক মো. সাইফুল, দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন মো. জুয়েল। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল আলম ফকির, ছাত্রদল নেতা এইচএম তছলিম উদ্দিন, মো. আবুল বাশার, শাহে আলম হাওলাদার, আজিজ শিকদার প্রমুখ। এছাড়া বরিশালের পার্শ্ববর্তী ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর এবং কাঁঠালিয়া উপজেলাতেও মাঝেমধ্যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১০. কানামাছি

এই খেলাটিও শিশু-কিশোরদের একটি দলবদ্ধ জনপ্রিয় খেলা। অতি সামান্য উপকরণ অর্থাৎ সামান্য একটুকরা কাপড় দিয়ে কানামাছি খেলা হয়। শুরুতে খেলার নিয়মানুসারে বিশেষ গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে একজনের চোখে কাপড় বেঁধে তাকে কানামাছি অর্থাৎ অন্ধমাছি নির্বাচন করা হয়। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা বলতে বলতে কানামাছিকে ঘিরে মৃদু চিমটি এবং খোঁচা মারতে থাকে।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাও তাকে ছোঁও

চোখ বাঁধা কানামাছি হাতড়ে হাতড়ে, তাকে উত্যক্ত করা যে কোন একজনকে ধরার চেষ্টা করে। কোনক্রমে একজনকে ধরা গেল ধৃত খেলোয়াড়টি নুতন কানামাছিতে পরিণত হয় এবং নুতন কানামাছিকে ঘিরে নতুন করে খেলা শুরু হয়।

১১. এক্কাদোক্কা

দেশের বিভিন্ন স্থানে এই লৌকিক খেলাটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি বৃহত্তর বরিশালের সর্বত্রই শিশু-কিশোরীদের নিকট এই খেলাটি এক্কাদোক্কা নামে পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণত উঠোন বা ঘরের মেঝেতে দাগ কেটে ছয়টি ঘর এক্কাদোক্কা খেলার জন্য তৈরি করা হয়। এই ঘরগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ ছাড়া মাটির কলসি বা হাঁড়ির ভাঙ্গা সামান্য একটি টুকরো (চারা) এক্কা দোক্কা খেলায় প্রয়োজন হয়। একা কিংবা অনেক মিলে খেলা হলেও এই খেলার হার-জিত ব্যক্তিগত ভাবেই নির্ধারিত হয়।

এক্কাদোক্কা খেলার খেলোয়াড়কে দিতে হয় প্রথমে মাটির চারাটিকে প্রথম ঘরে ছুড়ে দেয়। তারপর এক নিঃশ্বাসে এক পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে টুকরোটিকে নির্দিষ্ট ঘরগুলি ঘুরিয়ে আনতে হয়। এক নিশ্বাসে মাটির টুকরোটিকে প্রত্যেকটি ঘরে ঘুরতে হয় বলে, নিশ্বাসের ব্যাপারটা এই খেলায় গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে এক নিশ্বাসেই যে চারাটি নিয়ে ঘোরা হয়েছে, সেটা বোঝাতে খেলোয়াড়কে মুখ দিয়ে শব্দ করতে হয়। নিশ্বাস ছুটে গেলে খেলোয়াড় খেলার অধিকার হারায়। পর্যায়ক্রমে সকল ঘর ঘোরা হলে এক সময়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সফলকাম খেলোয়াড় একটি একটি করে ঘর কেনার সুযোগ পায়।

ক্রয় করা ঘরের অধিকার ক্রেতার একচেটিয়া। খেলার সময়ে দম হারিয়ে ফেললে বা নির্দিষ্ট ঘর ব্যাতিরেকে খেলোয়াড়ের ছোড়া মাটির টুকরোটি অন্য ঘরে পড়লে কিংবা ঘরের বাইরে অথবা ঘরের সীমানা নির্ধারণ করা দাগের উপর পড়লে সেই খেলোয়াড় খেলার অধিকার হারায় এবং তার পরিবর্তে অন্য একজন সুযোগ পায়। এ রকমভাবে খেলা চলতে থাকে।

১২. উপেন্টি বায়স্কোপ

দক্ষিণাঞ্চলের লোকক্রীড়াসমূহের মধ্যে ছড়াসমৃদ্ধ উপেন্টি বায়স্কোপ খেলাটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই খেলায় ব্যবহৃত ছড়ার প্রথম শব্দদ্বয় থেকে এর

www.pathagar.com

নামকরণ। উপেন্টি বায়স্কোপ প্রধানত গ্রাম্য কিশোরীদের খেলা। দলবদ্ধ এই খেলায় দশ থেকে কুড়ি/পঁচিশজন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে দুজন রাজা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের পর রাজাদ্বয় গোপনে নিজেরা নিজেদের জন্য দুইটি ছদ্মনাম স্থির করে। তারপর তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত উঁচু করে তোরণের মতো তৈরি করে। অবশিষ্টরা সারিবদ্ধভাবে একজনের পেছনে আর একজন দাঁড়িয়ে, সামনের খেলোয়াড়ের কাঁধ বা কোমর ধরে রাজাদের তোরণ পার হওয়া শুরু করে। এ সময়ে রাজাদ্বয় সমস্বরে উপেন্টি বায়স্কোপ।

লাইনটানা তেইস্কোপ
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেববাবুর বৈঠকখানা
আজ কইছে যাইতে
পান সুপারী খাইতে
পানের আগায়
মরিচ বাড়া
ইস্প্রিংয়ের ছবি আড়া
যার নাম মনিমালা
তার দেবো মুক্তার মালা

ছড়া বলতে বলতে তাদের হাতের নিচে সেই সময়ে অবস্থান করা খেলোয়াড়ের গলায় মালার মতো হাত নামিয়ে আনে। গলায় মালা পরানো খেলোয়াড়কে অন্যদের থেকে একটু দূরে নিয়ে রাজাদ্বয় তাদের ছদ্মনাম থেকে একটি পছন্দ করতে বলে। যার নামটি পছন্দ করা হবে, ওই খেলোয়াড় তার দলের হয়ে যাবে এবং সে দল থেকে বেরিয়ে আলাদা দাঁড়াবে।

পরবর্তী সময়ে নূতন করে ছড়া শুরু করে খেলা আরম্ভ হবে। এভাবে শেষ পর্যায়ে যে রাজার দল ভারি হবে সে বিজয়ী হবে। এলাকা ভেদে উপেন্টি বায়স্কোপ খেলার ছড়ার বাক্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৩. এলাটিং বেলাটিং

এই খেলাটি পলাপলি খেলার অনুরূপ। পার্থক্যের মধ্যে এলাটিং বেলাটিং খেলায় ছড়ার ব্যবহার থাকে। শিশু এবং কিশোরীদের কাছে এলাটিং বেলাটিং অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। যে কোন সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে এই খেলা শুরু হতে পারে। প্রথমে খেলোয়াড়েরা বৃত্তকারে দাঁড়ায়। তারপর তাদের মধ্যে যে কোন একজন–

এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং চোর
মাইফোর বিফোর ফট্টিফোর
ইস্টিশনের মিষ্টিকুল
সখের বাগান গোলাপ ফুল

www.pathagar.com

ছড়াটির এক একটি শব্দ এক একজন খেলোয়াড়কে উদ্দেশ্য করে আবৃত্তি করতে থাকে। যে খেলোয়াড়ের কাছে ছড়ার শেষ শব্দ 'ফুল' উচ্চারিত হবে, তাকে বাদ দিয়ে নুতন করে আবার ছড়া আবৃত্তি শুরু হবে।

এভাবে যখন শুধুমাত্র একজন অবশিষ্ট থাকবে, সেইজনই চোর হয়ে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে পড়া অন্য সকল খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করবে। সকলকে খুঁজে বের করার পর খেলার সমাপ্তি ঘটবে।

১৪. কোইল্যা

উপকরণবিহীন বিভিন্ন রকমের কথোপকথনের এই খেলাটি বেশ জনপ্রিয়। আঞ্চলিক ভাষায় কোকিলকে কোহিলা, কোইল্যা ইত্যাদি বলা হয়, সেখান থেকে এই খেলার নামকরণ করা হয়েছে। দশ থেকে পনেরজন বালক/ বালিকা মিলে এই খেলাটি খেলে থাকে। শুরুতে একজন কোইল্যা নির্বাচিত হয়। বাকি খেলোয়াড়েরা পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে। এরপর কোইল্যা বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নার ভান করলে বৃত্তাবদ্ধ খেলোয়াড়দের যে কোনো একজন কোইল্যাকে প্রশ্ন করে :

খেলোয়াড়েরা : নাম কিরে তোর?
কোইল্যা : কোইল্যা।
খেলোয়াড়েরা : কান্দ ক্যা?
কোইল্যা : এট্টা পুহইরের লইগ্যা।
খেলোয়াড়েরা : পুহইর দিয়া কি করবি?
কোইল্যা : ডিম পারমু।
খেলোয়াড়েরা : এই পুহইর দ্যাহো না?
কোইল্যা : এডা ছোড।
খেলোয়াড়েরা : টাহা দেলে বড় হইয়া যাইবে।

খেলার এ পর্যায়ে কোইল্যা খেলোয়াড়দের তৈরি বৃত্তের মধ্যে কিছু টাকা ফেলে দেয়ার ভান করে। গায়ে গা লাগানো খেলোয়াড়েরা তখন পরস্পরের হাত ধরে বৃত্তের পরিধি বৃদ্ধি করে। কোইল্যা বিভিন্ন জায়গা অর্থাৎ খেলোয়াড়দের হাতের নিচ থেকে পুকুরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাল-বাহানার মাধ্যমে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত কোইল্যা জোর করে পুকুরে ঢুকে পড়ে। এ সময় শেষ চেষ্টা হিসেবে খেলোয়াড়েরা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তায় ধোঁকা দিয়ে পুকুর থেকে বের করে কোনো একটা কাজের জন্য দূরে পাঠিয়ে দেয়। কোইল্যা পুকুর থেকে বের হওয়ার পরপরই খেলোয়াড়েরা তার পাড়া ডিম খেয়ে ফেলার ভান করে পালিয়ে যায়। কাজ শেষ করে ফিরে এসে ডিম না দেখে ক্ষিপ্ত কোইল্যা খেলোয়াড়দের ধরতে চেষ্টা করে।

১৫. চার গুটি বা পচা কুমড়া খেলা

বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের মেয়েদের একটি প্রিয় খেলা চার গুটি বা পচা কুমড়া খেলা। বৃষ্টির দিনে এই খেলাটি বেশি দেখা যায়। মেঝে বা টেবিলের উপরও খেলা যায়।

www.pathagar.com

খেলার উপকরণ হিসেবে দরকার হয় চারটি গুটি। পাকা খেজুরের দুটি বিচি ফালি করলে চারটি অংশ পাওয়া যায় তা দিয়ে এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেজুরের বিচি পাওয়া না গেলে আধা ইঞ্চির মতো লম্বা পাটখড়ির দুটি টুকরোকে সমান দুই ফালি করলেও চারটি গুটি পাওয়া যায়। গুটি চালে যে সবচেয়ে আগে ১০০ পয়েন্ট যোগাড় করতে পারে সে খেলায় প্রথম হয় এবং যে সর্বশেষ থাকে সে খেলায় হেরে যায়। যে কোনো সংখ্যক ছেলেমেয়ে এ খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। শুরুতেই কোনো খেলোয়াড় পয়েন্ট পায় না। যতক্ষণ না সে একসাথে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে।

গুটি চাললে কোনো খেলোয়াড়ের চারটি গুটিই যদি উপুড় হয়ে পড়ে তা হলে সে চার পয়েন্ট পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে একচালে চার পয়েন্ট যোগাড় করতে না পারে তাকে ক্রমাগতভাবে সকল খেলোয়াড়ের চাল ঘুরে তার কাছে গুটি আসা পর্যন্ত চাল দিয়ে যেতে হয়।

একচালে চার পয়েন্ট পাওয়ার পর সে পরপর চাল দিতে পারে ও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে। যদি সে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তা হলে পরের খেলোয়াড় চাল দেবে। চালে যদি সব গুটি চিৎ হয়ে পড়ে তা হলে চালদানকারী খেলোয়াড় আট পয়েন্ট পাবে।

যদি দুইটি গুটি উপুড় ও দুইটি গুটি চিৎ হয়ে পড়ে তা হলে সে যে কোনো একটি গুটিকে টোকা দিয়ে অন্য একটি গুটিতে লাগাতে পারলে তার এক পয়েন্ট হবে। এ পয়েন্ট পেতে হলে দুই জোড়া গুটিকেই টোকা দিয়ে একটির সাথে অপরটি লাগাতে হবে। টোকা দিতে গিয়ে যদি তিনটি গুটিতে লেগে যায় তা হলে সে কোনো পয়েন্টই পাবে না বরং পরবর্তী খেলোয়াড়কে চাল দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ঘুঁটি চাললে যদি একটি গুটি উপুড় ও তিনটি গুটি চিৎ হয়ে থাকে কিংবা একটি গুটি চিৎ ও তিনটি গুটি উপুড় হয়ে পড়ে তা হলে সে কোনো পয়েন্ট পাবে না এবং গুটিতে টোকা দিয়ে পয়েন্ট সংগ্রহ করার সুযোগ পাবে না। এ ধরনের চাল পড়লে পরবর্তী খেলোয়াড় চাল দেওয়ার সুযোগ পাবে।

এভাবে খেলা চলতে থাকে। পিরোজপুরে এ খেলাটি পচা কুমড়া খেলা নামে পরিচিত। মেয়েদের সাথে অনেক সময় ছেলেরাও এ খেলায় অংশ নেয়। মাঝে মাঝে বয়স্কদেরও এ খেলা খেলতে দেখা যায়। সর্বপ্রথম যে পূর্ণ পয়েন্ট পায় সে খেলায় বিজয়ী হয়। একই নিয়মে পরবর্তী স্থানসমূহ নির্ধারণ হয়।

১৬. মোরগের লড়াই

বাড়ির আঙিনায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোরগের লড়াই খেলা প্রতিযোগিতা আকারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আট দশজন বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বাম হাতে বাম পা গুটিয়ে গোড়ালি ধরে রাখে। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত বুকের কাছে রেখে পরস্পর পরস্পরকে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কাঁধের সাহায্যে আঘাত করে। এই বেষ্টনীতে এলোপাথারি আক্রমণে নির্দিষ্ট ভঙ্গি বজায় রেখে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সেই বিজয়ী হয়। এটি শক্তি প্রদর্শন এবং কৌশলগত খেরা।

www.pathagar.com

১৭. মার্বেল খেলা

মার্বেল কিশোরদের জনপ্রিয় একটি খোলা। বরিশাল অঞ্চল ছাড়াও দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই খেলার প্রচলন আছে। চাল দিয়ে গর্তে মার্বেল ফেলা একটি জনপ্রিয় খলা। এ খেলায় বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অংশ নিতে পারে। সমাতল ভূমির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট গর্ত খুঁড়তে হয়। খেলোয়াড়রা যে জায়গা থেকে মার্বেল ফেলে গর্তে ফেলার চেষ্টা করবে সেখানে একটি আড়াআড়ি দাগ দিতে হয়। গর্ত থেকে ১২-১৪ ফিট দূরে মাটিতে এই দাগ দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের বয়স কম হলে গর্ত থেকে দাগের দূরত্ব কমান যেতে পারে। এ দাগ থেকে ৮-১০ ফিট দূরে গর্তের সামনে আরেকটি দাগ দিতে হয়। প্রথম চাল কে দেবে তা নির্ধারিত হয় মীর নির্ধারণের মাধ্যমে। মীর নির্ধারণ করা হয়– সব খেলোয়াড় একই দূরত্ব থেকে একটি গর্তের দিকে মার্বেল ছোড়ে। যার মার্বেল গর্তের সবচেয়ে কাছে যাবে সেই মীর অর্থৎ প্রথম চাল দেবে এবং সব মার্বেল একসাথে নিয়ে গর্তের দিকে ছুড়ে মারবে। যেসব মার্বেল সরাসরি গর্তে পড়বে সেগুলিকে নিয়ে নেবে। সে অন্যান্য মার্বেল জিততে পারবে কিনা বা কয়টি মার্বেল জিতবে তা নির্ভর করে কিছু শর্ত ও খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের ওপর।

যদি খেলোয়াড় সব মার্বেলকে গর্তের সামনের দাগ অতিক্রম করাতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে খেলোয়াড় যে কয়টি মার্বেল গর্তে ফেলেছিল শুধুমাত্র সেই মার্বেলগুলি পাবে। কিন্তু যে কয়টি মার্বেল দাগ অতিক্রম করেনি তাকে ততগুলি মার্বেল জরিমানা দিতে হবে। যদি সব মার্বেল দাগ অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে যে মার্বেলগুলি গর্তে পড়েছে খেলোয়াড় সেগুলির মালিক হবে। চাল দেওয়ার দাগ থেকে একটি মার্বেল ছুড়ে অন্য মার্বেলকে লাগাতে পারলে সেই মার্বেলগুলি জিতে নেবে। ছুড়ে দেয়া মার্বেল যদি একাধিক মার্বেলকে আঘাত করে তা হলে সে কোনো মার্বেল জিততে পারবে না, বরং ফাইন বা দণ্ডি দিতে হবে। একটি বাদে যে কয়টি মার্বেলকে তার ছুড়ে দেওয়া মার্বেল আঘাত করেছে তাকে সেই কয়টি মার্বেল দণ্ডি দিতে হবে। এরপর চাল দিবে পরবর্তী খেলোয়াড়। হিট করে মার্বেল নেওয়ার অনেকগুলি নিয়ম আছে। যেমন খেলোয়াড় নিজের পছন্দমত মার্বেল আঘাত করে জিতে নিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য মার্বেল, আঘাত পর পর যে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে পারবে খেলোয়াড় সে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে বলে। সে যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে পারে এবং তার ছুড়ে দেওয়া মার্বেল যদি অন্য মার্বেলকে আঘাত না করে তা হলে সে সবগুলো মার্বেলের মালিক হবে। যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে কোনো মার্বেল পাবে না। এরপর অন্য খেলোয়াড় চাল দেওয়ার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে সাধারণত দূরের বা কাছাকাছি অবস্থানরত মার্বেলের কোনো একটিকে আঘাত করতে বলা হয়।

প্রতিপক্ষের দলের খেলোয়াড় কর্তৃক চিহ্নিত মার্বেলকে আঘাত করতে হবে। আঘাত করতে গিয়ে সে যদি অন্য মার্বেলকে আঘাত করে তা হলে যে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করেছে সে কয়টি মার্বেল ফাইন বা দণ্ডি দিতে হবে। যখন সবগুলি মার্বেল খেলোয়াড়রা জিতে নেয় তখন প্রথম রাউন্ডের খেলা সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু

www.pathagar.com

করার জন্য পুনরায় সব খেলোয়াড়কে সমানসংখ্যক মার্বেল জমা দিতে হয়। খেলা শুরুর পূর্বে কার কতগুলি মার্বেল আছে তা দেখতে হয়। একটি নির্দিষ্টসংখ্যক মার্বেল না থাকলে একজন খেলায় অংশ নিতে পারে না। সর্বনিম্নসংখ্যক মার্বেল কয়টি হবে তা নির্ভর করে প্রতি রাউন্ডে একজন খেলোয়াড়কে কমপক্ষে কতটি মার্বেল জমা দিতে হয় তার ওপর।

১৮. ইচিংবিচিং বা বিঘাত বিঘাত খেলা

উঠানে কিংবা খোলা মাঠে কিশোর ও শিশুদের প্রিয় খেলা ইচিংবিচিং অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়দের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। এ খেলায় তিনের অধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারে। সব খেলোয়াড় একত্রিত হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বুড়ি নির্বাচন করে। বুড়ি নির্বাচন পদ্ধতিও কিছুটা আলাদা হতে পারে। তবে যেকোন প্রকারে নির্বাচন করলেই হয়। বুড়ি প্রথমে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে বসবে। খেলোয়াড় বুড়ির পা ডিঙিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যাবে। সবার একবার যাওয়া শেষ হলে বুড়ি পায়ের ওপর পা, তার ওপর এক হাতের পাঞ্জা বিঘাত আকারে আড় করে রাখবে। খেলোয়াড়রা সেটাও ডিঙিয়ে যাবে। এরপর বুড়ি পায়ের ওপর হাতের বিঘাত, তার ওপরে অন্য হাতের বিঘাত রাখবে। খেলোয়াড় সেটাও ডিঙিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যাবে। এরপরে বুড়ি দুই পা ফাঁক করে ছড়িয়ে বসবে। একজন একজন করে খেলোয়াড় বুড়ির পায়ের ভেতর এক পা বাইরে এক পা ভেতরে দিয়ে লাফাতে থাকবে এবং ছড়া কাটবে

ইচিং বিচিং চিচিং ছা
প্রজাপতি উড়ে যা।

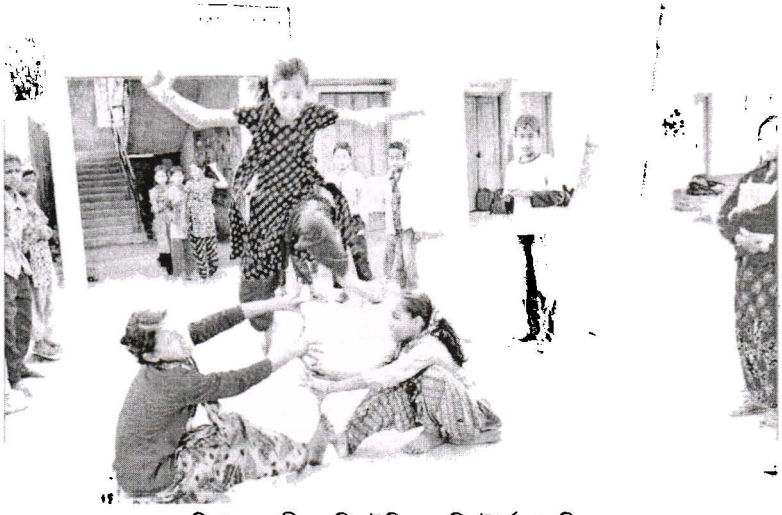

বরিশাল নগরীর দলিলউদ্দিন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বিরতিতে ইচিংবিচিং খেলছে

www.pathagar.com

বরিশাল জেলায় ইচিংবিচিং বা বিঘাত বিঘাত খেলায় প্রচলিত অন্য একটি ছড়া :

পড়ে না পড়ে না ডাবের পানি
আমি হবো ওমর সানি
ঢাকা যাইয়া মান্না হবো
মৌসুমির হাত ধরে ঘুরে বেড়াবো
মৌসুমি পড়েছে পাতলা শাড়ি
ইচ্ছে করে তারে কিল মারি।

যে বেশি সময় লাফাবে সে খেলায় জিতবে। খেলোয়াড়কে একটা কথা মনে রাখতে হয় যে, পা ডিঙানোর সময় বুড়ির পা স্পর্শ করলেই সে বাদ যাবে।

১৯. লাঠিখেলা

লোক খেলাধুলার মধ্যে লাঠিখেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা লাঠি খেলা। এ খেলায় একসাথে অংশগ্রহণ করতে পারে সবচেয়ে বেশি মানুষ। লাঠিখেলার জন্য প্রয়োজন হয় বাদকের দল। তারা লাঠিখেলার উপযোগী সুর তুলে বাদ্যযন্ত্রে। অনেক দূর থেকে শোনা যায় ঢাকের শব্দ। শব্দ শুনেই বোঝা যায় কি ধরণের লাঠিখেলা হচ্ছে।

লাঠিখেলার আয়োজন চলে বেশ কয়েকদিন আগে থেকে। ওস্তাদরা খেলা বা প্রতিযোগিতার আগে আয়োজন করেন প্রশিক্ষণ। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ মাঠে, ১৯ ডিসেম্বর মেহেন্দিগঞ্জ মুক্ত দিবস উপলক্ষে লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিজয় দিবসকে সামনে রেখে বরিশাল জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লাঠি খেলার আয়োজন করে আসছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। লাঠিখেলার জন্য লাঠি ছাড়াও প্রয়োজন সরকি, বানরি, ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি। লাঠিখেলার জন্য তিন ধরনের লাঠি প্রয়োজন। এর আকার, ব্যবহার ও তৈরি কৌশল ভিন্ন। এই তিন ধরনের লাঠি হচ্ছে–ছোট চিকন লাঠি স্থানীয় ভাষায় নড়ি নামে পরিচিতি, মাঝারি আকারের লাঠি এবং বড় লাঠি।

চিকন বা নড়ি লাঠি বাঁশের ফালি দিয়ে তেরি করা হয়। এর দৈর্ঘ ৪ ফিটের বেশি নয়। বড় বাঁশকে ৪-৬ ফালি করে ফালিগুলিকে বিশেষ কায়দায় ছেঁচে এই লাঠি তৈরি করা হয়। লাঠি খেলার আগে শতাধিক লাঠি বানিয়ে রাখরতে হয়। মাঝারি লাঠির দৈর্ঘ ৫ থেকে ৬ ফিট। বাঁশের আগার অংশ দিয়ে এই লাঠি তৈরি করা হয়। লাঠি খেলায় অর্ধ শতাধিক মাঝারি লাঠি প্রয়োজন।

বড় লাঠি লাঠিয়ালরা নিজ উদ্যোগে তৈরি করেন। বাঁশ কেটে আগুনে তাপ দিয়ে এবং তেল দিয়ে বিশেষভাবে এই লাঠি তৈরি করতে হয়। অনেক লাঠিয়াল উত্তরাধিকার সূত্রে এই ধরণের লাঠির মালিক হন। লাঠিকে তেল, মাখন, ঘি দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয় যা এক'শ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। এ লাঠিগুলি দিয়ে লাঠিয়ালরা লাঠি চালানোর নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করে। লাঠিয়ালরা এমন কায়দায় এত দ্রুততার সাথে লাঠি ঘুরাতে পারে যে লাঠি দেখা যায় না। এমনকি দশ বারোজন মানুষও যদি লাঠিয়ালকে আঘাত করে, তা লাঠিয়ালের শরীরে লাগে না।

www.pathagar.com

বিজয় দিবসে বাবুগঞ্জ কলেজ মাঠে লাঠিখেলা

লাঠিয়ালরা লাঠি খেলার জন্য আগেই হিসেব করে কোনো বাড়িতে লাঠি খেললে কেমন উপহার বা টাকা পাওয়া যাবে। যে বাড়ি লাঠিখেলার আয়োজন করা হয় সে বাড়িতে ঢাক ঢোল ও লাঠিখেলার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়। লাঠিয়ালরা বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়ে খেলা শুরুর প্রস্তুতি নেয়। বাজনাদারদের ছায়াযুক্ত জায়গা বা শামিয়ানার নিচে বসানো হয়। বাজনাদাররা খেলা শুরুর পূর্বেই বাজানো শুরু করে। ঢাকঢোলের শব্দে আশপাশের লোক বুঝতে পারে কোন বাড়িতে লাঠিখেলা হবে। লাইন দিয়ে লোকজন খেলা দেখার জন্য আসতে শুরু করে। লাঠিখেলা শুরু করার পূর্বে খেলোয়াড়রা লাঠি, সরকি, বানরি, ঢাল হাতে নামে মাঠে। বাদ্যের তালে তালে নাচতে থাকে। মাঠের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে আবার কখনো কখনো দুই দলের বিশেষ খেলোয়াড়রা নামতে থাকে। প্রথমে নামে চিকন লাঠি খেলোয়াড়, তারপর মাঝারি এবং পরে বড় লাঠি খেলোয়াড়রা।

চিকন লাঠি বা মাঝারি লাঠির খেলার নিয়মে মোটামুটি একই ধরনের। তবে দুই ধরনের লাঠি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়রা জোড়ায় জোড়ায় মাঠে নামে এবং পরে পক্ষ-বিপক্ষ দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একজন খেলোয়াড় অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কখনো এক দলে, ২, ৩ বা ৪জন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। খেলা শুরুর পূর্বে তারা চক্রাকারে বিভিন্ন ধরনের নাচে অংশগ্রহণ করে।

নাচের সময় একপক্ষ অন্যপক্ষের দিকে ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি দেখায়। এরপর একে অপরকে আক্রমণ করে। আক্রমণ পালা আক্রমণ করে একে অপরকে পরাভূত করার

www.pathagar.com

চেষ্টা করে। আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে লাঠির বাড়ি। প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়রা সুযোগ পেলেও শারীরিক আঘাত না করারই চেষ্টা করে। যখন একদল একাধিক খেলোয়াড় অপর দলের একাধিক খেলোয়াড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তখন খেলার সমাপ্তি হয় দ্বৈত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। অর্থাৎ একদলের একজনের সাথে অপর দলের অন্য একজন খেলোয়াড় একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যে পরাজিত হয় সে দুহাত তুলে আত্মসমর্পণ করে বা দাঁড়িয়ে মাঠ ত্যাগ করে। আঞ্চলিক লাঠি খেলায় ঢোল, কাসাঁর থালা, পিতলের হাড়ি, কার্সি বাজানো হয়। বড় আয়োজনে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অঞ্চলভেদে লাঠি খেলায় গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

এই গান প্রধানত দুই ধরণের। দলীয় বা কেরাস, দ্বিতীয়ত কাহিনীনির্ভর ও নাট্যভঙ্গীমাযুক্ত গান। নিচে এমন একটি গান তুলে ধরা হল যা খেলা শেষে বিদায় নেয়ার সময় গাওয়া হয় :

বিসমিল্লাহ বলিয়া শুরু করলাম ভাই
হাজার হাজার দর্শককে সালাম জানাই ॥
ওরে হাতের লাঠি পায়েল পানজরি সালাম জানাই চরণে
ওস্তাদ মানিয়া সালাম জানাই শিক্ষাগুরুর চরণে ॥
ওস্তাদ আমাগো খোরশেদ মিয়া সালাম জানাই সপাটে
চিনলেও চিনতে পারেন বদরপুরে তার বাড়ি ॥

[এসময় দোহাররা ধুয়া তোলে এবং লাঠিয়ালদের পায়ে বাধা ঘুঙুর তালে তালে বেজে ওঠে। একই সাথে বাজতে থাকে বাদ্যযন্ত্রগুলো।]

আসসালামু আলাইকুম সালামগো এইনা সবার মাঝে
বল এইনা সবার মাঝে ॥
ওই হোনায় হোনায় হুনছিগো –ওই ঘরের
ওই বড়মিয়া বড় ভাগ্যবান।
বল বেশ বেশ বেশ ॥
ধনে জনে গানে গানে বাড়াবে খোদায়।
বল বেশ বেশ বেশ ॥
আমরা কি আর করব দয়া, করবে লক্ষ্মী মা।
বল বেশ বেশ বেশ ॥
ওরে জলদি করে করেন বিদায় গো।
বল বেশ বেশ বেশ ॥
এই না সবার মাঝে
ওই ঘরের বড় মিয়া বড় ভাগ্যবান।
বল বেশ বেশ বেশ ॥
আমাগোরে করছেন যে হাজার টাহা দান।
বল বেশ বেশ বেশ ॥

www.pathagar.com

২০. ঘুড়ি উড়ানো

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুড়ি উড়ানো লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে অন্যতম। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সি মানুষের রয়েছে ঘুড়ি উড়ানোর শখ। ঘুড়ি উড়ানোকে কেন্দ্র করে উৎসবেরও আয়োজন চলে। এ অঞ্চলেও ঘুড়ি উৎসবের প্রচলন রয়েছে।

আগৈলঝাড়া : উপজেলার কোদালধোয়ায় ঐতিহ্যাসিক ঘুড়ি উৎসব

২১. পাঁচগুটি

পাঁচটি ইটের টুকরা অথবা মাটির গুটি খেলার প্রধান উপকরণ। ছেলেমেয়েরা প্রথমে এই গুটি পাঁচটি হাতে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর মাটিতে ছড়ানো গুটিগুলো থেকে একটি হাতে নিয়ে তা উপরে ছুড়ে দেয়। ছুড়ে দেয়া গুটিটি পড়ার আগেই ওই গুটিসহ মাটিতে ছড়ানো গুটিগুলো তুলতে হয়। মাটি থেকে ছড়ানো গুটিগুলো খুঁটেখুঁটে তুলতে হয় বলে এই খেলাটি খোঁটাখুঁটি খেলা নামেও পরিচিত।

প্রথমে ৫টি গুটি হাতে নিয়ে মাটিতে ফেলে, তারপর মাটি থেকে একটি গুটি হাতে নিয়ে উপর দিকে মেরে মাটি থেকে একটা গুটি হাতে নিয়ে উপরের গুটটি হাতে নেয়। এভাবে একটা একটা করে মাটি থেকে সব গুটি হাতে নিতে হবে তাকে বলে 'একাই'। তারপর আবার ৫টি গুটি হাতে নিয়ে মাটিতে মেরে ১টা হাতে নিয়ে উপর থেকে মেরে ২টা-২টা করে হাতে নেয় তাকে বলে 'দোলাই'। ৫টি গুটি হাতে নিয়ে মাটিতে মেরে মাটি থেকে ১টা গুটি হাতে নিয়ে উপরে মেরে, মাটি থেকে একটা গুটি হাতে নিবে

www.pathagar.com

আবার ১টা গুটি উপরে মেরে, বাকি ৩টা গুটি মাটি থেকে হাতে নেয়। যাকে বলে 'তিনাই'। পাঁচটি গুটি মাটিতে মেরে ১টা গুটি হাতে নিয়ে উপরে মেরে মাটি থেকে ৪টা গুটি হাতে নেয়া হলে তাকে বলে 'চারাই'। তারপর ৫টি গুটি হাতে নিয়ে উপরে মেরে হাতের উপর থেকে পরার সময় হাতের পিঠে নিবে, পিঠ থেকে আবার উপরে মেরে হাতের ভিতরে নিবে তাকে বলে 'পঞ্চম'। তারপর ৫টি গুটি মাটিতে মেরে, বাম হাত মাটিতে বাঁশের সাঁকোর মতো করে রেখে বিপক্ষের ছেলে বা মেয়েটি মাটি থেকে একটা গুটি মেরে কুত্তা বাদ রেখে হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ১টা ১টা করে সব গুটি ঢুকাবে তারপর কুত্তা ঢুকাবে। তাবে বলে 'কুত্তা'। তারপর ৫টি গুটি আবার হাতে নিয়ে উপরে মেরে হাতের পিঠে নিবে এবং হাতের পিঠ থেকে উপরে মেরে হাতের ভিতরে নিবে। যাকে বলে 'লাগা'। ১ গুটিই ১টা লাগা। যদি ৫টা ধরতে পারে তা হলে ১০টা লাগা হবে, এইভাবে জয় পরাজয় হয়।

তথ্যসহায়ক

১. *হুমায়ূন রহমান*, বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা, গাউছিয়া প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯।
২. *সাইফুল আহসান বুলবুল*, বৃহত্তর বরিশালের লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০।
৩. *আবদুল হামিদ*, গ্রাম বাংলার খেলাধুলা, মেইন স্ট্রিম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০ ।
৪. আতিকুর রহমান হিমু, মেহেন্দিগঞ্জ বন্দর, মেহেন্দিগঞ্জ।
৫. অজয় সন্যামত, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
৬. মো. ফারুক মল্লিক, চরাদি, বাকরগঞ্জ।
৭. অবনী চক্রবর্তী, বাখরকাঠি, নলছিটি, ঝালকাঠি।
৮. মো. আরিফুর রহমান, বরিশাল।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

লোকবাংলার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ুর উপর নির্ভর করে প্রাচীনকাল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পেশার। ওই সব পেশার বেশ কিছু বংশপরম্পরায় চলে আসছে। শিক্ষা অগ্রগতির সাথে সাথে বংশপরম্পরাগত পেশায় ঘটেছে পরিবর্তন, সংযুক্ত হয়েছে নতুনরূপ বা কৌশল। আবার বরিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটেছে। তারা নিয়ে এসেছে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বেশ কিছু লোকপেশাজীবী গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। তারা সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে পেশা অনুযায়ী কাজ করছে।

পলিবিধৌত জমির উর্বরাশক্তির কারণে এবং বৃহৎশিল্প কারখানা না গড়ে ওঠায় বরিশাল তথা দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীর পেশা কৃষকাজ বা কৃষিনির্ভর কাজ। দক্ষিণাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জনই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। নদী আধিক্যের কারণে জেলে, মাঝির পাশাপাশি শতকরা ২০ জন বিভিন্ন গৌণ পেশার উপর নির্ভরশীল।

বরিশাল জেলার অন্যান্য লোকপেশাজীবী গ্রুপের মধ্যে তাঁতী, দর্জি, আমিন, বাধাইকার, বৈদ্য বা হেকিম, কশাই, ধাঙর, হাজাম, দেহপসারিনী, চৌকিদার, ছাতিয়াল, জ্যোতিষ, ফেরিওয়ালা, রাখাল, ডোম, পাহাড়াদার, চুনারী অন্যতম। অবশ্য এই গ্রুপ লোকবাংলার সর্বত্রই রয়েছে। তদুপরি বরিশাল অঞ্চলের বেশ কয়েকটি পেশাজীবী গ্রুপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল:

১. বাড়ৈ/বারুজীবী/পান চাষি

পান বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বরিশাল অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই পানের চাষ হয়ে আসছে মধ্যযুগ থেকে। জেলার পানচাষের অন্যতম স্থান গৌরনদী উপজেলা। এরমধ্যে টরকী বন্দরের রামসিদ্ধি গ্রামের শতভাগ মানুষ পানচাষের উপর নির্ভরশীল।

পানবরজ তৈরিতে লোক উপকরণের ব্যবহার

পান চাষের জন্য প্রথমে বরজ তৈরি করতে হয়। বরজের আয়তন ন্যূনতম এক শতাংশের হতে হয়। এক বিঘার বরজে ৫০ কুড়ি (এক হাজারটি) গাছ লাগানো সম্ভব। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী এক বিঘার বরজ তৈরি এবং পান রোপন করতে ১০ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়। একবার বরজ তৈরি হলে ঝড়-বৃষ্টিতে না ভাঙলে সেখানে ১৫ থকে ২০ বছর অবধি পান চাষ করা যায়।

www.pathagar.com

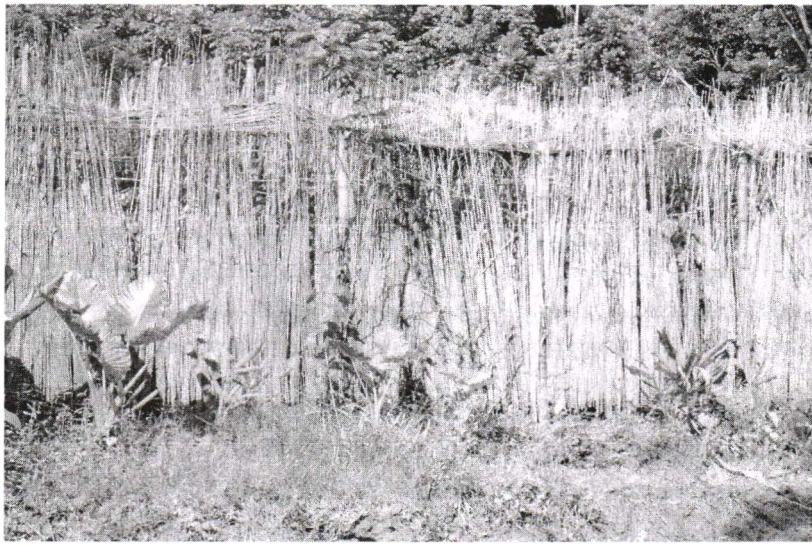

পানের বরজ

সাধারণত এটেল মাটিতে পানের চাষ হয়। পানবরজে যাতে পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পান জন্মাতে অধিক চাষের প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে ক্ষণার বচনে উল্লেখ আছে–

ষোল চাষে মূলা
তার অর্ধেক তুলা।
তার অর্ধেক ধান
বিনাচাষে পান ॥

বরজের ভেতরকার মাটিতে সারিবদ্ধভাবে পানের গাছ রোপন করা হয়। বরজ তৈরিতে প্রয়োজন বাঁশ, ঝাটি (নলখাগড়া বিশেষ), শন, নাড়া, পাটখড়ি এবং বাধার জন্য কৈয়া লতা, নারকেলের চুমুর বা গুনা। বর্গাকার ঘরের চারদিক আটকানে বরজের মূলখুঁটি বাঁশ দিয়ে দেয়া হয়। বেড়া দেয়া হয় পাটখড়ি, ঝাটি বাঁশের চেড়া দিয়ে। বরজের ছাদের অংশে সাধারণত শন, নাড়া ব্যবহার করা হয়। বাধার জন্য বর্তমানে গুনা ব্যবহার করা হলেও আজো লম্বা করে কাটা নারকেলের চুমুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থান ভেদে বাধার ক্ষেত্রে কৈয়া লতার ব্যবহারও লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে কৈয়া লতা দিয়ে বরজের বেড়া বাধার কাজ করা হয়। যারা পানবরজে সহযোগী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তাদের বলা হয় গুজি। বর্তমানে একজন গুজির দৈনিক পারিশ্রমিক ৪ শো টাকা। যা অন্যান্য দিনমজুরদের তুলনায় বেশি।

সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বরজ তৈরি এবং পান রোপন করা হয়ে থাকে। বরজ তৈরি করার পর পানামী করে (পানেরে করি প্রণাম বলে এবং বরজ ও

www.pathagar.com

মাটি প্রণাম করে) হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পানচাষিরা চারা রোপন করেন। পানের প্রথম চারার সাথে হলুদ, কলমী, কচু ও কানাইলতা রোপন করা হয়। এসময় সাধারণত পুরুষরাই বরজের ভেতর প্রবেশ করেন। নারীরা বরজের বাইরে দাঁড়িয়ে বলেন– আমি অশৌচ অবস্থায় বরজের ভেতরে ঢুকলাম না। তবে আজকাল হিন্দু নারীরা ধোয়া কাপড়- চোপর পরিহিত অবস্থায় বরজে প্রবেশ করেন এবং বরজে কাজ করে থাকেন। তবে মুসলামান সম্প্রদায়ের পানচাষিদের মধ্যে এমন সংস্কার নেই। এই অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বারুজীবী বা বাড়ৈরা পানচাষের সাথে সম্পৃক্ত। যাদের জমি রয়েছে এবং কয়েক পুরুষের বসতি একই এলাকায় এমন অধিকাংশ বাড়ৈ বংশপরম্পরায় পান চাষ করে আসছেন।

পান খাবারের বিভিন্ন উপকরণ

পানের উৎপাদন ভালা হবার আশায় চারা রোপনের দিন বা দুএক দিনের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের পানচাষিরা স্বস্তিমূলক রয়ানী (মনসা মঙ্গল গানের আসর) দেন। বর্ধিষ্ণু মুসলিম পানচাষিদের মধ্যে এক্ষেত্রে অনেকে মিলাদ পড়ান। কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে অনেকে বরজে তাবিজ ঝুলিয়ে রাখেন। এক্ষেত্রে বরজের মধ্যে দুএকটি অশ্বগাছ রোপন করার রীতি রয়েছে পূর্বপুরুষের বিশ্বাস অনুযায়ী। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে বরজে মনসা পূজা দিয়ে থাকেন। যাতে বরজে থাকা সাপ মানুষকে দংশন না করে। তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পানবরজে চৈত্রসংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখে পূজা দেয়ার রীতিও লক্ষ করা যায়। আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা এলাকায় বরজে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশির্বাদসূচক গান কয়েক বছর আগেও গাওয়া হত বলে স্থানীয় পান চাষিরা

www.pathagar.com

জানিয়েছেন। পান চাষিদের বিশ্বাস অনুযায়ী বরজের মধ্যে সাপ মারা নিষেধ। নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত শিয়াল এবং বাগদাস প্রজাতির প্রাণী পানবরজকে বেছে নেয় বাস করা, প্রজনন এবং বংশ বিস্তারের জন্য। পানচাষিরা বরজে কোন প্রাণীকে হত্যা না করায় জীববৈচিত্র রক্ষার অন্যতম স্থান হয়ে ওঠে বরজ। একইসাথে পানবরজ টুনটুনি পাখির বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। দুটি পানপাতাকে মোচার মতো পেঁচিয়ে এরা বাসা বানায়। পানচাষিরা কখনো ওই বাসা না ভাঙে তা সংরক্ষণ করে। তাদের বিশ্বাস– বরজে টুনটুনির যত বাসা তত টাকা।

পান বরজে পানের পাশাপাশি আরো কিছু ফসল ফলানো হয়। এর মধ্য মরিচ অন্যতম। বরজে জন্মানো মরিচকে বাড়ৈয়া মরিচ বলা হয়। এই মরিচের স্বাদ এবং গন্ধ আকর্ষণীয়। বাজারে এর দাম অন্যান্য মরিচের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া সহফসল হিসেবে পানবরজে পটল, হলুদ, থানকুনি, পুঁইশাক অন্যতম। এ সকল শাক বা সবজি সাধারণত বাড়ৈয়া শাক বা সবজি হিসেবে পরিচিত। পানবরজ শ্রমিকদের কাজের মধ্যে পাইয়ান (পান তোলার পর পানলতাকে খুঁটির সাথে পেঁচিয়ে ছোট করা) একটি অন্যতম কাজ। সহ অঞ্চল ভেদে পাইয়ানকে পাইটানো বলা হয়। শ্রমিকরা সারাদিন গুজি (বরজের কাজে সহায়তা করা) দেয়া এবং পাইয়ায়। শ্রমিকরা সাধারণত বরজ মালিকের বাড়িতেই দুপুরের খাবার খায়। শ্রমিকের খাবারে যেন তেল বেশি না দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ রয়েছে– পৌরাতের বড়া যেন তেলে না পোড়ে। অর্থাৎ শ্রমিকদের খাবারের জন্য বড়া তৈরি করতে যেন তেল বেশি ব্যবহার না করা হয়।

বর্ষাকালে পানের উৎপাদন বেশি থাকায় চাষিরা পানির দামে পান বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু উৎপাদন কম হওয়া সত্বেও পানচাষিদের জন্য শীতকাল অধিক লাভের সময়। এ ক্ষেত্রে পানচাষিদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে–যার ধরি না হাতে হের ধরি পায়ে, দেহি বর্ষার এই কয়ডা দিন যায় ॥ পানচাষে বর্তমানে সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দেখা গেলেও সাধারণত সরিষার খৈল পান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বরিশাল অঞ্চলে যে পান উৎপন্ন হয় তা ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে–

১. হাচি– সুস্বাদু, আকারে লম্বাটে, শিরা লাল বর্ণের। এই পানের দাম তুলনামূলক বেশি।
২. ভাবনা– সুস্বাদু, আকারে গোলা, ঝাল মুক্ত, শিরা সাদা।
৩. চালতাবুটি– স্বাদে মধ্যম ঝাল, গোলাকৃতি, শিরা হালকা লালচে, বোটা লম্বা।
৪. ঝালি– স্বাদে খুব ঝাল, মধ্যমাকৃতি, শিরা খয়েরি বর্ণের হয়ে থাকে।

চারা রোপনের ১৬০ দিন পর বিক্রির জন্য পান সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত সকালের দিকে পান তোলা হয়। পানচাষি পরিবারের নারীরা বরজ থেকে তোলা পানের আকার অনুযায়ী চলি এবং বিড়ায় বিভক্ত করেন। বরিশাল অঞ্চলের এক চলিতে ৩৬টি এবং এক বিড়ায় ৭২টি পান থাকে। তবে স্ট্যান্ডার্ড পরিমাণ হচ্ছে– এক চলিতে ৪০ এবং এক বিড়ায় ৮০টি। চাষি পবিারের নারীরা পান চলি-বিড়ায় সাজিয়ে তা ডালিতে

www.pathagar.com

(বড় এবং চ্যাপ্টা সাঝি) তোলেন। বরিশালের কয়েক স্থানে ডালিকে আবার খোতা বলা হয়। ডালিতে তুলে কলাপাতার ডাঁট ছিড়ে তৈরি করা বেতি দিয়ে বেধে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

বরিশাল অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বড় পানের হাট হল টরকী। বর্তমানে এই হাটের বাৎসরিক ইজারা ৩৮ লাখ টাকা। এছাড়াও গৌরনদী, বাটাজোর, মাহিলারা, শোলক, পিঙ্গলাকাঠি বরিশাল অঞ্চলের হাটগুলোর মধ্যে অন্যতম। জেলার প্রতিটি উপজেলার হাট-বাজারের নির্দিষ্ট অংশে পান বিক্রির স্থান নিধারিত রয়েছে। বরিশাল অঞ্চলের বড় পান ব্যবসায়ীদের মধ্যে টরকীর কানেরহাওলা গ্রামের নিতাই দাস, গৌরনদীর খাঞ্জাপুর গ্রামের রোহিনী দাস, টরকীর রামসিদ্ধি গ্রামের বোরহান সরদার অন্যতম। নিতাই দাস তিন হাজার, রোহিনী দাস এক হাজার আটশো এবং রোরহান সরদার এক হাজার বরজের মালিক বলে জানা গেছে। বর্তমানে বরিশালের বাজারে মাঝামাঝি মানের এক চলি পানের দাম ৫০/৬০ টাকা।

২. ওঝা/ ফকির/ সাপুরে/ বশিকারক

লোকসমাজ দীর্ঘকাল ধরে তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের জন্য ওঝা-ফকির-বশীকরণকারীর উপর নির্ভরশীল। খাল-বিল-নদী বা জলাভূমির বরিশালে বিশেষ করে সাপে দংশন করা রোগীর বিষ নামানোর জন্য ওঝারা ডোর পদ্ধতিতে বেশ সাফল্য দেখায়। এছাড়াও তাবিজ-কবজ, বশীকরণ, জলপরা বা পানিপরা, তেলপরা, ফুলপরা, চিনিপরা, থালপরা, সরিষা চালান, ক্ষুর চালান, বাটিচালান এবং বিষধর কোনো জীবজন্তুতে কামড়ালে এ পেশাজীবীদের শরণাপন্ন হন অনেকে। বরিশালের সকল উপজেলায় এই পেশার মানুষের বসবাস।

৩. করাতি

শহুরে জীবনে করাতকলের বদৌলতে গাছ চেরাইয়ের কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হলেও গ্রামীণ জীবনে করাত দিয়ে গাছ কাটার প্রচলন এখনো রয়েছে। যারা করাত দিয়ে গাছ বা কাছ চেরাইয়ের কাজ করেন তাদেরকে করাতি বলা হয়। অনেকে আবার এদের মিস্ত্রিও বলেন। তবে করাতিই যুক্তিযুক্ত। যে ঘরে বসে কাঠ চেরাইয়ের কাজ করা হয় তার নাম– ম্যাডাঘর। যে মাচানের উপর তারা কাজ করেন তার নাম ম্যাডা। ম্যাডাঘরের মাঝামাঝি কাঠ বা বাঁশ দিয়ে মাচান বানানো হয়। ভূমি থেকে তিন/চার হাত উপরে মাচানের উপর গাছ তুলে করাতের সাহায্যে করাতিরা চাহিদা অনুযায়ী কাঠ চেরাই করেন। মাচানের উপরে একজন ও নিচে দুজন অর্থাৎ সবমিলিয়ে তিনজন করাতির দরকার হয় কাঠ চেরাইয়ে। করাতই তাদের প্রধান উপকরণ। করাত শান দিতে র‍্যাত প্রয়োজন। এছাড়া সাঙ্গার, কাঠের খিল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় কাঠ চেরাই কাজে।

৪. কুলু

ঘানি প্রক্রিয়ায় এরা সরিষা, তিল, নারকেল থেকে তেল তৈরি করে যারা জীবিকা অর্জন করেন তাদেরকে কুলু বলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তদের বলা হয়– তেলি। ঘানি

www.pathagar.com

পদ্ধতিতে তেল উৎপাদন না থাকায় এই সম্প্রদায় এখন হ্রাস পেয়েছে। তবুও গৌরনদী, আগৈলঝাড়া এবং বানারীপাড়ায় কয়েক ঘর কুলু রয়েছেন।

৫. কামার

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা লোহা দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করে। দা, কাঁচি, খোন্তা, কুড়াল তৈরিতে এরা সিদ্ধহস্ত। কামারেরা কয়লা ও হাপরের সাহায্যে লোহা আগুনে পোড়ায়। এরপর হাতুরি দিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে। প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে রয়েছে হাপর, কয়লা, হাতুরি ছেনি, সাড়াশি, র‍্যাত, মাবল, ব্যানা ও লবনের পানি। জেলার প্রতিটি উপজেলায় এ পেশার লোকের বিচরণ রয়েছে। দা কাঁচিতে শান দেওয়ার কাজও এরা করে থাকেন। বরিশাল জেলার সব উপজেলাতেই কামার রয়েছে। তবে বিভাগের পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার ইন্দেরহাট বন্দরের কামারদের তৈরি বাংলা দা ও গজা লোহা বাংলাদেশ খ্যাত। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কামার শ্রেণি কর্মকার হিসেবে পরিচিত। তবে কর্মকার পদবী স্বর্ণের কাজ করেন এমন শ্রেণিভুক্তরাও ব্যবহার করেন।

৫. কুইড্ডাল

ধান, চাল ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে বরিশালের স্থানীয় ভাষায় কুইড্ডাল বলে। এরা হাট-বাজারে ধান চাল বেচাকেনা করে। নৌকায় তাদের দাড়িপালা থাকে। কুইড্ডালরা বাজার থেকে ধান কিনে এবং নিজস্ব প্রযুক্তিতে তা থেকে চাল তৈরি করে হাট-বাজারে বিক্রি করে থাকে। জেলার বড় বড় হাট-বাজারের আশপাশ এলাকায় কুইড্ডালদের অবসবাস।

৬. কুবাইত্তা

যারা গ্রামে ঘুরে মাটির কাজ করে তারাই কুবাইত্তা। এরা মাটিশ্রমিক। সকালে তারা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়। সেখান থেকে মহাজন অর্থচুক্তিতে নিয়ে কাজ করায়। কখনও কখনও কয়েকজন মিলে একটি দল তৈরি করে। একজন দলনেতা থাকে। তাকে সর্দার বলে। সর্দার কাজ সংগ্রহ করে, অন্যরা কাজ করে। প্রত্যেকের মজুরির একটা অংশ সে পায়। সর্দার বিধায় সে কাজ করে না কিন্তু মজুরি পায়। দৈহিক এবং দিন অনুযায়ী আর্থিক চুক্তিতে এরা কাজ করে থাকে।

৭. কুমার/কুম্ভকার

কুমারেরা পাল সম্প্রদায়ভুক্ত। মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলস, পেয়ালা, বাসন, চাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে। মাটির পুতুল ও বিভিন্ন তৈজসপত্রও এরা প্রস্তুত করে। এরা ঘর ছাউনির কাজে মাটি দিয়ে টালি তৈরি করে। টিন সহজলভ্য হওয়ায় টালি শিল্প বিলুপ্তির পথে। এছাড়া স্টিল ও প্লাস্টিকের সামগ্রীর দ্রুত প্রসারের ফলে এ পেশাজীবীরা হুমকির সম্মুখীন। তবুও যুগের চাহিদা অনুযায়ী মাটির টব, চারি, বিভিন্ন সৌখিন আসবাবপত্র, খেলনা তৈরি করে কুমার সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় এই পেশাকে আকড়ে আছে। হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বী এই পেশাজীবী গ্রুপ পাল নামে পরিচিত। এদের একটি শাখা প্রতিমা তৈরিতে দক্ষ।

৮. গাছি

খেজুর গাছ কেটে যারা রস বের করে আনে তারাই গাছি। বরিশাল এলাকায় এদের হিয়ালি বা শিয়ালি বলা হয়। খেজুর গাছের মাথার একপাশের ডাল কেটে ধারালো ছেনি দিয়ে চাঁছা হয়। পরপর দুই তিন দিন চাঁছার পর রস বের হতে থাকে। হিয়ালি কর্তৃক খেজুর গাছ চেঁছে দেওয়া অংশের দুই পাশে দুটি পেরেক পুঁতে দেয়। এ পেরেকে রসের হাঁড়ি আটকে দেওয়া হয়। চেঁছে দেওয়ার দুদিক থেকে নালি কেটে মাঝ বরাবর আনা হয়। এর মাথায় খিল দেওয়া হয়। খিল বেয়ে রস হাঁড়িতে পড়ে। সকালে গাছি বা হিয়ালি হাঁড়ি থেকে রস সংগ্রহ করে।

গাছি

৯. গোয়ালা

বরিশাল জেলায় কৃষিকাজের জন্য জমি চাষাবাদ করতে প্রচুর গরু-মহিষের প্রয়োজন হয়। কেউ কেউ শুধু দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য গাভী পালন করে থাকে। গরু থেকে উৎপাদিত দুধ কৃষক নিজেও বাজারে বিক্রি করে থাকে। দুধ বাজারজাতকরণের জন্য আর একটি পেশাজীবী রয়েছে যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুধ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে তারা গোয়ালা নামে পরিচিত।

১০. গণক

ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ও হারিয়ে যাওয়া কোনো জিনিস পুনরুদ্ধারে গুণিন বা গণকেরা সহায়তা করে থাকে। গণনা করে মানুষের শরীরের রোগ বালাইয়ের খবর ও মনের কথা বলতে পারে। স্বামী স্ত্রী অমিল, প্রেমে ব্যর্থতা রোধ, বানমারা, বানমারা ঠেকানো,

www.pathagar.com

এসব কাজও গুণিন বা গণকেরা করে থাকেন। জেলার প্রতিটি উপজেলাই দু চারজন গণক রয়েছে।

১১. ঘরামি

খড়ের নির্মিত ঘর তৈরিতে এ পেশার মানুষ বিশেষ পারদর্শী। এরা খড় গোলপাতা দিয়ে অন্যের ঘর নির্মাণ করে জিবীকা নির্বাহ করে। এরা প্রাচীন পেশাজীবী। এছাড়াও গৃহনির্মাণসামগ্রী ব্যবসার সাথে এরা সম্পৃক্ত।

১২. চামার/চর্মকার/ঋষি/ মুচি

বরিশাল জেলার সর্বত্র এদের অবস্থান রয়েছে। নদী বা খালের তীরেই এদের বসবাস বেশি। এরা বাঁশ ও বেতের কাজও করে থাকে। এছাড়া পশু চামড়া পাকাকরণ, জুতা তৈরি, জুতায় কালি দেওয়া ও ঢোল, খোলসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র চামড়া দিয়ে মুড়ে দেয়। এদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। এরা দলিত শ্রেণিভুক্ত। ঢোল, খোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করাও এই সম্প্রদায়ের কাজ। বরিশালে অবস্থানকারী ঋষিদের মধ্যে একদল এসেছেন ভারতের বিহার থেকে। এদের ঋষিদাস বা রবিদাস বলা হয়। অন্য দল এই লোকবাংলার অর্ন্তভুক্ত।

ঋষি

১৩. জিয়ানি

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। নদীর তীরবর্তী এদের আবাসস্থল। দলিত শ্রেণির লোক। এরা সাধারণত মাছ ধরে এবং বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের পদবি 'মাল, মল্লিক, রায়, মজুমদার পদবিও এরা ব্যবহার করে। বড়শি দিয়ে, জাল দিয়ে কিংবা ডোবানালা থেকে এরা মাছ ধরে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এদের সাথে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো না। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নমশূদ্র

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দু/চারটি নজির দেখা যায়।

১৪. দর্জি

দর্জিরা কাপড় কেটে পোশাক তৈরি করে। বরিশাল জেলায় এ পেশাজীবীদের খলিফা বলা হয়। জেলা সদরসহ উপজেলার প্রতি হাট-বাজার, শহর-বন্দরে এদের অবস্থান রয়েছে। এক সময় শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এ পেশার সাথে জড়িত ছিল বর্তমানে হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত। স্থানীয় হাটবাজারে শুধু হাটের দিন ভ্রাম্যমান দরজির উপস্থিতিও থাকে। যারা ছেড়া জামা-কাপড় সেলাই দেওয়া, লুঙ্গি সেলাইসহ বিভিন্ন কাপড় রিপু করে থাকে।

১৫. ধুনকার

এ পেশার লোক লেপ-তোষক তৈরির কাজে নিয়োজিত। মূলত এরা নাগার্সি সম্প্রদায়ের লোক। নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করলেও এদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম দুই ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যমান। গরুও খায় শূকরও খায়। নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতো। নাগার্সিরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও পারদর্শী। ২৫-৩০ বছর আগেও মেলা, বিয়ে-শাদি কিংবা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও এরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না।

১৬.রজক/ধোপা

জামাকাপড় ধোয়ার কাজে এ পেশার লোকজন নিয়োজিত। রেশমি ও পশমি কাপড় ধোয়া ও মেরামতে এরা খুবই পারদর্শী। শালকর সম্প্রদায়ভুক্ত। বন্দর, হাটবাজারের পাশাপাশি এদের অবস্থান ছিল। বর্তমানে এ পেশার সাথে হিন্দু ও মুসলমানরা সম্পৃক্ত হওয়ায় এ পেশাজীবী সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে।

১৭. নইক্‌দা/লাঠিয়াল

জবরদস্তিমূলক জায়গা দখলকারী পেশাজীবী। এরা অর্থের বিনিময়ে বিবাদপূর্ণ জায়গায় পেশিশক্তি প্রয়োগ করে। নইক্‌দারা শক্তিশালী ও কৌশলী। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এরা বাঁশের লাঠি, লেজা, বল্লম, ঢাল, রামদা, প্রভৃতি ব্যবহার করে। বংশমর্যাদা লড়াই ও অন্য কোনো লড়াইয়ে এরা এখনো লোকজ অস্ত্র ব্যবহার করে। ভূমির মালিক বা দখলদাররা নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে লাঠিয়ালদের লালন-পালন করেন। বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, মুলাদী, হিজলার চরাঞ্চলে লাঠিয়ালদের অবস্থান।

১৮. নলুয়া

নলখাগড়া দিয়ে হাতের সাহায্যে তৈরি এক প্রকার চাটাইকে চাচ বলা হয়। এ পেশার সাথে যারা জড়িত তারা অধিকাংশই হিন্দু। যারা নলখাগড়া কেটে চাচ তৈরি করে

www.pathagar.com

তাদেরকে নলুয়া বলা হয়। চাচ তৈরির উপকরণ জলজ উদ্ভিদ নলখাগড়া বা নল অনাবাদি জমি কিংবা নদীর তীরে বেশি জন্মে। ক্ষেত থেকে ওগুলো দা দিয়ে কাটা হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি ধারালো এ দা-এর নাম নলকাটা দা। নল কেটে আঁটি বেঁধে কলার ভেলার মতো তৈরি করে ভাসিয়ে স্রোতের অনুকূলে টেনে আনা হয়। এই ভেলাকে পিরোজপুর জেলায় ভুর বলা হয়। নদী বা খালে উজান থাকলে গুন টেনে আনা হয়। ভুর থেকে কিনারে তোলে একটি একটি করে নলখাগড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হয়। পরে মুশইল ছাড়া ঢেঁকিতে এগুলো থেতলানো হয়। পরে এগুলো দিয়ে চাচ বুনন করা হয়। নলখাগড়া দিয়ে চাচ বুনন প্রক্রিয়ায় শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সি মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। জেলার সব উপজেলায়ই কমবেশি নলুয়া রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জেলায় এ পেশার সাথে কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ সম্পৃক্ত। সুপারি শুকাতে, ধানের মোড়া নির্মাণে ও বেড়ায় চাচ ব্যবহার করা হয়।

১৯. নাপিত

যারা ক্ষৌরকার্য করে তাদের নাপিত বলে। আদিতে নাপিত সম্প্রদায়রা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। মুক্তশাল ও ভ্রষ্টশীল। উত্তম শ্রেণির নাপিত যারা নমশূদ্রদের ক্ষৌরকর্ম করত তারা মুক্তশীল নামে পরিচিত ছিল, মুক্তশীল নাপিতেরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্ষৌরকর্ম না করলেও মুসলমানদের ক্ষৌরকর্ম করতে এদের আপত্তি থাকত না। ভ্রষ্টশীল নাপিতের নমশূদ্রদের ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ময়রা সম্প্রদায়ের কোনো এক পূর্ব পুরুষ চৈতন্যদেবকে ক্ষৌরী করেছিল বলে এরা মধু নাপিত বলেও পরিচিত। নমশূদ্রের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সময় নাপিতের প্রয়োজন হয়। পটুয়াখালী জেলার সব উপজেলায় এ পেশাজীবীদের অস্তিত্ব রয়েছে। বর্তমানে অন্য সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

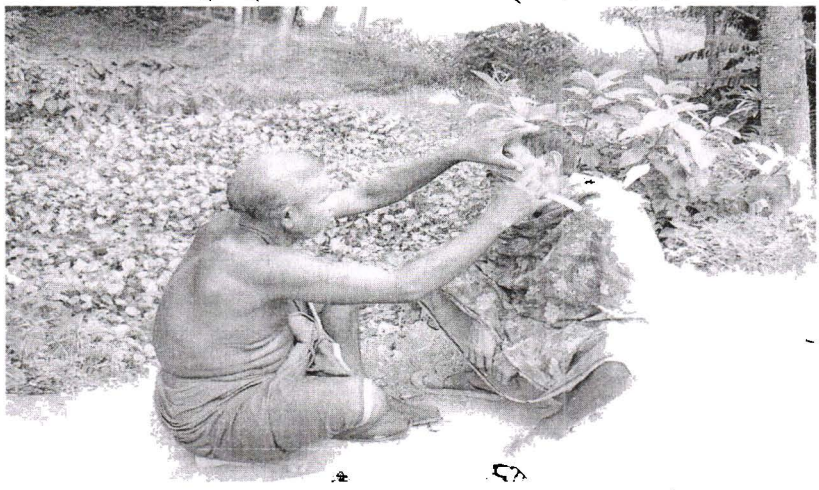

আগৈলঝড়া উপজেলার দুধুমি বাজারে নরসুন্দরের ক্ষৌর কর্ম

www.pathagar.com

২০. পাটিয়াল

পাটিতা নামক একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ দিয়ে চিকন বেতি তৈরি করা হয়। যা দিয়ে পাটি ও হাতপাখা তৈরি হয়। কম বেশি জেলার সব উপজেলায়ই এ পাটি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের নকশাও আঁকা হয় পাটিতে। বিছানা হিসেবে এর কদর আরো বেশি। নামাজ পড়ার বিছানা হিসেবেও পাটি সমাদৃত। এ পেশার সাথে মুসলমানরাই বেশি জড়িত।

২১. পুরোহিত / ব্রাহ্মণ

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ। এরা সমাজ অধিপতি, শিক্ষা-আভিজাত্য ও কুলীনশ্রেণি। হিন্দু বর্ণশ্রম প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণি সমাজে পূজনীয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা-বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের ফলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণি ধর্মভিত্তিক পেশা ছেড়ে আধুনিক স্রোতধারায় মিশে গেছে। তবে লোকবাংলার স্বল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যজন-যাজক পেশায় নিয়োজিত। ব্রাহ্মণ শ্রেণির মধ্যে কুলীন, পুজারী বা যাজনিক, আচার্য্য বা অগ্রদানী, ঘটক শ্রেণি বর্তমানে বিদ্যমান। যাজনিক, অগ্রদানী ও ঘটক শ্রেণির ব্রাহ্মণ আজো লোকপেশাজীবী গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। যাজনিক ব্রাহ্মণগণ পূজা-অর্চনা; অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণ, মৃতের সৎকার, মঠ উৎসর্গ, হাত দেখে ভাগ্য গণনা করেন। ঘটক শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ বিবাহ সম্পাদনে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বর্তমান সময়ে আচার-অনুষ্ঠান তেমন একটা পালিত না হওয়ায় এই পেশাজীবী গ্রুপ তাদের পেশা পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকছে।

পূণ্যার্থীদের মন্ত্র পাঠ করাচ্ছেন পুরোহিত

২২. বেদে

বেদে বা বাদিয়া নামে অপর এক শ্রেণি নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও তারা স্বকীয় জীবনধারাই অনুসরণ করে থাকে। এরা নদীতেই বারোমাস কাটায় এবং

www.pathagar.com

সাপ খেলা দেখিয়ে, গাছ-গাছড়া ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রোগ-বালাই সারানোর কাজ করে। তারা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়। বেদেনিরা খুবই কর্মঠ। যখন মাথায় সাপ ও লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার ঝাঁপি নিয়ে বেদেনিরা দূর-দূরান্তরে ঘুরে বেড়ায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, বেদে পুরুষেরা বাঁশি বাজিয়ে আর গান গেয়ে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে। বেদে পরিবারের কারো বিয়ে হলে তারা পিতা অথবা অভিভাবক তাকে একটি নৌকা উপহার দেয় যাতে করে সে নদীর বুকে যাযাবর জীবনকে বেছে নিতে পারে। দিনে দিনে বেদেরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। যাযাবর শ্রেণির এ সম্প্রদায় বাংলাদেশের সর্বত্র বিচরণ করে। সাপের খেলা ছাড়াও মন্ত্রতন্ত্র ও হাতের কারসাজিতে খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

একদল বেদেনি

২৩. বাওয়ালি

সুন্দরবনের কাঠুরেরাই বাওয়ালি। মুসলমান ধর্মের লোকই এ কাজে বেশি সম্পৃক্ত ছিল। বাওয়ালিরা সুন্দরবন থেকে সুন্দরী গাছ, গোলপাতা, হেতাল গাছ ইত্যাদি কাটে। জেলার পটুয়াখালী, কুয়াকাটা ও খেপুপাড়ায় বাওয়ালিদের সংখ্যা বেশি।

২৪. ময়রা

মিষ্টিজাত দ্রব্য তৈরিতে ময়রা সম্প্রদায় সিদ্ধহস্ত। যারা মিষ্টি তৈরি করে তাদের বলা হয় ময়রা। বেশ কিছু ময়রা পরিবারের পাশাপাশি অত্র জেলায় মিষ্টিজাত দ্রব্য তৈরিতে হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরও সম্পৃক্ততা রয়েছে। পিরোজপুর জেলার প্রতিটি উপজেলা শহর, হাট-বাজারে ময়রাদের তৈরি মিষ্টি বিক্রি হয়। গ্রাম-গঞ্জের দোকান বা মেলাতে ময়রাদের রয়েছে বিপুল সুনাম। বিত্তবানদের দেয়া বড়বড় মিষ্টির দোকানেও ময়রারা নির্মাণ শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে।

www.pathagar.com

ময়রা

২৫. ভূঁইমালী

শুদ্র বংশোদ্ভুত এ সম্প্রদায় ঢাক-ঢোল বাজাতে খুবই পারদর্শী ছিল। জমিদার বাড়িতেই এরা কাজ করত। ভূঁইমালী সম্প্রদায়েরা দুই ভাগে বিভক্ত বড় ভাগিয়া এবং ছোট ভাগিয়া। বড় ভাগিয়ারা জমিদার বাড়িতে ঢোল বাজাতো ছোট ভাগিয়ারা জমিদার বাড়ি ঝাড়ু দিত। এ পেশাজীবীরা ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে।

২৬. মালাকার

মালা তৈরিসহ বিভিন্ন প্রকার খেলনাজাতীয় সামগ্রী তৈরি করে হাটে-বাজারে বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের বলা হয় মালাকার। মালাকার আর্য সম্প্রদায়ের নীচু শ্রেণির হিন্দু।

মালাকারেরা জলজউদ্ভিদ ভাতশোলা ও ফুলশোলা দিয়ে লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের বহু জিনিস ও বিভিন্ন প্রকার খেলনা তৈরি করে। শোলা দিয়ে তারা তিন ধরনের কাজ করে। শোলার সাদা অংশ কেটে ফুল, পুতুল, বিয়ের মুকুট, খেলনা ইত্যাদি তৈরি করে।

শোলাকে পাতলা করে কেটে একটা একটা জোড়া দিয়ে তার উপর কাগজ লাগিয়ে চিত্র আঁকা হয়। শোলা দিয়ে ছোট আকারের মূর্তিও তৈরি করা হয়। মালাকারেরা মূর্তির পেছনের চালচিত্র, মূর্তির মাথার মুকুট, মূর্তি ও অলঙ্কার, কালী ও লক্ষ্মীপূজার কপালি, মনসা পূজার মের ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। হিন্দুদের বিয়ের মুকুট, দেবমূর্তির মুকুট, টায়রা বা কপালিও মালাকারেরা তৈরি করে। এগুলোতে নকশা ও কারুকার্য করা হয়।

www.pathagar.com

মালাকার

২৭. মাঝি

নদীনালা বেশি হওয়ায় মালপত্র বহন ও চলাফেরার অন্যতম বাহন নৌকা। নৌকা চালিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের মাঝি বলা হয়। লোক বহন করার জন্য ছৈঅলা নৌকা রয়েছে। ভাড়ার বিনিময়ে মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এ নৌকার নাম টাবুরে নৌকা। খেয়াঘাট মাঝিদের ঠিকানা। অনেকে বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত। ইঞ্জিনচালিত নৌকার প্রচলন বা প্রযুক্তি ব্যবহারে মাঝির সংখ্যা কমেছে।

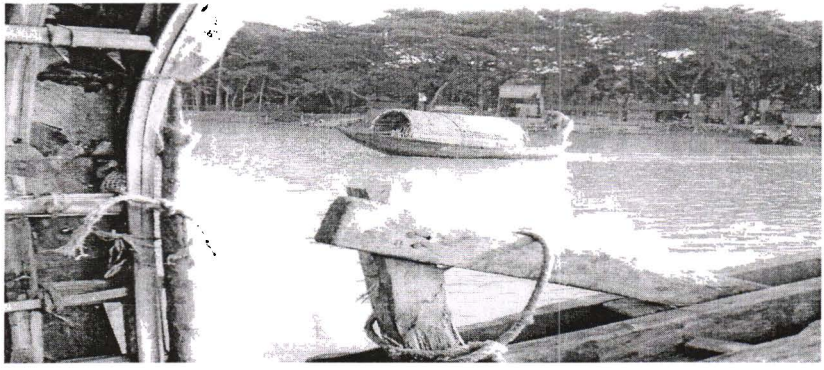

মাঝি

২৮. মিস্ত্রি

যারা নৌকা, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি করে পটুয়াখালী জেলায় তাদের মিস্ত্রি বলে। যারা নৌকা তৈরি করে তারা নৌমিস্ত্রি, যারা পাকা বাড়ি তৈরি করে তারা রাজ মিস্ত্রি, যারা ঘরবাড়ি তৈরি করে তারা ঘরমিস্ত্রি হিসেবে পরিচিত। কাঠ মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত

www.pathagar.com

উপকরণ- হাতুরি, বাটল, শাবল, করাত, রায়েন্দা প্রভৃতি। এ পেশার মানুষ চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে থাকে। জেলার প্রতিটি এলাকায় এদের অবস্থান। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের যে কেউই এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সুতার, মিস্ত্রি কাঠের কাজের সাথ সম্পৃক্তদের পদবী। এদের অনেকেই বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

২৯. শাখারি

অলংকারের প্রাচীনতম উপকরণ শঙ্খ। শঙ্খ হতে বিভিন্ন অলংকার তৈরি করে যেসব কারিগর তাদের শাখারু বলা হয়। শাঁখার সামগ্রীর সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে জড়িত। নব বিবাহিত হিন্দু কনের জন্য দুটি প্রধান সামগ্রী অত্যাবশ্যক একটি সিঁথির সিঁদুর অন্যটি শাঁখার বালা। হিন্দু সধবা মেয়েদের জন্য শাঁখার বালা অবশ্যম্ভাবী। শাঁখা বিবাহ বন্ধনের প্রতীক। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের কাব্যেও শাঁখার উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্খ দিয়ে তৈরি প্রধান প্রধান অলংকারের মধ্যে রয়েছে– শালাবালা, লতাবালা, লতাসাপ, উপরবেনী, দোসাপা, আংটি প্রভৃতি।

শাখারি

শঙ্খকারগণ শঙ্খ সংগ্রহের পর কুরা দিয়ে শঙ্খ কাটে। এ প্রক্রিয়ার নাম পোনকাটা। এরপর শাঁখের করাত দিয়ে শঙ্খের মূলের অংশ ফেলে যাকে বলা হয় 'মাজার দেওয়া' পরবর্তীতে শঙ্খ পাটায় ঘষে চেপ্টা করা হয়। যাকে বলা হয় 'ঝাপানি'। এরপর নমুনা অনুযায়ী কেটে শাঁখার আকৃতি দেওয়া হয়। শাঁখা কাটতে শাঁখারিরা ব্যবহার করে করাত, বাঁশের খুঁটি, কাঠের পিটলা, কাঠের চাকাই, কুরা, টাট-

www.pathagar.com

চট, তেলের বাটি, নেকড়া ইত্যাদি। অন্যান্য হাতিয়ার হচ্ছে সলই কাঠের গোলদণ্ড। যাতে বালি, চাঁচ, ধূপ ও সরিষার তেল মিশ্রণে তৈরি খসখসে জমাট দ্রব্য লাগানো থাকে। এত শাঁখার ভেতরের অংশ ঘষা হয়। বরিশাল অঞ্চলের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর এলাকায় শাখারিরা শঙ্খবণিক পদবী ব্যবহার করেন।

৩০. শানদার

লোকবাংলার বৈচিত্রপূর্ণ পেশাজীবী গ্রুপের মধ্যে শানদার অন্যতম। এই শ্রেণি হিন্দু বা মুসলিম যে কোনো সম্প্রদায়ের হতে পারে। লোক সমাজে ব্যবহার্য লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি ধারালো করাই এদের কাজ। আগে বিভিন্ন ধরণের র‍্যাত দিয়ে করাত, দা-বটি-কাচি হাতের সাহায্যে শানানো হত। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সাইকেল প্যাডেল পদ্ধতিতে পাথরের চাকা ঘুড়িয়ে শান দেয়ার কাজ করা হয়। ওই যন্ত্রটি কাধে করে ঘুরে ঘুরে এই পেশাজীবীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তবে শহুরে জীবনে এখন আর এদেরকে তেমন একটা দেখা যায় না। বর্তমানে বরিশাল নগরীসহ বিভিন্ন উপজেলা সদরে স্থায়ী শানদার দোকান দেখা যায়। বরিশাল নগরীর বাজার রোডস্থ মহিম বাবুর কাচারী এলাকায় প্রয়াত বলাই শীলের বংশধররা এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন।

শানদার

৩১. স্বর্ণকার

প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের রমণীরা সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ এর গহনা ব্যবহার করে আসছে। সোনা রূপার অলংকার নারী দেহের শুধু সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই নয় এর সাথে

www.pathagar.com

ধর্মবিশ্বাসের একটি অংশ জড়িয়ে আছে। যারা এ গহনা তৈরি করে তাদের বলা হয় স্বর্ণকার। তারা নারীর সৌন্দর্যবর্ধনে নাক ফুল, নোলক, দুল, কানবালা, দানাপুছি, টিকলি, হার, মাদুলি, কবজ, বাজু, রুলি, আংটি, চেইন, নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদি তৈরি করে। স্বণকারেরা কয়েকটি ভাগে কাজগুলো করে থাকে যেমন, খোদাই কাজ, ডাইসের কাজ, বিন্দ্রির কাজ, মিনা করার কাজ। স্বর্ণকারদের ব্যবহার্য উপকরণসমূহ– হাতুড়ি, চুঙ্গা, আপর, কয়লা, ফার্নিস, ডালনি, প্রদীপ, সোন, পাস ইত্যাদি। জেলার শহর ও বন্দরকেন্দ্রিক এ পেশাজীবীরা বেশি বসবাস করলেও গ্রামের প্রায় প্রতিটি হাটবাজারেও তারা বসবাস করে।

৩২. পাটা খোঁটানি

জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই পাটাখোটানিদের দেখা মেলে। এরা শাল-নুড়ি খুঁটিয়ে গৃহিণীদের মসলা পিসতে সহায়তা করেন। যন্ত্র হিসেবে একটি ছেনিতে (বাটালি যাতীয়) হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে করে পাতা-পুতা খোঁটানো হয়। এক্ষেত্রে খোটানিরা পাটায় জ্যামিতিক নকশা, ফুল, সমান্তরাল রেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অঙ্কন করেন। একটি পাটা-পুতা খোঁটাতে বর্তমান সময়ে ২০ টাকা ব্যয় হয়। খোঁটানিরা এক দেড় মাস অন্তর অন্তর এক একটি এলাকায় ঘুরে বেড়ান। আর হাঁক দিয়ে বলতে থাকেন– পাটা-পুতা খোঁটাইবেন...।

পাটা খোঁটানি

৩৩. হাজমা বা ওস্তা

মুসলমান বালকদের খাতনা করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এ সনাতনী ব্যবস্থায় তারা বাঁশের চাচ ও পোড়া ন্যাকড়া ব্যবহার করে। চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এবং এ কাজটি ডাক্তার কর্তৃক সম্পাদন করায় হাজাম বা কাব্দার এর সংখ্যা কমে গেছে।

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল থেকেই পটুয়াখালী জেলায় হাজাম বা কাব্দার রয়েছে। হাজামরা শুধু খাতনার কাজই করে না, পাশাপাশি অন্যান্য পেশার কাজও করে।

৩৪. হেকিম বা কবিরাজ

আদিকাল থেকেই বরিশাল জেলায় এ পেশাজীবীরা দাপটের আথে তাদের পেশাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক হওয়ার পরও এখনো এ জেলার জনসংখ্যার বিশাল একটা অংশ চিকিৎসার জন্য হেকিমের দ্বারস্থ হন। হেকিমেরা গাছ-গাছালি, লতাগুল্ম দিয়ে ওষুধ তৈরি করে বিক্রি করে। এদেরকে কবিরাজও বলা হয়।

তথ্যসহায়ক

১. জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশের পেশাজীবী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।
২. হুমায়ূন রহমান, বাংলাদেশের পেশাজীবী পরিচিতি, আপন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬।
৩. শিহাব বাহাদুর,বাংলাদেশের পথশিল্প, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ৪৭ আজিজ সুপার মার্কেট, ২০০৬।
৪. মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও সৈকত আসগর, বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য, ফোকলোর ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৯।
৫. হুমায়ূন রহমান, পিরোজপুরের বিচিত্র পেশা, আনন্দ লিখন, সম্পাদক : সৈয়দ দুলাল, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৯।
৬. সাইফুল আহসান বুলবুল, বৃহত্তর বরিশালের লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০।
৭. তপন কুমার শীল, বাজার রোড, বরিশাল।
৮. আ. রহমান, পদ্মাবতী সড়ক, চকবাজার, বরিশাল।
৯. মালা রাণী বিশ্বাস, যুগীরকান্দা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
১০. বিপ্লব বণিক, বাজার রোড, বরিশাল।
১১. মো. আউয়াল, পাতারহাট বন্দর, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।
১২. বাদল বিশ্বাস, বাকেরগঞ্জ বন্দর, বরিশাল।
১৩. অবনী চক্রবর্তী, বাখরকাঠি, নলছিটি, ঝালকাঠি।
১৪. রতন রজক দাস, বানারীপাড়া বন্দর, বরিশাল।
১৫. সত্তার হাওলাদার, বাহেরচর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
১৬. লোকমান মাতুব্বর, কারফা বাজার, উজিরপুর, বরিশাল।
১৭. আলো রাণী মালো, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
১৮. শিপ্রা রাণী পাল, কলসকাঠি, বাকের গঞ্জ, বরিশাল।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

আধুনিক কালেও লোকচিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন লোকসমাজ। এর ফলাফল সম্পর্কে অমৃত লাল দে আয়ুর্বেদ ও ইউনানী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কবিরাজ ননীগোপাল শীল বলেন– হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা। ফল না পেলে কেন এর প্রচলন থাকবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে মানুষ সুফল পাচ্ছেন। কবিরাজ নীলরতন ঘটকরায় বলেন, ভেষজ চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাছাড়া লোকসমাজ টিকিয়ে রেখেছে এই পদ্ধতি। দেখুন চোচরাপাতা গায়ে লাগলে গা চুলকায় আবার ধুতরা খেলে মানুষ পাগল হয়। তিনি রোগ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ বা ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁককে বিশ্বাস না করে সকলকে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। নিচে প্রচলিত ভেষজ অথচ লোকচিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করা হল–

গুড়োকৃমি দূর করতে : সোনাইল গাছের ২০/২৫টা পরিষ্কার পাতা ছেঁচে রস খেলে গুড়োকৃমি পড়ে যায়। তবে আমাশয় থাকলে পাতার রস খাওয়া নিষেধ।

দাঁদ ও একজিমা : চাটকাটা গাছের পাতা দুধ দিয়ে বেটে দাঁদ ও একজিমায় লাগিয়ে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ধুয়ে ফেলতে হয়। এরপর একটি নারিকেলের আচি আগুনে পোড়া দিয়ে অর্থপোড়া অবস্থায় তা তুলে আচিটিকে উপুর করে রেখে কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ঘণ্টাখানেক পর আচা তুললে দেখা যাবে– ওর মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ জমা হয়েছে। ওই তৈলাক্ত পদার্থ দাঁদ ও একজিমায় লাগালে দাঁদ একেজিমা সেরে যায়।

একজিমা উপশমের ক্ষেত্রে একতোলা শঙ্খচূর্ণ, ১ তোলা মুরদাশিং, ১ তোলা মনোছিলা, ১ তোলা গন্ধক, ১০০ গ্রাম ভেসলিনের সাথে মিলিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগালে কয়েকদিনের মধ্যেই একজিমা ভালো হয়। রোগ পুরোনো হলে পঞ্চতিক্তঘৃত ২চা চামচ গোদুগ্ধের সাথে সেব্য।

ব্রণ, মুখের দাগ দূরীকরণ : কাচা হলুদ ১০০ গ্রাম, মেহেদী পাতা ২৫ গ্রাম, নিম পাতা ২৫ গ্রাম বেটে প্রতি দিন সকাল ও রাতে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ধুয়ে ফেললে মুখের দাগ দূর হয়।

প্রসূতি মায়ের সন্তান ভূমিষ্ঠের পর শরীর ও জরায়ুর ব্যথা দূর করতে : কালোজিরা ও রসুন সমপরিমাণ বেঁটে চাল ভাজার সাথে মেখে গুড়ো করে খেলে প্রসূতি

www.pathagar.com

মায়ের জরায়ু ও শরীরের ব্যথা দর হয়। এতে দুগ্ধদানকারী মায়ের বুকের দুধ বাড়ে। সন্তানের শরীরও ভালো থাকে। একইসাথে ২ চা চামচ মধু খাওয়া আরও ভাল।

অর্শ : ১ তোলা দুর্বা, আধা তোলা ডালিমেরর রস চিনিসহ প্রতিদিন দুই বার সেবনে অর্শ রোগ ভালো হয়। সাথে সারিবাদ্যারিষ্ট ৪চা চামচ করে খাবার পর ২ বার খেলে আরো ভালো কাজ করে।

তাছাড়া থানকুনি, গন্ধভাদাল, হেলেঞ্চা, সমপরিমাণ বেঁটে এক মার্বেল পরিমাণ খেতে হয়। সাথে কদবেল, ওলকচু ও অরোরডাল পথ্য হিসেবে খেলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়।

আমাশয় : সিকি তোলা স্বেতধুপ চূর্ণ করে চিনিসহ প্রত্যহ দুই বার গাবগাছের ছালের রসের সাথে মিশিয়ে খেলে আমাশয় ভালো হয়। এছাড়া কুটরাজ গাছের ছাল ৫০ গ্রাম, গন্ধভাদালে ২৫ গ্রাম, থানকুনি পাতা ২৫গ্রাম ছেঁচে রস বের করে প্রতিদিন সকাল ও রাতে খেলে আমাশয় ভালো হয়। পুরাতন আমাশয় হলে বা আম পড়লে বেলসুট গুড়া করে ১ চা চামচ করে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

উকুন বিনাশক : পাইলামাদারগাছের ছাল ২৫০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম পানি, ৫০ গ্রাম সাদা ছাই একত্র করে ২০ মিনিট জ্বাল দিয়ে নামিয়ে রাখতে হবে। এরপর ওগুলো ছেঁকে চুলে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলতে হয়। এভাবে কয়েকদিন মাথা ধুলে উকুন মরে যায়। নারকেল তেলের সাথে কর্পুর ও মেথিগুড়ো মিলিয়ে মাথায় দিলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়।

একশিরা : চক এবং হরিতকি সামান্য পানি দিয়ে বেঁটে কয়েকদিন প্রলেপ দিলে একশিরায় উপশম হয়। বরিশাল অঞ্চলের স্বনামধন্য কবিরাজ হোসেন মোল্লার হাত কাটা মহাশঙ্কর তেল কদম পাতায় লাগিয়ে কয়েকদিন সেক দিলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

বাচ্চাদের বিছানায় প্রস্রাব : ৪টি তেলকুচির পাতা ২টি যজ্ঞডুমুরের পাতা বেঁটে রস বের করে আখের গুড়ের সাথে মিলিয়ে শিশুকে খাওয়ালে শিশুর ঘন ঘন প্রস্রাব করা এবং রাতে প্রস্রাব করা ভালো হয়।

সুতিকা : গুলঞ্চ, খেতপাপড়া, বৃহতী, পিপুল, গোক্ষুর, আদা, কন্টিকারী, প্রতিটা ১০০ গ্রাম করে দুই কেজি পানিতে এক ঘণ্টা জ্বাল দিয়ে ছেঁকে নিয়ে ২চা চামচ করে প্রত্যেক দিন তিনবার খাবার পর খেতে হবে। একইসাথে দশমূলারিষ্ট, পত্রাঙ্গসব ৪ চা চামচ করে খাবার পর সকাল-বিকাল বার খেলে সুতিকা ভালো হয়।

ঋতুস্রাব বন্ধ হলে : একতোলা থানকুনি মূলের রস সামান্য কালজিরার সাথে দিনে দুইবার দুইসপ্তাহ খেলে ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য : হরিতকি ১০০ গ্রাম, যবক্ষার ৫০ গ্রাম, সোনাইল গাছের পাতা ৮/১০টা একত্রে মিশিয়ে ১০ ভাগ করে সকাল ও রাতে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য ভালো হয়।

গেটেবাত : কনকধুতরা গাছের শিকড় বেটে তারপিন ও লবঙ্গ তেল মিশিয়ে মালিশ করলে গেটেবাত ভালো হয়।

www.pathagar.com

টাকপড়া : ১০০ গ্রাম মঘা সুপারী কেটে ১ সের পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে মাথা ধুইয়ে ১ তোলা গন্ধক, ২ তোলা তেলকুচা পাতার রস ও ১টি পেঁয়াজের রস একত্র করে সকাল-বিকাল মাথায় লাগালে টাকে চুল গজায়।

হাঁপানি : কবাব চিনি, জ্যৈষ্ঠমধু, গোলমরিচ, শুকনো আদা, বচ ও বাসকপাতা, আকন্দেরফুল প্রতিটা ১০০ গ্রাম করে নিয়ে ভালো করে গুড়া করে আখের ঝোলাগুড় পরিমাণ মতো দিয়ে ১ মার্বেল পরিমাণ সকালে ও রাতে খাবার পর খেয়ে ছাগলের দুধ খেতে হবে। কিছুদিন খেলে হাঁপানি বা যেকোন কাশি ভালো হয়। সাথে চ্যাবনপ্রাস খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মূত্ররোধে : জামের বিচি, আমের বিচি এবং সমপরিমাণ জোইন গুঁড়ো করে এক চা চামচ করে খেতে হয়। সাথে তেলাকুচার পাতা ৮/১০টা ও যজ্ঞডুমুরের পাতা ৮/১০টা একত্র করে ছেঁচে রস খেলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

ধ্বজভঙ্গ : আলকুশিবীজ, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুরকাঁটা, ভুইকুমড়া, শতমূল সমপরিমাণ বেঁটে দুই মার্বেল পরিমাণ মধু দিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

জ্বর হলে : ছাইতান গাছের ছাল, গুরুচি, হাতিশুরা, কালোমেঘ ভালো করে বেঁটে এক মারবেল পরিমাণ নিয়ে শেফালি ফুলের পাতার রস মিশিয়ে দুই সপ্তাহ খেলে ঘন ঘন জ্বর হওয়া ভালো হয়।

শ্বাস কাশ : কদবেল, টেবালেবু, তেঁতুল প্রত্যহ দুই বার স্বাভাবিক মাত্রায় খেতে হয়।

হৃদরোগ : কদবেল, টেবালেবু তেঁতুল প্রতিদিন সকাল বিকাল খেতে হয়, সাথে এক চা চামচ অর্জুনছালের গুঁড়ো খাওয়া আরও ভাল।

গ্যাস্ট্রিক : আমলকি, হরিতকী, কটকি, পিপলতা প্রতিটি ১০০ গ্রাম ও পিপুল ১০ গ্রাম একত্র করে ২ কেজি পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে তিন দিন। এরপর আধা ঘণ্টা জ্বাল দিয়ে নামিয়ে রাখতে হবে। ছেকে ওর মধ্যে ২০০ গ্রাম আখের গুড় দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তিন দিন পর আবারো আগুনে দশ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। তারপর ঠাণ্ডা করে বোতলে ভর্তি করে ৪ চা চামচ খাবার পর প্রতিদিন ৩ বার খেলে গ্যাসস্ট্রিক ভালো হয়।

মোটা হতে চাইলে : হাঁসের ডিম পুঁইশাক দিয়ে রান্না করে খেতে হয়। সাথে মিষ্টি ও চর্বি জাতীয় খাদ্য খেতে হবে।

জন্ডিস : বুহইর গাছের ছাল ১০০ গ্রাম ছেঁচে রস বের করে আধা সের খাঁটি দুধের কাচাদধির সাথে খেতে হয়। খাবার পর শরীরটা একটু ঝিমঝিম করতে পারে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।

তাছাড়া উলটকম্বলের ছাল, লোটপিপুলের ছাল সমপরিমাণ আখের গুড়ের শরবত করে খেলে অসাধারণ উপকার পাওয়া যায়। সাথে দুটো করে কচি ডাব খেলে ভালো হয়।

ডায়াবেটিক : যজ্ঞডুমুরের ছাল ২৫০ গ্রাম, জামের বিচি ২৫০ গ্রাম, আমলকি ১০০ গ্রাম, তেলকুচার পাতা ৫০ গ্রাম, জৈন ৫০ গ্রাম, বেলসুট ৫০ গ্রাম প্রতিদিন তিন বার ১ চা চামচ মাত্রায় খেলে ডায়বেটিকস নিয়ন্ত্রণে থাকে। বেশি কিছুদিন ব্যবহারে

www.pathagar.com

উপশম হয়। সমপরিমাণ রসুন ও কালোজিরার ভর্তা খেলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়।

টান কাশ : বাসকপাতা ৮টা, তুলসি পাতা ২৫টা, আদা ছোট ১ টুকরা লবণ দিয়ে ছেঁচে খাওয়ালে ভালো হয়। সাথে ১ মার্বেল পরিমাণ তেঁতুল খাওয়ালে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়।

সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা লাগা ও গলা ব্যথা : ১ সের পরিমাণ পানির মধ্যে তেঁতুল পাতা ১০০ গ্রাম, রসুন ১০০ গ্রাম, হলুদ ১০ গ্রাম, পরিমাণমত লবণ দিয়ে জ্বাল দিয়ে আধাসের পরিমাণ পানি থাকতে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর রসুন দিয়ে ফোরন দিয়ে দুবার খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এইরূপ এক সপ্তাহ খেলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভালো হয়ে যায়।

মাথা ভারভার ও সর্দিতে নাক বন্ধ হলে : ৫০ গ্রাম কালোজিরা ১টা পরিষ্কার কাপড়ে বেধে ছেঁচে নিতে হবে। এরপর বার বার নাকের কাছে নিয়ে নস্যির মত টানলে সাথে সাথে উপকার পাওয়া যায়।

খুসখুসে কাশি : একটা আস্ত পেয়াজ লবণ মাখিয়ে ১ ঘণ্টা পর পর চিবিয়ে খেলে খুসখুসে কাশ ভালো হয়।

বাতের ব্যথা ও দুর্বলতা : পাতাসহ গুড়িকচু ১ কেজি, রসুন ২০০ গ্রাম, দারুচিনি ১০০ গ্রাম, পরিমাণ মতো অন্যান্য মসল্লা যা দরকার তা দিয়ে শাক রান্না করে তুলে পাত্রের মাঝখানে একটু ফাঁক করে ঢেকে দিতে হবে। ঘণ্টাখানেক পরে ফাঁকাস্থানে লাল পানি দেখা যাবে। তা বোতলে রেখে প্রতিদিন তিন বার খেতে হবে। চার-পাঁচ দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নতুন ও পুরাতন জ্বর : শেফালি ফুল গাছের পাতা ১০০ গ্রাম, চিরতা ১০ গ্রাম, কালো মেঘ ১০ গ্রাম, নিম ৫ গ্রাম, আমলকি ৫০ গ্রাম, হরতকি ৫০ গ্রাম একত্র করে ১ কেজি পানিতে জ্বাল দিয়ে আধাকেজি পরিমাণ থাকিতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। প্রতিদিন ৪ চা-চামচ করে ৩ বার খেলে জ্বর ভালো হয়।

শরীর ব্যথা ও কামড়ানি হলে : কালিজিরা ২৫ গ্রাম, রসুন ২৫ গ্রাম একত্রে বেঁটে সকাল ও রাতে খেলে ব্যথা ভালো হয়।

মাথা গরম, হাত-পায়ের তালু জ্বলা : ১ গ্লাস গুড়ের শরবত করে ১ চা-চামচ ইছবগুলের ভুষি আধা চামচ তোকমা দানা ভিজিয়ে সকালে ও রাতে খেলে ভালো হয়।

অতিরিক্ত রজস্রাব বন্ধ করতে হলে : ডালিম পাতার রস পান করলে রজস্রাব বন্ধ হয়। লেবুর সরবত খেতে হবে ৩ বার। সাথে পত্রাঙ্গাসব খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অকালে প্রসব : গর্ভের সন্তান উপযুক্ত সময় হবার আগেই যদি গর্ভস্রাবের লক্ষণ দেখা দেয় তবে আপাং গাছের সামান্য শিকড় কোমরে বেধে দিতে হবে। গর্ভের সময় ৪/৫ মাস হলে ১০/১২টা ডালিমের পাতা, সাদাচন্দন আধা তোলা পরিমাণ বেঁটে সামান্য মধুসহ সেবন করিলে গর্ভস্রাব হওয়া বন্ধ হয়।

www.pathagar.com

বরিশাল অঞ্চলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত আয়ুর্বেদ জ্ঞান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রসারে দানবীর অমৃত লাল দে-এর নামানুসারে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদ বোর্ডের অধীনে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এবং সার্জারি (ডিএএমএস) কোর্স সম্পন্ন করেছেন শতাধিক কবিরাজ প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখছেন। এছাড়া একই বোর্ডের অধীনে ভোলায় একটি ইউনানী মহাবিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

জেলার শিকারপুর এলাকায় কবিরাজ হোসেন মোল্লা নিজ প্রচেষ্টায় একটি আয়ুর্বেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কবিরাজ হোসেন মোল্লা আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে হাতকাটা মহাশংকর তেল, দাঁতের মাজন, গ্যাসট্রিক, ডায়াবেটিস রোগের ওষুধ তৈরি করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া বরিশালে বেশ কয়েকটি আয়ুর্বেদিক এবং ইউনানী ওষুধ তৈরির কারখানা রয়েছে। বরিশালের লোকসমাজ শতাধিক বছর আগে থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধমে দুটি নির্দিষ্ট রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এর প্রথমটি– উজিরপুরের গুঠিয়া বালা বাড়ির বাতের ওষুধ; অপরটি বরিশাল নগরীর দৈবশক্তি পাগল নিরাময় কেন্দ্র। বরিশালের বিভিন্নস্থানে বালাবাড়ির বাতের তেল বিক্রি হয়ে আসছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা বাত রোগীদের মহৌষধ এই তেল স্বপ্নে পাওয়া বলে প্রচলিত। অপরদিকে দৈবশক্তি ভেষজ ওষুধ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা দিয়ে আসছে।

লোকসমাজে দীর্ঘকাল ধরে তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের জন্য ওঝা-ফকির-বশীকরণকারীর উপর নির্ভরশীল। খাল-বিল-নদী বা জলাভূমির বরিশালে বিশেষ করে সাপে দংশন করা রোগীর বিষ নামানোর জন্য ওঝারা ডোর পদ্ধতিতে বেশ সাফল্য দেখায়। এছাড়াও তাবিজ-কবজ, বশীকরণ, জলপরা বা পানিপরা, তেলপরা, ফুলপরা, চিনিপরা, থালপরা, সরিষা চালান, ক্ষুর চালান, বাটিচালান এবং বিষধর কোনো জীবজন্তুতে কামড়ালে এ পেশাজীবীদের শরণাপন্ন হন অনেকে। বরিশালের সকল উপজেলায় এই পেশার মানুষের বসবাস।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসার মন্ত্র

এক.

আয় বিষ আয়
তোরে ডাকে তোর মায়
আয় জোড়ে আয়
পদ্ম কুমারী মায়ে
তোর নাম ধইর‍্যা ডাহে
আয় বিষ আয়।
উজান ছাড়িয়া ভাটিতে আয়

www.pathagar.com

বিষ খেয়ে আদদার স্মরণে
পদ্মার স্মরণে বিষ খেয়ে
উজান ছাড়িয়া ভাটি দে ॥

সাপুড়ে বা বেদে সম্প্রদায় সাপেকাটা রোগীদের লোকপদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকেন

দুই.
অন্যা কলমা কালিন্দিরী সিলপাট বিষেশ্বরী বিশ খাইল
বিষয়ারী হরির বিষ নয়, আল্লা মোহাম্মদের জটার বিষ কোথায় লুকায়
রক্তবরণ মুখ তোর পাথর বরণ কায়া।
রক্ত চুইয়া খায় দেবী আপনি মহামায়ের রক্ত গায় চামুণ্ডা
কালী তা দেখিয়া শিব করে বিষ খেয়ে যা ভস্ম
যা কালকুট বিষ—
ফু.
কালী কালী ঘোর কালী
শিবের মাথায় জটা
ত্রিণওলি কালী তুই
পদতলে কেটা।
অমাবস্যা মঙ্গলবারে
জন্মাইয়া হুংকারে
তুই মহামায়া মুণ্ডুখানা গায়ে
সজ্যচক্র সদাবসে তোর পদতলে
তা দেখিয়া শিব করে বিষ শোধ
যা ভস্ম যা কালকুট বিষ।

তিন.
ওরে ওরে কালিয়া
তুই যারে চলিয়া

www.pathagar.com

আল্লাহ মোহাম্মদের বন্দনা
পাক ১৮ মোকামের জোলাই মাতাই
বিষ অমুকের গুজারিতে চাপাইয়া থাক
আমার এই আজ্ঞা যদি ছোটে
ঈশ্বর মহাদেবের মস্তক ফোটে।
ভগবতীর যোনী ছিড়িয়া রক্ত খাও।
হুংকারে হুংকারে ব্রহ্মার বিষ
ডোর মুখে আয়।
বিষ আঠারো মোকামের জোলাই মাতাই
বিষ (অমুকের) উদারিতে চাপাইয়া থাক।
আমার এই আজ্ঞা যদি টোটে
ঈশ্বর মহাদেবের মস্তক ফোটে।

২. শিয়াল-কুকুরে কামড়ালে বিষ নিবারণের মন্ত্র

জানিগো জলেশ্বর, তোমার যে আমি
যে রূপ করিলে বিষ, হয়ে যায় পানি।
পাগলা কুকুরের বিষ নাম জলেশ্বর
করিতেছি আমি এ যে তোমার প্রতি ভর
নরসিং হের বর ইহা অন্য কিছু নয়
নাম, অঙ্গের বিষ জল হয়ে যায়
কার অঙ্গে ?
কামক্ষা কামিক্ষা মায়ের অঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গে কার অঙ্গে ?
হরির ঝি চণ্ডির অঙ্গে।

৩. ফোড়ার ব্যথা নিবারণের মন্ত্র

গাঙ্গের কূলে মাদার গাছটি
তাহাতে জন্মিল ফোড়া,
ভাসারাম বলে দক্ষ
(অমুকের) ফোড়া ঝাড়িয়া অক্ষ।

শরীরের কোন অংশে ফোড়া দেখা দিলে একশ্বাসে এই মন্ত্রটি পড়তে হয় পর পর তিনবার। প্রতিবারই ব্যথার জায়গায় ফু দেয়া হয়।

৪. পোড়া জায়গা ঝাড়ার মন্ত্র

কামার বাড়ির টুকটাক
কুমার বাড়ির চাক,

www.pathagar.com

জ্বালাইসনা পোড়াইসনা
চুপ করে থাক।

পুড়ে গেলে এ মন্ত্রটি এক শ্বাসে পাঠ করতে হবে এবং পোড়া জায়গায় ফু দেয়া হয়। ওঝা এভাবে তিনবার করে থাকেন।

৫. বাটি চালান মন্ত্র

সু-চালান কু-চালান
পাতালে বাসুকী চালান
জয়দুর্গা কামেশ্বরী চালান
রং, কৃষ্ণ রং
যে স্থানে চালান দিই
সেই স্থলে যাও।
যদি না যাও
জয় দুর্গার মাথা খাও
দোহাই মহাদেবের মাথার দোহাই।

শুধুমাত্র তুলা রাশির জাতকই বাটি চালান দিতে পারেন। ধোয়া কাপড় পরে কাসাঁরবাটিতে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে হয়। মন্ত্রপাঠকারী বাটিতে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। বাটির নিচে কয়েকটি কয়েকটি শুকনো ধান রাখা হয়। পর পর তিনবার উল্লিখিত মন্ত্র পাঠ করে ফু দেয়ার পরেই বাটি চলা শুরু করবে। বাটি যদি কখনো বিপদসংকুল এলাকায় প্রবেশ করতে চায় তখন ভার কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ ভার কাটার মন্ত্র পাঠ করে বাটির উপর ফু দিতে হবে। বাটি চালান দেওয়ার আগে ভার কাটার মন্ত্র পড়ে পানি পড়ে নেওয়া হয়। ওই জল বাটিতে ছিটিয়ে দিলেও ভার কেটে যায়। বাটি চলা বন্ধ হয়ে যায়। নিচে ভারকাটার মন্ত্র উল্লেখ করা হল :

অভ্র কাটি অভ্রেশ্বরী
ভার কাটি কামেশ্বরী।

৬. তেল পড়ার মন্ত্র

উক্তি শক্তি সরস্বতী
আমারে করিয়া ভর,
আমারে ভালো না পাইয়া
অমুকে রে ভালো পাও।
ভগবতীর যোনি ছিঁড়িয়া
চাটিয়া রক্ত খাও।
কার আজ্ঞা?
তেইশ কোটি পিপির আজ্ঞা
এই কথা যদি লড়ে

www.pathagar.com

শিবের লিঙ্গ ছিঁড়িয়া
মাটিতে পড়ে।
দোহাই ইল
আসমানে মারিলাম বজ্রের খিল।

৭. শিং মাছের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

ছাপান্ন কোটি বাও বিষ
থুরিথুরি দিয়া
করলাম নির্বিষ।

যে স্থানে শিং মাছের কাঁটা ফুটেছে সেখানে চিপে রক্ত বের করে নিতে হয়। এক একবার মন্ত্র পাঠ করে ওই স্থানে থুথু দিতে হবে। এরকম পর পর তিনবার করলে বিষমুক্ত হওয় যাবে।

৮. দাঁত রস ও সাহ্নিক ব্যথা ঝাড়ার মন্ত্র

১

নাকে দড়ি পিঠে ঘা
দাতরসা সাহ্নিক
থাকিতে মিলিয়া যা।

২

হস্ত বন্দি পদ বন্দি
শরীর বন্দি ভাই
আঠারো মোকামের বন্দি
ঊনপঞ্চাশ বাই।
কোনো অঙ্গে যদি বেদনা আইছে তবে
নব্বই কোটি নারীর বেদনা
পানি হইয়া যা
দোহাই কালীর, দোহাই কালীর।

৯. শিশুদের ভয় নির্মূল করার মন্ত্র

ঠাকুর রইছে খাটের উপর
ঠাইরোন রইছে শুইয়া,
অমুকের শ্যাম ফুল ব্যথা
সব ফালাইলাম খাইয়া।

নিয়ম : মন্ত্র পাঠ করতে হবে তিনবার। প্রত্যেকবার শিশুর শরীর ঝাড়তে হবে। ফুঁ দিতে হবে। তারপর উপরে বর্ণিত চার্ট লিখে রূপার মাদুলিতে পুরে শিশুর হাতে বা গলায় বেঁধে দিতে হবে।

www.pathagar.com

১০. জন্ডিস ঝাড়ার মন্ত্র

দোহাই মনসার, দোহাই মনসার
অমুকের কাওলা ঝাড়িয়া দিলাম বাড়ি
রং বেরঙের হুংকার করিয়া
আয় চলে হাতে, লাম পাতে।
না লামো যদি—
মনসা মায়ের হেডা খাও
দোহাই শিবের।

পানি একতোলা, পাথরকুচার রস তিন তোলা ও তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবণ। উপকরণাদির মধ্যে শুধু পাথরকুচার রস চুলে দিতে হবে। বাকি উপকরণ একটা গামলা বা অন্য কোনো পাত্রে রাখতে হবে। যেখানে রোগী হাত ডুবিয়ে রাখবে। রোগীর মাথার চুলে মন্ত্রপাঠকারী তিনবার মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দেবেন। ফলে মাথার পানি পাত্রের মধ্যে পড়বে। পাত্রের পানি হলুদ বর্ণ হয়ে যাবে। শরীর থেকে জন্ডিস বা কাওলা বা কামলা নেমে যাবে।

শিশুর জন্ডিস ঝাড়ছেন এক ফকির

১১. ভয় ঝাড়ার মন্ত্র

এর ফের জের জাল্লা
মার ছুট পর তাল
অক্ষয় অক্ষয়
দোহাই আল্লাহ তালার
মোহাম্মদের রসুলুল্লাহর
না লাগে যেন ভয়
(অমুকের) গায়।

www.pathagar.com

কেউ ভয় পেলে এ মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ফু দিতে হয়। প্রতিবার মন্ত্র পাঠে আপাদমস্ত ক একবার ফু বাধ্যতামূলক।

১২. ভূতে না ধরার মন্ত্র

ভূত আমার পুত
পেতনি আমার ঝি,
রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে
করবি আমায় কি?

১৩. রমণী বশীকরণ মন্ত্র

সূর্য বন্ধন তারা বন্ধন
আকাশ বন্ধন, পাতাল বন্ধন
তেত্রিশ কোটি দেবতা বন্ধন
অনাদি আদি বন্ধন
মা সরস্বতীর দুই নয়ন বন্ধন
কামরূপ কামিখ্যার বরে
অমুকের পাঁচ পরান যেন
অমুকের লাইগ্যা মরে।
অমুকের পাঁচ পরান যেন
অমুকের লাইগ্যা ঘর ছাড়ে।

এ মন্ত্রের উপকরণের মধ্যে কখনো পান, চিনি, পানি, শাড়ির আঁচল, পরনের শাড়ির লালপাড়, মাসিকের তেনা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। পান অথবা চিনি দিয়ে বশীকরণের মন্ত্রেও এরকম পন্থা অবলম্বন করতে হয়। উপর্যুক্ত মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করতে হবে। পান খাইয়ে বশীকরণ করতে হবে। পানবরজ থেকে দুটি পান চুরি করে শূন্যভারে সংগ্রহ করতে হবে। মন্ত্রটি পড়ে পানে তিনবার ফু দিতে হবে। কৌশলে একটি পান প্রেমিক-প্রেমিকাকে খাইয়ে দিতে হয়। অপরটি যে ঘরে নিদ্রা যায় সে ঘরে এক কোণে শনি অথবা মঙ্গলবার রাতে পুতে রাখতে হয়। এরপর একজন অন্যজনের জন্য অস্থির হয়ে মন ও শরীর ছটফট শুরু করবে। আবার চিনি দ্বারা বশীকরণের জন্য এই একই মন্ত্র পাঠ করতে হয় তিনবার। একসাথে সোয়া তোলা চিনি কিনতে হবে। মন্ত্র পড়ে সাতবার শরবতে ফু দিতে হবে এবং প্রেমিকাকে খাইয়ে দিতে পারলে একই অবস্থা হবে। প্রেমিকা যদি প্রেমিককে এ পানপরা খাওয়ায় তাতেও একই অবস্থা হবে।

১৪. পেত্নী ছাড়ানোর মন্ত্র

ওরে কুল কুল পিচাশি
তুই মহা সর্বনাশী
তোর আছে কত বল

www.pathagar.com

পারলে কালীখোলার মাঠে চল
নিজ মান যদি রাখিতে চাও
সামনের গাবগাছের বড় ডাল
কামড়াইয়া লইয়া উইড়্যা যাও
কার আজ্ঞে?
কামরূপ কামিখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
হরির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে
অমুকের সঙ্গে থেকে জলদি চইল্যা যা
নইলে মুড়া পিছার বাড়ি খা।

কাউকে পেত্নীতে ধরলে এ মন্ত্র পাঠ করে অপরিষ্কার ঝাড়ু দিয়ে রোগীকে ঝাড়তে হয়। এতে পেতনি ছেড়ে যায়।

১৫. ভয় নিবারণের মন্ত্র

বাঁশ বুড়ি বাঁশ বুড়ি
থাকো বাঁশের আগায়
চাইয়া দেখ তোর নাতনি
একলা হাঁটে, একলা যায়।
নাতিনের দিকে যদি চাও
তোর মার মাথা খাও
তোর নাতিনের বড় ডর
তারে দেইখ্যা ইজ্জত কর॥

১৬. চোর ডাকাত থেকে রেহাই পাওয়ার মন্ত্র

উত্তরে বান্ধিলাম
পুবে বাঁন্ধিলাম
বান্ধিলাম পশ্চিম গর্দিশ
চোরেরা হইল বন্দিশ
লাগ-লাগ-লাগ
দোহাই পিরের, দোহাই মুর্শিদের।

চোর ডাকাত যাতে বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এই মন্ত্রটি সাতবার পাঠ করে ঘুমালে চোর ডাকাত বাড়িতে প্রবেশ করবে না।

১৭. সন্তান প্রসবের মন্ত্র

আঁচল ছালম, মুছাল ছালম
ক্ষেত্রফল গলাইয়া ছালম

www.pathagar.com

অমুকের পেডের পোলা বা মাইয়া ছালম
কাটিলাম গিট, কাটিলাম বন্ধন
ফুলে মূলে পড়িয়া মাইয়া পোলা
চলিয়া আয় ধরণীতে
পেডের পোলা, আন্ধারের পোলা
দুনিয়ায় চলিয়া আয়
ডাকে তোর মায়
নামিয়া আয় ধরণীতে।

অনেক সময় মহিলাদের সন্তান প্রসব করতে কষ্ট হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। সন্তান প্রসব বা খালাস হয় না। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ মন্ত্র পাঠ করতে হবে। একটা পাত্রে পানি রেখে মন্ত্র পাঠ করে সাতবার ফুঁ দিতে হয়। পরে সেই পানি প্রসব বেদনায় ছটফটকারী মাকে খাইয়ে দিতে হয়। তাড়াতাড়ি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। প্রসব বেদনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

১৮. আয়নাপড়া মন্ত্র

অন্ধকার দ্বন্দ্বকার
নিলাকার বন্ধকার
চোর আর চোট্টা
সকলই করিলাম বন্দি।
(বন্দি)
আল্লাহু উল্লাহু আল্লাহ
আল্লা হক উল্লাহ
(পাঁচবার এ মন্ত্র পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে আয়নায় ছিটিয়ে দিতে হয়)
(পানি পড়া)
আয়নার মধ্যে আঁখি যদি না আস
কামরূপ কামিখ্যার মাথা খাও।
(ভার কাটার মন্ত্র)
সোনার কুটার রূপার পাড়
ভার কাটিয়া করলাম ছাড়খাড়।

তথ্যসহায়ক

১. মাই সুইট লাইফ, কবিরাজ হোসেন মোল্লা, শিকারপুর, বরিশাল।
২. ননী গোপাল শীল, অধ্যক্ষ, অমৃত লাল দে ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
৩. কবিরাজ নীল রতন ঘটকরায়, বরিশাল সদর, বরিশাল।
৪. কবিরাজ আ. হাই, বরিশাল সদর, বরিশাল।

www.pathagar.com

৫. কবিরাজ চন্দন বসু, প্রভাষক, অমৃত লাল দে ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
৬. কবিরাজ সুদীপ্তা অধিকারী, প্রভাষক, অমৃত লাল দে ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
৭. কানাই লাল বণিক, বাজার রোড, বরিশাল।
৮. অব্দুল রব ফকির, চরগাধাতলী, গৌরনদী, বরিশাল।
৯. কমলা রাণী মণ্ডল, রামানন্দেরআক, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
১০. কল্পনা রাণী, চরআইচা, বরিশাল সদর, বরিশাল।
১১. ইদ্রিস ফকির, গিলাতলী, বরিশাল সদর, বরিশাল।
১২. নগেন গোসাঁই, রাজারচর, বরিশাল সদর, বরিশাল।
১৩. ভবরঞ্জন ঠাকুর, আসকর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
১৪. আ. বাতেন ফকির, রঙ্গশ্রী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা মূলত বুদ্ধির খেলা। ধাঁধার আকৃতি বড় নয়। সাধারণত একটি দুটি বাক্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তি সম্পর্কিত তুলনা এবং সাদৃশ্যবোধ থেকেই ধাঁধার জন্ম। ধাঁধার আবেদন সকলের জন্যই। বরিশালে ধাঁধাকে অনেকে ভাঙানি, পুনি বা মাইনি বলে থাকেন। ধাঁধায় কেবলমাত্র বস্তু বা প্রাণির তুলনা বা সাদৃশ্য থাকবে এমন কথা নয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আচার আচরণ, পার্বণ, উৎসব, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধাঁধার প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ ধাঁধাই চমৎকারভাবে ছন্দোবদ্ধ থাকে। ধাঁধা নির্মল হাস্যরস প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। রঙ্গরস প্রিয় বরিশালবাসী ধাঁধা বলে অন্যকে বিচলিত করে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। সাহিত্যের শুরু থেকেই ধাঁধা প্রচলিত। কোন কোন ধাঁধা বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে বাক্য ও শব্দে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। এতে দুই ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। তবে দুটি পক্ষ থাকলেও প্রতিপক্ষে একাধিক ব্যক্তি অংশ নিতে পারে। যার ফলে বড়দের চেয়ে শিশু কিশোরেরা ধাঁধা বেশি পছন্দ করে। এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিজীবী বলে ধাঁধায় অনেক সময় কৃষিজাত পণ্য স্থান পেয়েছে। রূপকের মাধ্যমে মূল অর্থ প্রকাশ পেলেও এর আবরণে ছিল চারপাশের চেনা জগৎ। কৃষি বিষয়ক ধাঁধা হচ্ছে–

লতায় পাতায় জড়ি পড়ি
পত্রে বিলাস
ফুল নাই ফল নাই
মাস ফলে এমন একটি কৃষি হচ্ছে 'পান'। আবার–
এক ব্যাডা আডে যায়
একশো একটা পেরোন গায়।
(পেরোন অর্থ-জামা)ফলে বার মাস।
ফুল নাই ফল নাই, বার

এখানে একশো একটা জামা গায় অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে কলার মোচাকে। কলার মোচার খোলগুলোকে জামার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার–

বটগাছ লহু লতা
এক এক ডালে এক এক পাতা।
এর উত্তর হচ্ছে কচুগাছ।

এক বাগরে এক বাগ তুইত্যা
তুইত্যারে ভাতে দিল মুইত্যা।
–লেবু।

www.pathagar.com

আল্লার কি কুদরত
লাডি ভরা শরবত।
এর উত্তর : আখ।

যেহেতু এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী তাই কৃষি দিয়ে সাজানো হয়েছে এ ধরণের ধাঁধা। বরিশালে এক সময় হুক্কা খাওয়ার প্রচলন ছিল। প্রায় সকল বাড়িতেই ছিল হুক্কা। নানা ডিজাইনের হুক্কা দিয়ে সাজানো থাকতো অবস্থাপন্ন ঘরের বসার ঘর। হুক্কা নিয়ে ধাঁধা হচ্ছে–

আকাশ দিয়া পড়ল বুড়ি কাঁথা বালিস লইয়া
হেই বুড়ি কথা কয় সবার মাঝে বইয়া।

মৎস্যজীবীদের অন্যতম বাহন জাল। জাল দিয়া মাছ ধরা বরিশালবাসীর অন্যতম নেশা ও পেশা। মাছ ধরার জাল নিয়ে রচিত ধাঁধাটি হচ্ছে–

গলায় গজমতি হার
পৃষ্ঠে ল্যাজ তার
উড়িয়া উড়িয়া করে আহার।

এ ধরনের আরও একটি ধাঁধা হল–

মরাডার প্যাডে
জ্যাতাডা লড়ে।
এর উত্তর হচ্ছে মাছ ধরার চাই।

বরিশালের লোকজীবনের সাথে থানা, পুলিশ, আইন, আদালত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। জোঁক যেমন রক্ত শুষে খায় ফৌজদারী পেয়াদা তেমনি আসামীর রক্ত শুষে খায়। যেমন–

এই মাটি ল্যাদা প্যাদা
এই মাটির মধ্যে ফৌজদারী প্যাদা।

কিছু ধাঁধা যেমন চশমা, মাছ ধরার চাই, উকুন, পান, কবর, আখ ইত্যাদি প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত রয়েছে। নবান্ন এবং পূজাকেন্দ্রিক ছড়াগুলো সনাতন ঐতিহ্যে রচিত। এক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনাচরনের চাল-চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ছড়া, ধাঁধা একান্তই ঘরোয়া ভাষায় রচিত।

লোক সাহিত্যকে প্রাণের সাহিত্য বলা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় থেকে বেড়িয়ে আসা ছড়া ও ধাঁধা একেবারেই অকৃত্রিম। কিছু কিছু ছড়া ও ধাঁধা কুরুচিপূর্ণ। স্থূল বিন্যাসে তা অনেকটাই উচ্চারণের অযোগ্য। নাগরিক রুচির অভাব রয়েছে এতে। যেমন, একটি ধাঁধায় আছে–

রাজার বউ আগদে বয়
হুন কুহর ডা চাইয়া রয়।
এর উত্তর হল– বদনা।

আজও এ অঞ্চলে বিশেষ করে শিশু কিশোররা যখন একত্রে জড় হয় বা আড্ডায় বসে তখন কোন না কোন কথার ফাঁকে হঠাৎ করে শোলকের লড়াই শুরু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

একপর্যায় তাদের সাথে এসে যোগ দেন বাড়ির বুড়ো-বুড়িরাও। নিচে বরিশাল অঞ্চলের সংগৃহীত ধাঁধাঁ তুলে ধরা হল–

১. আত ধইর‍্যা টিপাটিপি মুখ কইরা কালো
সাবান দিয়া কাজ সারলে খুবই ভালো।
উত্তরঃ হাতে চুড়ি পরানো

২. অন্ধে ভিডার কান্দি নাই
ফুল তুলুইন্যা মামু নাই
কালা মামি ভেচকি দেছে
ফুলগুন সব তুইলগা নেছে।
উত্তর : তারা

৩. অতিশয় রাগী, দেয় ঘুম ভাঙ্গাইয়া
কিছুতেই নাহি যায় বিছানা ছাড়িয়া।
এরূপ নিষ্ঠুর দেখি নাই কখন
দংশন করিয়া করে জ্বালাতন।
উত্তরঃ ছারপোকা

৪. অন্তহীনে নাম কি তার
দেহ আছে পদ নাই যার
মাথা কেটেও মাথা দেখি তার
মুক্তার সাথে তুলনা যার।
উত্তরঃ শিশির

৫. অষ্ট চরণ ষোল হাঁটু মাছ ধরতে চায়
শুকনো ভূমিতে পেতে জাল, মাছ ধরে চিরকাল।
উত্তরঃ মাকড়সা

৬. অহুর মহুর
কহুর বুড়ি
বুকে একটা দাঁত
হাত পাঁচ ছয় ল্যাজ তার
পাছায় একটা বাঁশ।
উত্তরঃ বরশী

৭. অভাগীর ঘরে বাস
এমন ডাক ডাকে

www.pathagar.com

অমানুষ বলে মানুষ
সকলেই ঠেকে।
উত্তরঃ টিকটিকি

৮. অতি ছোড জন্তুটা
পিঠে নেয় মানুষটা।
উত্তরঃ খড়ম

৯. আইছি কাজে
কইনা লাজে
হেইয়্যা আছে
দুই ঠ্যাঙের মাঝে।
উত্তর : গাভীর দুধ

১০. আইলে আইলে যায়
হোগায় আদার খায়।
উত্তর : কাঁথা সেলাই করা

১১. আইল্যা মুরহার
টাইন্যা ছাও
উল্ডা বাইলে জবাই দিয়া
কাইড্যা কুইড্যা খাও।
উত্তর : নারিকেল

১২. আউলা গাছের তলা দিয়া
কালা ছাগল যায় চলিয়া।
উত্তর : উকুন

১৩. আকাইশদ্যা পড়লো বুড়ি
কাঁথা বালিশ লইয়া
হেই বুড়ি কথা কয়
সবার মাঝে বইয়া।
উত্তর : হুঁকা

১৪. আম না, জাম না, গাছে না ধরে
সকলে ফল বলে জানে শুধু তারে।
উত্তরঃ পরীক্ষার ফল

www.pathagar.com

১৫. আসে বসে বেয়াই
বাড়ির সবাই ক্যামন আছে ভাই ?
উত্তরঃ নাতীন জামাই

১৬. আইলাম কাজে বলি না লাজে
আছে তা দুই ঠ্যাংগের মাঝে ।
উত্তরঃ দুধ

১৭. আল্লায় দেছে হরমু কি
বোট নাই তার ধরমু কি
উত্তর : ডিম

১৮. আন্ধার ঘরে বান্দর নাচে
দূর করলে আরো নাচে ।
উত্তর : জিহ্বা

১৯. আছে ফল গাছে নাই
খাই ফল দ্যাশে নাই ।
উত্তর : শীল

২০. ইল বিলে পানি নাই
হুগনার উফাইরদা নৌকা যায় ।
উত্তর : মই

২১. উঁচাউঁচা বুক টান
এক বেডার চাইর কান ।
উত্তর : চৌচালা ঘর

২২. উপরে কাডা ভিতরে আডা
বলতে হবে কি হেডা?
উত্তর : কাঁঠাল

২৩. এ ঘর খায় ও ঘর খায়
পেরতেক ঘরে পাছার খায় ।
উত্তর : ঝাড়ু

২৪. এইড়ু পক্ষীর এইড়ু গোশত
এইয়া যে কইতে পারবে

www.pathagar.com

হেই আমার দোস্ত ।
উত্তর : সুপারি

২৫. একটু হানে পুহুর পানি টলমল করে
এমন বাপের পুত নাহি বইস্যা মাছ ধরে ।
উত্তরঃ হুক্কা

২৬. আসতে আসতে আইছ তুমি চালাকী করবে কারে
হাউরে আমার বিয়া হরছে তোমার বউর মারে ।
উত্তরঃ শাশুড়ি

২৭. এই দেহি এই নাই
রূপালী লেজ, দেহ নাই ।
উত্তরঃ বিজলি

২৮. এক মাড়ি দাঁত ভাংগে জঙ্গল বন
দাঁত দিয়া তোলে পোকা সে কোন জন ।
উত্তরঃ চিরুনি

২৯. আমি থাহি ডালে তুমি থাহো খালে
তোমার আমার দেখা হবে মরণের কালে ।
উত্তরঃ মরিচ ও মাছ

৩০. আমি তুমি একজন দেখতে একরূপ
আমি কত কথা কই তুমি কেন চুপ ?
উত্তরঃ ছবি

৩১. আজব জিনিস দেইখ্যা আইলাম মাডে
আট পাও, দুই হাঁটু, লেজ আছে তার পিডে ।
উত্তরঃ দাঁড়িপাল্লা

৩২. আগায় খস খস গোড়ায় মৌ
বলতে না পারলে হে আমার বউ ।
উত্তরঃ আখ

৩৩. এমন কি জিনিস ভাই
চোখ আছে মাথা নাই ।
উত্তরঃ কাঁকড়া

www.pathagar.com

৩৪. আতুর বাড়োইল বাইশখান
চোরে নিলো তিন হান, থাহে কয় হান।
উত্তরঃ একখানও না

৩৫. একা গাছে এক বুড়ি
চউক তার বার কুড়ি।
উত্তরঃ আনারস

৩৬. এক মুখ তিন মাথা
রোজই খায় লতাপাতা।
উত্তরঃ চুলা

৩৭. একা তারে যায় না দেখা সঙ্গী পাইলে বাঁচে
আন্ধারে পালায় সে আলোতে ফিইর‍্যা আসে।
উত্তরঃ ছায়া

৩৮. আন্দি ভিডায় কান্দি নাই
ফুল ফুইট্যা রইছে তোলনী নাই।
উত্তরঃ আকাশের তারা

৩৯. আল্লাহর কি কুদরত
লাঠির মইদ্যে শরবত।
উত্তরঃ আখ

৪০. আষ্টো পায়ে বুনে জাল দিন রাত ঘরে
জালে বইস্যা করে শিকার জালটা যেই লড়ে।
উত্তরঃ মাকড়সা

৪১. আকাশে জন্ম দিন রাইত থাহে
আকাশে হগোলে রাইতেই দ্যাহে।
উত্তরঃ তারা

৪২. হাত পাও মুখ নাই কোমো চলে
পানিতে ফালাইলে মাছে খাইয়া ফেলে।
উত্তরঃ কেঁচো

www.pathagar.com

৪৩. আমরা দুই ভাই
দাদার মাথায় টিকি আছে
আমর মাথায় নাই
উত্তরঃ ব-ধ

৪৪. আঁক কেঁটে পাঁক কেটে
লাগালাম চারা
ফুল নাই, ফল নাই
শুধু পাতা ভরা।
উত্তরঃ পান

৪৫. আশ্চর্য কথা শুনে হাসি পায়
নিজেকে দেখে না কিন্তু অপরকে দেখায়
মানব মধ্যেতে সে সদা করে বসতি
ঠিক উত্তর দিতে পারে কেবল বুদ্ধিমতী।
উত্তরঃ চশমা

৪৬. আদ্যিকালের কাথা
কোন গাছের একটা পাতা।
উত্তরঃ ব্যাঙের ছাতা

৪৭. আটখানা পা ষোলখানা হাঁটু
জাল বুনছে মোক্তার নাটু।
উত্তরঃ মাকড়সা

৪৮. আকাশ থাইক্যা পড়ল বুড়ি
খাতা বালিশ লইয়া
সেই বুড়ি কথা কয়
সবার মাঝে বইয়্যা।
উত্তরঃ হুক্কা

৪৯. আগা লক লক পাতায় রসের বাস,
ফুল না ফল ধরে বার মাস।
উত্তরঃ পান

৫০. আমি যাকে আনতে গেলাম
হ্যারে দ্যাইখ্যা ফিরা আইলাম

www.pathagar.com

হে যহোন চইলা গ্যালো
হ্যারে লইয়া ঘরে আইলাম।
উত্তরঃ বৃষ্টির পানি

৫১. আঁখির মধ্যে পাখির বাসা
জল দিয়াছে নালে
চৌপাইয়ার উপর নিপাইয়া নাচে
ছোপাইয়া নিছে চিলে।
উত্তরঃ গরু ও গাছ

৫২. আউত্তা রইছে তাউত্তা দিয়া
বৈরাগী রইছে চাইয়া
গাছের বোট গাছে রইছে
ফলটা পড়ছে খইয়া।
উত্তরঃ দুধ

৫৩. আল্লাহ পাকের ফুল বাগানে
ফুটছে নানান ফুল
কোন কালের পণ্ডিতের দল
গুইন্যা না পায় কুল।
উত্তরঃ তারকা

৫৪. আমার ভাই মীর
বড় বড় লোকের সঙ্গে
বসে খায় ক্ষীর।
উত্তরঃ মাছি

৫৫. আকাশ ধুম ধুম পাতালে কড়া
ভাঙল হাঁড়ি লাগল জোড়া।
উত্তরঃ মেঘের ডাক ও বিজলি চমক

৫৬. আমার ভাই মদন রায়
একশো আটটা জামা গায়,
তবু আরো জামা চায়।
উত্তরঃ কলাগাছ

৫৭. আম গাছে চিলের বাসা
কোন গাছের ফল কাঁচা।
উত্তরঃ আলু

www.pathagar.com

৫৮. আছাড় দিলে ভাঙে না
টিপ দিলে গলে
একওক্তা না পেলে
বাঙালির না চলে ।
উত্তরঃ ভাত

৫৯. আট পাও ষোল হাঁটু
বসে আছে বীর বাটু
হুগনায় ফালাইয়া জাল
মাছ মারে সবকাল ।
উত্তরঃ মাকড়সা

৬০. ইল শুকাইল, বিল শুকাইল
এক গোল্লা পানি রইল ।
উত্তরঃ তরমুজ ।

৬১. ইট ঘুঘুর পিঠ টান
কোন ঘুঘুর তিন কান ?
উত্তরঃ চুলা

৬২. ইলবিল হুগাইয়া গ্যাছে গাছের আগায় পানি
কও দেহি হেই কতাডা ক্যামন কইর‍্যা জানি ।
উত্তরঃ নারকেল

৬৩. উঠান ঠনঠন বৈঠক মাটি
কোন কুমারে গড়ছে ঘটি
বিনা দুধে হইছে দই
এমন কুমার পাইবা কই ।
উত্তরঃ চুন

৬৪. উপরে বাড়িতে আগুন লাগছে
মধ্যের বাড়ি ডাক মারছে
ভাঙাও শোলক আমার কাছে ।
উত্তরঃ হুক্কা

www.pathagar.com

৬৫. উপরে গোনে পড়লো বুড়ি
ছায়াময় আঠার কুড়ি।
উত্তরঃ বৃষ্টি

৬৬. উডান টনটন ঘণ্টায় বাড়ি
কো ছাগলের মুখে দাড়ি।
উত্তরঃ রসুন

৬৭. উপরে চাপ নিচে চাপ
মইদ্যেগোনে বাইরায় সাপ।
উত্তরঃ জিহ্বা

৬৮. উপরডা শক্ত ভিতরটা নরম
খাইতে মজা যদি খাও গরম গরম।
উত্তরঃ ডিমি

৬৯. উল্টো সোজা একই কথা
প্রাণী যেথা সেও তথা
তিন অক্ষরে সবটা
বল দেখি উত্তরটা।
উত্তরঃ নয়ন

৭০. উপরে তিতা মধ্যে মিঠা গোল গোবিন্দ দাস
এই ধাঁধা বলতে লাগবে সাড়ে তিন মাস।
উত্তরঃ কাঠবাদাম

৭১. উপরে কাঁটা ভিতরে আটা
বাঙালি খেলে বলে, ভারি মজা এটা।
উত্তরঃ কাঁঠাল

৭২. এক গাছের দুই মাথা
শুনছে কে এই আজগুবি কথা।
উত্তর : নৌকা

৭৩. এক ঘোড়ার দুই শিং
দশ ঘোড়ার কয় শিং?
উত্তর : ঘোড়ার শিং নাই

www.pathagar.com

৭৪. একই সনে জন্ম নিল
ভাই তিন জন,
মাইজ্যা ভাই বড় ভাই রে
করিল গ্রাস,
ছোট ভাই গর্ভে গিয়ে
করিল খালাস।
উত্তর : শিকল, তালা, চাবি

৭৫. একটা ডিম সিদ্ধ করতে পাঁচ মিনিট লাগে
পাঁচটা ডিম সিদ্ধ করতে কয় মিনিট লাগে।
উত্তর : পাঁচ মিনিট

৭৬. একটি গাছে সাতটি বক
শিকারি বন্দুক দিয়ে
করল একটি বধ
বাদবাকি গাছে আর
কয়টা বক আছে।
উত্তর : একটিও না (গুলির শব্দে সব উড়ে যায়)

৭৭. একটা ঘরে সাতটা বাটি
যে কইতে না পারে হ্যার নাকটা কাটি।
উত্তরঃ চালতা

৭৮. এক গাছে তিনি তরকারি
কইতে পারে কোন ব্যাপারী ?
উত্তর : কলাগাছ

৭৯. এমন একটা দেশ চাই
যে দেশে মাটি নাই।
উত্তরঃ সন্দেশ

৮০. এমন সুন্দর মাইয়াডি
পরে সাদা শাড়ি
নায় না খায় না
তবুও সে সুন্দরী।
উত্তর : রসুন

www.pathagar.com

৮১. এক প্যাডে তিন মাথা মাঝে আগুনের গোলা
কইতে না পালে খাইবে কান মলা।
উত্তরঃ উনুন

৮২. এক হাত গাছটা
ফল ধরে পাঁচটা।
উত্তরঃ হাতের পাঁচ আঙুল

৮৩. এপার ঝাড়ি ওপার ঝাড়ি
ঝাড়িতে করে পিড়াপিড়ি।
উত্তরঃ চোখের পিসি

৮৪. এক ঘরে জন্মে দুই ভাই
মানষের মইধ্যে তা দেখতে পাই।
উত্তরঃ চোখ

৮৫. এক মাঘে যায় না
হারা বছর রয় না।
উত্তরঃ শীত

৮৬. একটা গরুর পাছে পাঁচ লেজুড়
পাঁচটা গরুর কয়টা লেজুড়।
উত্তরঃ পাঁচটা

৮৭. এক গাছে বহু ফল গায়ে কাঁটা কাঁটা
পাকলে ছেলো যদি হাতে লাগে আটা।
উত্তরঃ কাঁঠাল

৮৮. একা গাছে একা বুড়ি
চোক তার বারো কুড়ি।
উত্তরঃ আনারস

৮৯. একটা মাথা তিনটা পা
চললে বলি আহা আহা !
থামলে বলি হায় হায়
পরানটা বুঝি এই যায়।
উত্তরঃ সিলিং ফ্যান

www.pathagar.com

৯০. এতবড় আঙিনা, ঝাড় দিলেও ফুরোয় না
কত ফুল ফুটে আছে নাই তার তুলনা।
উত্তরঃ আকাশ ও তারা

৯১. এক গাছা দড়ি
গুছাতে না পারি।
উত্তরঃ রাস্তা

৯২. এখান তেকে মারলাম তারা
তারা গেল দক্ষিণপাড়া।
উত্তরঃ বাঁশি

৯৩. এই ঘর দিয়া ঐ ঘরে যায়
দুপপুর দুপপুর পাছাড় খায়।
উত্তরঃ ঝাঁটা

৯৪. এতটুকু গাছে
লাল মিঞা নাচে।
উত্তরঃ পাকা মরিচ

৯৫. এক মুট কাইচ্চা
ফুল ফোটে নাইচ্চা
উত্তর : খই

৯৬. একটু খানি গাছে
কেষ্ট ঠাকুর নাচে।
উত্তরঃ বেগুন

৯৭. এখান থেকে দিলাম দৃষ্টি
ওই গাছটা বড় মিষ্টি।
উত্তরঃ আখ

৯৮. এপারে ঢেউ ওপারে ঢেউ
মধ্যিখানে বসে আছে বুড়া বেটার বউ।
উত্তরঃ শাপলা

৯৯. এতটুকু গাছটি ফল বিস্তর ধরে
তোতা পাখি খেয়ে গেল

www.pathagar.com

প্রাণ ধুক ধুক করে।
উত্তরঃ মরিচ

১০০. এখান থেকে ফেললাম ছুরি
বাঁশ কাটলাম আড়াই কুড়ি
বাঁশের মধ্যে গোটা গোটা
আমার বাড়ি চল্লিশ কোঠা।
কোঠার উপর কোঠা জানি
তার মধ্যে এক রাণী।
উত্তরঃ মৌমাছি

১০১. একটু খানি মামা
তার গা ভর্তি জামা।
উত্তরঃ পিঁয়াজ

১০২. একটু খানি পুস্করিণী জল টলমল করে
রাজার বেটার সাধ্যি নেই জাল ফেলতে পারে।
উত্তরঃ চোখ

১০৩. এক মায়ের দুই ভাই
কেউ কারে দেখতে নাই।
উত্তরঃ চোখ

১০৪. একটু খানি ঘরে চুনকাম করে
জন্ম যখন পাই, আমার নড়চড় নাই।
উত্তরঃ ডিম

১০৫. একটা পুস্কুনি দুই রকম পানি
রাজার বউ রাণী, এক বাটায় দুই রহম পানি।
উত্তরঃ ডিম

১০৬. এক পাত্রে চাইর খুটা
ফল তুললে গাছ হুদা।
উত্তরঃ গরুর ওলান

১০৭. এক বেডার এক ঠ্যাং
গাছে উইড্যা ঢ্যাং ঢ্যাং।
উত্তর : কুঠার

www.pathagar.com

১০৮. এক বুড়ির ষাইট মাথা
চন্দ্রের লহে কয় কথা
সূর্য দেখলে গোছায় মাথা
উত্তর : শাপলা

১০৯. এক বুড়ির তিন মাথা
নিত্য খায় লতাপাতা
উত্তর : চুলা

১১০. এপারে সাপ ওপারে সাপ
ডিম পারে সাপাসাপ।
উত্তর : বেত ফল

১১১. এট্টুহানে পুহিরডা মরা মানুষ ভাসে
হোগা ধইর‍্যা টিপ দিলে খট্ খটাইয়া হাসে।
উত্তর : টর্চ লাইট

১১২. এট্টুহানে পুহিরডা,
পিতলার ছাউনি।
মেঘ নাই বিষ্টি নাই
তবুও পড়ে পানি।
উত্তর : চোখ

১১৩. ওপার থেকে এলো বুড়ি সাদা কাপড় পরে
ভোজনে বসিল বুড়ি ঘাড় নেড়ে নেড়ে।
উত্তরঃ বক

১১৪. কইতে পার ভাই এ কেমন ধারা
রাইতে থাহে শুইয়া দিনে থাহে খাড়া।
উত্তরঃ মাদুর

১১৫. কাঠের বলদ গোশতের শিং
চলছে বলদ বাদলা দিন।
উত্তরঃ শামুক

www.pathagar.com

১১৬. করাতে কাটিয়া পাথরে ঘঁষিয়া
নারী লোকে হাতে দেয় হাসিয়া হাসিয়া।
উত্তর : শঙ্খ

১১৭. কালা ছাগলডার গলার দড়ি
পেরতেক আডে লড়ালড়ি।
উত্তর : কেরসিনের বোতল

১১৮. কালা কালা ভূইত্যা কালা
লেঙ্গুর ধইর‍্যা খালে ফালা।
উত্তর : ঝাঁকি জাল

১১৯. কোনো জল খায় না।
উত্তর : কাজল

১২০. কালা পাথর গলায় দড়ি
রাইত অইলেই তালাশ করি।
উত্তরঃ কেরোসিনের বোতল

১২১. কালিদাস কইয়া গেছে
শিশুকালের কথা
নয় লক্ষ তেঁতুল গাছে
কয় লক্ষ পাতা।
উত্তর : আঠারো লক্ষ

১২২. কালিদাস পণ্ডিতের ফাঁকি
আড়াইশো থেকে পাঁচ পঞ্চাশ গেলে
কত থাকে বাকি।
উত্তর : কিছুই না।

১২৩. কাঁচার সময় আমারে শুকাও
শুকাইলে তখন জ্বালাও।
উত্তরঃ গোবর

১২৪. কাঁচার তুল তুল পাকলে সিন্দুর
এই শ্লোক ভাংগাইতে না পালে সে উন্দুর।
উত্তরঃ মেটে পাতিল

www.pathagar.com

১২৫. কালা হরিণ থাহে কালা বনের ধারে
দশজনে ধরে দুইজনে মারে।
উত্তরঃ উকুন

১২৬. কাঁচায় তুল তুল পাকালে দল
নেংটা দেখলে মুখে আসে জল।
উত্তরঃ তেঁতুল

২২৭. কাঁসারির সারি ছেড়ে
পাঠার ছেড়ে পা
লবঙ্গের বঙ্গ ছেড়ে
কিনে আনো তা।
উত্তরঃ কাঁঠাল

২২৮. কাঁচা খাও পাকা খাও খেতে বড় মিষ্টি
আমি যদি খেতে বলি রেগে অনাসৃষ্টি।
উত্তরঃ কলা

১২৯. কান্দার উপর কান্দা
যে না ভাংগাইতে পারে
হ্যার বাপ-ভাই সব বান্ধা
উত্তরঃ কলার ছড়া

২৩০. কালা কুইল্যা জলে ভাসে
হাড্ডি নাই তার মাংস আছে।
উত্তরঃ জোঁক

২৩১. কি কমু বাপুরে
বেইল যায় চলেরে
ওর বাপ বিয়া হরচে
মোর বাপের মেয়েরে।
উত্তরঃ মামা ও ভাগনি

১৩২. কেবল বাইড়া যায় তবো কেন কোমে না
দুইন্যারে একি ব্যাপার বুঝিতে পারি না।
উত্তরঃ বয়স

www.pathagar.com

১৩৩. কোমর ধইর‍্যা শোয়াইয়া দাও
কাজ করার কইর‍্যা নাও।
উত্তরঃ শিলনুড়ি

১৩৪. কোলার ধারে বাসাইলাম চারা
ফুল নাই ফল নাই শুধু পাতা ভরা।
উত্তরঃ পান

১৩৫. কোন পাখির আন্ডা নাই কও দেহি ভাই
না পারলে বুঝুম মাথায় বুদ্ধি নাই।
উত্তরঃ বাদুড়

১৩৬. কোঠরে বাস করে
বাড়ি লাগে না
সবাইরে দেখতে পারে
নিজেরে দেহে না।
উত্তর : চক্ষু

১৩৭. কোল গুঁজা কোল গুঁজা
মুখে এট্টা দাঁত
আত পাঁচ-ছয় লেগুরডা
হোগায় এট্টা বাঁশ।
উত্তর : বড়শি

১৩৮. কোলার মাঝে রইস্যা
দুয়ার দেছে কইস্যা।
উত্তর : শামুক

১৩৯. কান্দার উপর কান্দা
যে না কইতে পারে
তার নানি রে দেই বান্দা।
উত্তর : কলা

১৪০. কান্ধে আয় কান্ধে যায়
বিনা দোষে মার খায়।
উত্তরঃ ঢোল

www.pathagar.com

১৪১. কোন বেটা শয়তান
নাকে বসে ধরে কান।
উত্তরঃ চশমা

১৪২. কোন ফলের বীজ নেই বল দেখি দাদা
বলিতে না পার যদি হবে তুমি গাঁধা।
উত্তরঃ নারকেল

১৪৩. কালো মেয়ে আকাশে চলে
কলসি থেকে পানি ফেলে।
উত্তরঃ মেঘ

১৪৪. খাল বিল হুগাইয়া গেছে
গাছের মাথায় পানি।
উত্তর : নারিকেল

১৪৫. খাল বিল হুগাইয়া গেছে
গাছের মাথায় পোনা।
উত্তর : খেজুর ।

১৪৬. খুইল্যা বইয়া রইলাম
হান্দাইয়া আইড্যা আইলাম
উত্তর : জুতা

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

লোকসমাজে প্রবাদের প্রচলন সুপ্রাচীনকাল থেকে। জীবন পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশের সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি হল প্রবাদ। প্রবাদ-প্রবচনে প্রস্ফূটিত হয় সমাজজীবনের তাৎক্ষণিক দর্শন ও অভিব্যক্তি। বরিশালের সামগ্রিক জীবন প্রবাহে প্রবাদ-প্রবচনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। নিচে বরিশাল অঞ্চলের কিছু সংখ্যক প্রবাদ প্রবচন তুলে ধরা হলো।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন

অ.

১. অতি চালাকের গলায় দড়ি।
অতিরিক্ত চালাকির ফাদে নিজেই পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা কপটতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আ.

১. আইগ্যা হোছে না মুইত্যা নামে গলা পানি।
আসল কাজ না করে অকাজে মাতুব্বরি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. আউগারি জোয়ারের পোটকা
চাতুর্য অর্থে প্রয়োগ।

উ.

১. উটকালে উটকাল চেনে।
হীস্বজাতির পরিচয় স্বজাতিই ভালো জানে।

২. উদ্যাইররা পাদন পাদা।

এ.

১. এক গোস্তে খাওন শ্যাষ
লাভবান হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. এমনি নাচউন্যা বুড়ি
হের উফার ঢোলের বাড়ি।
উৎপাতসৃষ্টিকারীকে উসকে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ও.

১. ওই চেহারায় আলোমতির পাঠ।
নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. ওড ছেমড়ি তোর বিয়া।
তাড়াহুড়া করে কোন কাজ সম্পন্ন করা।
অভিজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

ক.

১. কই রাজরাণী, কই বুইড়া চুতমারানী।
ভালো-মন্দের তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

২. কফালে চান ওডছে।
সৌভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খ.

১ খায় খয়রাত চাইয়া
পাদে চেরাগ জ্বালাইয়া।
সামর্থের বাইরে কোনকিছু করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২ খালি হাত কুত্তায়ও চাডে না।
অর্থহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ.

১. গরিব মাইনষের মোতনের কাম কি?
সাধারণ মানুষের বিলাসিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঘ.

১. ঘরে নাই বেড়া, চৌদ্দ হাত চেড়া।
গৌণ কাজকে প্রাধান্য দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চ.

১. চালাক মানষের গু লাগে তিন জাগায়।
অতিরিক্ত চালাকির ক্ষতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. চিলে থাবা দেলে কুডা গাছ নেলেও নে।
শক্তিশালী শত্রু ক্ষতি করলে কিছু না কিছু হবেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ছ.

১. ছ্যাপ দিয়া পিডা ভাজা।
যেনতেনভাবে কাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ।

জ.

১. জাত বৈদ্যের ওষুধ খাইয়া মরণও ভাল।
সঠিক কাজ করে ঠকাও লাভজনক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. জাতের ধারা বেগুন চাড়া।
স্বজাত্যবোধ বজায় রাখা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঝ.

১. ঝিঙ্গা রেহা খায় না
পিছা মারলেও যায় না।
আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ট.

১. টাহা গুঁইলেরও থাহে।
মূর্খ ব্যক্তিরও অর্থ থাকতে পারে অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

ঠ

১. ঠেকলে বুড়া গরুতেও চাড় পাড়ায়।
সমস্যায় পড়লে অসমর্থ লোকও সামর্থ ফিরে পায়।

ড.

১. ডুগডুগ খেলা না কি কুদ্দুসইস্যারে লাইথানো?
কোন কাজের আড়ালো অন্যের ক্ষতি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ত.

১. তাল টাহি।
অতিশয় ধূর্ত ব্যক্তি।

২. তেল পিছলা।
চাটুকার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

দ.

১. দায়ের চাইতে আছাড়ি বড়।
কর্তার চেয়ে তার তোষামোদকারী ক্ষমতা প্রদর্শন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২ দারোগার চাইতে মাঝির চোট বেশি।
একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ধ.

১. ধইরা বাইন্ধা পীরের মুরিদ অয়না।
জোর করে ভালো কিছু করানো যায় না অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. ধর খোন্তা দে মাডি, কোন চেডের কান্নাকাডি।

ন.

১. নাপিতের বুদ্ধি ষোল চুঙ্গা।
নাপিতের ধূর্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. নিজে হোয়ার জাগা নাই, কেডি পালে বর্গা।
সামর্থহীনের বিলাসিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প.

১. পাগলের সুখ মনে মনে
টাট্টিতে বইয়া তারা গোনে।
ফলাফলহীন সাফল্য জাহির করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. পারে না বাল ফালাইতে, উইড্যা বইছে বেইন্যা রাইতে।
অকর্মণ্যের নিস্ফল কর্মস্পৃহা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ফ.

১ ফাডা বাঁশে ওল পড়া।
মহাবিপদে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব.

১. বইতে (বসতে) দিলে হুইতে (শুইতে) চায়।
সুযোগসন্ধানী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

২. বউ আডে যাইবে পোলের উফাইরদা সরেন।
লোক দেখানো লজ্জা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভ.

১. ভরা কলস লড়ে না।
জ্ঞানী ব্যক্তি বাচাল বা অস্থির নয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. ভাতে কয় মোরে খা
আপুর দিয়া ঘরে যা।
ক্ষুধা রাগ মানে না অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ম.

১. মাইয়া তো না, জাইত্যা হাপ
সোয়ামিরে কয় ধম্মের বাপ।
ঝগড়াটে ও মিথ্যাবাদী নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

২. মাথায় নাই চুল বোগলে বাবড়ি
ক্ষমতাহীনের ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।

য.

১. যার গোষ্ঠী কুমিরে খাইছে হে ঢেঁহি দেখলেও ডরায়।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সামান্য সমস্যায় ভয় পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. যার লগে যার ভাব আছে, হোগা দেখলেও লাভ আছে।
যাকে ভালো লাগে তার সবকিছু ভালোলাগা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ল.

১. লাঙও গেলো ভাতারও গেলো।
যে বৈধ ও অবৈধ উভয়কূল হারিয়েছে।

শ.

১. শহরে খায় আফারে মোতে।
অলস যুবক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স.

১. সুইড্যাকাডির বাইল
ধাপড়ায় মুরহা রান্দে ডাইল।
প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হ.

১. হোগায় নাই লোম পুথি পড়ার যম।
ক্ষমতাহীনের অহেতুক আস্ফালন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. জোড়া ইলিশ ঘরে তোলা

বরিশাল অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অন্যতম বিষয় জোড়া ইলিশ ঘরে তোলা। সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ মাঘ মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা মাঘ, অথবা শুক্লপক্ষের শ্রীপঞ্চমী আবার কেউ কেউ মাঘী পূর্ণিমায় জোড়া ইলিশ জোড়া বেগুনসহ ঘরে তোলেন। ঘরে লক্ষ্মীদেবীর সুদৃষ্টি প্রদান, সন্তানেরা মাছে-ভাতে থাকবে এমন আশায় এই রীতি হাজার বছর ধরে বরিশাল অঞ্চলে চলে আসছে।

অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রভাষক অনিতা বসু জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার পর অর্থাৎ বিজয়া দশমী থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। পহেলা মাঘ বা উল্লিখিত অন্যান্য দিনে জোড়া ইলিশ কিনে পুকুর বা তোলা জলে স্নান করিয়ে কাঁসার থালায় জোড়া বেগুনসহ ঘরে তোলে। এসময় সিঁদুর দিয়ে ইলিশ মাছকে সাজিয়ে থালায় ধান-দূর্বা-সিঁদুর সহকারে উলুধ্বনি দিয়ে মাছ ঘরে তোলা হয়। তবে সিঁদুর একটি মাছের গায়ে দেয়া হয়। কারণ, মনে করা হয়, জোড়া ইলিশের একটি পুরুষ এবং অপরটি নারী। যেটিকে নারী ইলিশ মনে করা হয় সেটিকেই সিঁদুর পড়ানো হয়। ঘরে জোড়া ইলিশ ওঠাবার ক্ষেত্রে কোন মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

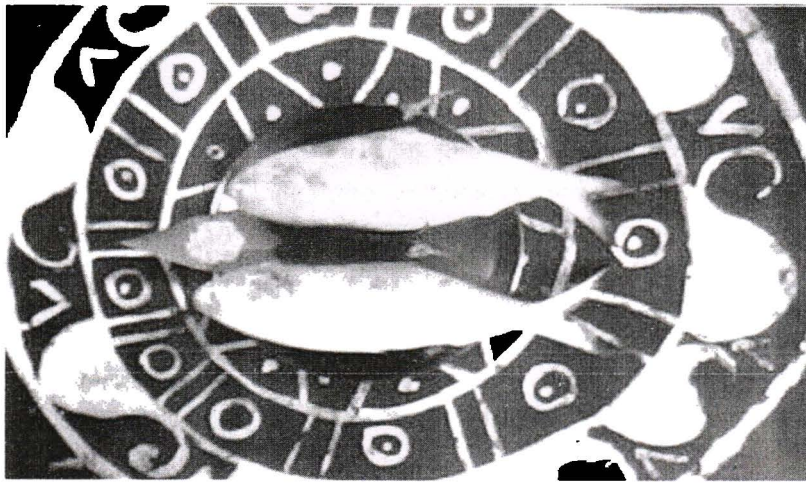

www.pathagar.com

মঙ্গলসূচক আলপনার উপর জোড়া ইলিশ

মাঙ্গলিক এই রীতি অনুযায়ী ঘরে তোলা ইলিশের আঁশও সংরক্ষণ করা হয়। কারণ হিসেবে অনিতা বসু বলেন, যত আঁশ তট অর্থ আসবে ঘরে এমন ধারণা থেকেই আঁশ ঘরে বছর ধরে সংরক্ষণ করা হয়।

ইলিশ ঘরে তোলার রীতির বিষয়ে অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক অঞ্জু বড়াল বলেন, আমাদের মা-ঠাকুরমারা ইলিশ ঘরে তুলতেন। তাদের দেখাদেখি বংশপরম্পরায় আমরাও জোড়া ইলিশ ঘরে তুলছি।

প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক নীলরতন ঘটক রায় জোড়া ইলিশ ঘরে তোলার বিষয়ে বলেন, ইলিশ রক্ষার জন্য আগেরকার সচেতন মানুষ এই রীতির প্রচলন করেন। কারণ হিসেবে তিন বলেন, আশ্বিন থেকে পৌষের শেষ পর্যন্ত ইলিশের প্রজনন মৌসুম। ওই সময় একটি ইলিশ ধরলে হাজার হাজার ইলিশ থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইলিশ রক্ষায় এই রীতির প্রচলন আছে আজো।

২. ভিতপূজা

গৃহনির্মাণের আগে ভূমি সংস্কার এবং বাস্তু দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পূজা দেয়ার রীতি এই অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এই বিশেষ পূজা ভিতপূজা নামে পরিচিত। পাকা বাড়ির ক্ষেত্রে এই পূজার পরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং কাঁচা বাড়ির জন্য খুঁটি পুঁতে গৃহনির্মাণ শুরু করা হয়। এ ছাড়া নির্মাণাধীন গৃহের উপর থেকে অশুভ শক্তির প্রভাব দূরীকরণের জন্য খুঁটির আগায় ছেড়া জুতা, ভাঙা ঝুড়ি, ঝাড়ু ইত্যাদি টানানো হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই সকল দ্রব্যাদি, কুনজর থেকে বাড়ি রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৩. বন্ধন

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকসমাজে রোগ-শোক, ভূত-প্রেম এবং দৈব দুর্বিপাকের প্রতিরোধক হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত। এই ধারার অংশ হিসেবে বাংলার দক্ষিণ প্রান্তের লোকসমাজে বিভিন্ন প্রকার বন্ধন মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিরক্ষায় বিশ্বাস করা হয়। এই বিশ্বাসের পরপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলে, অগ্নিবন্ধন, সাপবন্ধন, বাঘবন্ধন এমনকি বাড়ি ও গ্রামবন্ধন দেয়ার রীতির কথা জানা যায়। বন্ধন ধরনের লোকচারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, জীবনধারণের উপায়সমূহ যে স্থানে বিপন্ন প্রতীয়মান, সেই স্থানের লোকজীবনে এই

www.pathagar.com

প্রকারের বন্ধন নামক বিশ্বাস, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থানে অবস্থিত। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক কারণে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ায় এখানকার লোকসমাজের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন লোকচারে অভ্যস্ত বলে প্রতীয়মান। প্রত্যন্ত এলাকার নিরুপায় লোকজীবনে দেব-দেবী ছাড়াও পির-মুর্শিদের দোহাই দেয়া এখানকার অতি পরিচিত দৃশ্য।

৪. আটকলাই

শিশু জন্মের অষ্টম দিনে নবজাতকের নিরাপদ ভবিষ্যৎ কামনার লক্ষে আটকলাই বা আটকড়াই নামের এই লোকাচারটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পালন করা হয়। এই দিনে নবজাতকের প্রতিবেশী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা কুলা পিটানো হলে, অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে দেয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই সংগে ছড়া কেটে নবজাতকের মঙ্গল কামনাও করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে নবজাতকের পরিবারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা ছেলেমেয়েদের ছোলা, মুগ, খেসারি, মুড়ি, চিড়া, খই, মটরভাজা ইত্যাদি ধরনের আট প্রকার খাবার খেতে দেয়া হয়।

৫. নজর লাগা

আদিম সমাজের বিভিন্ন প্রকার ভীতি থেকে নজর লাগা ধারণার উদ্ভব। এই অঞ্চলের লোকসমাজে নজর লাগা ব্যাপারটি বেশ তাৎপর্যের সংগে গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক সময়েও মায়েরা তার সন্তানটিকে যেকোন ধরনের নজর থেকে দূরে রাখতে সন্তানের কপালে কাজলের টিপ এঁকে দেন

www.pathagar.com

সাধারণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, অপ-দেবতাদের অমঙ্গলসূচক দৃষ্টি যে কোনো কিছুরই জন্যই অনিষ্ট বয়ে আনে। অনিষ্টকারী এই দৃষ্টিকেই লোকসামাজে নজর লাগা বলা হয়। বস্তুত এই লোকবিশ্বাসের মূল, আদিম সমাজের ভয়-ভীতি এবং অনিশ্চিয়তার মধ্যে নিহিত।

গ্রামবাংলার মানুষ সন্তান-সন্ততি, ফসল ইত্যাদি, নজর লাগা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশে নানা প্রকার প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। শিশুদের কপালে কাজল বা কালো রঙের টিপ দেয়া, হাতে লোহা বা অন্য কোনো ধাতু নির্মিত বালা পরানো হয়।

অপ-দেবতারা খুঁতসম্পন্ন শিশু স্পর্শ করবে না এই বিশ্বাসে কোনো কোনো সময়ে জন্মের পর শিশুর কান ফোঁড়ানোও হয়ে থাকে। এ ছাড়া শিশুর কোমরে তাগা অর্থাৎ কালো মোটা সুতা বেঁধেও অপ-দেবতাকে প্রতিরোধ করা চেষ্টা করা হয়। ফসলের ক্ষেত্রে নজর দূরীকরণের জন্য, মাটির হাঁড়িতে চুন দিয়ে মানুষের মুখ এঁকে নজর প্রতিহত করার চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়।

৬. বাণ মারা

প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করা বা কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় হিসেবে আদিম সমাজে বাণ মারার প্রথা প্রচলিত ছিল। ওঝা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন গুণীনেরাই বাণ মারার কাজে সিদ্ধহস্ত বলে লোকসমাজে বিশ্বাস রয়েছে। বাণ মারার জন্য গুণীনেরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। মন্ত্র ছাড়া আরোও কতিপয় অনুষঙ্গ বাণ মারার প্রয়োজনে দরকার হয়। এই সকল কাজে সাধারণত যাকে বাণ মারা হবে, তার মাথার চুল, পরনের কাপড় বা ব্যবহৃত অন্য কোনো জিনিষের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও বাণ মারার কাজে লাউ বা মূর্তির ব্যবহার করা হয়।

৭. বশীকরণ

অপরের ইচ্ছাকে নিজের অনুকূলে বা স্ববশে আনাকে বশীকরণ বলা হয়। আদিমকাল থেকে বশীকরণে বিশ্বাসী মানুষ, স্ত্রী, স্বামী বা শত্রুকে বশ করার জন্য গুণীনদরে স্মরণাপন্ন হয়েছে। বাংলার লোকসামাজে বশীকরণকে গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয়। বশীকরণ সিদ্ধহস্ত বলে পরিচিত গুণীনেরা, কাউকে বশ করার জন্য কয়েক রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে দারুটোনা অন্যতম। দারুটোনা বলতে, মন্ত্রের সাহায্যে কাউকে বশীভূত করা হয়েছে

www.pathagar.com

বোঝায়। দারুটোনায় কাল এবং ক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দিনের ক্ষেত্রে শনি ও মঙ্গলবার এবং সময়ের ক্ষেত্রে অমাবস্যার রাত বশীকরণের জন্য সর্বোত্তম বলে বিবেচিত। গুণীন কর্তৃক নির্বাচিত গাছের শিকড়, মাথার চুল, হাতের নখ, শাড়ির অংশ বশীকরণের অতি আবশ্যক বস্তু। এইসকল দ্রব্য মন্ত্রপুত করে বশীকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয় বলে লোকসমাজে বিশ্বাস করা হয়। এ ছাড়া তেলপড়া এবং পানপড়া দিয়েও বশীকরণ করা যায় বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে।

৮. বাটি চালান

ওঝা বা গুণীনদের দ্বারা চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া কোনো মূল্যবান দ্রব্যের সন্ধানে বাটি চালান দেয়ার প্রচলন বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত। বাটি চালান দুই ধরনের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়। এক. চুরি বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সন্ধান এবং দুই. চোর ধরা। প্রথমটিতে গুণীনের মন্ত্রে চালান দেয়া বাটি চুরি বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস যে স্থানে আছে সেখানে উপস্থিত হয়। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় বাটি সরাসরি চোরের শরীর বেয়ে ওঠে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাটি চালান প্রক্রিয়ায় তুলা বা সিংহ রাশির লোক আবশ্যক। এই রাশির লোক ব্যতীরেকে বাটি চালান দেয়া সম্ভব নয়। লোক নির্বাচনের পর গুণীনের দেয়া তাবিজ মুঠিতে নিয়ে বাটির উপর সেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপুড় করে রাখা হলেই বাটি, মন্ত্র অনুসারে চলতে শুরু করে এবং জিনিষ বা চোর খুঁজে বের করে। চোর ধরার জন্য আয়নাপড়া বা চালপড়ার ব্যবহারও এই অঞ্চলে পরিদৃষ্ট।

৯. তিথি ভেদে যে খাদ্য নিষিদ্ধ

তিথি ভেদে কিছু কিছু খাবার নিষিদ্ধ বলে মনে করেন বরিশাল অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়। বরিশাল সদর উপজেলার চাঁদপুরা ইউনিয়নের রায়াপুরা গ্রামের সত্তরোর্ধ কার্তিক ঘোষ জানান–

প্রতিপদে– কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া)

দ্বিতীয়ায়– বৃহতি (বাকুর বিশেষ)

তৃতীয়ায়– পটল

চতুর্থীতে– ভাউত্তা শাক

পঞ্চমীতে– বেল

ষষ্ঠীতে– নারকেল

সপ্তমীতে– তাল

www.pathagar.com

অষ্টমীতে– গোলআলু
নবমীতে– আলাবু (লাউ)
দশমীতে– কলমী শাক
একাদশীতে– নিম
দ্বাদশীতে–পুঁই শাক
ত্রয়োদশীতে– বেগুন
চতুর্দশীতে– মাসকালাই এবং
পূর্ণিমা বা অমাবশ্যায়– মাংস ভক্ষণ নিষেধ।
কার্তিক ঘোষের মতে, তিথি ভেদে খাবার না খেলে দেহ চির রুগ্ন হয়।

১০. ভর হওয়া

গ্রাম বাংলায় যদি কোনো স্ত্রীলোকের অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার উপর ভর হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভর হওয়া বলতে লোকসমাজের মানুষ, ভর হওয়া স্ত্রীলোকটি কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে করে। ভর হওয়ার পর স্ত্রীলোকটি উচ্চস্বরে কথা বলে, বিকট স্বরে হাসাহাসি করে, বিকট অঙ্গভঙ্গীসহ অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে।

লোকবিশ্বাস যে একমাত্র গুণীন সম্প্রদায়ই মন্ত্রের সাহায্যে এই অপ-দেবতাকে তাড়াতে সক্ষম। এই অপ-দেবতাকে তাড়াতে গুণীন, মন্ত্রের সংগে হলুদ-মরিচ পোড়া, ঝাড়ুর দ্বারা পেটানো ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে। বরিশাল অঞ্চলের লোকসমাজে ভর হওয়ার চিকিৎসায় ওঝা বা গুণীনদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১১. নিশির ডাক

লোকসমাজে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, অতিপ্রাকৃত শক্তি, মানুষকে ক্ষতি করার উদ্দেশে গভীর রাতে নাম ধরে ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বা ডাক শুনে যদি কেই ঘর থেকে বের হয়, তবে ঐ শক্তি, সাড়া দেয়া বা বের হওয়া মানুষটির ক্ষতি করে থাকে।

লোকবিশ্বাস অনুসারে, এই কারণে গভীর রাতে একবার ডাক শুনে সাড়া দেয়া বা বের হওয়া উচিত না। অন্তত তিনবার ডাকের পর সাড়া দিলে, অতি-প্রাকৃত শক্তি বা অপ-দেবতার নিকট থেকে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

www.pathagar.com

১২. পানিকাওরি বাও

লোকজীবনে বিভিন্ন রোগ-ব্যধি আক্রান্ত মানুষ, রোগের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে বিভিন্ন লৌকিক এবং অলৌকিক উপায়কে রোগমুক্তির অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের লোকজীবনেও এই ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

এই অঞ্চলের কোনো শিশু বা কিশোর পুকুর বা নদীর ঘাট থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, ধারণা করা হয় ঐ শিশুর উপর পানিকাওরির আছর হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রোগী যেখান থেকে ফিরে এসেছে, সেখানে তাকে নিয়ে চাল মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। এ ছাড়া নদী বা পুকুরপাড়ের কোনো উঁচু স্থানে তিনটি কাঠি পুঁতে, একটি ছোট পাতিলে শিন্নি রান্না করে কলার ভেলায় করে দেবতার উদ্দেশে ভোগ দেয়া হয় তারপর রোগীর হাতে-পায়ে কলার খোলার আঁশ বেঁধে দিলে রোগ ভালো হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

১৩. হাইয়া নেয়া

স্বাভাবিক মৃত্যু শোকাবহ হলেও মানুষের অবধারিত পরিণতি হিসেবে মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু শিশু মৃত্যুকে মেনে নেয়া কঠিন। আর সে মৃত্যু যদি জন্মের সাথে ঘটে থাকে, তা অবশ্যই হৃদয় বিদারক।

গ্রামীণ সমাজের পরিবাসমূহে এক সময়ে শিশু মৃত্যুর হার ছিল অধিক। হাইয়া নেয়া লোকাচারটি পালন করার কথা জানা যায়। এই লোকচারটি পালন করতে, কোনো জীবিত শিশুর মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ, এবং শরীরের বিভিন্ন জোড় স্থানের ময়লা ইত্যাদি সংগ্রহ করে মাদুলি তৈরি করা হয়। মৃতবৎসা নারী এই মাদুলি ধারণ করলে, পরবর্তীতে সে মৃত সন্তান প্রসব করে না বলে বিশ্বাস করা হয়। শিশুমৃত্যুকে প্রতিহত করার এই আচারটি হাইয়া নেয়া নামে পরিচিত। হাইয়া নেয়ার ক্ষেত্রে যার কাছ থেকে মাদুলির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়, সেই শিশুটি ক্রমশ শুকিয়ে বা দুরারোগ্য রোগে ভুগে মারা যায়। অবশ্য তার প্রতিরোধকে ব্যবস্থা সম্পর্কেও বলা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যার কাছ থেকে হাইয়া নেয়া হয়েছে সেই শিশুটির নখ, চুল ইত্যাদি একটি পাতিলেবুর মধ্যে ঢুকিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিলে দোষমুক্ত হওয়া যায়। তবে এই ব্যবস্থাটি মৃতবৎসা রমণীর মাদুলি গ্রহণের আগেই করা প্রয়োজন।

হাইয়া শব্দটি সম্ভবত আরবি হায়াত অর্থাৎ আয়ু থেকে নেয়া। সে হিসেবে হাইয়া নেয়া বলতে আয়ুগ্রহণ করা বোঝায়।

এছাড়া বৃহস্পতিবারকে শুভ এবং শনিবারকে অশুভ মনে করা হয়।

www.pathagar.com

পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরের দিন কোনো কাজ করা বা যাত্রা করা হয় না।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণদিকে এবং মঙ্গল ও বুধবারে উত্তরদিকে ভ্রমণ অশুভ।

যাত্রাপথে সাপ দেখা অশুভ।

জন্মবারে চুল কাটা হয় না।

রাতে চুল আঁচড়ানো বা আয়না দেখাও অশুভ বলে বিবেচনা করা হয়।

চোখের উপরিভাগের নড়া-চড়া শুভ এবং নিচের অংশ নড়াচড়াকে অশুভ চিহ্নিত করা হয়।

সাধরণত স্ত্রী তার ভাসুরর হাত থেকে বা স্বামী তার স্ত্রীর বড়বোনের হাত থেকে বা কোনো জিনিস গ্রহণ করে না অথবা তার সাথে পারতপক্ষে কথা না বলা।

কুনজর প্রতিহত করার জন্য নুতন বাড়ি-ঘর নির্মাণের সময়ে প্রথম পোতা খুঁটির আগায়, আমপাতা, জামপাতা টানিয়ে দেয়া হয়। অশুভ আত্মা বিতাড়নে পাড়ার বৃক্ষ দেবতা ট্যান খোয়ে নামের পতাকা টানানো হয়।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

১. ডালা-কুলা-চালুনি

বাঁশ দিয়ে তৈরি কুলা এবং ডালা এবং চালুনি বাংলার লোকজীবনের অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে পরিগণিত। চাল ঝাড়া এবং চালের ক্ষুদ বের করার কাজে কুলা লোকসমাজের বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। হালকা দ্রব্যসামগ্রী বহন এবং কোনো কিছু রোদে শুকাতে দেয়ার জন্য ডালা ব্যবহার করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকাচার এবং লোকউৎসবে কুলা ও ডালার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ে, হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজায় কুলার ব্যবহার চলে আসছে। গৃহস্থালীর আর একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে চালুনির পরিচিতি। স্থানীয় ভাষায় চালুনিকে চালভিন বলা হয়। পেষাই করা শস্যাদি অপেক্ষাকৃত বড়ো অংশ বাছাই করার জন্য চালুনি ব্যবহার করা হয়। শাকপাতা ধরনের জিনিস ধোয়ার কাজেও কখনও কখনও চালুনির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। বরিশাল অঞ্চলে বাঁশ থেকে তৈরি ডালা-কুলা-চালুনি সমাজের সর্বস্তরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাঁশ-বেতের লোকপ্রযুক্তি

www.pathagar.com

২. পিঁড়ি

লোকসমাজে পিঁড়ির ব্যবহার অতি প্রাচীন। কাঠ নির্মিত এই আসন গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন জীবনে বসার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত তিন টুকরা কাঠের সমন্বয়ে পিঁড়ি তৈরি হয়ে থাকে। আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য পিঁড়ির ছাউনি জোড়াবিহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রাম্যবিবাহে ব্যবহৃত পিঁড়িতে নানাবিধ চিত্র এবং নকশার ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্যণীয়। আধুনিকতার সংগে তাল মিলিয়ে লোকউপকরণের অধিকাংশ বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেলেও পিঁড়ি আজও গ্রাম সমাজে প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে টিকে আছে।

৩. বিঁড়া

মাটির মেঝেতে হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি ধরনের জিনিসপত্র ঠিক মতো রাখার জন্য গ্রামীণ সমাজে বিড়া ব্যবহার করা হয়। মাটির নির্মিত কলস বা পানি রাখার দ্রব্যাদি বিঁড়ার উপরে রাখা হলে ঐ পাত্রের তলদেশ কর্দমাক্ত হওয়া বা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সাধারণত শুকনো ঘাস বা খড় দিয়ে দড়ি পাকিয়ে, সেই দড়ি দিয়ে গোলাকৃতির বিঁড়া তৈরি করা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের রান্নাঘরে শিঁকের মতো বিঁড়ার ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

৪. মালই

উপকূলবর্তী নারিকেল গাছসমৃদ্ধ এলাকার অধিবাসীরা চামচের বিকল্প হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে নারিকেলের মালা যা স্থানীয়ভাবে আইচা নামে পরিচিত তার ব্যবহার করে আসছে। এই আদিম ধরনের চামচ এখানে মালই নামে পরিচিত। একটি নারিকেলের মালার অর্ধেকাংশ ভাল করে চেঁছে নিয়ে, একপাশ ধরার সুবিধার জন্য খানিকটা উঁচু রেখে মালাই তৈরি হয়। ডাল বা এ ধরণের তরল পদার্থ পরিবেশন করার জন্য গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে মালইর ব্যবহার দেখা যায়।

৫. দেউলহা

বিদ্যুতের আলো বর্জিত গ্রামাঞ্চলে মাটির প্রদীপ সামান্য উঁচু করে রাখার জন্য দেউলহার ব্যবহার রয়েছে। প্রদীপের মিটমিটে আলো অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গায় ছড়ানোর উদ্দেশে দেউলহার ব্যবহার। এক ফিট বা তার সমদৈর্ঘের এক টুকরো গোলাকার কাঠ দিয়ে এই বস্তুটি নির্মাণ করা হয়। লম্বা করে দাঁড় করানো দেউলহার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তলদেশের চেয়ে উপরের পরিধি কিঞ্চিৎ ছোট করে তৈরি করা হয়। কোনো কোনো সময়ে দেউলহার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে বিভিন্ন ধরনের খাঁজ কেটে নকশা করা হয়।

৬. হিজারি

রান্নার উপকরণ নেড়েচেড়ে দেয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে হিজারির ব্যবহার রয়েছে। ধাতব খুন্তির বিকল্প, এই প্রয়োজনীয় উপকরণটি স্থানীয় ভাষায় হিজারি নামে পরিচিত। সুপারি গাছ থেকে লম্বায় দেড়/দুই ফিট ফালি করা অংশ দিয়ে হিজারি তৈরি হয়। প্রয়োজন

www.pathagar.com

অনুসারে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি চওড়া করে ফালি অংশটিকে ভালোভাবে মসৃণ করে এক প্রান্ত চ্যাপ্টা এবং অন্য প্রান্ত গোল করে নেয়া হলেই হিজারি তৈরি হয়ে যায়। অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে তৈরি হিজারি এখানকার গ্রামীণ সমাজে বহুল প্রচারিত।

৭. উড়কি

চামচের আর একটি প্রকরণ হিসেবে উড়কির পরিচিতি। রান্নায় কিংবা রান্নাকৃত তরল পদার্থ পরিবেশনে উড়কি ব্যবহার করা হয়। বৃহৎ আকৃতির গোলাকার চামচের এই বিকল্পটিও নারিকেলের মালা দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি নারিকেল মালার চেঁছে নেয়া অর্ধাংশের প্রান্তদেশ সংলগ্ন একটু নিচে বাঁশ বা সুপারি গাছের টুকরো গোল করে ভাগ করে চেঁছে, মালায় লাগিয়ে নিলেই উড়কি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। সাধারণ উপকরণে তৈরি উড়কি লোকসমাজে বহুল ব্যবহৃত।

৮. বাসন/খোরা

মাটি নির্মিত বাসনের ব্যবহার অতি পুরাতান। তৈজসপত্র ব্যবহারের আগে মাটির বাসন সর্বস্তরে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয়ভাবে বাসনকে বাসুন নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক পেয়ালার মাটি নির্মিত সংস্করণ, স্থানীয়ভাবে খোরা নামে পরিচিত। স্থানীয় হিন্দু সমাজের পাল সম্প্রদায়, মাটির এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করে থাকে।

৯. সরা

হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি ঢাকার জন্য মাটি নির্মিত ঢাকনা সরা নামে পরিচিত। স্থানীয় ভাষায় সরাকে হরা বলা হয়। গৃহস্থালীর এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যটিও পাল সম্প্রদায় কর্তৃক তৈরি হয়। এখানকার নানা আচার-অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন ধরনের চিত্রিত সবার ব্যবহার রয়েছে। বরিশালের বিস্তৃত এলাকায় সরার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়।

১০. ঘট/ঘটি

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজার্চ্চনা, আচার অনুষ্ঠানে জলপাত্র হিসেবে ঘটের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পোড়ামাটি নির্মিত ঘট লৌকিক পূজানুষ্ঠানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। অনেক সময় এই ঘট দেবতার প্রতীক হিসেবেও পূজিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানভেদে ঘটের আকৃতি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলঘট, দ্বারঘট, নাগঘট প্রভৃতি ঘটের প্রকরণ বিশেষ। আকৃতিতে ঘটের থেকে সামান্য বড় পাত্রকে ঘটি বলা হয়। লোকসমাজে ঘটির বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়।

১১. মালসা

ভাতের ফেন ঝরানোর পাত্র হিসেবে মালসার পরিচয়। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ সমাজে মালসা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটির তৈরি গামলা সদৃশ্য এই পাত্রটি কোনো কোনো সময়ে দরিদ্র পরিবারে গামলা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

১২. শিঁকা

লোকসমাজে শিঁকার বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। রান্নাঘরে খাবার-দাবার কিংবা কোনো তৈজসপত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে শিঁকা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। সাধারণত পাট, স্থান, খড় বা নারিকেল ছোবড়ার দড়ি দিয়ে শিঁকা তৈরি হয়। স্থানীয় ভাষায় শিঁকাকে ছিহা বলা হয়। আকার, আকৃতি এবং বুণন রীতিতে শিঁকার বিভিন্ন প্রকরণ পরিলক্ষিত হয়। আর এই বৈচিত্র্যময় শিঁকা লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

১৩. হামানদিস্তা/ মুষাল

চাল, ডাল ইত্যাদি ধরনের যেকোনো শক্ত দ্রব্য গুড়া করার জন্য হামানদিস্তার ব্যবহার করা হয়। দুই/আড়াই ফিট উচ্চতা এবং একই পরিধির এক টুকরো গোলাকার গাছের গুড়ির এক প্রান্ত কুঁদে বৃহৎ গামলার আকার দিয়ে হামানদিস্তা তৈরি হয়। এরপর চার/পাঁচ ফিট দৈর্ঘ্যের খুঁটি সদৃশ্য শক্ত একটুকরো সোজা এবং গোলাকার কাঠদণ্ড দ্বারা হামানদিস্তার মধ্যে রাখা দ্রব্যাদি আঘাতের মাধ্যমের গুড়ো করা হয়। আঘাত করার এই দণ্ডটি মুষাল নামে পরিচিত। অল্পসল্প পেষাইয়ের জন্য হামানদিস্তার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

১৪. পাটা/পুতা

গৃহস্থালীর এই উপকরণদ্বয়ও পেষাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্যজীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনে মসলা জাতীয় শস্য পেষণের জন্য পাটা-পুতোর ব্যবহার। পুরোনো দিনে পাটা অর্থাৎ যার উপরে রেখে মসলাদি রাখা হয় এবং পুতো যা দিয়ে পেষণ করা হয় এই দুইটিই পাথর নির্মিত হতো। বর্তমানেও লোক প্রযুক্তিগত এই উপকরণের প্রচলন বাংলাদেশর সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বরিশাল নগরীর হাটখোলায় পাটা-পুতা তৈরি এবং বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা সিলেট অঞ্চল থেকে সাইজ করে কাটা অমসৃণ পাথর খণ্ড কিনে ট্রাক বা কার্গোতে করে বরিশাল আনেন। এর পর হাতে তৈরি হয় পাটা পুতা। যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় হাতুরী এবং ছেনি। অমসৃণ পাথর খণ্ডকে সাইজ অনুযায়ী পাটার আকৃতিতে নিয়ে মসৃণ করা হয় অন্য পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে। একই পদ্ধতিতে পুতা তৈরি করা হয়। পাটার মাথার দিকটা অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার। নিচের দিকটা বর্গাকার কোণের। পাটা এবং পুতা ব্যবহারের আগে তা খোটানো হয়। এর ফলে মসলা বা শস্যদানা মিহি হয়। কয়েকবছর আগেও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে পাটা খোটানোর জন্য লোক পাওয়া যেত। বর্তমানে দেখা যায় না। পাটার উপর বিভিন্ন প্রকার নকশা আঁকা হয়। জমিনের নকশাগুলো কোণাকুণি সমান্তরাল হলেও অর্ধবৃত্তাকার অংশে বাঁকা করে চাঁদ-তারাসহ জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়। বরিশাল হাটখোলা থেকে এই অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে পাটা পাঠানো হয়। বড় এবং মোটামুটি ভালো একটি পাটা-পুতার বর্তমান বাজার মূল্য এক থেকে দেড় হাজার টাকা। সর্বনিম্ন তিনশ টাকাতেও পাটা পুতা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

১৫. জাঁতা

মসলা জাতীয় শস্যাদির ছাড়া অন্যান্য খাদ্য শস্যের খোঁসা ছাড়ানোর জন্য জাঁতা ব্যবহার করা হয়। এক সময়ে জাঁতার বহুল প্রচলন থাকলেও বর্তমানে গৃহস্থালীর এই উপকরণটি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। সাধারণত থালাকৃতির দুটি ভারি পাথরের টুকরো একটির উপরে অন্যটি স্থাপন করে হাতলের সাহায্যে জাঁতার উপরের অংশ ঘুরিয়ে ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করা হয়।

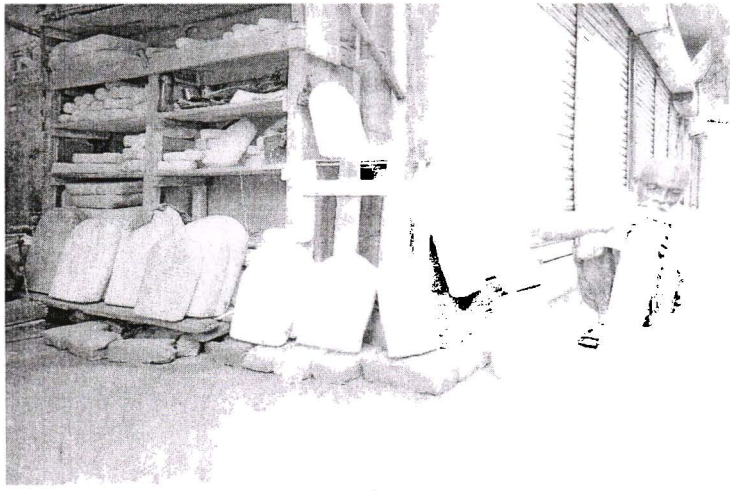

জাঁতা পাটা

১৬. হাত পাখা

গ্রীষ্মের দাবদাহে কৃত্রিম বাতাস সৃষ্টির লক্ষে পাখার ব্যবহার করা হয়। তালগাছের পাতা দিয়ে তৈরি হলেও বরিশাল অঞ্চলে হোগল পাতার পাখাও দেখা যায়। হাত পাখায় কোনো সময়ে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য এবং নকশা করা হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে হাতপাখা বিভিন্ন নামে পরিচিত। কারুকার্য এবং নকশার কারণে লোকসংস্কৃতিতে হাতপাখার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বরিশালের বিভিন্নস্থানে হাতপাখা তৈরি করা হলেও গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী গ্রাম হাতপাখার গ্রাম নামে খ্যাতি পেয়েছে। পাখার মূল উপাদান তালপাতা। তৈরিতে বাঁশের চিকন চেড়া, সুঁই-সুতা এবং রং ব্যবহার করা হয়। আগে ছোট তাল গাছের একটি পাতা দিয়ে সর্বোচ্চ দুটো পাখা তৈরি করা হত। এগুলোয় পাখার ধরনি বা হ্যান্ডেল হিসেবে পাতার আসল ডাট বর্তমান থাকত।

বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড়পাতা গোলাকৃতি কেটে কেটে বাঁশের চেড়ার হ্যান্ডেল ব্যবহার করা হয়। বসন্তের আগমনের সাথে সাথে চাঁদশী গ্রামে পাখা তৈরির ধুম পরে যায়। আসন্ন গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি দিতে বৈদ্যুতিক লোডশেডিংয়ের

www.pathagar.com

সময় শহুরে জনজীবনে পাখার বিকল্প নেই। চৈত্রমাস থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত পাখা তৈরি হয়ে থাকে। ওই তিন মাস চাঁদশী গ্রামের পাখা তৈরিকারী পরিবার মাসে অন্তত পাঁচ হাজার পাখা তৈরি করেন। পাখা তৈরি হবার পর তাতে লাল এবং সবুজ রংয়ের নকশা করা হয়। বাঁশের চেড়ার হ্যান্ডেলযুক্ত একটি পাখার বর্তমান বাজার মূল্য পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। তবে তাল পাতার ডাট সম্বলিত পাখার দাম পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা।

লোকপ্রযুক্তি : পাখা

আমাদের লোকসমাজে তালপাখার উপর নানান ছন্দ লেখার প্রচলন রয়েছে। এর মধ্যে প্রচলিত একটি লেখা হল–

তালের পাখা তালের পাখা
শীতকালেরতে হয় না দেখা
গরমকালে প্রাণের সখা ॥

এছাড়া হৃদয়ঘটিত অনেক আবেদন-নিবেদনের ইঙ্গিতও তালের পাখায় লিখে রেখে যায় আগন্তুকরা। তালের পাখা ছাড়াও হোগলের পাখা এবং কাপরের নকশীপাখা তৈরি করা হয়ে থাকে। গৃহিণীরা কাপরের পাখায় সূচিশিল্পের নকশা তোলেন নিপূণভাবে। গৃহিণীদের সূচিশিল্পের প্রদর্শনী হিসেবে অনেক গৃহস্থ ঘরে পাখা টাঙিয়ে রাখা হয়। আজকাল লোকমেলাগুলোতেও উভয় ধরণের পাখা পাওয়া যায়। মেলা বা বাজারে পাওয়া কাপরের পাখার এক একটির দাম পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো-তিনশ টাকা অবধি হতে পারে। এক্ষেত্রে নকশাই মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা।

www.pathagar.com

১৭. মরই/ডোলা

ধান সংরক্ষণের জন্য মরাই বা স্থানীয় ভাষায় মরই এবং কোনো কোনো এলাকায় ডোলা নামে পরিচিত আধারটির ব্যবহার দেখা যায়। খড় বা বাঁশের তৈরি মরই আকৃতিতে সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে। কাঠ বা বাঁশের মাচার উপরে মরই নির্মাণ করে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার চারদিকে গোবর লেপে দেয়া হয়। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে মরইর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৮. পিছা (ঝাড়ু)

ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য লোকসমাজে ঝাঁটা অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় পিছার বহুল ব্যবহার রয়েছে। নারিকেল পাতার মধ্যকার শলাকা দিয়ে পিছা তৈরি করা হয়। বাঁশের সরু কাঠি কিংবা খেজুরের পাতা দিয়েও পিছা তৈরি হতে দেখা যায়। পিছার সংগে বিভিন্ন লৌকিক বিশ্বাস জড়িত। অত্যাধিক ব্যবহারে পিছার শলাকা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে মুড়োপিছা নামে অভিহিত করা হয়। জমে থাকা ময়লা পরিষ্কারে মুইড়া পিছা (মুড়োপিছা) ব্যবহৃত হয়। বরিশাল অঞ্চলের অধিকাংশ ঝাড়ু প্রস্তুতকারী সাধারণত পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি অথবা খুলনা থেকে শলাকা পাইকারি দরে কিনে এনে সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈরি করা হয়। পিছা তৈরিতে দা ছাড়া তেমন কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। পিছার গোড়ায় কাঠের টুকরা দিতে হয়। নতুবা পিছা ফুলে উঠে না। কাঠের টুকরাটির মাঝ বরাবর কেটে সরু করতে হয়। শলাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরেরেখে শক্ত করে সেই সরু স্থানে পেঁচিয়ে বাঁধতে হয়। আগে পিছা বাধার জন্য বেতের সুতলী ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে গুনা, প্লাস্টিকের দড়ি বা ফিতা ব্যবহার করা হয়। নারকেলের শলাকার পিছা বা ঝাড়ু ছাড়াও ফুলের ঝাড়ুর প্রচলন বাড়ছে শহুরে জীবনে।

পিছা (ঝাড়ু)

www.pathagar.com

১৯. চাই/বুচনা

মাছ ধরার ফাঁদের প্রকরণ হিসেবে চাই এবং বুচনার পরিচয়। লোকসমাজের মৎস্যজীবী বা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে মাছ ধরার জন্য চাই এবং বুচনা নামের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্ষা ঋতুতে ডুবে যাওয়া মাঠ-ঘাটের বা গ্রামীণ সরু নালার পানি নিষ্কাশনের পথে মাছ ধরা এই ফাঁদ পেতে রাখা হয়। বাঁশের তৈরি চাই এবং বুচনা মাছ ধরার উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

২০. গুচা/খুচইন

ছোট জলাশয় কিংবা খাল-বিলে মাছ ধরার জন্য ওচা এবং খুচইন ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারিক দিক থেকে ওচা এবং খুচইনের যথেষ্ট মিল পরিদৃষ্ট হলেও নির্মাণ পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে। বাঁশ নির্মিত ওচা অল্প পানিতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বেশি পানিতে ব্যবহারের জন্য সুতার তৈরি জাল আর বাঁশের সমন্বয়ে খুচইন নির্মিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজে মাছ ধরার এই উপকরণদ্বয় যথেষ্ট জনপ্রিয় বলে পরিদৃষ্ট। খুচইন জাল দিয়ে সাধারণত খালে মাঝ ধরা হয়। ছোট মাছ ধরতে খুইচইনজালের জনপ্রিয়তা সকলধরণের মৎস্য শিকারীদের মাঝে দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু-কিশোররা এই জাল ব্যবহার করে খালে চিংড়ি ধরে থাকে।

২১. খারই

মাছ রাখার জন্যই মূলত খারই ব্যবহার করা হয়।-গ্রামীণ সমাজে দৈনন্দিন বাজারের জন্য থলের বিকল্প হিসেবে খারইর ব্যবহার রয়েছে। বহু ছিদ্র বিশিষ্ট খারই কোনো কোনো স্থানে খালুই নামে পরিচিত।

২২. গড়া

গ্রামীণ মৎস্যজীবীরা পানি নিষ্কাশনের সময়ে মাছ চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য গড়া ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও মাছ ধরার কাজে গড়া ব্যবহার করা হয়। সুপারি গাছ কিংবা বাঁশের তৈরি মোটা শলাকা দিয়ে গড়া তৈরি করা হয়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নিকট গড়া অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে বিবেচিত।

২৩. চুঙ্গা

ছোট জলাশয় বা খালে সহজে মাছ ধরার জন্য চুঙ্গা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুপারি গাছের ফালি কিছুদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ভেতরের অংশ পচে যায়। পচে যাওয়া ভেতরের অংশ খুড়ে উপরের শক্ত অংশ মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যারা চুঙ্গার সাহায্যে মাছ ধরেন তারা চুঙ্গার একদিক আটকে তার ভেতরে খৈল-কুড়া-ভুষি ইত্যাদি দিয়ে খালের নিদৃষ্টস্থানে ডুবিয়ে বেঁধে রাখেন। দুই /তিন দিনের মধ্যেই মাছ বেশি পরিমাণ জমানো খাবারের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই চুঙ্গার মধ্যে ঢুকে থাকে। আর শিকারি চুঙ্গা উঠিয়ে নিয়ে মাছ সংগ্রহ করে থাকেন।

www.pathagar.com

অলস মৎস্য শিকারিরা এই পদ্ধতিতে মাছ ধরতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। সাধারণত খালে চুঙ্গা পেতে রাখা হয়। চুঙ্গায় বেলেমাছ ধরা পড়ে বেশি। এছাড়া সলাচিংড়ি ধরার আশায় শিকারিরা চুঙ্গা ব্যবহার করেন।

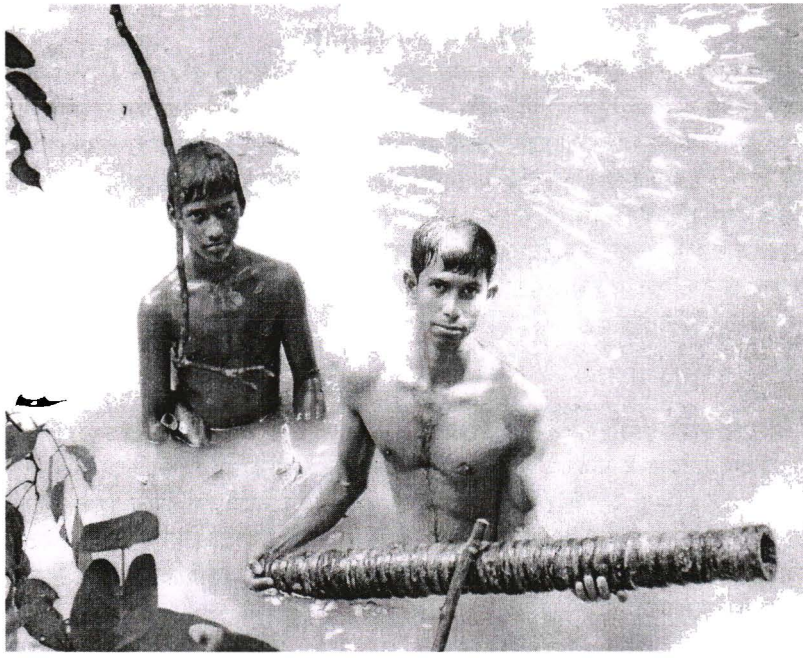

মাছ ধরার চুঙ্গা

২৪. ঠুঁই

গরু-মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মুখোশ হিসেবে ঠুঁসি বা ঠুইয়ের পরিচয়। গ্রামীণ সমাজে আদিম প্রক্রিয়ায় ফসল মাড়াইয়ের সময়ে পশুর নিকট থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য ঠুঁইয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ফসলের ক্ষেত রক্ষার্থে পশুর মুখে ঠুঁই ব্যবহার করা হয়। অনেকটা বাটি আকৃতির ঠুঁই সাধারণত বেত নির্মিত হয়ে থাকে। ফসলের ঋতুতে ঠুঁইয়ের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

২৫. ছাবি

বাংলার দক্ষিণ প্রান্তের গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের নিকট মাছ ধরার এই উপকরণটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আয়তকার এক টুকরো পুরানো কাপড়কে কায়দা করে আড়াআড়ি করা দুইটি বাঁশের কঞ্চির সাথে আটকে রেখে ছবি তৈরি করা হয়। ধানের কুঁড়া মাটিতে মিশিয়ে, ছাবির ঠিক মধ্যখানে রেখে আস্তে করে পানিতে নামিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কুঁড়ার আকর্ষণে চিংড়ি এবং অন্যান্য ছোট মাছ ছাবির মধ্যে এসে পড়ে। ছাবি পানিতে নামানোর খানিক পরে আস্তে করে তুলে নিলে বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ পাওয়া যায়। ছাবির মাধ্যমে পরিশ্রমবিহীন মাছ ধরার এই পদ্ধতি লোকজীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

২৬. লাঙল/ জোয়াল

সুপ্রাচীনকাল থেকে কৃষিকর্মে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লাঙলের গঠন কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। এই কৃষিউপকরণটির মাঝারি মোটা ভারী একখণ্ড কাঠের শরীরের একপ্রান্তে জিহ্বার মতো লাগানো থাকে লোহার সুঁচালো ফলা। অন্যপ্রান্তে থাকে লাঙল মুঠি করে ধরার ব্যবস্থা। লাঙলের মধ্যবর্তী স্থান থেকে যে কাঠের খণ্ড জোয়ালের সাথে গ্রন্থিত হয় সেটা ইষ নামে পরিচিত। ফসলের ক্ষেতে লাঙল টানার জন্য গরু-মহিষের কাঁধে যে বক্রাকার কাঠ ব্যবহার করা হয়, সেটা জোয়াল নামে পরিচিত। ফসলের মাঠে লাঙল-জোয়াল সব থেকে পরিচিত কৃষিযন্ত্র। কৃষি কাজের এই উপকরণটি নিয়ে বহু ধাঁধা এবং গান রচিত হয়েছে।

২৭. কারাইল্যা

মাড়াইয়ের সময় পশুর পদদলনে এলোমেলো হয়ে যাওয়া ফসল সুবিন্যস্ত করার জন্য কারাইল্যা ব্যবহার করা হয়। চার/পাঁচ ফিট দৈর্ঘ্যের একটুকরো বাঁশের দণ্ডকে আঁকশি হিসেবে তৈরি করা হলেই সেটা স্থানীয়ভাবে কারাইল্যা নামে পরিচিতি লাভ করে। তিন/চার ইঞ্চি কঞ্চিসহ এক টুকরো বাঁশ কেটে নিয়ে এই আঁকশি বা কারাইল্যা তৈরি করা হয়। অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে তৈরি কারাইল্যা ফসল মাড়াইয়ের সময়ে বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হয়।

২৮. টোনা

পেশাদার খেজুর রস আহরণকারীদের মধ্যে টোনা নামের এই লোকউপকরণটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। খেজুর গাছ থেকে রস নিস্বরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ এই থলে সদৃশ্য টোনায় সংরক্ষণ করা হয়। বেত বা বাঁশ নির্মিত টোন দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই হয় বলে পেশাজীবীদের মধ্যে এই উপকরণটির বিশেষ কদর রয়েছে।

২৯. তেক্যাইট্যা

গ্রামবাংলার লোকবিশ্বাস অনুসারে ছাগলে খাওয়া বৃক্ষ-লতাদির কোনো বাড়ন হয় না বলে, গৃহস্থের শাক-সবজি বা ফসলের ক্ষেত রক্ষার্থে ছাগলের গলায় ব্যবহৃত কাঠ নির্মিত বিশেষ ধরনের প্রতিরোধক বন্ধনী স্থানীয়ভাবে তেকাইট্যা নামে পরিচিত। দুই/আড়াই ফিট দৈর্ঘ্য এবং দুই/আড়াই ইঞ্চির তিনটি কাঠ ত্রিভূজাকৃতি করে ছাগলের গলায় পরিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে ক্ষেতের বেড়ার কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছাগল প্রবেশ করতে না পারে। গ্রামবাংলায় ক্ষেত রক্ষার এই আদিম পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

৩০. ঢেঁকি

দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত লোকসমাজের যে সকল উপকরণের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে ঢেঁকি তার অন্যতম। গ্রামীণ সমাজে ধানের খোসা ছাড়ানোর জন্য পদচালিত এই যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। প্রথমে ভারী এক টুকরো কাঠের একদিকে সরু করে অন্যদিকে আরেকটি কাঠের মূষল লাগানো হয়। তারপর ঢেঁকির অর্ধাংশের কিছুটা নিচে আড়াআড়িভাবে গোলাকার আরেক টুকরো কাঠ লাগিয়ে নেয়া হয়। এরপর ঢেঁকিটিকে তাল বা নারিকেল গাছের তৈরি খুঁটির সংগে লাগিয়ে নিলেই ঢেঁকি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। মহিলারা সরু অংশে বারবার বলপ্রয়োগ করে ধানের খোসা ছাড়ানোর কাজ করে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের হিন্দু সমাজেও ঢেঁকি দেবতা জ্ঞানে পূজিত হয়। দেবতা নারদের বাহন হিসেবেও ঢেঁকির আলাদা মূল্য হিন্দু সমাজে। লোকসংস্কৃতির অন্যতম এই উপকরণ, ঢেঁকিকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন এবং সংগীতের প্রচলন রয়েছে।

৩১. পাচোইন

বেয়াড়া গরু-মহিষ শায়েস্তা করার জন্য গ্রামাঞ্চলে পাচোইনের ব্যবহার রয়েছে। অত্যন্ত শক্ত কোনো গাছের ডাল বা বাঁশের টুকরো দিয়ে পাচোইন নামের লাঠি তৈরি করা হয়। এবং এই বিশেষ কাজেই পাচোইন ব্যবহার করা হয়। গ্রামের রাখাল সম্প্রদায়ের নিকট পাচোইন অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিবেচিত।

৩২. হাঁড়িকাঠ

দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত এককোপে পশুর গলা ছেদন করার জন্য তৈরি করা কাঠের বিশেষ সামগ্রী হাঁড়িকাঠ নামে পরিচিত। মন্দির প্রাঙ্গন ছাড়াও গ্রামের কিছু নির্দিষ্ট এলাকা বা লৌকিক দেবতার থানে হাড়িকাঠ প্রোথিত থাকতে দেখা যায়। যদিও শুধুমাত্র বলি দেওয়ার সুবিধার হাঁড়িকাঠ ব্যবহার করা হয়, তা সত্ত্বেও গ্রামীণ লোকসামজে হাঁড়িকাঠটিকেও যথেষ্ট গুরুত্বসহ তারে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে হাঁড়িকাঠ কাঠগড়া নামে পরিচিত।

৩৩. বাঁক

ভারী কোনো মাল বিশেষ করে তরল পদার্থ ব্যবহারের জন্য কাঁধে বাহিত দণ্ড ভারবাঁশ নামে পরিচিত। কোনো স্থানে এই মালবাহী দণ্ডটি বাঁক নামেও পরিচিত। সাধারণত পাকা বাঁশ দিয়ে ভারবাঁশ তৈরি হয়ে থাকে।

৩৪. চরকি

গ্রামবাংলার শিশু-কিশোরদের কাছে নারিকেল বা খেজুরের পাতা নির্মিত হওয়ায় ঘোরা চরকি নামের খেলনাটির বিশেষ কদর রয়েছে। এছাড়া নারিকেল পাতার তৈরি সাপ বা

www.pathagar.com

নারিকেল শাখার গোড়ার অংশ বিশেষ থেকে তৈরি ঘোড়া শিশুদের মনোরঞ্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩৫. গুলতিবাঁশ

গুলতিবাঁশ নামের এই আদিম অস্ত্রটি পাখি শিকারের জন্য লোকসমাজে ব্যবহার করা হয়। তিন/চার ফিট লম্বা একটুকরো পাকা বাঁশ ফেঁড়ে নিয়ে তাতে ধনুকের মতো দুটি ছিলা পরিয়ে নেয়া হয়। ছিলার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে শক্ত সুতা দিয়ে মাটি নির্মিত গুলি ছোড়ার ব্যবস্থা রাখা হলেই গুলতিবাঁশ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। তীর ছোঁড়ার মতো করে গুলতিবাঁশ থেকে মাটির গুলি ছোঁড়া হয়ে থাকে। কুশলীহাতে পাখি শিকারের এই অস্ত্রটি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে বলে আত্মরক্ষার জন্যও গুলতিবাঁশের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের জাল, হাপর, ইন্দুর মারার কল, ঘানি বারশালের সর্বত্র দেখা যায় বা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

লোকভাষা

মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। একমাত্র মানুষই সীমিত সংখ্যক অর্থবোধক শব্দ দিয়ে অসীম বাক্য নির্মাণের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। শব্দের সুষম বিণ্যাসে বাক্য এবং অর্থবোধক বাক্য সমন্বয়ে ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা হলেও মনের ভাব প্রকাশে সব মানুষ একই ভাষা নির্ভর নয়। জাতি এবং অঞ্চলভেদ ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর সে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহে এবং দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। লোকভাষার সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিভিন্ন বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। সেই সকল যুক্তিতর্ক পরিহার করে অতি সহজভাবে কোনো আঞ্চলিক ভাষার চলিত রূপকে সেই স্থানের লোকভাষা বলা যেতে পারে। বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলি লোকভাষা, নানা বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। এই এলাকার ভোলা অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য এলাকায় ব্যবহৃত চলিত অর্থাৎ লোকভাষার শব্দ ও উচ্চারণে সামান্য তারতম্য থাকলেও মূল কথ্যভাষায় সাযুয্য পরিলক্ষিত। এখানকার লোকভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উচ্চারণ : **এক.** শব্দের আদিতে শ, ষ, ও স ধ্বনি হ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : শিয়াল > হিয়াল, শাক > হাক, শাপলা > হাপলা, শামুক > হামুক, সকল > হগল ইত্যাদি। **দুই.** শব্দের আদিতে ক, ত এবং ফ ধ্বনি কখনও কখনও হ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : কর কি > হর কি, কতা কেন > হ্যা ক্যা, ফেলে দাও > হালাইয়া দ্যাও ইত্যাদি। কখনও কখনও শব্দের মধ্যবর্তী ক বর্ণও হ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– আকাল > আহাল ইত্যাদি। **তিন.** দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের শেষে ট বা ঠ বর্ণ থাকলে তা ড ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : মিঠা > মিডা, পিঠা > পিডা, বেটা > ব্যাডা, সেটা > হেডা ইত্যাদি। **চার.** শব্দের আদিতে হ বর্ণ থাকলে কখনও কখনও তা লোপ পায়। যেমন : হাল > আল, হলো > অইল ইত্যাদি। **পাঁচ.** বিশেষ্যের শেষে গো ধ্বনি যোগ করে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন : আমাদের > আমাগো, তোমাদের > তোমাগো, তাহাদের > হ্যাগো ইত্যাদি। **ছয়.** কোনো কোনো ক্রিয়া না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হলে ক্রিয়ার অন্তে বুজি বা বোচন অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন : > যাও বুজি বা যান বোচন, খেওনা > খাও বুজি বা খাও বোচন ইত্যাদি। **সাত.** কখনও মূল ক্রিয়ার শেষে আনে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন : করব > করমু আনে, যাবো > যামু আনে, বলব > বলমু আনে ইত্যাদি। **আট.** কখনও কখনও মহাপ্রাণ ধ্বনি খ, ঘ, ছ এবং ঝ ইত্যাদি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন : ঘর > গর, ভাত > বাত, ধান > দান ইত্যাদি। **নয়.** কর্তৃকারক ভিন্ন অপরাপর কারক ও সম্বন্ধপদের বহুবচনে স্বরান্তিক শব্দে গো এবং ব্যঞ্জনান্তিক শব্দে এগা ব্যবহৃত হয়। যেমন : মোগো, পোলাগো, সায়েবেগো। **দশ.** দ্বিতীয় বিভক্তি হিসেবে কে-এর পরিবর্তে সাধারণতঃ রে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ সাধুকে > সাধুরে। **এগারো.** ক্রিয়ারূপ সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন : বলিয়াছে > বলছে। **বারো.** অসমাপিকা

www.pathagar.com

ক্রিয়ার ইয়া প্রত্যয় ধাতুর সংগে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র সিলেবল রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : মারিয়া > মার- ইয়া, করিয়া > কর-ইয়া। **তেরো.** উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার শেষে ব, ইব স্থলে মু হয়। যেমন: যাইব> যামু, করব > করমু। নিম্নে বরিশাল অঞ্চলের লোকভাষার ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের উল্লেখ করা হলো বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত এই সকল শব্দ, বৃহত্তর বরিশালের লোকভাষাকে চিহ্নিত করতে বিশেষ সহায়ক হবে।

এক. কাল সময়

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
ভোর ব্যান	বেইন্যাকাল
দুপুর	দুফার
বিকেল	বিয়াল
সন্ধ্যা	সন্দা
রাত	রাইত
সময়	সোমায়
অন্ধকার	আন্দার

দুই. পদবি

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
চৌকিদার	চহিদার
হাওলাদার	হালাদার
মৃধা	মেরদা
খাঁন	খা
জমাদ্দার	জোমাদ্দার
শিকদার	হিকদার
মিয়া	মেয়া

তিন. শাক-সবজি, ফল-ফলাদি

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
তরকারী	আনাজ
শাক	হাক
বেগুন	বাইগুন
চিচিঙ্গা	র‍্যাহা
লাউ	কদু
কুমড়া	কুমার
কলা	ক্যালা
জামরুল	জাম্বুল
খেজুর	খাজুর

www.pathagar.com

লিচু	লেচু
বাতাবী লেবু	ছোলম
আখ	আউক
পেঁপে	কোম্বা

চার. আত্মীয়-স্বজন

সাধুরূপ	লোকরূপ
চাচা	দুদু
মামা	মামু
মামী	মামানী
ফুপা	হুবা
ফুফু	হুবু
শ্বশুর	হউর
শাশুড়ি	হাউরি
ছেলে	পোলা
মেয়ে	মাইয়া
ভাবী	ভাউজ

পাঁচ. পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বিষয়ক

সাধুরূপ	লোকরূপ
কুকুর	কুত্তা
বিড়াল	বিলাই
মোরগ	মুরহা
সজারু	হ্যাজা
সাপ	হাপ
গুইসাপ	গুইল
পিপঁড়া	পিরহা
ইঁদুর	ইন্দুর
ছারপোকা	উরাশ
প্রজাপতি	পরদা

ছয়. খাদ্যদ্রব্য মসল্লা

সাধুরূপ	লোকরূপ
লবণ	নুন
তেল	ত্যাল
পিয়াজ	পেইজ
রসুন	রোহন

www.pathagar.com

সরিষা	হউর‍্যা
মিষ্টি	মিডা
পিঠা	পিডা

সাত. প্রকৃতি পরিবেশ

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
বাতাস	বাসাত
নদী	গাঙ
ছোট খাল	হোতা
চাষের জমি	কোলা

আট. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
পাতিল	পাইলা
পাত্র	ভাণ্ড
কাটারি	দাও
জাঁতি	সরতা
রশি	দরি

নয়. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
মেরুদণ্ড	মেইদারা
ঘাড়	ঘেডি
গোঁফ	মোচ
থুথু	ছ্যাপ
চামড়া	চাম
পশম	রোমা

দশ. বিবিধ

সাধুরূপ	**লোকরূপ**
খাদ্য	খাওন
শপথ	কিরা
অকর্মণ্য	আনাডা
সামনে	হোম্মে
এখানে	এম্মে
ওখানে	ওম্মে
কোথায়	কোম্মে
ভোগান্তি	ছিদ্‌দাৎ
পুল	হাক্কা

www.pathagar.com

সহায়কগ্রন্থ

১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২. কমল চৌধুরী (সম্পাঃ), *বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।
৩. তপংকর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), *সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব : স্মারক পুস্তিকা*, বরিশাল প্রেসক্লাব, বরিশাল, ২০০০।
৪. নিখিল সেন (আহ্বায়ক), *বরিশালে মুক্তিদ্ধের সূচনাকেন্দ্র* উৎসব-৯৩, বরিশাল।
৫. রতন লাল চক্রবর্তী (সম্পাঃ), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৬. *বাংলা পিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৭. বরিশাল জেলা কমান্ড, ১৯৯৬, বরিশাল।
৮. মিজান রহমান (সম্পাঃ), *বৃহত্তর বরিশালের লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড)*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।
৯. মিন্টু বসু (সম্পাঃ) *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর স্মারক গ্রন্থ*, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা ১০. ১১. সংসদ মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, সৈকত আসগর (সম্পাঃ), *বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য*, প্রকাশকঃ অমৃত লাল দে, বরিশাল, ১৯৮৯।
১২. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাঃ), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, বাকেগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রকল্প, বরিশাল, ১৯৯০।
১৩. সাইফুল আহসান বুলবুল, *বৃহত্তর বরিশালের লোকসংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০।
১৪. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস*, প্রকাশকঃ আলহাজ্ব কাজী হারুনুর-রশিদ, ঢাকা, ১৯৮৫।
১৫. সুশান্ত ঘোষ, দেবাশীষ চক্রবর্তী (সম্পাঃ), *কালের ধ্বনি*, বরিশাল, ২০১২।
১৬. সৈয়দ দুলাল (সম্পাঃ), *আনন্দ লিখন*, বরিশাল।
১৭. হুমায়ুন রহমান, বরিশালের প্রবাদ, নার্গিস প্রকাশনী (পঞ্চম মূদ্রণ), ঢাকা, ২০১১।
১৮. ঐ, বরিশালের লোককাহিনী, আপন প্রকাশ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা, ২০০৪।
১৯. ঐ, বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা, গাউসিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯।

সহায়তা প্রদান করেছেন যাঁরা

আ. জলিল বয়াতি, রূপাতলী, বরিশাল।
কবিয়াল রবি সরকার, হারতা, উজিরপুর, বরিশাল।
মানিক শীল, চরকাউয়া, বরিশাল সদর, বরিশাল।

www.pathagar.com

নিমাই দেউরি, হারতা, উজিরপুর, বরিশাল।
ডাক্তার রফিকুল ইসলাম সিরাজী, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।
নিখিল সেন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ঝাউতলা, বরিশাল।
অধ্যক্ষ তপংকর চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
অধ্যাপক অজয় কুমার সন্যামত, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
অধ্যাপিকা ফয়জুন্নাহার শেলী, ইসলামিয়া কলেজ, বরিশাল।
অধ্যাপিকা টুনু রাণী কর্মকার, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
অধ্যাপিকা আসমা চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজ, বরিশাল।
অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মজুমদার, অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।
অধ্যাপক নাসের জামাল, কাউনিয়া বরিশাল।
প্রবীর বিশ্বাস ননী, সাংবাদিক, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
সেলিম রেজা, সাংবাদিক, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
শ্যামল সেন, কাউনিয়া, বরিশাল।
আরিফুর রহমান, সাংবাদিক, বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি, বরিশাল।
মিজানুর রহমান, সাংবাদিক, বরিশাল প্রেসক্লাব বরিশাল।
সুধীর তালুকদার, অমৃত লাল দে সড়ক, বরিশাল।
বিশ্বনাথ দাশমুন্সি, সভাপতি বরিশাল উদীচী শিল্প গোষ্ঠী, বরিশাল জেলা শাখা।
অনিমেষ সাহা লিটু, নাট্যকর্মী, শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার, বরিশাল।
প্রভাষক বাদল বিশ্বাস, বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
দিলীপ খাসকেল, বাজার রোড, বরিশাল।
তপন কুমার শীল, বাজার রোড, বরিশাল।
জয়দেব কুমার শীল, বাজার রোড, বরিশাল।
জহর শাখারী, বাজার রোড, বরিশাল

www.pathagar.com

www.pathagar.com